আবুল কালাম আযাদ

উম্মুল কুরআন

অনুবাদ ঃ আখতার ফারূক

ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ

অনুবাদকের নিবেদন

মরহুম মওলানা আবুল কালাম আযাদ পাকিস্তানে শুধু বিতর্কিতই ছিলেন না, নিন্দিতও ছিলেন। পাকিস্তানের সেই গোড়ার দিকের কথা। তখন এ দেশে তাঁর নাম নেওয়াও ছিল মহাপাপ। ঠিক তেমনি মুহূর্তে আমি মওলানার 'আসহাবে কাহাফ' 'হযরত ইউসুফ' 'আফসানাই হিজর বিছাল' (যে সত্যের মৃত্যু নেই), 'কওলে ফয়সল' (জবানবন্দী) ও সিরাতুল মুস্তাকীম (গন্তব্যের রাজপথ) অনুবাদ করি। পয়লা দু'টি পাক কিতাব ঘর, তৃতীয়টি ইসলামিয়া লাইব্রেরী, চতুর্থটি পাকিস্তান বুক কর্পোরেশন ও পঞ্চমটি জুয়েল লাইব্রেরী প্রকাশ করে। তা ছাড়া মওলানার অনূদিত 'মুসলমান আওরাত' 'ইসলামের দৃষ্টিতে নারী' নামে অনুবাদ করে ইসলামিয়া লাইব্রেরীকে প্রকাশ করতে দেই। এ বইগুলো বাজারে যে তুমুল আলোড়ন সৃষ্টি করল তাতে তদানীন্তন পূর্বপাক সরকার সম্ভবত উদ্বিগ্ন হলেন। আর এ কারণেই হয়ত বাংলা একাডেমীর তৎকালীন ডিরেক্টর সাহেব আমাকে ডেকে মওলানার বহুবিধ কুৎসা শুনিয়ে এহেন মওলানাকে এ দেশে চালু করার গরজে ভারত আমাকে কি পরিমাণ অর্থ যোগান দিচ্ছে সেটাই জানতে চাইলেন। নিঃসন্দেহে তাতে হতভম্ব হয়েছিলাম। তার চাইতেও হতবুদ্ধি হলাম তখনই, যখন সেই ডিরেক্টর সাহেবই আবার বাংলা একাডেমী থেকে মওলানার 'উম্মুল কুরআন' অনুবাদ করার জন্য আমাকে ডেকে পাঠালেন। তখন আলেকজাণ্ডারের ভাষায়ই আমাকে বলতে হলো ঃ সেলুকাস, কত বিচিত্র এ দেশ!

সম্ভবত উনিশ শ' চৌষট্টিতে বাংলা একাডেমীকে 'উম্মুল কুরআন' অনুবাদ করে দেই। ছাপতে নিঃসন্দেহে দু'-চার বছর নিয়েছিল। তাই ভূমিকা লেখার সময় সুযোগ আমার ভাগ্যে জুটেনি। এডিশনও তাদের দু'-এক বছরেই শেষ হয়েছিল। তা বলে পুনর্মুদ্রণের গরজ আর তাদের কখনও দেখা দেয়নি। হয়ত ভিতরে ভিতরে বাংলা একাডেমীকে ধর্ম-কর্ম থেকে পাক-পবিত্র করার ফয়সালা হয়ে গিয়েছিল। সেটা সদরে ঘোষণার সুযোগ পেল এসে বাংলাদেশে। অগত্যা তাদের সেই পরিত্যক্ত বস্তুটি এনে চাপালাম বুক সোসাইটির মুস্তফা কামাল সাহেবের ঘাড়ে। তার হাতেই প্রকাশ পেল এর দ্বিতীয় সংস্করণ। এক্ষণে ইসলামিক ফাউন্ডেশন এর তৃতীয় সংস্করণ প্রকাশের ভার নিল। আর তা মুদ্রণের দায়িত্ব চাপাল আমারই জুলকারনাইন প্রেস-এর ওপর। ফলে দায়ে পড়ে হলেও বহুদিনের করা কাজটির ওপরে নতুন করে একবার চোখ বুলাবার সুযোগ পেলাম। এতে বইটির হয়তো কিছু ভালই হলো।

মওলানা আযাদ কুরআনের তফসীরেও হাত দিয়েছিলেন। নাম দিয়েছিলেন তর্জমানুল কুরআন। সেই তর্জমানুল কুরআন থেকে সূরা ফাতিহার তফসীর আলাদা করে নাম দেয়া হলো 'উম্মুল কুরআন।' 'উম্মুল কুরআন' নিঃসন্দেহে মওলানার শ্রেষ্ঠতম বিস্ময়কর সৃষ্টি। গোটা কুরআনের নির্যাস তিনি তুলে ধরেছেন কুরআনের ভূমিকাটির ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণে। মওলানার তর্জমানুল কুরআন পুরোপুরি অনূদিত হলে বাংলা ভাষাভাষীরা অধিকতর উপকৃত হবে। আর তা সম্পন্ন করার দায়িত্ব স্বভাবতই ইসলামিক ফাউন্ডেশনের ওপরে বর্তায়। এমন কি মওলানার সমগ্র রচনাই যদি ফাউন্ডেশন বাংলা ভাষাভাষীদের উপহার দিতে পারে সেটা সত্যিই তাদের গর্বের ব্যাপার হবে।

বিনীত
আখতার ফারূক
৬/৬/৮০

উম্মুল কুরআন
মূল ঃ আবুল কালাম আযাদ
অনুবাদ ঃ আখতার ফারূক

ইফাবা প্রকাশনা ঃ ৫১৭/২
ইফাবা গ্রন্থাগার ঃ ২৯৭.১২২৫
ISBN : 984-06-0687-5

পঞ্চম মুদ্রণ (ইফাবা তৃতীয়)
নভেম্বর ২০০২
কার্তিক ১৪০৯
রমজান ১৪২৩

প্রকাশক
মোহাম্মদ আবদুর রব
পরিচালক, প্রকাশনা বিভাগ
ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ
আগারগাঁও শেরেবাংলা নগর, ঢাকা-১২০৭

মুদ্রণ ও বাঁধাই
মুহাম্মদ মুনসুরউদ্‌দৌলাহ্ পাহ্‌লোয়ান
প্রকল্প ব্যবস্থাপক (ভারপ্রাপ্ত)
ইসলামিক ফাউন্ডেশন প্রেস
আগারগাঁও শেরেবাংলা নগর, ঢাকা-১২০৭

প্রচ্ছদ
জসিমউদ্দিন

মূল্য ঃ ৫২.০০ টাকা

UMMUL QURAN : (The Preface to the Holy Quran): written by Abul Kalam Azad in Urdu, translated by Akhter Farooq into Bangla and published by Islamic Foundation Bangladesh, Agargaon, Sher-E-Bangla Nagar, Dhaka-1207. November 2002

Price : Tk .52.00 ; US Dollar : 2.00

প্রকাশকের কথা

কুরআনুল করীম সর্বশেষ ও সর্বশ্রেষ্ঠ আসমানী কিতাব। আল-কুরআন মানুষের ইহকাল ও পরকালের পথ-নির্দেশক। মানব জাতির হেদায়াতই এর মূল উদ্দেশ্য।

পবিত্র কুরআনের প্রারম্ভিক সূরা, সূরায়ে ফাতিহা কুরআনের মূল নির্যাস। এতে রয়েছে ওয়াহদানিয়াত, রবুবিয়াত, ইবাদাত, রিসালাত, হেদায়াত, সৎকর্ম, প্রার্থনা ইত্যাদি, যা ইসলামের মৌলিক বিষয়। এই জন্যই এই সূরাকে উম্মুল কুরআন বা কুরআনের জননী হিসেবে আখ্যায়িত করা হয়েছে।

উপমহাদেশের প্রখ্যাত ইসলামী চিন্তাবিদ, রাজনীতিক ও সুলেখক মওলানা আবুল কালাম আযাদ রচিত 'উম্মুল কুরআন' এই বিষয়ে একটি আকরগ্রন্থ। তিনি কুরআন মজীদের প্রথম সূরা আল-ফাতিহার তাফসীর 'উম্মুল কুরআন' উর্দু ভাষায় রচনা করেন। সূরা আল-ফাতিহার উক্ত তাফসীর 'উম্মুল কুরআন' ইসলামী সাহিত্য এবং তাফসীর শাস্ত্রে এক বিশেষ মর্যাদায় অধিষ্ঠিত। গ্রন্থটির প্রাঞ্জল ও সাহিত্যসম্মত অনুবাদ করেছেন বিশিষ্ট অনুবাদক, লেখক ও সাহিত্যিক অধ্যাপক আখতার ফারূক।

ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ থেকে 'উম্মুল কুরআন'-এর চতুর্থ সংস্করণ ১৯৮৬ সালে প্রকাশিত হবার পর পাঠক মহলে তা ব্যাপক সাড়া ফেলে। এবার এর পঞ্চম সংস্করণ প্রকাশিত হলো। আমরা আশা করি বইটি পূর্বের মতোই সুধী পাঠকদের জ্ঞানের স্পৃহা মেটাতে সক্ষম হবে। আল্লাহ্ তা'আলা আমাদের সকলকে কুরআন মজীদ বোঝা এবং সে অনুযায়ী চলার তৌফিক দান করুন। আমীন!

মোহাম্মদ আবদুর রব
পরিচালক
প্রকাশনা বিভাগ
ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ

সূচিপত্র

এক	ঃ	সূরার গুরুত্ব ও বৈশিষ্ট্য	১১
দুই	ঃ	আলহামদু লিল্লাহ্	১৮
তিন	ঃ	রাব্বিল 'আলামীন	২৩
চার	ঃ	আর-রহমানির-রহীম	৫৬
পাঁচ	ঃ	মালিকি ইয়াওমিদ্-দীন	১২২
ছয়	ঃ	ইহ্দিনাস্ সিরাতাল মুস্তাক্বীম	১৮৬

এক

সূরার গুরুত্ব ও বৈশিষ্ট্য

কুরআন মজীদের সূরা বলিয়া ইহার নাম দেওয়া হইয়াছে 'ফাতিহাতুল কিতাব' বা গ্রন্থের প্রারম্ভিকা।

যে কথা অধিক গুরুত্ব রাখে, স্বভাবতই তাহা শীর্ষস্থান অধিকার করিয়া থাকে। এই সূরাটি কুরআনের সকল সূরার ভিতরে বিশেষ গুরুত্বের অধিকারী। তাই স্বভাবতই ইহা পবিত্র গ্রন্থে যথাযথ স্থান লাভ করিয়াছে। কুরআনের প্রথম পৃষ্ঠায়ই ইহা সন্নিবেশিত হইয়াছে।

বস্তুত, কুরআন মজীদেও ইহার উল্লেখ এমনভাবে করা হইয়াছে, যাহাতে সহজেই ইহার অপরিসীম গুরুত্ব অনুধাবন করিতে পারা যায়। যেমন ঃ

وَ لَقَدْ اٰتَيْنٰكَ سَبْعًا مِّنَ الْمَثَانِىْ وَالْقُرْاٰنِ الْعَظِيْمِ -

হে রসূল ! ইহা ঠিক যে, আমি আপনাকে সাতটি 'নিত্য পাঠ্য বাণী' ও মহান কুরআন দান করিয়াছি। (১৫ ঃ ৮৭)

হাদীস ও সাহাবাদের বাণী হইতে সুপ্রমাণিত হইয়াছে যে, এখানে 'সাতটি নিত্য পাঠ্য বাণী' দ্বারা এই সূরাকেই বুঝানো হইয়াছে। কারণ ইহাতে সাতটি আয়াত রহিয়াছে এবং সব নামাযেই ইহা পাঠ করা হয়। এই কারণেই সূরাটির অপর নাম দেওয়া হইয়াছে 'আস্‌সাবউল মাসানী' বা 'নিত্য পাঠ্য বাণী সপ্তক'।[১]

'কালামে রসূল' ও 'কালামে সাহাবায়' ইহার আরও কয়েকটি নামের উল্লেখ দেখা যায়—উহা দ্বারা এই সূরার বৈশিষ্ট্য আরও সুপরিস্ফুট হইয়া উঠে। যথা—উম্মুল কুরআন (কুরআন-জননী), আল-কাফিয়া (সম্পূরক), আল-কাঞ্জ (অনন্য ভাণ্ডার), আসাসুল কুরআন (কুরআনের ভিত্তিমূল)।[২]

যে বস্তুর ভিতরে বহু বস্তুর সমাবেশ বুঝায়, কেবল সেই বস্তুর ক্ষেত্রেই আরবীতে 'উম্মুন' শব্দের প্রয়োগ দেখা যায়। অন্য কথায় বলা যায়, অনেক বস্তুর ভিতরে সর্বাধিক গুরুত্বপূর্ণ বস্তুটি অর্থাৎ যাহা সবকিছুর উপরে প্রাধান্য লাভ করে শুধু সেইটির বেলায়ই 'উম্মুন' শব্দের প্রয়োগ ঘটিয়া থাকে। কিংবা যে উর্ধ্বতন বস্তু হইতে অনেক

---

১. ইমাম বুখারী ও আসহাব-ই-সুনান আবূ সাঈদ ইবনুল মু আল্লাহ্‌র উদ্ধৃতি দিয়া বর্ণনা করেন ঃ
اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعٰلَمِيْنَ هِىَ السَّبْعُ الْمَثَانِىْ وَالْقُرْاٰنِ الْعَظِيْمِ الَّذِىْ اُوْتِيْتُهٗ

২. সহীহ্ বুখারী, মু'আত্তা, আবূ দাউদ ,ইবনে মাজা ও মস্‌নদ ইত্যাদি হাদীস সংকলনে ভাষার সামান্য ওলট-পালট সহকারে এই একই বিষয়ের বর্ণনা রহিয়াছে।

বস্তুর সৃষ্টি অথবা অনেক বস্তুই উহার অনুসারী, সেইরূপ কিছুর বেলায়ও এই শব্দের ব্যবহার দেখিতে পাওয়া যায়।

অর্থাৎ 'আস্‌সাবউল মাসানী' বলিতে সূরা আলহামদু ও 'কুরআনে আযীম' বলিতে অবতীর্ণ গ্রন্থ বুঝানো হইয়াছে।

এবং ইমাম মালিক, তিরমিযী ও হাকাম হযরত আবূ হুরায়রার উদ্ধৃতি দিয়া বলেন, রসূলে করীম (সা) উবায় বিন কা'বকে সূরা ফাতিহার তাল্‌কীন দিয়াছিলেন এবং অনুরূপ মন্তব্য করিয়াছিলেন।

এইভাবে তাবারী হযরত উমর (রা), হযরত আলী (রা), হযরত ইবনে আব্বাস (রা) ও ইবনে মাসউদ (রা) প্রমুখের উদ্ধৃতি দিয়া বলেন ঃ

اَلسَّبْعُ الْمَثَانِىْ هِىَ فَاتِحَةُ الْكِتَابِ –

অর্থাৎ আস্ সাবউল মাসানী (নিত্য পাঠ্য বাণী সপ্তক) বলিতে সূরা ফাতিহাকে বুঝায়। এখানে ইবনে মাসউদের বর্ণনা 'মুনকাতে' (বিচ্ছিন্ন) বটে কিন্তু ইবনে আব্বাসের বর্ণনা 'হাসন' (ত্রুটিমুক্ত)।

আবুল 'আলিয়াও এইভাবে বর্ণনা দান করিয়াছেন। ইহা ছাড়া তাবে'ঈ ইমামদের বিরাট একদল এই মতই পোষণ করেন। হাফিজ ইবনে হাজর 'ফতহুল বারী' গ্রন্থে তাঁহাদের সকলের বর্ণনা একত্র করিয়াছেন। (শরহে কিতাবুত্ তাফসীর ঃ জিল্‌দ ৮, পৃ ঃ ১২০, প্রথম সংস্করণ)।

এই কারণেই মস্তিষ্কের মধ্যস্থলকে বলা হয় 'উম্মুর রা'স্। অর্থাৎ উহা মগজের কেন্দ্রভূমি। সেনাবাহিনীর পতাকাকে 'উম্মুন' বলা হয়। কারণ বাহিনীর প্রতিটি সৈন্য এই পতাকার অনুগত। মক্কা শরীফকে 'উম্মুল কুরা' বলা হয়। কারণ কা'বা ঘর প্রদক্ষিণ ও হজ্জব্রত উদ্‌যাপনের জন্য গোটা আরবের সকল বসতির লোকের এখানে সমাবেশ ঘটে। সুতরাং এই সূরাকেও এই কারণে উম্মুল কুরআন বলা হইয়াছে যে, এই সূরাটির ভিতরে সমগ্র কুরআনের মর্ম পুঞ্জিভূত হইয়া রহিয়াছে। আরেকটি কারণ এই হইতে পারে যে, কুরআনের অন্য সব সূরার ভিতরে ইহা স্বীয় বৈশিষ্ট্যের বদৌলতে অগ্রাধিকার লাভ করিয়াছে।

'আসাসুল কুরআন' অর্থ কুরআনের ভিত্তি। 'আল্-কাফিয়া' বলিতে এমন বস্তু বুঝায় যাহা যথেষ্ট বলিয়া বিবেচিত হয় অর্থাৎ যাহা প্রাপ্ত হইলে অন্য কিছুর প্রয়োজন হয় না। 'আল্-কাঞ্জ' অর্থ খাজাঞ্চিখানা বা ভাণ্ডার।

ইহা ছাড়াও এমন সব হাদীস বিদ্যমান রহিয়াছে, যাহা দ্বারা বুঝা যায় যে, এই সূরার এইসব গুণবাচক নাম রসূলের যুগেই বহুল প্রচলিত ও সর্বসাধারণ্যে খ্যাত ছিল।

এক হাদীসে আছে, আমাদের হযরত (সা) উবায় বিন কা'বকে এই সূরা তাল্‌কীন দিয়াছেন এবং ফরমাইয়াছেন, এই সূরার মত আর একটি সূরাও নাই। আরেকটি রিওয়ায়েত ইহাকে সর্বশ্রেষ্ঠ ও সর্বোত্তম সূরা বলিয়াও আখ্যায়িত করিয়াছে।

সত্য ধর্মের সারমর্ম

বস্তুত, এই সূরাটির উপরে এবার চোখ বুলাইলেই এই কথা উজ্জ্বল হইয়া ধরা দেয় যে, অবশিষ্ট কুরআনের সহিত ইহার সম্পর্ক সারমর্ম ও বিশ্লেষণের সম্পর্ক ছাড়া অন্য কিছু নহে। অর্থাৎ গোটা কুরআনে সত্য ধর্মের উদ্দেশ্যাবলির যে বিশ্লেষণ দান করা হইয়াছে, সূরা ফাতিহায় সেই সব বর্ণনার নির্যাস সন্নিবেশিত হইয়াছে। যদি কোন ব্যক্তি সমগ্র কুরআনের অন্য কোন অংশ পাঠ করিতে নাও পারে, শুধু এই সূরাটি মর্ম সহকারে স্মরণ রাখে, তাহা হইলেও সে সত্য ধর্ম ও আল্লাহ্ তা'আলার ইবাদত করার মূল উদ্দেশ্য পরিজ্ঞাত হইল। কুরআনের যাবতীয় বর্ণনা বিশ্লেষণের ইহাই সারকথা।

এতদ্ভিন্ন সূরাটির প্রার্থনামূলক প্রকৃতি ও নিত্যকার ইবাদতে ইহার অপরিহার্যতা ও এই সূরার বৈশিষ্ট্যকে উজ্জ্বলতম করিয়া তোলে। ইহার মাধ্যমে এই কথাও সুস্পষ্ট হইয়া উঠে যে, এই সূরাটির এই ধরনের সংক্ষিপ্ত রূপ দান ও সমগ্র কুরআনকে ইহার বিশ্লেষণ-রূপে প্রতীয়মান করার ভিতরে স্রষ্টার অবশ্যই কোন মঙ্গলময় ইচ্ছা নিহিত রহিয়াছে। সেই উদ্দেশ্যটি হইল এই বিরাট কুরআনের এমন একটি সহজ ও সংক্ষেপ নির্যাস থাকা চাই যাহা প্রতিটি মানুষের পক্ষে সহজেই মুখস্থ করিয়া নেওয়া সম্ভবপর হয় এবং প্রত্যেকেই যেন নিত্যকার 'ইবাদত ও মুনাজাতে তাহা বারংবার পাঠ করিতে পারে!

এই সূরাটি হইল মানুষের ধর্মীয় জীবনের কর্মসূচী ও আল্লাহ্ তা'আলার 'ইবাদতের মূল বিশ্বাসগুলির সার-সংক্ষেপ এবং আত্মিক ধ্যান-ধারণার মৌলিক ভিত্তি। এই কারণেই কুরআন ইহার উল্লেখ করিতে গিয়া সাবআম্ মিনাল্ মাসানী (নিত্য পাঠ্য বাণী-সপ্তক) নামানুকরণের মাধ্যমে ইহার বৈশিষ্ট্যের দিকে ইঙ্গিত দান করিয়াছে। অর্থাৎ সর্বদা পাঠ করার ভিতরেই এই সূরা অবতীর্ণ হইবার রহস্য লুকায়িত রহিয়াছে। শত মূর্খ ও অজ্ঞ ব্যক্তির পক্ষেও এই চারিটি ছত্র কণ্ঠস্থ করিয়া ইহার মর্ম আয়ত্ত করা আদৌ কঠিন কাজ নহে। যদি কোন ব্যক্তি কুরআন মজীদের আর কিছু নাও পড়িতে পারে, তথাপি সে এই একটি মাত্র সূরা দ্বারা সত্য ধর্মের মূলশিক্ষা অর্জন করিতে পারে।

এই কারণেই প্রত্যেক মুসলমানের জন্য এই সূরাটি শিক্ষা করা ও পাঠ করা অপরিহার্য হইয়াছে এবং নামাযে নিত্য পাঠ্য দো'আ হিসাবে ইহা ছাড়া আর কোনটিকে মনোনীত করা হয় নাই। সহীহ্ বুখারী শরীফ ও মুসলিম শরীফে পরিষ্কার ঘোষণা পাই ঃ

لاَ صَلٰوةَ اِلاَّ بِفَاتِحَةِ الْكِتَابِ –

সূরা ফাতিহা ছাড়া কোন নামাযই সমাধা হইবে না।

এইজন্যই সাহাবায়ে কিরাম এই সূরাকে নাম দিলেন 'সূরাতুস সালাত' (নামাযের সূরা) অর্থাৎ যেই সূরা ছাড়া নামায পড়াই চলে না। যদি কেহ আরও অনেক কিছু কুরআন হইতে শিখিতে পারে ও পাঠ করিতে সমর্থ হয়, তাহা হইলে তাহা অধিক স্রষ্টা-পরিচিতি ও দিব্যজ্ঞান অর্জনে সহায়ক হইবে বটে কিন্তু তাহার কোন ইবাদতই এই সূরাটি বাদ দিয়া চলিবে না।

সত্য ধর্মের সামগ্রিক রূপ কি ? যতই চিন্তা-ভাবনা করা হউক না কেন, চারিটি কথার বাহিরে অন্য কিছু মিলিবে না।

১. আল্লাহ্‌র গুণাবলির যথাযথ পরিচয় লাভ। কারণ আল্লাহ্‌র 'ইবাদতের ক্ষেত্রে মানুষের পদে পদে যত সব হোঁচট খাইতে হয়, তাহা কেবল আল্লাহ্‌র গুণাবলি সম্পর্কিত সঠিক ধ্যান-ধারণার অভাবেই।

২. কর্মফলের চিরন্তন নীতিতে আস্থা স্থাপন। অর্থাৎ যেভাবে পৃথিবীর প্রতিটি জিনিসের একটি বৈশিষ্ট্য রহিয়াছে এবং প্রত্যেকটির স্বাভাবিক প্রভাব ও পরিণতি রহিয়াছে, তেমনি মানুষের কার্যাবলিরও বিশেষত্ব রহিয়াছে এবং উহার বিশেষ বিশেষ পরিণতি ও প্রভাব রহিয়াছে। ভাল কাজের পরিণাম ভাল ও মন্দ কাজের পরিণাম মন্দ হইবে !

৩. আখিরাতে বিশ্বাস। অর্থাৎ মানুষের জীবনধারার এই পৃথিবীতেই পরিসমাপ্তি নহে। ইহার পরেও তাহার জীবন-প্রবাহ অব্যাহত থাকিবে এবং কর্মফল ভোগের ব্যাপারটি সামনে রহিয়াছে।

৪. কল্যাণ ও মঙ্গলের পথের পরিচয় লাভ।

সূরা ফাতিহার বর্ণনা কৌশল

এখন ভাবিয়া দেখুন, এই চারিটি সারকথা কি সুন্দরভাবে এই সূরায় সমবেত করা হইয়াছে। একদিকে অত্যন্ত সংক্ষিপ্ত আকারে আঙ্গুলে গোণা মাত্র কয়েকটি শব্দের ভিতরে, অন্যদিকে এরূপ বাছাই করা মাপা শব্দের সাহায্যে যে, সেই শব্দ কয়টির মাধ্যমে সব তত্ত্বকথা পূর্ণ বিশ্লেষণসহ আত্মস্থ হইয়া যায় ! অথচ বর্ণনা অতি সহজ ও সুন্দর। কোথাও বিন্দুমাত্র জটিলতা বা কুটিলতা নাই। কোনরূপ বাড়াবাড়ি বা ভাবপ্রবণতার প্রশ্রয় নাই।

এই কথা স্মরণ থাকা চাই যে, পৃথিবীতে যে জিনিস যতখানি সত্যস্পর্শী ও খাঁটি, তাহা ততখানিই সহজ ও চিত্তাশ্রয়ী হয়। বিশ্ব-প্রকৃতিতে কোথাও ভাবপ্রবণতার স্থান নাই। উচ্ছ্বাস সৃষ্টির জন্য কৃত্রিমতা ও মিথ্যার আশ্রয় লইতে হয়। যাহা সত্য. যাহা খাঁটি, তাহা সোজা, সরল ও চিত্তাশ্রয়ী হইবে। চিত্তাশ্রয়ী কথা বলিতে সেই কথাকেই বুঝায়, যাহা শুনিলে অস্বাভাবিক বা নূতন কিছু বলিয়া মনে হইবে না। চিত্ত তাহা এমনভাবে গ্রহণ করিয়া লইবে যেন অনেক দিন হইতেই এই কথা উহার জানাশোনা ছিল। এক উর্দূ কবি এই সত্যটি এইভাবে ব্যক্ত করিয়াছেন ঃ

دیکھنا تقریر کی لذت جو اس نے کیا
مین نے یہ جانا گویا یہ بھی میرے دل میں ھے

বলার তাহার ধরন এমন চমৎকার
ভাবছি, এ যে আমার কথা পরিষ্কার।

এখন চিন্তা করুন যে, আল্লাহ্‌র ইবাদত ও তৎসম্পর্কিত ধ্যান-ধারণার সহিত মানুষের যতখানি সংযোগ রহিয়াছে আর এই সূরায় যে ভাবে তাহার বর্ণনা দান করা হইয়াছে, তাহা হইতে অধিক সহজ-সরল বর্ণনা আর কি হইতে পারে ? তাহা হইতে সহজ, সুন্দর ও চিত্তাকর্ষক বর্ণনারীতিই বা আর কি হইতে পারে ?

মাত্র সাতটি ছোট বাক্য। প্রত্যেকটি বাক্যই পাঁচ শব্দের ভিতরে সীমিত। প্রত্যেকটি শব্দ এরূপ পরিষ্কার ও সহজবোধ্য, যেন এক-একটি হীরকখণ্ড বাক্যের আংটিতে জুড়িয়া রাখা হইয়াছে। আল্লাহ্ তা'আলাকে এরূপ বিশেষণ পদ দ্বারা সম্বোধন করা হইয়াছে, যাহার পরিচয়-দ্যুতি দিনরাত মানুষের সামনে উজ্জ্বল হইয়া ধরা দেয়; অবশ্য মানুষ স্বীয় মূর্খতা ও ঔদাসীন্যের দরুন সেইদিকে তাকাইবার অবকাশ পায় না। তারপর পাই তাঁহার বন্দেগির স্বীকৃতি, সহায়তা কামনা ও স্খলন-পতন হইতে পরিত্রাণ পাইয়া সোজাপথে চলিবার আকুতি। ইহার ভিতরে না আছে কোন দুঃসাধ্য কল্পনা, না আছে কোন নূতন কথা। কোন অদ্ভুত ও স্বাভাবিক রহস্যও ইহাতে লুকাইয়া নাই।

এখন প্রশ্ন হইল এই, কেন আমরা বারংবার এই সূরাটি পাঠ করিতেছি ? কেনই বা শতাব্দীর পর শতাব্দী ধরিয়া ইহার মর্ম মানব জাতির সামনে উদ্‌ঘাটিত হইয়া চলিয়াছে ? মনে হইতেছে —যেন ইহা আমাদের ধর্মীয় চিন্তাধারার নিতান্ত একটি সাধারণ কথা। অথচ এই সাধারণ কথাটিই যতদিন পর্যন্ত পৃথিবীর বুকে আত্মপ্রকাশ করে নাই, ততদিন ইহার চাইতে অস্বাভাবিক ও অসাধ্য কথাও আর কিছু ছিল না। পৃথিবীতে প্রত্যেকটি খাঁটি ও সত্য কথার এই দশাই দেখা দেয়। যতক্ষণ তাহা সামনে স্পষ্ট হইয়া না উঠে, ততক্ষণ উহা হইতে জটিল কথা আর কিছুই হইতে পারে না। তারপর যখনই তাহা সামনে আসিয়া ধরা দেয়, মনে হয় যেন ইহা হইতে সরল ও সহজ কথা আর কি হইতে পারে ? বিখ্যাত ফার্সী কবি উরফী এই সত্যটিকেই অন্যভাবে ব্যক্ত করিয়াছেন ঃ

هرکس نشنا سنده راز است و گر نه
اینها همه راز است که معلوم عوام است –

রহস্য যা কেউ রাখে না হদিস তাই
নইলে ধরায় রহস্য ঠিক কিছুই নাই।

পৃথিবীতে যখনই আল্লাহ্‌র ওহী অবতীর্ণ হইয়া মানুষকে সঠিক পথের নির্দেশ দান করিয়াছে, তাহাতে যে মানুষকে নূতন নূতন কথা শোনানো বা শেখানো হইয়াছে, তাহা নহে। কারণ সৃষ্টিকর্তার অর্চনার ব্যাপারে নূতন কিছু বলিবার বা শিখাইবার থাকিতে পারে না। ওহীর কাজ ছিল মানুষের অন্তর্নিহিত স্বাভাবিক বিশ্বাস ও সংস্কারকে জ্ঞানের আলোকে যথাযথভাবে বিশ্লেষণ করা। সূরাটি মানুষের অন্তর্নিহিত সনাতন বিশ্বাসটিকে চমৎকার ব্যাখ্যার মাধ্যমে এমন সুন্দর রূপ দিল যে, প্রতিটি বিশ্বাস, ভাবনা ও অনুভূতি স্ব স্ব মহিমায় ভাস্বর হইয়া উঠিল। যেহেতু এই ব্যাখ্যা মনের

অবস্থার সহিত হুবহু মিলিয়া যায়, নিতান্ত সত্য ও খাঁটি হইয়া মানুষের কাছে ধরা দেয়, তাই যখনই কোন মানুষ নিরপেক্ষ মন লইয়া সততার সহিত ইহা ভাবিয়া দেখে, তখন আপন মনেই বলিয়া উঠে যে, ইহার প্রতিটি কথা ও প্রত্যেকটি শব্দ তাহার মন ও মগজের স্বতঃস্ফূর্ত প্রতিধ্বনি ছাড়া অন্য কিছুই নহে।

সত্য ধর্মের গুরুত্বপূর্ণ ঘাঁটিসমূহ

আবার দেখুন, ধরন-ধারণে যদিও এই সূরাটি আল্লাহ্-ভক্ত মানুষের কয়েকটি সহজ-সরল প্রার্থনা ছাড়া কিছুই নহে কিন্তু কি সুন্দরভাবে ইহার প্রত্যেকটি বর্ণনাভঙ্গী সত্য ধর্মের কোন না কোন গুরুত্বপূর্ণ উদ্দেশ্য প্রকাশ করিতেছে এবং প্রত্যেকটি শব্দই এক গভীর তাৎপর্যপূর্ণ অর্থ বহন করিতেছে।

১. আল্লাহ্ সম্পর্কিত ধারণায় মানুষের সবচাইতে বড় ভুল হইল এই যে, তাঁহাকে মানুষ ভালবাসার দৃষ্টিতে দেখার বদলে ভয়ের দৃষ্টিতে দেখিয়া থাকে। সূরা ফাতিহার পহেলা শব্দটিই মানুষের সেই ভুল ভাঙ্গিয়া দিয়াছে।

'হাম্‌দ' (প্রশংসা) দ্বারা সূরাটি শুরু হয়। সুন্দরের প্রশংসাকেই হাম্‌দ বলা হয় অর্থাৎ ভাল গুণাবলির প্রশংসা করার নামই হাম্‌দ ! যাহার ভিতরে সৌন্দর্য রহিয়াছে, যাহা ভাল তাহাকেই প্রশংসা করা চলে। সুতরাং প্রশংসার সহিত ভীতি বা ত্রাসের ভাবনার সমাবেশ ঘটিতে পারে না। প্রশংসিত ব্যক্তি কখনও ভয়ঙ্কর বা ভীতিপ্রদ হইতে পারে না।

'হাম্‌দ'-এর পরে আল্লাহ্‌র বিশ্বব্যাপী রবুবিয়াত (প্রতিপালন), 'রহমত' (অনুগ্রহ) ও 'আদালত' (ন্যায়বিচার)-এর উল্লেখ করা হইয়াছে। এইভাবে আল্লাহ্‌র গুণাবলির এমন এক পূর্ণাঙ্গ চিত্র তুলিয়া ধরা হইয়াছে যাহাতে পরিষ্কার বুঝা যায় যে, মানুষের রক্ষণ ও বর্ধনের যাবতীয় প্রয়োজনীয় বস্তু তিনি মানুষকে দান করেন এবং তাহাদিগকে সর্ববিধ ভুল-ভ্রান্তি হইতে রক্ষা করিয়া সঠিক পথে পরিচালিত করেন।

২. 'রাব্বিল আলামীন' কথাটির ভিতরে আল্লাহ্ তা'আলার বিশ্বব্যাপী প্রতিপালন কার্যের স্বীকৃতি রহিয়াছে। প্রতিটি ব্যক্তি, দল, জাতি, দেশ এক কথায় নিখিল সৃষ্টির প্রতিটি ক্ষেত্রে ইহার প্রসারতা বিদ্যমান। সুতরাং এই সার্বজনীন প্রতিপালন বৈশিষ্ট্য পৃথিবীর বিভিন্ন গোত্র ও জাতির দৃষ্টির সংকীর্ণতা বিলোপ করে। দুনিয়ার প্রতিটি মানুষই ভাবিত যে, আল্লাহ্‌র দয়া-দাক্ষিণ্য শুধু তাহার জন্যই নির্দিষ্ট হইয়াছে।

৩. 'মালিকি ইয়াওমিদ্দীন'— ইহার ভিতরে 'আদ্‌দীন' শব্দটি প্রতিদানের বিধানকে স্বীকৃতি জানায়। আর প্রতিদানকে 'দীন' শব্দ দ্বারা এইজন্য ব্যক্ত করা হইয়াছে যে, মানুষের কার্যাবলির উহা যে স্বাভাবিক পরিণতি—এই সত্যটি সুস্পষ্ট হইয়া ধরা দিবে। প্রতিদান বলিতে প্রতিশোধ বুঝায় না। আল্লাহ্ তা'আলা প্রতিশোধ স্পৃহা লইয়া সেই দিন বান্দাদের শাস্তি দিতে বসিবেন না। কারণ 'আদ্‌দীন' অর্থই হইল প্রতিদান বা কর্মফল।

৪. 'রবুবিয়াত' ও 'রহমত'-এর পরে 'মালিকি ইয়াওমিদ্দীন' বিশেষণ প্রয়োগের দ্বারাও এই সত্যটি উদ্‌ঘাটিত হইয়াছে। যদি সৃষ্টিজগতে ক্ষমা ও সুন্দরের সহিত ক্রোধ ও শক্তির উপস্থিতি দেখা দেয়, তাহা এইজন্য নয় যে, সৃষ্টিজগতের প্রতিপালকের ভিতরে ক্রোধ ও প্রতিশোধ-স্পৃহা বিদ্যমান বরং তাহা এইজন্য যে, তিনি ন্যায়বিচারকও। তাঁহার সৃষ্টিকৌশল প্রত্যেক বস্তুর ও প্রতিটি কার্যের একটি বিশেষত্ব ও বিশেষ পরিণতি দান করিয়া রাখিয়াছে। ইন্‌সাফ বা ন্যায়বিচার কখনও অনুগ্রহের পরিপন্থী নহে ; বরং অনুকূলই হইয়া থাকে।

৫. ইবাদত বা উপাসনার কথা বলিতে গিয়া তিনি শুধু 'না'বুদু' বলেন নাই বরং 'ইয়্যাকা না'বুদু' বলিযাছেন। অর্থাৎ 'তোমার উপাসনা করি' না বলিয়া নির্দিষ্টভাবে 'শুধু তোমারই 'ইবাদত করি' বলিয়াছেন। আবার সেই সঙ্গে 'ইয়্যাকা নাস্তা'ঈন' বলিয়া নির্দিষ্টভাবে কেবল তাঁহারই সাহায্য কামনা করিতে বলিয়াছেন। বর্ণনার এই বিশেষত্বটি একত্ববাদের সকল উদ্দেশ্য পূর্ণ করিয়া দিয়াছে এবং শির্‌কের সকল পথ রুদ্ধ করিয়াছে।

৬. পূর্ণ ও কল্যাণের পথকে তিনি 'সিরাতুল মুসতাকীম' অর্থাৎ সোজা পথ নামে উল্লেখ করিয়াছেন। বস্তুত ইহার চাইতে স্বাভাবিক ও উত্তম নাম আর কিছুই হইতে পারে না। কারণ এমন কেহ নাই যে, সোজা ও বাঁকা পথের পার্থক্যটুকু বুঝে না এবং সোজা পথে চলিতে ইচ্ছুক নহে।

৭. তারপর এই সোজা পথের এমন এক সাদাসিধা ও জানাশোনা পরিচয় দেওয়া হইয়াছে, যাহার স্বীকৃতি প্রত্যেক মানুষের অন্তরে মওজুদও রহিয়াছে। তাই সেই পরিচয় পাইতে কল্পনা বা চিন্তা-ভাবনার আশ্রয় লইতে হয় না ; বরং উহার প্রত্যক্ষ ও বাস্তব চিত্র তুলিয়া ধরা হইয়াছে। তাহা হইল, অনুগ্রহপ্রাপ্ত বা সফলকামদের পথ। দেশ-কাল-পাত্র নির্বিশেষে মানুষ সেই পথটিকে সর্বত্র স্পষ্টরূপে বর্তমান দেখিতে পায়।

দুনিয়ায় মাত্র দুই ধরনের পথই বিদ্যমান ! একটি সফলকামদের, আরেকটি ব্যর্থকামদের। এক্ষেত্রে পরিষ্কার ও স্পষ্ট করিয়া কিছু বলিতে হইলে সেই দিকে ইঙ্গিত করাই সবচাইতে সহজ উপায়। ইহার চাইতে বেশি জটলা পাকাইয়া কিছু বলার অর্থ সোজা ও জানা বস্তুকে জটিল ও দুর্জ্ঞেয় করিয়া তোলা।

এই সূরাটিকে প্রার্থনার ভঙ্গীতে বর্ণনা করা হইয়াছে। কারণ যদি সবক বা নির্দেশ দানের রীতি অনুসরণ করা হইত, তাহা হইলে ইহার বর্তমান বৈশিষ্ট্যের সব প্রভাবই লোপ পাইত। প্রার্থনার এই বিশেষ রীতিটি আমাদের বলিয়া দেয় যে, একজন সত্যানুসারীর আল্লাহ্‌র পথে পা বাড়াইবার ক্ষেত্রে মনোভাবটি কিরূপ থাকে এবং কিরূপ থাকা উচিত। ইহা যেন আল্লাহ্‌র 'ইবাদতের যাবতীয় বিশ্বাস ভাবনার নির্যাস। একজন সত্যানুসন্ধানীর মুখে ইহা স্বতঃস্ফূর্তভাবে উচ্চারিত হয়।

দুই
আল্ হাম্‌দু লিল্লাহ

হাম্‌দ

আরবীতে হাম্‌দ অর্থ সুন্দরের প্রশংসা অর্থাৎ ভাল গুণাবলি বর্ণনা করা। যদি কাহারও দোষ বর্ণনা করা হয়, তাহা কখনই হাম্‌দ (প্রশংসা) হইবে না। 'হাম্‌দ' শব্দের সহিত 'আল' সংযুক্ত হইয়াছে। ইহা 'জিন্স' (জাতি) কিংবা ইস্তেগরাক (সমগ্র বস্তু) বুঝাইবার জন্য হইয়া থাকে। সুতরাং 'আল্ হাম্‌দু লিল্লাহ্' অর্থ দাঁড়ায় এই, প্রশংসা জাতীয় যাহা কিছু আছে তাহা সমগ্রই আল্লাহ্‌র জন্য। কারণ সৌন্দর্য বা কৃতিত্ব বলিতে যত কিছু বুঝায়, সবের মূলেই তিনি। যদি রূপই থাকে, প্রেমের দৃষ্টি হইবে না কেন ? প্রশংসার সবকিছুই যদি বিদ্যমান, রসনা কেন গুণগানে পঞ্চমুখ হইবে না ?

آئنه ماروئے تراعکس پذیر است
گر تونه نحائی گناه از جانب ما نیست

মুকুর আমার তোমার ছবিটি বুকে এঁকে নিতে চায়
তুমি যদি তাতে ধরা নাহি দাও, পাপ কি আমার তায় ?

হাম্‌দ দ্বারা সূরার আরম্ভ করা হইল কেন ? এইজন্য যে, স্রষ্টা-পরিচিতির পথে মানুষের প্রথম প্রতিক্রিয়া ইহাই। অর্থাৎ যখনই কোন সত্য সাধক এই পথে পা বাড়ায়, তখন সর্বাগ্রে যে অবস্থাটি তাহার মন ও মগজকে গ্রাস করিয়া নেয়, তাহা স্বভাবতই প্রশংসা ও কৃতজ্ঞতা প্রকাশের আকুতি ভিন্ন অন্য কিছু হয় না।

মানুষের জন্য আল্লাহ্‌কে চেনার পথ কি ? কুরআন বলে, তাহা একটি মাত্র পথ এবং পথটি এই, সৃষ্টিজগতের রহস্য লইয়া সে চিন্তা-ভাবনা করিবে ও গবেষণা চালাইবে। এই সৃষ্টি সম্পর্কিত গবেষণাই মানুষকে স্রষ্টা পর্যন্ত পৌঁছাইয়া দিবে।

اَلَّذِيْنَ يَذْكُرُوْنَ اللّٰهَ قِيٰمًا وَّ قُعُوْدًا وَّ عَلٰى جُنُوْبِهِمْ وَ يَتَفَكَّرُوْنَ فِىْ خَلْقِ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ -

যাঁহারা দাঁড়াইয়া, বসিয়া কিংবা শুইয়া (এক কথায়) যে কোন অবস্থায় আল্লাহ্‌কে স্মরণ করে এবং আকাশ ও পৃথিবীর সৃষ্টি রহস্য লইয়া গবেষণা করে (তাহারাই আল্লাহ্‌র খাঁটি বান্দা)। (৩ ঃ ১৯১)

এখন ধরুন, একজন সত্যানুসন্ধানী এই পথে অগ্রসর হইল এবং সৃষ্টি জগতের বিভিন্ন নিদর্শন লইয়া গবেষণা চালাইল। তখন তাহার মন ও মগজে সর্বাগ্রে যে প্রভাবটি ছাপ ফেলিবে, তাহা কি হইতে পারে ? সে দেখিতে পাইবে, তাহার নিজের এবং তাহার বাহিরের অন্য সব বস্তুর পিছনে একজন সুদক্ষ স্রষ্টা ও বিজ্ঞ শিল্পীর কুদরতী পরিচালনা সক্রিয় রহিয়াছে। তাহার প্রতিপালন ও করুণার হস্ত সৃষ্টির প্রতিটি অণু-পরমাণুতে সুস্পষ্টরূপে পরিদৃষ্ট হইতেছে। তখন তাহার প্রাণ স্বতঃস্ফূর্তভাবেই তাঁহার গুণগান ও সৌন্দর্য বর্ণনায় আবেগদীপ্ত হইয়া উঠিবে। অজ্ঞাতে বলিয়া উঠিবে 'আল্‌হাম্‌দুলিল্লাহি রাব্বিল 'আলামীন' (সমগ্র প্রশংসা নিখিল সৃষ্টির প্রতিপালকের জন্য)। অর্থাৎ যত প্রশংসা ও গুণগান সবই তাঁহার জন্য, সৃষ্টি জগতের প্রতিটি অংশে যাঁহার কৃপা ও দান এবং সৌন্দর্য ও কৃতিত্বের সুস্পষ্ট ছাপ বিদ্যমান।

এই পথে মানুষের সবচাইতে মারাত্মক ভ্রান্তি এই যে, তাহারা মহান শিল্পীর সুনিপুণ শিল্পকর্মের নশ্বর সৌন্দর্যের যুপকাষ্ঠেই আত্মাকে বলি দেয় কিন্তু আরেকটু অগ্রসর হইয়া অবিনশ্বর শিল্পীর সন্ধান লাভের তৎপরতা চালাইবার অবকাশ রাখে না। তাহারা বুরকার নকশা ও কারুকার্য দেখিয়াই খেই হারাইয়া ফেলে। অথচ উহার অভ্যন্তরে যেই অনন্ত সুন্দর গা-ঢাকা দিয়া চলিয়াছে, তাঁহাকে খুঁজিয়া দেখার সৌভাগ্য তাহাদের হয় না। পৃথিবীতে প্রাকৃতিক নিদর্শনাবলির পূজা-পার্বণ মানুষের এই সংকীর্ণ দৃষ্টির কারণেই দেখা দিয়াছে।

সুতরাং 'আল্ হাম্‌দু লিল্লাহ'-এর স্বীকৃতি মানেই হইল নিখিল সৃষ্টির প্রতিটি ক্ষেত্রের যাবতীয় সৌন্দর্য ও নিদর্শন যে শুধুমাত্র এক মহান শিল্পীর গুণাবলির প্রকাশ, তাহাই স্বীকার করিয়া লওয়া। এই কারণেই উৎকর্ষ ও কৃতিত্বের জন্য যত প্রশংসা ও স্তুতিগান হইবে, সৌন্দর্য ও রূপ মাধুরীর প্রতি যত আকর্ষণ দেখা দিবে, দান অবদানের জন্য যত কৃতজ্ঞতা প্রকাশ পাইবে তাহা কোন শিল্পকার্য ও সৃষ্ট জীবের প্রাপ্য নহে বরং সুদক্ষ শিল্পী ও মহান স্রষ্টার জন্যই হইবে।

عِبَارَاتُنَا شَتّٰى وَ حُسْنُكَ وَاحِدٌ –
وَ كُلٌّ اِلٰى ذَاكَ الْجَمَالِ يَصِيْرُ –

হাজার রূপের নিদর্শনে একই রূপের বিকাশ পাই
সবার রূপই হারিয়ে গিয়ে তোমার রূপে নিচ্ছে ঠাঁই।

আল্লাহ্ তা'আলা

কুরআন মজীদ অবতীর্ণ হইবার আগেও আরবে 'আল্লাহ্' শব্দটি নামবাচক বিশেষ্যরূপে ব্যবহৃত ছিল। আইয়ামে জাহিলিয়ার কবিদের কাব্যে আমরা তাহার পরিচয় পাই ! অর্থাৎ 'আল্লাহ্' শব্দ দ্বারা তাহারা স্রষ্টার কোন বিশেষ গুণ প্রকাশের ধারণা রাখিত না বরং স্রষ্টার যাবতীয় গুণ সেই শব্দের সহিত জুড়িয়া লইত।

কুরআনেও এই শব্দটি নামবাচক বিশেষ্যরূপে ব্যবহৃত হইয়াছে এবং স্রষ্টার যাবতীয় গুণ এই নামের সহিত জড়িত করা হইয়াছে ঃ

وَ لِلّٰهِ الْاَسْمَاءُ الْحُسْنٰى فَادْعُوْهُ بِهَا –

—যেহেতু সেই আল্লাহ্‌র গুণবাচক অনেক সুন্দর সুন্দর নাম রহিয়াছে, সুতরাং তাঁহাকে সেই সব নামেও ডাক।

কুরআন এই শব্দটিকে এইজন্যই নির্বাচিত করিয়াছে যে, প্রশংসা ও গুণাবলির সহিত এই নামটির সুষম সম্বন্ধ রহিয়াছে। হয়ত ইহার চাইতেও কোন গোপন উপযোগিতা ইহাতে নিহিত রহিয়াছে।

যখনই আমরা শব্দটির অন্তর্নিহিত ইঙ্গিত লইয়া গবেষণা করি, তখন মনে হয় যে, উদ্দেশ্যের পূর্ণ চরিতার্থতার জন্য সর্বাপেক্ষা উপযুক্ত শব্দ ইহাই।

মানব জাতির ধর্মীয় ধ্যান-ধারণার যে প্রাচীন চিত্র আমরা ইতিহাসের আলোকে দেখিতে পাই, তাহাতে বিভিন্ন প্রাকৃতিক শক্তির পূজা-অর্চনাই ধরা পড়ে। এই পূজাই ধীরে ধীরে মূর্তিপূজায় রূপান্তরিত হয়। মূর্তিপূজার অনিবার্য ফলস্বরূপ দেখা দিল অজস্র দেবতা এবং বিভিন্ন ভাষাভাষী নিজ নিজ দেবতাদের স্ব স্ব ভাষায় ভিন্ন ভিন্ন নাম দিল। যতই পূজা-অর্চনার ধরন-ধারণ প্রসারতা লাভ করিল, ততই বিভিন্ন নাম সৃষ্টি হইয়া চলিল। কিন্তু মানুষের স্বভাব কিছুতেই এই ভাবনা বর্জন করিতে পারিল না যে, সব শক্তির উপরে এমন এক সর্বশক্তিমান বিরাজ করিতেছেন যিনি সব দেবতার বড় এবং সব সৃষ্টির স্রষ্টা। সুতরাং সব দেবতা ও প্রাকৃতিক শক্তির অর্চনার সঙ্গে সঙ্গে তাহারা কম-বেশি সেই সর্বশক্তিমানের কল্পনা অব্যাহত রাখিয়া আসিতেছিল। এই কারণেই যেখানে এরূপ হাজার নামের দেবতাদের অর্চনা চলিত, সেখানে অবশ্যই এমন কোন-না-কোন নাম খুঁজিয়া পাইবে যাহার সাহায্যে তাহারা সেই অদৃশ্য শ্রেষ্ঠতম উপাস্যের দিকে ইঙ্গিত করিত।

বস্তুত শামী ভাষা অধ্যয়ন করিলে বর্ণমালা ও উচ্চারণের এমন এক বিশেষ বিন্যাস তাহাতে মিলে যদ্দ্বারা উপাস্য কাহাকেও বুঝানো হইয়া থাকে ! তেমনি ইব্রানী, সুরিয়ানী, আরামী, কাল্‌দানী, হোমায়রী, আরবী ইত্যাদি সব ভাষাতেই সেই উদ্দেশ্যে বিশেষ শব্দ প্রচলিত রহিয়াছে। তাহা হইল 'আলিফ, লাম ও হা' এই তিন বর্ণমালাকে ব্যুৎপত্তি রাখিয়া উহার বিভিন্ন রূপান্তর। উহাই কালদানী ও সুরিয়ানী ভাষায় 'ইলাউয়ো', ইব্রানী ভাষায় 'উল্‌হ্‌' ও আরবী ভাষায় 'ইলাহ্‌' রূপ লাভ করিয়াছে। সন্দেহ নাই যে, আরবী ভাষায় প্রচলিত এই 'ইলাহ্‌' শব্দের সহিত নির্দিষ্টবাচক 'আল্‌' যোগ করিয়া কুরআনে 'আল্লাহ্‌' ব্যবহার করা হইয়াছে। এই 'আল' সংযোগই ইলাহ্‌ শব্দটিকে নিখিল সৃষ্টির মহান স্রষ্টার জন্য চিরতরে নির্দিষ্ট করিয়া দিল।

এখন কথা হইল 'আল্লাহ্‌' যখন 'ইলাহ্‌' শব্দেরই রূপান্তর মাত্র, তখন 'ইলাহ্‌' শব্দের অর্থ কি ? এই ব্যাপারে ভাষাবিদ্‌দের বিভিন্ন মত দেখা যায়। তাহার ভিতরে

সর্বাপেক্ষা শক্তিশালী মত অনুসারে 'ইলাহ্' অর্থ ব্যাকুলতা ও বিমূঢ়তা। একদল ভাষাবিদ 'ওয়া-লাম-হা' হইতে ইহার উৎপত্তি ধরিয়া থাকেন। তাহার অর্থও ইহাই। সৃষ্টিকর্তার জন্য এই শব্দটি এইজন্য নির্দিষ্ট করা হইল যে, স্রষ্টার ব্যাপারে মানুষ যাহা কিছু জানে ও জানা সম্ভব, তাহাতে তাহাদের মনের ব্যাকুলতা ও মগজের বিমূঢ়তা বৃদ্ধি পাওয়া ছাড়া আর কিছুই হয় না। মানুষ যতই সেই মহান অস্তিত্ব লইয়া গবেষণা চালাইবে, তাহার জ্ঞানশক্তি ততই ব্যাকুল ও বিমূঢ় হইয়া চলিবে। এমনকি শেষ পর্যন্ত সে ইহাই জানিতে পাইবে যে, ব্যাকুলতা ও বিমূঢ়তা দিয়াই তাহার পথের যাত্রা শুরু এবং যাত্রা শেষেও এই ব্যাকুলতা ও বিমূঢ়তা ছাড়া সে কিছুই দেখিতে পাইল না।

اے برون ازوهم قال و قیل من
خاك سرفرق من و تمثیل من

—আমার সংশয় মুক্ত হে মহান সত্তা সুবিপুল
তোমার ও আমিত্বের মোর ভেদ সৃষ্টি মস্তবড় ভুল।

এখন চিন্তা করুন, আল্লাহ্‌র পবিত্র সত্তার জন্য মানুষের মুখ হইতে ইহার চাইতে যথাযোগ্য শব্দ আর কি বাহির হইতে পারে ? যদি আল্লাহ্‌কে তাঁহার কোন বিশেষ গুণবাচক নামে ডাকিত, সে ক্ষেত্রে নিঃসন্দেহে তাঁহার সেরূপ নাম অসংখ্য হইত। কিন্তু যদি গুণবাচক অসংখ্য নাম ছাড়িয়া সামগ্রিকভাবে কোন এক নাম ডাকিয়া তাঁহাকে ইঙ্গিত করিতে হয়, তাহা হইলে এই শব্দটি ছাড়া তাহা আর কি হইতে পারে ? মানুষের পক্ষে তো ইহা স্বীকার করা ছাড়া গত্যন্তর থাকে না যে, তাহার মন ও মগজকে ব্যাকুল ও বিমূঢ় করিবার মতই এক বিপুল সত্তা তিনি।

ধরুন, গোটা মানব জাতি অদ্যাবধি স্রষ্টার সত্তা কিংবা সৃষ্টির মূল রহস্য সম্পর্কে যাহা কিছু ভাবিয়াছে ও বুঝিয়াছে, সব কিছু সামনে রাখিয়া আমরা আজ যদি স্রষ্টার এক নূতন নাম রাখিতে চাই, তাহা কি হইতে পারে ? উহা হইতে বড় কিংবা ভাল কোন নাম প্রস্তাব করা যাইতে পারে কি ?

এই নামকরণের একমাত্র কারণ এই যে, যখনই এই পথে সাধনা ও দিব্যদৃষ্টির সাহায্যে বেশি কিছু বলা সম্ভবপর হইয়াছে, তখন সেখানে নিজেকে হারাইয়া ফেলার স্বীকৃতিই দেওয়া হইয়াছে এবং ইহাকেই জানা-বুঝার শেষ স্তর বলিয়া আখ্যায়িত করা হইয়াছে। সেখানে বলা হইয়াছে, অবশেষে বুঝার ব্যর্থতাই বুঝা গেল। সাধকদের অন্তর ও রসনায় সর্বদা এই সুরই ধ্বনিত হইল ঃ – رَبِّ زِدْنِىْ فِيْكَ تَحَيُّرًا

—হে প্রতিপালক ! এমন দশা কর যেন তোমার ব্যাপারে আমার হয়রানি ও হতবুদ্ধিতা বাড়িয়াই চলে।

কারণ এখানে হয়রানি ও হতবুদ্ধিতা তোমার পরিচয় লাভে ব্যর্থতার দরুন আসে না বরং পরিচয় লাভের অনন্ততার অনিবার্য ফলস্বরূপ দেখা দেয়। বিজ্ঞানীদের বিজ্ঞান ও মনীষীদের মনীষাও সর্বদা এই সিদ্ধান্ত ঘোষণা করিয়া আসিতেছে ঃ

معلومم شد كه هيچ معلومم نه شد –

–অবশেষে জানিলাম যে, কিছুই জানিলাম না।

যেহেতু এই নামটি স্রষ্টার জন্য নামবাচক বিশেষ্যরূপে দেখা দিয়াছে সুতরাং স্বভাবতই ইহা স্রষ্টার যত সব গুণ বা গুণবাচক নাম কল্পনা করা যায়, সব কিছুই গ্রাস করিয়া লইয়াছে। যদি আমরা স্রষ্টার কল্পনা কোন বিশেষ গুণবাচক নামের সাহায্যে করি, যেমন 'আর্-রহ্মান' বিংবা 'আর্-রহীম্', তখন স্রষ্টা সম্পর্কিত এই ধারণা তাঁহার বিশেষ এক গুণের ভিতরে সীমিত হইয়া যায়! অর্থাৎ আমাদের চিন্তায় তখন এমন এক সত্তার কল্পনা জাগে, যাহার ভিতরে শুধু প্রতিপালন কিংবা দয়াগুণ বিদ্যমান। কিন্তু যখন আমরা 'আল্লাহ্ শব্দ বলি, অমনি আমাদের ধারণায় এমন এক সত্তার অস্তিত্ব অনুভব করি, যিনি এই ধরনের যাবতীয় সৌন্দর্য ও কৃতিত্বের গুণে মহিমান্বিত। অদ্যাবধি এই সম্পর্কে যত গুণবাচক নাম দেওয়া হইয়াছে এবং ভবিষ্যতেও দেওয়া যাইতে পারে, সেই সব কিছুই এক 'আল্লাহ্ নামের সহিত বিজড়িত রহিয়াছে।

তিন

'রাব্বিল 'আলামীন'

রবুবিয়াত

হাম্‌দ-এর পরে ধারাবাহিকভাবে চারিটি গুণের বর্ণনা দেওয়া হইয়াছে ঃ 'রাব্বিল 'আলামীন', 'আর-রহমান', 'আর-রহীম' ও 'মালিকি ইয়াওমিদ্দীন'। 'আর-রহমান' ও 'আর-রহীম' একই গুণের দুইটি দিক ছাড়া অন্য কিছু নহে। সুতরাং বলা যায় যে, এখানে রবুবিয়াত, রহমত ও 'আদালত এই তিন গুণের উল্লেখ করা হইয়াছে।

'ইলাহ্'-এর মতই 'রব'ও শামী ভাষায় এক বহুল প্রচলিত ব্যুৎপত্তি বা শব্দমূল। ইব্রানী, সুরিয়ানী ও আরবী—তিনটি ভাষাতেই ইহার অর্থ প্রতিপালন। যেহেতু লালন-পালনের প্রয়োজনীয়তার অনুভূতি মানুষের মৌলিক অনুভূতির অন্যতম, সুতরাং ইহাকেও শামী ভাষায় প্রাচীনতম ব্যাখ্যা ধরা যাইতে পারে। তারপর যেহেতু শিক্ষক, গুরুজন ও মালিক কোন-না-কোন দিক হইতে লালন-পালনেরই দায়িত্ব গ্রহণ করিয়া থাকেন, সুতরাং 'রব' শব্দের ব্যবহার তাহাদের বেলায়ও হইতে লাগিল। তাই দেখা যায়, ইব্রানী ও আরামী ভাষায় 'রাব্বী' ও 'রাব্বাহু' বলিতে প্রতিপালক, শিক্ষক ও মনিব—এই তিন অর্থই বুঝানো হইত। প্রাচীন মিসরী ও কালদানী ভাষায় 'রাবু' শব্দটিও এই তিন অর্থে ব্যবহৃত হইত। এই সব দেশের প্রাচীনতম ভাষাগুলি শামী ভাষার সহিত অনেকটা অভিন্ন ছিল বলিয়া জানা যায়।

যাহা হউক, আরবী ভাষায় 'রবুবিয়াত' অর্থ প্রতিপালন। যেহেতু 'প্রতিপালন' শব্দটিকে সেই ব্যাপক অর্থে গ্রহণ করা চাই, তাই কোন কোন ভাষাতাত্ত্বিক অভিধানকর্তা এই শব্দটির অর্থ বলিতে গিয়া লিখিয়াছেন ঃ

هُوَ اِنْشَاءُ الشَّيْئِ حَالاً فَحَالاً اِلٰى حَدِّ التَّمَامِ –

> কোন কিছু এইরূপভাবে স্তরে স্তরে প্রতিপালন করা যেন উহা বিভিন্ন অবস্থায় যথোপযোগী প্রয়োজন মিটাইয়া সর্বতোভাবে লালিত-পালিত হইয়া চরম পরিণতিতে পৌছিতে পারে।[৩]

যদি কেহ ক্ষুধার্তকে খানা দেয় কিংবা ভিখারীকে পয়সা দেয়, ইহা তাহার অনুগ্রহ হইবে, দান হইবে, মহানুভবতা হইবে কিন্তু প্রতিপালন হইবে না কিছুতেই। রবুবিয়াত বা প্রতিপালনের জন্য অপরিহার্য হইল লালন-পালন ও রক্ষণাবেক্ষণের এক ধারাবাহিক ব্যবস্থা অবলম্বন এবং এক সত্তাকে উহার পূর্ণতা প্রাপ্তি পর্যন্ত যখন যে ধরনের প্রয়োজন

---

৩. মুফরাদাতে রাগেব ইস্পাহানী।

দেখা দেয় তাহা মিটাইবার ব্যবস্থা করা। সঙ্গে সঙ্গে ইহাও প্রয়োজন যে, এই সব করা হইবে স্নেহ-প্রীতির প্রয়োজনে। কারণ স্নেহ ও ভালবাসার ভিত্তিতে না হইলে ইহাকে 'রবুবিয়াত' বলা চলিবে না।

রবুবিয়াতের এক অসম্পূর্ণ নমুনা জননীর সন্তান প্রতিপালনের ভিতরে দেখিতে পাই। এই প্রতিপালন স্পৃহাটি জননীর স্বভাবগত হইয়া থাকে। সন্তান যখন জন্ম নেয়, অস্তি-মাংসের একটি স্পন্দনশীল মাংসপিণ্ড হইয়া আত্মপ্রকাশ করে। জীবনীশক্তি কিংবা বর্ধন ক্ষমতা যাহা কিছু নিয়া আসে, সবই স্তরে স্তরে প্রতিপালনের মুখাপেক্ষী হয়। এই প্রতিপালন স্নেহ ও প্রীতি, রক্ষণ ও পর্যবেক্ষণ এবং বদান্যতা ও সহায়তার সুদীর্ঘ ধারারূপে দেখা দেয় ! যতক্ষণ পর্যন্ত সন্তান দেহ, মন ও মগজের দিক হইতে পূর্ণতায় না পৌঁছে, ততক্ষণ পর্যন্ত এই প্রতিপালনের ধারা অব্যাহত রাখিতে হয়।

তারপর প্রতিপালনের দিক শুধু দুই-একটি নহে, অনেক। প্রতিনিয়ত তাহার ধরন-ধারণে পরিবর্তন সূচিত হয়। বয়সের পরিবর্তনের সাথে সাথে অবস্থার পরিবর্তন দেখা দেয় এবং পরিবর্তিত অবস্থার পরিপ্রেক্ষিতে প্রতিপালনের ধারাও যথোপযোগী করিতে হয়। পরিবর্তিত বয়সের নূতন অবস্থার সহিত সংগতি রক্ষা করিয়া স্নেহ-প্রীতির ও রক্ষণ-পর্যবেক্ষণের মাত্রা বাড়াইতে কমাইতে হয় এবং জীবনের নূতন চাহিদা মিটাইবার ব্যবস্থা করিতে হয়। স্রষ্টার সৃষ্টি কৌশল জননীর স্নেহের ভিতরে প্রতিপালনের এসবই ধারাবাহিক প্রয়োজন মিটাইবার ক্ষমতা দান করিয়াছে। জন্মের দিন হইতে শুরু করিয়া বয়ঃপ্রাপ্ত হওয়া পর্যন্ত সন্তানকে পরম স্নেহে লালন-পালন, রক্ষণাবেক্ষণ, পরিচর্যা, শিক্ষা-দীক্ষা দান এবং যখন যাহা প্রয়োজন তাহা সম্পাদন করার ভিতরে আমরা জননীর রবুবিয়াতের পরিচয় পাই।

সন্তানের পাকস্থলী যখন মাতৃদুগ্ধ ভিন্ন অন্য কিছু সহ্য করিত না, তখন তাহাকে ঠিক মাতৃস্তন্যই পান করানো হইত। যখন দুধ ছাড়িয়া বার্লি অথবা আরও শক্তিশালী পথ্য সেবন করিতে সক্ষম, তখন ধীরে ধীরে তাহাকে তাহাই সেবন করাইতে লাগিল। যখন সন্তান নিজের পায়ে ভর করিয়া দাঁড়াইতে পারিত না, তখন জননী তাহাকে কোলে রাখিয়া পালিতেছিল। যখন পায়ে ভর করিয়া দাঁড়াইবার শক্তি পাইল, জননী তাহার হাত ধরিয়া এক পা দুই পা করিয়া হাঁটাইতে লাগিল। স্থূল কথা, যখনকার যেই অবস্থা সেই অবস্থার সহিত সংগতি রাখিয়া সন্তানের সকল প্রয়োজন জননী সস্নেহে মিটাইয়া চলিল। ফলে লালন-পালন ও রক্ষণাবেক্ষণের এক ধারাবাহিক ব্যবস্থা অভ্যাহত রহিল। শুধু এই অবস্থাকে সামনে রাখিয়া 'রবুবিয়াত' সম্পর্কে কিছুটা ধারণা অর্জন করা যাইতে পারে।

কৃত্রিম রবুবিয়াতের এই অসম্পূর্ণ ও সীমাবদ্ধ নমুনা সামনে রাখুন এবং খোদায়ী রবুবিয়াতের অসীম ও অকৃত্রিম চিত্রের কল্পনা করুন। তাঁহার 'রাব্বিল আলামীন' হইবার তাৎপর্য এই যে, যেই ভাবে তাঁহার সৃজন প্রতিভা নিখিল সৃষ্টিকে রূপদান

করিয়াছে, তেমনি তাঁহার প্রতিপালন-স্পৃহা প্রতিটি সৃষ্টির পালিত ও বর্ধিত হইবার সকল ব্যবস্থা সুসম্পন্ন করিয়া চলিয়াছে। আর এই প্রতিপালনের প্রয়োজনীয় সব বস্তু এমন অদ্ভুত শৃঙ্খলার সহিত সরবরাহ করা হইতেছে যে, প্রতিটি সত্তার জীবনধারণ ও পরিপোষণের জন্য যখন যাহা চাই, তখন তাহাই মিলিতেছে। কাহার কখন কতটুকু কিসে কি প্রয়োজন, তাহা যেন তিলে তিলে হিসাব করিয়া রাখা হইয়াছে। পিপীলিকা, পোকা, মাকড়সা যে যাহার আশ্রমে গড়াগড়ি যাইতেছে। মাছ নদীতে সাঁতরাইতেছে। পাখি হাওয়ায় উড়িতেছে। ফুলবাগান হাওয়ায় দোলা খাইতেছে। হাতী বনে-জঙ্গলে ছুটিয়া বেড়াইতেছে। তারকারাজি নিজ নিজ কক্ষপথে ঘুরিয়া বেড়াইতেছে। কিন্তু প্রকৃতি সবাইকে সমানে কোলে লইয়া প্রতিপালন ও পর্যবেক্ষণের কাজে ব্যাপৃত রহিয়াছে। কেহই তাহার স্নেহের দৃষ্টি হইতে বঞ্চিত হয় নাই। যদি এই ধরনের উদাহরণ খুঁজিতে কিছুটা কষ্ট স্বীকার করা বৈধ মনে করা হয়, তাহা হইলে দেখা যাইবে যে, এমন অসংখ্য ক্ষুদ্রাতিক্ষুদ্র সৃষ্টি রহিয়াছে, যাহাদের দূরবীক্ষণ যন্ত্র ছাড়া দেখারও উপায় নাই, আল্লাহ্‌র রবুবিয়াত হাতীর মত বিশাল দেহ ও মানুষের মত মহাজ্ঞানী জীবের মতই তাহাদের যথাযথ প্রতিপালনের আয়োজন রাখিয়াছে। এই সব উদাহরণ তো মানব দেহের বাহির হইতে লওয়া হইল। মানুষ যদি নিজের শরীরের প্রতি পর্যবেক্ষণের দৃষ্টি ফিরায়, তাহা হইলে দেখিবে তাহার জীবনের প্রতিটি মুহূর্তই আল্লাহ্‌র রবুবিয়াতের লীলাখেলার একটি পূর্ণাঙ্গ ক্ষেত্র হইয়া রহিয়াছে।

وَفِى الْاَرْضِ اٰيٰتٌ لِّلْمُوْقِنِيْنَ - وَفِىْ اَنْفُسِكُمْ - اَفَلَا تُبْصِرُوْنَ -

সত্যানুসারীদের জন্য পৃথিবী জুড়িয়া স্রষ্টার লীলাখেলার অসংখ্য নিদর্শন রহিয়াছে। এমনকি তোমাদের নিজেদের ভিতরেও তো—তোমরা কি দেখিতে পাও না ? (৫১ ঃ ২০-২১)

প্রতিপালনের বিধান

জীবনের সরঞ্জাম সরবরাহ ও রবুবিয়াতের দায়িত্বের ভিতরে যে পার্থক্য রহিয়াছে, তাহা উপেক্ষা করা চলে না। যদি এই পৃথিবীতে সুশৃঙ্খলভাবে জীবন ধারণের সব উপায়-উপাদান মওজুদ থাকে, তাহাই রবুবিয়াতের জন্য যথেষ্ট নহে। এরূপ থাকাটা আল্লাহ্‌র দয়া-দাক্ষিণ্য ও মহানুভবতার পরিচায়ক মাত্র। কিন্তু রবুবিয়াত আলাদা জিনিস। রবুবিয়াত হইল এইটি যে, পৃথিবীতে জীবন ধারণের সব প্রয়োজনীয় বস্তু মওজুদ থাকার সঙ্গে সঙ্গে তাহার যথাযথ বণ্টন ব্যবস্থা রহিয়াছে। নির্ধারিত সময়ে সবাইকে নির্দিষ্ট পরিমাণে যথোপযোগী বস্তু সরবরাহ করা হইতেছে ! যেই জীবনের যে বয়সে যাহা যতটুকু দরকার, তাহা সুশৃঙ্খলভাবে যথাসময়ে পৌঁছানো হইতেছে। এইভাবে নিয়মিত ব্যবস্থার মাধ্যমে জীবজগতের এই বিরাট কারখানাটি পরিচালিত হইতেছে।

পানি সৃজন ও বণ্টন ব্যবস্থা

জীবনের জন্য পানি ও আর্দ্রতার প্রয়োজনীয়তা অপরিহার্য। আমরা দেখিতে পাই, পানির বিরাট সমুদ্র মওজুদ রহিয়াছে, নদী-নালার অন্ত নাই। কিন্তু সর্বজীবের জীবন ধারণের জন্য ইহা যথেষ্ট ছিল না। কারণ জীবনের প্রয়োজনে কোথাও পানির মওজুদ থাকাই শুধু জরুরী নহে বরং এক বিশেষ ব্যবস্থার মাধ্যমে নিয়মিতভাবে প্রয়োজনীয় পরিমাণে পানি পাওয়া দরকার। সুতরাং দুনিয়ায় পানি সৃষ্টি ও বণ্টনের যে বিশেষ ব্যবস্থা দেখা যায় তাহাতে বিশ্ব প্রকৃতি শুধু পানি সৃষ্টিই করে না, বরং বিশেষ উপায়ে সৃষ্টি করিয়া আবার জীবের চাহিদার সহিত সঙ্গতি রাখিয়া নির্দিষ্ট পরিমাণে বিতরণ করে, ইহাই রবুবিয়াত। এই একটি উদাহরণের সাহায্যে রবুবিয়াতের সকল ধারা ও কার্যাবলি সম্পর্কে ধারণা সৃষ্টি করা চাই।

কুরআন বলে, পানির মত একটি অমূল্য সম্পদ সৃষ্টি করা আল্লাহ্ তা'আলার বিরাট একটি দয়ার কার্য বটে। কিন্তু তাঁহার রবুবিয়াতের পরিচয় হইল এই যে, সেই পানি বৃষ্টির বিন্দুতে পরিণত করিয়া পৃথিবীর প্রতিটি কোণায় যথানিয়মে তিনি পৌঁছাইয়া থাকেন। বিশেষ মৌসুমে বিশেষ এলাকায় নির্দিষ্ট পরিমাণে পানি সরবরাহ করিয়া যেন খুঁজিয়া খুঁজিয়া যমীনের প্রতিটি তৃষ্ণার্ত কণাকে তিনি পরিতৃপ্ত করেন।

وَ اَنْزَلْنَا مِنَ السَّمَاءِ مَاءً بِقَدَرٍ فَاَسْكَنّٰهُ فِى الْاَرْضِ وَ اِنَّا عَلٰى ذَهَابٍ بِهٖ لَقٰدِرُوْنَ -

فَاَنْشَاْنَا لَكُمْ بِهٖ جَنّٰتٍ مِّنْ نَّخِيْلٍ وَّ اَعْنَابٍ - لَكُمْ فِيْهَا فَوَاكِهُ كَثِيْرَةٌ وَّ مِنْهَا تَاْكُلُوْنَ -

—আর দেখ, আমি আকাশ হইতে নির্দিষ্ট পরিমাণে পানি বর্ষণ করিয়াছি। উহা যমীনে মওজুদ রাখিয়াছি এবং আমি অবশ্যই তাহা উঠাইয়া নিবারও ক্ষমতা রাখি। আবার দেখ, সেই পানি দ্বারা আমি খেজুর ও আঙুরের বাগান সৃষ্টি করি। তাহাতে অসংখ্য ফল ধরে এবং তোমরা তাহা হইতে তোমাদের খোরাক সংগ্রহ করিয়া থাক।—(২৩ ঃ ১৮-১৯)

বস্তুর পরিমাণ নির্ধারণ

এই কারণেই কুরআন মজীদের এখানে বস্তুর পরিমাণ নির্ধারণ সম্পর্কে উল্লেখ রহিয়াছে। অর্থাৎ এই সত্যটির দিকে ইঙ্গিত করা হইয়াছে যে, স্রষ্টার প্রকৃতি যাহা দান করে, তাহা নির্দিষ্ট পরিমাণে করিয়া থাকে এবং পরিমাণ নির্ধারণ এক বিশেষ নিয়ম-নীতি অনুসারে হইয়া থাকে।

وَاِنْ مِّنْ شَىْءٍ اِلاَّ عِنْدَنَا خَزَائِنُهٗ وَ مَا نُنَزِّلُهٗ اِلاَّ بِقَدَرٍ مَّعْلُوْمٍ -

—আর আমারই নিকট আছে প্রত্যেক জিনিসের ভাণ্ডার এবং আমি তাহা পরিজ্ঞাত পরিমাণেই অবতীর্ণ করি। —(১৫ ঃ ২১)

وَ كُلُّ شَىْءٍ عِنْدَهُ بِمِقْدَارٍ –

—অনন্তর আল্লাহ্ তা'আলার কাছে প্রত্যেক বস্তুর পরিমাণ নির্দিষ্ট করা রহিয়াছে।

اِنَّا كُلَّ شَىْءٍ خَلَقْنٰهُ بِقَدَرٍ –

—আমি যত রকম বস্তু সৃষ্টি করিয়াছি, সব কিছুই নির্দিষ্ট পরিমাণে সৃষ্টি করিয়াছি। —(৫৪ ঃ ৪৯)

ইহা কিরূপ কথা যে, পৃথিবীতে শুধু পানিই সরবরাহ করা হয় নাই বরং উহার পরিমাণ ও সরবরাহ বিশেষ নিয়ম-নীতি অনুসারে নির্দিষ্ট হইয়া চলিয়াছে ? কেন সূর্যের কিরণজাল সমুদ্র হইতে মশক বোঝাই পানি তুলিয়া হাওয়ার উপরে বিশাল এক চাদর বিছাইতেছে ? আবার কেন হাওয়ার তরঙ্গ দোলায় চঞ্চল হইয়া এক বিশেষ মৌসুমে বিশেষ বিশেষ এলাকায় তাহা বিন্দু বিন্দু বৃষ্টির আকারে বর্ষিত হয় ? আর যেখানেই এরূপ বর্ষণ শুরু হয়, সেখানে কেনই বা তাহা বিশেষ ধারায় নির্দিষ্ট পরিমাণে বর্ষিত হয় ? কেন এরূপ বিশেষ পরিমাণে বর্ষিত হয় যে, যমীনের অভ্যন্তরভাগ আর্দ্র করিয়াও উপরিভাগে প্রয়োজনীয় পরিমাণে পানি মওজুদ থাকে ? কেনই বা পাহাড়ের চূড়ায় প্রথম কিছু বরফ জমিতে দেখি ? তারপর ঋতু বদলের সঙ্গে সঙ্গে কেন তাহা গলা শুরু হয় ? দেখিতে দেখিতে পানির ফোয়ারা কেন উছলিয়া উঠে ? সেই ঝর্ণাধারা নিম্নে আসিয়া নদী-নালারূপে কেনই বা দূরান্তরে ছুটিয়া চলে এবং শত-সহস্র মাইল অবধি দিগন্ত বিস্তৃত প্রান্তর সবুজ শ্যামল করিয়া তোলে ?

এইসব কেন ঘটে ? এইরূপ কেন দেখি না যে, পানি মওজুদ আছে বটে, বিশেষ নিয়মে তাহা বণ্টিত হইতেছে না ?

কুরআন বলে, তাহা এই কারণে যে, নিখিল সৃষ্টি জুড়িয়া আল্লাহ্র 'রবুবিয়াতে'র কুদ্রত বিদ্যমান রহিয়াছে। বস্তুত রবুবিয়াত ইহাই দাবি করে যে, পানি এইভাবেই সৃষ্টি হইবে এবং এইরূপ বিশেষ পরিমাণে বণ্টিত হইবে। পানি সৃষ্টি করা স্রষ্টার অনুগ্রহ ও বিজ্ঞতার পরিচয় বহন করে এবং সেই পানি দ্বারা লালন-পালন ও রক্ষণাবেক্ষণের দায়িত্ব সম্পাদনের ভিতরে রহিয়াছে তাঁহার রবুবিয়াতের পরিচয়।

اَللّٰهُ الَّذِىْ يُرْسِلُ الرِّيٰحَ فَتُثِيْرُ سَحَابًا فَيَبْسُطُهُ فِى السَّمَاءِ كَيْفَ يَشَاءُ وَ يَجْعَلُهُ كِسَفًا فَتَرَى الْوَدْقَ يَخْرُجُ مِنْ خِلٰلِهٖ – فَاِذَا اَصَابَ بِهٖ مَنْ يَّشَاءُ مِنْ عِبَادِهٖ اِذَا هُمْ يَسْتَبْشِرُوْنَ –

আল্লাহ্ যিনি বায়ু প্রেরণ করেন অতঃপর ইহা মেঘমালাকে সঞ্চালিত করে। অবশেষে তিনি নিজের মর্জি মুতাবিক সেগুলি আকাশের সর্বত্র ছড়াইয়া দেন।

ক্রমে ক্রমে উহা ইতঃবিক্ষিপ্ত খণ্ড-বিখণ্ড মেঘে পরিণত হয়। তারপর তোমরা দেখিতে পাও যে, সেই সব খণ্ড মেঘ হইতে বৃষ্টি বর্ষিত হয়। অতঃপর যখন তিনি তাঁহার বান্দাদের মধ্যে যাহাদের নিকট ইচ্ছা ইহা পৌঁছাইয়া দেন। তখন উহার আনন্দে উৎফুল্ল হয়। (৩০ ঃ ৪৮)

জীবনের উপাদান

তারপর এই ব্যাপারটি ভাবিয়া দেখুন যে, জীবন ধারণের জন্য যেই বস্তুর প্রয়োজন যত বেশি, সেগুলি তত বেশি পরিমাণে ও ব্যাপকভাবে দান করা হয়। আর যেইগুলির প্রয়োজন বিশেষ অবস্থায় কিংবা বিশেষ এলাকায় সীমিত, সেই সব বস্তুর দানের বেলায় সীমাবদ্ধতা ও আঞ্চলিকতার বিবেচনা পরিলক্ষিত হয়। জীবন ধারণের জন্য হাওয়ার প্রয়োজন সর্বাধিক। কারণ পানি ও খাবার ছাড়া জীবন কিছু সময় টিকিয়া থাকিতে পারে কিন্তু বায়ু ছাড়া এক মুহূর্তও চলে না। সুতরাং বায়ুর সরবরাহ ব্যবস্থা এত প্রচুর ও ব্যাপকভাবে করা হইয়াছে যে, কোন স্থান বা কোন এলাকা একটি মুহূর্তও বায়ুশূন্য রাখা হয় নাই। গোটা শূন্য এলাকা জুড়িয়া হাওয়ার সমুদ্র বিছাইয়া রাখা হইয়াছে। যখন যেখানে চাও শ্বাস-প্রশ্বাস চালাও। জীবনের সর্বাধিক গুরুত্বপূর্ণ প্রয়োজনটি আপনা-আপনি সরবরাহ হইয়া চলিবে। বায়ুর পরেই জীবনের প্রয়োজনে পানির স্থান। যেমন ঃ

وَ جَعَلْنَا مِنَ الْمَاءِ كُلَّ شَيْءٍ حَيٍّ –

—পানি দ্বারাই আমি সব বস্তুকে সজীব রাখি।

তাই দানের বেলায়ও হাওয়ার পরে এবং অন্য সব বস্তুর উপরে ইহার স্থান রাখা হইয়াছে। অর্থাৎ হাওয়া ছাড়া এত অধিক ও ব্যাপক হারে আর কোন বস্তুই দান করা হয় নাই। যমীনের উপরে চারিদিকে নদী-নালা বহিয়া চলিয়াছে এবং যমীনের ভিতর দিয়া আর্দ্রতা ও উর্বরতার স্রোত প্রবাহিত হইতেছে। ভূগর্ভে অহরহ মিষ্টি পানি বিরাজমান। যমীনের ভিতরে ও বাহিরে পানির এই দুইটি ভাণ্ডার ছাড়াও আকাশে পানির কারখানা পাতিয়া রাখা হইয়াছে। দিনরাত সেই কারখানায় কাজ চলিতেছে। সূর্য সমুদ্র হইতে বাষ্প তুলিয়া লইতেছে। উহাকে পরিষ্কার ও সুমধুর করিয়া একত্র করিতেছে। তারপর চাহিদা মুতাবিক উহা যমীনকে দান করিতেছে।

পানির পরেই জীবনের প্রয়োজনে খাদ্য সর্বাধিক গুরুত্ব রাখে। সুতরাং বায়ু ও পানির পরে খাদ্যবস্তুকেই সবচাইতে ব্যাপক ও বিপুলভাবে দান করা হইয়াছে। শস্য শ্যামল এলাকা কিংবা ঊষর ধূসর মরু সবখানেই খাদ্যের দস্তরখান পাতিয়া দেওয়া হইয়াছে। এমন কোন সৃষ্ট জীব নাই, যাহার খোরাক আশেপাশে মওজুদ রাখা হয় নাই।

প্রতিপালন ব্যবস্থা

তারপর লালন-পালনের এই জগতজোড়া উপায়-উপকরণের দিকে লক্ষ করুন। সেগুলি প্রত্যেকটি এলাকায় কোল পাতিয়া দিয়া জীবন বাঁচানোর উৎসরূপে বিরাজ করিতেছে। মনে হয় যেন জীবন দান ও সংরক্ষণের ইহা এক বিরাট কারখানা। সূর্য এইজন্য রহিয়াছে যে, আলোর বেলায় প্রদীপের ও আগুনের প্রয়োজনে চুল্লীর কাজ দিবে এবং রশ্মির ডালা ভরিয়া পানি সৃষ্টির ব্যবস্থা করিবে। বায়ু নিজ ঠাণ্ডা ও গরম প্রকৃতি লইয়া পৃথিবীর প্রয়োজন মিটাইয়া চলিবে। কখনও আবার মেঘের চাদর চিরিয়া পানির ফোয়ারা সৃষ্টি করিবে। মাটি এইজন্য রহিয়াছে যে, সৃজন ও বর্ধনের ভাণ্ডাররূপে সর্বদা আবাদ হইয়া চলিবে। প্রতিটি বীজের জন্য নিজের কোলে জীবন নিহিত রাখিবে এবং প্রতিটি অঙ্কুরের জন্য নিজের বুকে লালন-পালনের স্পৃহা রাখিবে।

মূলকথা, সৃষ্টির এই বিশাল কারখানাটির প্রতিটি এলাকা শুধু এই কাজেই ব্যস্ত রহিয়াছে যে, প্রত্যেকটি শক্তির উৎস যোগ্য বস্তু খুঁজিয়া ফিরিতেছে এবং প্রত্যেকটি প্রভাব ব্যবহৃত হইবার জন্য অধীরভাবে অপেক্ষা করিতেছে। যখনই কোন বস্তুর ভিতরে বৃদ্ধি লাভের এবং প্রতিপালিত হইবার যোগ্যতা সৃষ্টি হয়, অমনি সমগ্র কারখানাটি তাহার চাহিদা মিটাইতে ঝুঁকিয়া পড়ে। সূর্যের সকল কার্যধারা, আকাশের সর্ববিধ বিবর্তন, পৃথিবীর সকল শক্তি, উপাদান-উপকরণের যাবতীয় আনাগোনা শুধু এই অপেক্ষাই করিতে থাকে যে, কখন পিপীলিকার ডিম হইতে একটি বাচ্চা জন্ম নেয় এবং কখনই বা চাষীর ডালা হইতে একটি বীজ যমীনে নিক্ষিপ্ত হয়।

وَ سَخَّرَ لَكُمْ مَّا فِى السَّمٰوٰتِ وَمَا فِى الْاَرْضِ جَمِيْعًا مِّنْهُ - اِنَّ فِىْ ذٰلِكَ لَاٰيٰتٍ لِّقَوْمٍ يَّتَفَكَّرُوْنَ -

আর আকাশ ও পৃথিবীতে যাহা কিছু বিরাজ করিতেছে, সব কিছুই আল্লাহ্ তা'আলা তোমাদের জন্য ঝুলাইয়া রাখিয়াছেন। সন্দেহ নাই, ইহার ভিতরে চিন্তাশীল মনীষীদের জন্য (সত্যদ্রষ্টা হইবার) বহু নিদর্শন রহিয়াছে। (৪৫ ঃ ১৩)

প্রতিপালন-সংবিধানের ঐক্য ও সমতা

সবচাইতে আশ্চর্য, অথচ সবচাইতে সুস্পষ্ট সত্য হইল প্রতিপালন-সংবিধানে ঐক্য ও সমতা। অর্থাৎ প্রত্যেকটি বস্তুর প্রতিপালনের উপায়-উপকরণ যে ধরনে ও যেভাবে নির্ধারিত করা হইয়াছে, তাহা সব এলাকায় সমানভাবেই দেখা যায়। তাহা একই নিয়ম-নীতিতে চলিতেছে। পাথরের একটি টুক্‌রা ও একটি গোলাপ ফুলের ভিতরে আকাশ-পাতাল পার্থক্য বিদ্যমান। অথচ এই দুইয়ের প্রতিপালন ব্যবস্থা ও রীতিনীতির দিকে লক্ষ করিলে সুস্পষ্ট দেখিতে পাইবে যে, একইভাবে উভয়ই প্রতিপালিত হইতেছে এবং একই ধরনের উপায়-উপকরণ দ্বারা উভয়ের প্রতিপালন কার্য পরিচালিত হইতেছে। মানুষের সন্তান ও বৃক্ষের চারার ভিতরে বিরাট পার্থক্য বিরাজমান। কিন্তু

উভয়ের লালন-পালনের ও রক্ষণ-বর্ধনের পন্থা ও উপায়-উপকরণ খুঁজিয়া দেখিলে দেখা যাইবে যে, প্রতিপালন-বিধির ঐক্য ও সমতার রজ্জু উভয়কে একই সূত্রে গ্রথিত করিয়া রাখিয়াছে। পাথরের টুকরা হউক কিংবা ফুলের কলি, মানুষের সন্তানই হউক কিংবা পিপীলিকার ডিম, সকলের জন্যই জন্ম ব্যবস্থা রহিয়াছে এবং জন্মের পূর্বেই সকলের প্রতিপালনের আয়োজন সম্পন্ন হইয়া থাকে।

তারপর শৈশবের একটি অধ্যায় আসে এবং এই অধ্যায়ের কতকগুলি বিশেষ প্রয়োজন দেখা দেয়। মানব শিশুর জন্য যেরূপ শৈশব আসে তেমনি আসে বৃক্ষের চারার জন্যও। আপনাদের বাহ্যিক দৃষ্টি ইহাকে যতই বিস্ময়ের সহিত দেখুক না কেন, নিঃসন্দেহে পাথরের টিলা ও মাটির স্তূপের জন্যও এই শৈশব দেখা দেয়।

অতঃপর ধীরে ধীরে শৈশব গড়াইয়া যৌবন ও বয়স্কতা আসিতে থাকে। যেমনি জীবনের অধ্যায়গুলির পরিবর্তন দেখা দিতে থাকে, তেমনি জীবনের প্রয়োজনের ভিতরে বিভিন্ন রূপ পরিবর্তন সূচিত হয় এবং জীবন ধারণের উপায়-উপকরণেও বিভিন্নতা পরিলক্ষিত হয়।

এই ধারা বাহিয়া অবশেষে প্রত্যেক বস্তুই পূর্ণতায় পৌঁছে এবং পূর্ণতার পরেই দেখা দেয় আবার দুর্বলতা ও পতনের অধ্যায়। এই দুর্বলতা ও পতনের অধ্যায়ই সর্বশেষে যে পরিসমাপ্তি ডাকিয়া আনে, তাহা সবার জন্যই একাকার। একদলের মৃত্যু হয়, একদল লুকাইয়া যায় আর কোন দল হয় নিশ্চিহ্ন। শুধু ভাষার তারতম্য। এই সকল শব্দের অন্তর্নিহিত সত্যটি মূলত এক।

اَللّٰهُ الَّذِىْ خَلَقَكُمْ مِّنْ ضُعْفٍ ثُمَّ جَعَلَ مِنْ بَعْدِ ضُعْفٍ قُوَّةً ثُمَّ جَعَلَ مِنْ بَعْدِ قُوَّةٍ ضُعْفًا وَّ شَيْبَةً - يَخْلُقُ مَا يَشَاءُ وَ هُوَ الْعَلِيْمُ الْقَدِيْرُ -

আল্লাহ্, যিনি তোমাদের এমনভাবে সৃষ্টি করিয়াছেন যাহাতে প্রথমে অক্ষমতার অবস্থা দেখা দেয়। তারপর ক্ষমতা দেখা দেয়। আবার শক্তি লোপ পাইয়া অক্ষমতা ও বার্ধক্য আত্মপ্রকাশ করে। তিনি যাহা ইচ্ছা করেন, তাহাই সৃষ্টি করেন। অনন্তর তিনিই বিজ্ঞ ও ক্ষমতাবান।

اَلَمْ تَرَ اَنَّ اللّٰهَ اَنْزَلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً فَسَلَكَهٗ يَنَابِيْعَ فِى الْاَرْضِ ثُمَّ يُخْرِجُ بِهٖ زَرْعًا مُّخْتَلِفًا اَلْوَانُهٗ ثُمَّ يَهِيْجُ فَتَرٰهُ مُصْفَرًا ثُمَّ يَجْعَلُهٗ حُطَامًا - اِنَّ فِىْ ذٰلِكَ لَذِكْرٰى لِاُوْلِى الْاَلْبَابِ -

তোমরা কি দেখিতে পাও না যে, আল্লাহ্ তা'আলা আকাশ হইতে পানি বর্ষণ করিতেছেন এবং পৃথিবীতে উহার সাহায্যে নদী-নালা প্রবাহিত করিতেছেন? তারপর সেই পানি দ্বারাই রঙ-বেরঙের শস্য ক্ষেত আত্মপ্রকাশ করিয়াছে। তারপর উহা তরু-তাজায় পরিণত হইয়াছে। যখন পূর্ণমাত্রায় পরিপক্বতা আসিল, তখনই

শুরু হইল পতনের অধ্যায়। তোমরা দেখিতেছ, উহা হলুদ বরণ ধারণ করিয়াছে এবং শেষ পর্যন্ত শুকাইয়া চৌচির হইয়াছে। নিশ্চয়ই এই সবের ভিতরে জ্ঞানীদের জন্য অনেক উপদেশ ও শিক্ষণীয় ব্যাপার নিহিত রহিয়াছে। (৩৯ ঃ ২১)

জীব-জগতের ব্যাপার হইল এই, এক ধরনের প্রাণীর বাচ্চা হয় স্তন্যপায়ী এবং অন্য এক ধরনের জীব আছে যেগুলি সাধারণ খাদ্যাদি গ্রহণ করিয়া বাঁচে। এখন ভাবিয়া দেখুন, পালনকর্তার প্রতিপালন বিধি এই দুই ধরনের প্রাণীকে কিরূপ আশ্চর্যজনক উপায়-উপকরণ দান করিতেছে। স্তন্যপায়ী প্রাণীর ভিতরে মানুষও অন্তর্ভুক্ত রহিয়াছে। সর্বপ্রথম মানুষ নিজের অস্তিত্ব লইয়া গবেষণা করিয়া দেখুক। যখনই সে জন্ম নেয়, তাহার খোরাক আপনা হইতেই সব শর্ত মুতাবিক যথাযথভাবে পাইয়া থাকে। এমনি স্থানে তাহার ব্যবস্থা হইয়া থাকে, শিশু যেন কোলে বসিয়া হাতের কাছেই পাইতে পারে। বস্তুত শিশুর জন্য সেটিই সমগ্র দেহের ভিতরে সবচাইতে নিকটবর্তী ও সবচাইতে উপযুক্ত স্থান। জননী সন্তানকে স্নেহের আতিশয্যে বুকে ধারণ করে এবং সেখানেই শিশুর খোরাকের উৎস মওজুদ রহিয়াছে।

আবার দেখুন, সেই খাদ্যের ধরন ও প্রকৃতি দিন দিন শিশুর বয়োবৃদ্ধির সঙ্গে তাল রাখিয়া কিরূপে পরিবর্তিত হইয়া চলে ! শুরুতে সন্তানের পাকস্থলী এত দুর্বল থাকে যে, সেই সময়ে নিতান্ত পাতলা ও অত্যন্ত লঘুপাক দুধ তাহার জন্য অপরিহার্য। সুতরাং শুধু মানুষই নহে, প্রত্যেকটি স্তন্যদাত্রী প্রাণীর দুধ তখন অত্যন্ত পাতলা ধরনের হইয়া থাকে। তারপর বাচ্চার বয়স ও শক্তি বাড়িবার সঙ্গে সমান তাল রাখিয়া স্তন্যের ভিতরে আপনা-আপনিই প্রয়োজনীয় পরিবর্তন দেখা দিতে থাকে। প্রথমে উহা এত পাতলা থাকে যে বাচ্চার মুখ লাগানোর সঙ্গে সঙ্গে আপনা-আপনি বাহির হইয়া আসে। ক্রমে তাহা ঘন হইয়া বাচ্চার চোষণের অপেক্ষায় থাকে। এইভাবে ক্রমবিবর্তনের ধারা বহিয়া যখন বাচ্চা সাধারণ খোরাক গ্রহণের ক্ষমতা অর্জন করে, তখন হইতেই মাতৃস্তন শুষ্ক হইয়া চলে। হয়তো ইহা পালনকর্তারই প্রতিপালন-বিধির ইঙ্গিত যে, এখন আর বাচ্চার দুধের প্রয়োজন নাই, তাহাকে সাধারণ খাদ্য দিতে পার।

وَ حَمْلُهُ وَفِصَالُهُ ثَلٰثُوْنَ شَهْرًا –

জন্ম হইতে স্তন্যদান বন্ধ পর্যন্ত নির্ধারিত সময় হইল (অন্যূন) ত্রিশ মাস।

আবার খোদায়ী রবুবিয়াতের এই লীলাখেলাটি নিয়া চিন্তা করুন যে, বাচ্চার জন্য মাতৃহৃদয়ে কি অফুরন্ত স্নেহধারা সঞ্চিত রাখিতেছে। মানুষের প্রকৃতিতে যত রকমের প্রবণতা দেখা দিতে পারে সবচাইতে বেশি উচ্ছ্বাসময় ও বেসামাল করা হইয়াছে এই সন্তান বাৎসল্যকে। মায়ের অপার স্নেহের সহিত দুনিয়ার কোন প্রবণতা মুকাবিলা করিতে পারে কি ? অথচ মায়ের জন্য সন্তান প্রসবের মত কঠিন বিপদ আর কিছুই নাই।

حَمَلَتْهُ اُمُّهٗ كَرْهًا وَّ وَضَعَتْهُ كُرْهًا –

তাহার জননী তাহাকে অনেক কষ্টে পেটে ধারণ করিয়াছে এবং বহু কষ্টে প্রসব করিয়াছে।

সন্তানের স্নেহ জননীর ভিতরে সবচাইতে বেশি উন্মাদনা সৃষ্টি করে। যতক্ষণ পর্যন্ত সন্তান প্রাপ্তবয়স্ক না হয়, ততক্ষণ নিজের জন্য নহে বরং সন্তানের জন্যই সে বাঁচিয়া থাকিতে চায়। সন্তানের জন্য সে ষোলআনা আত্মভোলা হইয়া যায়। এমন কোন আরাম-আয়েশ হইতে পারে না, যাহা সে সন্তানের স্বার্থে বর্জন করিতে পারে না। নিজের অস্তিত্বকে ভালবাসা মানব প্রকৃতির সবচাইতে সবল প্রবণতা। উহা উপেক্ষা করিয়া কোন মানুষ বাঁচিয়া থাকিতে পারে না। তাহাও বাৎসল্যের সামনে নিস্তেজ হইয়া যায়। সন্তানের জন্য জননীর প্রাণ বিসর্জন এত নিত্যনৈমিত্তিক ব্যাপারে পরিণত হইয়াছে যে, উহার উদাহরণ তালাশ করিতে গিয়া কোনরূপ অভাবই দেখিতে পাই না।

অথচ আবার দেখুন, প্রকৃতির লীলাখেলার ইহা কিরূপ এক তামাশা যে সন্তান যতই বড় হইয়া চলে, জননীর স্নেহে ততই ভাটি লাগিতে থাকে। এইভাবে অবশেষে এমন সময় আসিয়া দেখা দেয়, যখন অন্যান্য প্রাণীর উহা একেবারেই লোপ পায় এবং মানুষেরও সেই উচ্ছ্বাস আর অবশিষ্ট থাকে না। এই বিবর্তন কেন আসে ? এরূপ কেন হয় যে, সন্তান পয়দা হইবার সঙ্গে সঙ্গেই স্নেহের এক সর্ববৃহৎ ভাণ্ডার বুকে আসিয়া ঠাঁই লয় এবং নির্দিষ্ট কাল তাহা বিরাজ করিয়া আবার আপনা-আপনি উধাও হয় ? ইহাই হইল রবুবিয়াতের লীলাখেলা। রবুবিয়াতই ইহা দাবি করে। রবুবিয়াত চায় বাচ্চাটির প্রতিপালন। মায়ের স্নেহের ভিতরে সে সন্তানের প্রতিপালিত হইবার চাবিকাঠি লুকাইয়া রাখিয়াছে। তাই যখনই সন্তানের বয়সসীমা জননীর স্নেহের প্রয়োজন অতিক্রম করিল, তখন আর সেই চাবিকাঠির আবশ্যকতা রহিল না। তখনও তাহা অবশিষ্ট থাকিলে জননীর জন্য অহেতুক বোঝা ও সন্তানের জন্য অনাহূত প্রতিবন্ধক সৃষ্টি করিত। সন্তানের মুখাপেক্ষিতা সব চাইতে কচি অবস্থায়ই সর্বাধিক ছিল। এইজন্য সেই সময়ে জননীর স্নেহের মাত্রাও অতিরিক্ত ছিল। সন্তান যতই বড় হইতে লাগিল, তাহার মুখাপেক্ষিতার প্রয়োজনও হ্রাস পাইতে লাগিল। সুতরাং সেই সঙ্গে জননীর স্নেহের তরঙ্গ-দোলাও স্তিমিত হইয়া চলিল। প্রকৃতি মাতৃস্নেহের রজ্জুটি সন্তানের প্রতিপালন-মুখাপেক্ষিতার সহিত জুড়িয়া দিয়াছিল। তাই মুখাপেক্ষিতার জোর থাকিলে স্নেহের জোর থাকে এবং মুখাপেক্ষিতার জোর কমিয়া গেলে স্নেহেরও জোর কমিয়া আসে।[৪]

---

৪. মানুষের ভিতরে সন্তান প্রাপ্তবয়স্ক হইবার পরেও সন্তানবাৎসল্য বহাল থাকিতে দেখা যায়। কখনও তাহা ঠিক শিশু সন্তানের প্রতি আকর্ষণের মতই প্রবল মনে হয়। সম্ভবত ইহা মানুষের কৃষ্টি ও সভ্যতার উৎকর্ষের দরুন হইয়া থাকে। অন্যথায় শুধুমাত্র জীব হিসাবে এইরূপ হইবার কথা নহে। আদি মানবদের ভিতরে ঠিক অন্যান্য জীবের মতই সন্তানের প্রাপ্তবয়স্কতা পর্যন্ত সন্তানবাৎসল্য সীমিত ছিল। সভ্যতা বিকাশের সাথে সাথে সন্তানের সহিত মানুষের সম্পর্ক স্থায়ী হইয়া গিয়াছে।

যেই সব প্রাণীর ডিম হইতে বাচ্চা হয়, সেই সব বাচ্চার দৈহিক কাঠামো এরূপ শক্ত হয় যে, স্তন্যপায়ীদের হইতে উহারা স্বতন্ত্র হইয়া যায় এবং প্রথম দিন হইতেই উহারা সাধারণ খাদ্য গ্রহণ করিতে পারে। অবশ্য যদি কোন স্নেহশীল তত্ত্বাবধায়ক থাকে। আপনারা লক্ষ করিয়া থাকিবেন যে, ডিম হইতে বাচ্চা আত্মপ্রকাশ করিয়া খাদ্য খুঁজিতে থাকে তখন মা খুঁজিয়া বাছিয়া উহাদের সামনে খাদ্য রাখিয়া দেয় এবং মুখে লইয়া উহাদের খাবার সবক দেয় ! এইরূপ ভাব করে, মনে হয় যেন মা সব খাইয়া ফেলিল! মূলত সে না খাইয়া মুখের ভিতরে রাখিয়া নরম করে এবং যখনই বাচ্চা খাদ্যের জন্য মুখ খোলে তখনই সে নিজ মুখ হইতে বাচ্চার মুখে ঢুকাইয়া দেয়।

রবুবিয়াতের আভ্যন্তরীণ রূপ

ইহার চাইতেও বিস্ময়কর হইল রবুবিয়াতের আভ্যন্তরীণ রূপ। জীবন ধারণের জন্য বাহিরে যত উপায়-উপকরণের সমাবেশ ঘটানো হইত, যদি তাহা যথাযথভাবে গ্রহণের ক্ষমতা প্রত্যেকটি জীবের ভিতরে দান না করা হইত, তাহা হইলে কোন কাজেই আসিত না। যদি ভিতর ও বাহিরের শক্তিগুলি জীবের সহিত সমানে সহযোগিতা রক্ষা না করিত, তাহা হইলে এইরূপ হাজার ব্যবস্থাও তাহার কোন কল্যাণে আসিত না। সুতরাং আমরা রবুবিয়াতের এই কৃপাটিও দেখিতে পাইতেছি যে, প্রত্যেক জীবের বাহ্যিক ও আভ্যন্তরীণ অঙ্গ-প্রত্যঙ্গগুলি গড়িয়া তোলা হইয়াছে যেন জীবের উহা জীবন ধারণের উপায়-উপকরণগুলি ব্যবহার করিবার জন্য সর্বতোভাবে উপযোগী হয় এবং তাহার জীবন রক্ষণ ও বর্ধনের ব্যাপারে সহায়ক হয়। এরূপ কোন জীব দেখা যাইবে না যাহার দেহের গঠন ও আভ্যন্তরীণ শক্তিগুলি তাহার জন্য নির্ধারিত খাদ্যদ্রব্যাদি গ্রহণের জন্য যথোপযোগী নহে। এই ব্যাপারে অভিজ্ঞতা ও গবেষণার মাধ্যমে যেসব সত্য উদঘাটিত হইয়াছে, তাহার ভিতরে দুইটি সত্যই সব চাইতে উজ্জ্বল হইয়া ধরা দিয়াছে। কুরআনও তাই এই দুইটি ব্যাপারের দিকে বারংবার মানুষের দৃষ্টি আকর্ষণ করিয়াছে। কুরআন সেই সত্য দুইটির একটিকে 'তক্‌দীর' ও অন্যদিকে 'হিদায়ত' নাম দিয়াছেন।

তক্‌দীর (পরিমাণ)

তক্‌দীর অর্থ হইল পরিমাণ নির্ধারণ অর্থাৎ কোন বস্তুর একটি বিশেষ অবস্থা (সংখ্যা হউক কিংবা পরিমাণ) নির্দিষ্ট করা। এই কারণেই আমরা দেখিতে পাই যে, জীবন সংগ্রামের প্রয়োজনে সৃষ্ট দেহের অবয়ব ও আভ্যন্তরীণ শক্তিগুলো সংখ্যা ও পরিমাণের দিক হইতে প্রকৃতি এমন ভাবে নির্দিষ্ট করিয়া দিয়াছে যে, কোন জীবই তাহার বাহিরে কিছু করিবার ক্ষমতা রাখে না। আর এই নির্দিষ্টকরণ এরূপ সংযত হইয়াছে যে, প্রত্যেক জীবের জীবনের রক্ষণ-বর্ধনের যাবতীয় উপায়-উপকরণের সহিত উহার পূর্ণ সামঞ্জস্য রহিয়াছে।

وَخَلَقَ كُلَّ شَىْءٍ فَقَدَّرَهُ تَقْدِيْرًا –

তিনি সবকিছু সৃষ্টি করিয়া প্রত্যেক বস্তুর (অবস্থা ও প্রয়োজন অনুসারে) পরিমাণ ও পরিসংখ্যান নির্দিষ্ট করিয়া দিয়াছেন।

ইহা কিরূপে ঘটে যে, আশেপাশে যেসব খাদ্যবস্তুর সমাবেশ দেখা যায়, সেখানকার জীবগুলির সৃজন বৈশিষ্ট্য তাহার সহিত সঙ্গতি রক্ষা করিতেছে ? কেনই বা বিন্দুমাত্র ব্যতিক্রম দেখা যাইতেছে না ? প্রত্যেক জীবের ভিতর ও বাহিরের গড়ন কেন তাহার পরিবেশের সহিত সঙ্গতি রক্ষা করিতেছে ? ইহা সেই অশেষ বিজ্ঞ ও অপরিসীম ক্ষমতাবান স্রষ্টার নির্ধারিত তক্‌দীরের লীলা মাত্র। তিনি প্রত্যেকের জীবন ও দৈহিক গঠন এইভাবেই নির্দিষ্ট করিয়া দিয়াছেন। তাঁহার এই নির্দিষ্টকরণ বিধি শুধু জীবজগৎ ও উদ্ভিদ জগতের জন্যই নহে বরং নিখিল সৃষ্টির জন্যই সমানে প্রযোজ্য রহিয়াছে। গ্রহ-উপগ্রহ তথা সৌরজগতের সকল গতিবিধিই এই স্রষ্টা নির্ধারিত বিধির দ্বারা সর্বতোভাবে নিয়ন্ত্রিত হইতেছে।

وَالشَّمْسُ تَجْرِىْ لِمُسْتَقَرٍّلَّهَا ذٰلِكَ تَقْدِيْرُ الْعَزِيْزِ الْعَلِيْمِ –

আর দেখ, সূর্যের জন্য যে কক্ষপথ নির্দিষ্ট করা হইয়াছে, সে তাহা অনুসরণ করিয়াই চলিতেছে। মহাবিজ্ঞ ও অসীম ক্ষমতাবান প্রভুই তাহার এই তক্‌দীর নির্ধারিত করিয়াছেন।

সৃষ্টি এবং তাহার পরিবেশের ভিতরে এইরূপ সামঞ্জস্যের নীতি সুরক্ষিত হইয়াছে যে, প্রত্যেকটি বস্তু বাঁচার ও বৃদ্ধির জন্য প্রয়োজনীয় উপায়-উপকরণ তাহার চারিপাশে দেখিতে পায়। পাখি উড়িয়া বেড়ায়। মাছ পানিতে সাঁতরায়। চতুষ্পদ জীব যমীনে চরিয়া ফেরে। কীট-পতঙ্গ গর্তের জীব। এইজন্য প্রত্যেক ধরনের জীবকে তাহাদের পরিবেশের বৈশিষ্ট্যের সহিত সঙ্গতি রক্ষা করিয়া প্রয়োজনীয় অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ দান করা হইয়াছে। নদীতে সাঁতরাইয়া জীবন কাটাইবার জন্য পাখিকে সৃষ্টি করা হয় নাই। কারণ নদীর পরিবেশ পাখির প্রতিপালিত হইবার উপযোগী নহে। মাছকে ভূচর প্রাণী করা হয় নাই। কারণ শুষ্ক মাটি মাছের জীবন ধারণের জন্য উপযুক্ত পরিবেশ হইতে পারে না। প্রকৃতির এই অমোঘ বিধান লংঘন করিয়া যদি এক বিশেষ পরিবেশের জীব অন্য পরিবেশে গিয়া পড়ে, তাহা হইলে হয় সে জীবন হারাইবে, অন্যথায় ধীরে ধীরে সেই পরিবেশ অনুসারে তাহার অবয়বে পরিবর্তন সূচিত হইবে। সঙ্গে সঙ্গে তাহার প্রকৃতিও সেই নূতন পরিবেশ অনুসারে গড়িয়া উঠিবে।

আবার প্রত্যেক ধরনের জীবের ভিতরে বিভিন্ন আঞ্চলিক পরিবেশের প্রভাবও বিদ্যমান। পরিবেশের এই আঞ্চলিক পার্থক্যের গুরুত্বও সমান। শীতল আবহাওয়ার জীবগুলি গরম আবহাওয়ায় টিকিবে না। উত্তর মেরুর জীবগুলি বিষুব রেখা এলাকায় পরিদৃষ্ট হইবে না। তেমনি গ্রীষ্মমণ্ডলের জীবকে কখনও হিমমণ্ডলে দেখা যাইবে না।

হিদায়ত (পথের নির্দেশ)

হিদায়ত অর্থ পথ দেখানো, পথে চালানো ও পথের নির্দেশ দান। উহার বিভিন্ন স্তর ও ধরন রহিয়াছে। বিস্তারিত আলোচনা পরে আসিবে। এখানে শুধু হিদায়তের সেই স্তরটি বর্ণনা করা হইবে, যাহা যাবতীয় সৃষ্টির প্রতিপালনের পথ খুলিয়া দিয়া তাহাদের জীবনের পথে পরিচালিত করে এবং জীবনের চাহিদা ও কামনা আদায়ের পথ বাতলাইয়া দেয়। প্রকৃতির এই হিদায়ত মূলত রবুবিয়াতের হিদায়ত। যদি রবুবিয়াতের হিদায়ত সবাইকে হাত ধরিয়া জীবনের পথে পরিচালিত না করিত, তাহা হইলে কোন সৃষ্টির জন্যই জীবন ধারণের এ বিপুল উপায়-উপকরণ কোন কল্যাণে আসিত না। তেমনি বিশ্বব্যাপী এই প্রাণচাঞ্চল্যও বিরাজ করিত না।

এখন কথা হইল খোদায়ী রবুবিয়াতের এই হিদায়তের ধরনটি কি ? কুরআন বলিতেছে, ইহা বিবেক বা প্রকৃতিগত সহজাত জ্ঞান। ইন্দ্রিয়ানুভূতির স্বভাবগত শক্তিই এই হিদায়তের ধারক ও বাহক। ইহা প্রত্যেক জীবের ভিতরেই প্রথমে সহজাত জ্ঞান হইয়া আত্মপ্রকাশ করে এবং পরে ইন্দ্রিয়শক্তিও আলো সঞ্চার করে। এই হিদায়তের বিভিন্ন স্তর ও ধারার ভিতরেই দিব্যজ্ঞান ও ইন্দ্রিয়ানুভূতির হিদায়ত মওজুদ রহিয়াছে।

সহজাত জ্ঞানের পথনির্দেশ

আমরা দেখিতেছি, প্রত্যেক জীবের ভিতরেই এমন একটি আভ্যন্তরীণ ঐশী ইঙ্গিত সুপ্ত রহিয়াছে, যাহা তাহাকে আপনা-আপনি নিজ জীবন ধারণের পথে পরিচালিত করে। এতটুকুর জন্য সে বাহিরের কাহারও পথ-প্রদর্শন কিংবা শিক্ষাদানের মুখাপেক্ষী থাকে না। মানুষের সন্তান হউক কিংবা পশুর বাচ্চা, যখন মাতৃগর্ভ হইতে বহির্গত হয়, আপনা-আপনি জানিয়া লয় যে, তাহার খাদ্য মায়ের বুকে রহিয়াছে। তাই যখন সে স্তন মুখে লয়, তখনই বুঝিতে পারে যে, জোরেশোরে উহা চুষিতে হয়! বিড়ালের বাচ্চাকে আমরা দেখিতে পাই, এইমাত্র জন্ম নিল, এখনও চোখ ফুটে নাই, মা পরম স্নেহে তাহাকে চাটিতেছে আর সে মায়ের বুকে ঢু মারিতেছে। যেই সদ্যোজাত বাচ্চা সবেমাত্র সৃষ্টিজগতে পদার্পণ করিল, বাহিরের কোন প্রভাবই যাহাকে এখন পর্যন্ত স্পর্শও করে নাই, কি করিয়া সে জানিতে পাইল যে, তাহাকে মায়ের বুকের দুধ পান করিয়া বাঁচিতে হইবে ? কোন্ ফেরেশ্‌তা তাহার কানে ফুঁকিয়া দিল যে, এই ভাবেই সে নিজের খাদ্য হাসিল করিবে ? নিঃসন্দেহে ইহা দিব্যজ্ঞানরূপ ফেরেশ্‌তা এবং ইহাই দিব্যজ্ঞানের হিদায়ত। ইন্দ্রিয় শক্তিগুলি আলো যোগাইবার আগে এই ফেরেশ্‌তাই প্রত্যেক জীবকে জীবন ধারণের উপায় বাতলাইয়া থাকে।

আপনাদের ঘরে অবশ্যই পালিত বিড়াল রহিয়াছে। আপনি হয়তো দেখিয়াছেন যে, একটি বিড়াল জীবনে এই প্রথম গর্ভবতী হইল। এই গর্ভাবস্থার কোন অভিজ্ঞতাই তাহার সঞ্চিত নাই। তথাপি তাহার ভিতর কি এক শক্তি যেন রহিয়াছে, যাহা তাহাকে স্বীয় ভাবী বাচ্চার রক্ষণাবেক্ষণের আয়োজনে নিয়োজিত করিয়া চলিয়াছে। যখনই

বাচ্চা প্রসবের সময় ঘনাইয়া আসে, তখনই আপনা-আপনি সে সব ছাড়িয়া কোন একটি সুরক্ষিত স্থানের খোঁজে তৎপর হইয়া উঠে। আপনি হয়তো দেখিয়াছেন— বিড়ালটি তখন অস্থির হইয়া বাড়ির প্রতিটি কোণা এক এক করিয়া দেখিয়া ফিরে। তারপর সে নিজেই বাড়ির সর্বাপেক্ষা নিরাপদ ও নিরিবিলি স্থানটি বাছিয়া লয় এবং সেখানেই বাচ্চা দেয়। বাচ্চা হইবার সঙ্গে সঙ্গে হঠাৎ তাহার ভিতরে সন্তানের বিপদাপদের এক গোপন দুর্ভাবনা মাথাচাড়া দেয়। তাই সে এখানে সেখানে করিয়া একে একে বহুবার স্থান বদলাইতে থাকে।

ভাবিয়া দেখুন, কোন্ অন্তর্নিহিত শক্তি বিড়ালকে এইরূপ নিরাপদ স্থান খুঁজিয়া বেড়াইবার প্রেরণা যোগায় ? কিরূপে সে বুঝিতে পারে, শীঘ্রই এইরূপ একটি স্থান তাহার প্রয়োজনে আসিবে ? কোন্ ঐশী ইঙ্গিত তাহাকে বলিয়া দেয় যে, বাচ্চার দুশমন আছে এবং সেই দুশমন ঘ্রাণ পাইলেই ছুটিয়া আসিবে বলিয়া তাহাকে বারংবার স্থান বদলাইয়া বাচ্চাকে রক্ষা করিতে হইবে ? নিঃসন্দেহে ইহা খোদায়ী রবুবিয়াতের প্রদত্ত সহজাত জ্ঞানের হিদায়ত। এই ঐশীজ্ঞান তিনি প্রতিটি জীবের স্বভাবগত করিয়া দিয়াছেন। আর এই সহজাত জ্ঞানই জীবজগতকে জীবন ধারণের ক্ষেত্রে স্বাভাবিক পথের নির্দেশ দেয়।

ইন্দ্রিয়শক্তির পথ-সংকেত

হিদায়ত বা পথের নির্দেশের দ্বিতীয় স্তরটি হইল ইন্দ্রিয়শক্তির পথপ্রদর্শন। এই ব্যাপারটি এত সুস্পষ্ট যে, ব্যাখ্যা করিয়া বুঝাইবার দরকার হয় না। আমরা দেখিতে পাই, মানবেতর জীবগুলি যদিও চিন্তা-ভাবনা ও বিবেক-বিবেচনার সাহায্য লাভ হইতে বঞ্চিত থাকে, তথাপি প্রকৃতি তাহাকে অনুভূতি ও উপলব্ধির এমন সব ক্ষমতা দিয়া রাখিয়াছে যাহার সাহায্যে তাহারা নিজেদের থাকা, খাওয়া ও বর্ধন রক্ষণের সব প্রয়োজন সুন্দরভাবে মিটাইতে পারে। আবার দেখা যায়, অনুভূতি ও উপলব্ধির এই পথনির্দেশের ব্যাপারটি সব প্রাণীর বেলায় একরূপ নহে। বরং প্রত্যেক শ্রেণীর প্রাণীকে সেইভাবে ততটুকু শক্তিই দান করা হইয়াছে, যাহা সেই শ্রেণীর বিশেষ অবস্থা ও পরিবেশের জন্য প্রয়োজন ছিল। পিপীলিকার ঘ্রাণশক্তি অত্যন্ত সুদূরপ্রসারী হয়। কারণ গর্তে থাকিয়া দূর-দূরান্তর হইতে তাহাকে খাদ্য সংগ্রহ করিতে হয়। চিল ও বাজের দৃষ্টিশক্তি প্রখর হয়। কারণ শূন্যে উড্ডীয়মান থাকিয়া যমীনে তাহার খোরাক খুঁজিয়া ফিরিতে হয়। এই প্রশ্ন এখানে অবান্তর যে, এই সব প্রাণী জন্ম হইতেই এইসব শক্তির অধিকারী ছিল, না পরিবেশের প্রভাবে ধীরে ধীরে এইগুলি অর্জন করিয়াছে ? কারণ যেভাবেই তাহারা ইহার অধিকারী হউক, মূলত ইহা প্রকৃতিরই দান এবং রক্ষণ-বর্ধনের বিধানও প্রকৃতির বিধান।

বস্তুত হিদায়তের এই ব্যবস্থাটিকে কুরআনে রবুবিয়াতে ইলাহীর 'ওহী' নামে আখ্যায়িত করিয়াছে। আরবীতে 'ওহী' অর্থ গোপন ইঙ্গিত বা ইশারা। ইহা যেন

প্রকৃতির সেই গোপন ইঙ্গিত, যাহা প্রত্যেকটি জীবকে বাঁচিয়া থাকিবার পথ দেখাইয়া দেয়।

وَ اَوْحٰى رَبُّكَ اِلَى النَّحْلِ اَنِ اتَّخِذِىْ مِنَ الْجِبَالِ بُيُوْتًا وَّ مِنَ الشَّجَرِ وَ مِمَّا يَعْرِشُوْنَ –

আর দেখ, তোমাদের প্রভু মধুমক্ষিকার অন্তরে এই কথা জাগ্রত করিয়া দিয়াছেন যে, পাহাড়ে, গাছে ও এই উদ্দেশ্যে সৃষ্ট উঁচু স্থানে বাসা বাঁধিবে।(১৬ ঃ ৬৮)

ইহা সেই রবুবিয়াতে ইলাহী, যাহার দিকে হযরত মূসা (আ) অঙ্গুলি সংকেত করিয়াছিলেন ! ফিরাউন যখন জিজ্ঞাসা করিল ঃ

فَمَنْ رَّبُّكُمَا يٰمُوْسٰى –

হে মূসা ! তোমাদের প্রভু কে ?

তখন হযরত মূসা (আ) জবাব দিলেন ঃ

رَبُّنَا الَّذِىْ اَعْطٰى كُلَّ شَىْءٍ خَلْقَهٗ ثُمَّ هَدٰى –

তিনিই আমাদের প্রতিপালক, যিনি সকলকে সৃষ্টি করিয়া তাহাদের (জীবন ধারণের) পথ বাতলাইয়া দিয়াছেন।

এই হিদায়তকেই অন্যত্র 'সহজ কর্মপন্থা' বলা হইয়াছে।

مِنْ اَىِّ شَىْءٍ خَلَقَهٗ – مِنْ نُّطْفَةٍ – خَلَقَهٗ فَقَدَّرَهٗ ثُمَّ السَّبِيْلَ يَسَّرَهٗ

তিনি মানুষকে কোন্ বস্তু হইতে সৃষ্টি করিয়াছেন ? শুক্র হইতে সৃষ্টি করিয়াছেন। তারপর তাহার সব বাহ্যিক ও আভ্যন্তরীণ শক্তি নির্দিষ্ট করিয়াছেন। তারপর তাহার জীবনের কর্মপন্থা সহজ করিয়া দিয়াছেন।

এই 'ছুম্মাস্ সাবীলা য়্যাস্সারাহু' অর্থাৎ কর্মপন্থা সহজ করাই সহজাত জ্ঞান ও ইন্দ্রিয়শক্তির হিদায়ত। 'তক্দীর'-এর পরেই ইহার স্থান। যদি প্রকৃতির এই পথপ্রদর্শন ব্যবস্থা না থাকিত, তাহা হইলে আমরা হয়তো জীবনের প্রয়োজনগুলি অর্জন করিতে পারিতাম না।

সামনে অগ্রসর হইয়া আপনারা জানিতে পারিবেন যে, সৃষ্টির অস্তিত্ব দানের যে চারিটি স্তর কুরআন বর্ণনা করিয়াছে, তন্মধ্যে তৃতীয় ও চতুর্থ স্তর হইল এই তক্দীর ও হিদায়ত। প্রথম দুইটি হইল তাখলীক ও তাস্ভিয়া অর্থাৎ গঠন ও সামঞ্জস্য বিধান।

اَلَّذِىْ خَلَقَ فَسَوّٰى – وَالَّذِىْ قَدَّرَ فَهَدٰى –

তিনিই প্রতিপালক যিনি সৃষ্টি করিয়াছেন এবং তাহাতে সামঞ্জস্য বিধান করিয়াছেন! আর যিনি সকল সৃষ্টির পরিমাপ নির্দিষ্ট করিয়া দিয়াছেন এবং বাঁচিবার পথ বাতলাইয়াছেন।

কুরআনের প্রামাণ্য দলীলের উৎস

বস্তুত এই কারণেই কুরআন আল্লাহ্‌র অস্তিত্ব ও একত্ব সম্পর্কে বিভিন্ন স্থানে এই নিজামে রবুবিয়াতকে প্রামাণ্য দলীল হিসাবে উল্লেখ করিয়াছেন। আর এই প্রমাণ গুরুত্বপূর্ণ প্রমাণসমূহের অন্যতমরূপে বিবেচিত। এই ব্যাপারটি বিশ্লেষণ করার আগে কুরআনের দলীল-প্রমাণের ধারার বিভিন্ন উৎস সম্পর্কে আলোকপাত করা ভাল মনে করি। কারণ বিভিন্ন সূত্রে কুরআনের এই তাৎপর্যপূর্ণ দিকটি চাপা পড়িয়া গিয়াছে। সেই সব সূত্র আলোচনার এখানে অবকাশ নাই। এখন প্রয়োজন হইল সেই লুপ্ত সত্যের পুনরুদ্ধার ঘটানো।

জ্ঞান-সাধনার আহ্‌বান

কুরআনের প্রমাণ দানের ধারার আদি উৎস হইল জ্ঞান-চর্চা ও চিন্তা-গবেষণার দিকে মানুষকে আহ্‌বান জানানো। অর্থাৎ বিভিন্ন স্থানে এই কথাটির উপরেই জোর দেওয়া হইয়াছে যে, মানুষের জন্য সত্য চিনিবার একমাত্র পথ হইল আল্লাহ্‌ প্রদত্ত জ্ঞান ও সূক্ষ্মদর্শিতার প্রয়োগ এবং নিজের ভিতরে এবং আশেপাশে যাহা কিছু অনুভব করিবে, তাহা লইয়া চিন্তা-গবেষণা চালানো। বস্তুত কুরআনের এমন কোন সূরা কিংবা সূরার অংশ পাওয়া যাইবে না, যেখানে মানুষকে জ্ঞান-চর্চা ও গবেষণার দিকে আহ্‌বান জানানো হয় নাই।

وَفِى الْاَرْضِ اٰيٰتٌ لِّلْمُوْقِنِيْنَ - وَفِىْ اَنْفُسِكُمْ اَفَلَا تُبْصِرُوْنَ -

এবং নিশ্চিত বিশ্বাসীদের জন্য পৃথিবীতে (স্রষ্টার পরিচয়ের) বহু নিদর্শন রহিয়াছে। আর স্বয়ং তোমাদের ভিতরেও তো—তারপর তোমরা কি তাহা দেখ না ?

(৫১ ঃ ২০-২১)

কুরআন বলে, মানুষকে জ্ঞান ও দৃষ্টিশক্তি এইজন্য দেওয়া হইয়াছে যে, মানুষ এইগুলির যথাযথ ব্যবহার করিল কি না তাহার জন্য জবাবদিহি হইবে।

اِنَّ السَّمْعَ وَالْبَصَرَ وَالْفُوَادَ كُلُّ اُوْلٰئِكَ كَانَ عَنْهُ مَسْؤُلاً -

নিশ্চয়ই মানুষের শ্রবণ, দর্শন ও চিন্তাশক্তি নিজ নিজ ক্ষেত্রে জবাবদিহি থাকিবে।

কুরআন বলে, পৃথিবীর সব বস্তুর ভিতরে, আকাশের সকল দৃশ্যে, জীবনের প্রত্যেকটি বিবর্তনে মানুষের চিন্তাশক্তির জন্য সত্য চিনিবার নিদর্শনাবলি নিহিত রহিয়াছে। অবশ্য তাহার শর্ত হইল—এইগুলি সম্পর্কে উদাসীন থাকিলে চলিবে না।

وَ كَاَيِّنْ مِّنْ اٰيٰتٍ فِى السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ يَمُرُّوْنَ عَلَيْهَا وَ هُمْ عَنْهَا مُعْرِضُوْنَ -

—আর আকাশ ও পৃথিবীতে (সত্যকে চিনিবার) কতই নিদর্শন রহিয়াছে। কিন্তু (মানুষের ঔদাসিন্যের প্রতি) আক্ষেপ! মানুষ সেইগুলির পার্শ্ব দিয়া চলিয়া যায় অথচ চোখ তুলিয়া একবার দেখে না।

সার্থক সৃষ্টির সুষম বিধান

আচ্ছা, যদি মানুষ জ্ঞান ও সূক্ষ্মদর্শিতার সাহায্যে সব অনুধাবন করে এবং সৃষ্টিজগত লইয়া চিন্তা-ভাবনা করে, তাহা হইলে কোন্ সত্যের দ্বার তাহার সামনে উদ্‌ঘাটিত হইবে ? কুরআন বলে, তাহার সামনে সর্বাগ্রে যে সত্যটি ধরা দিবে তাহা হইল নিখিল জগতব্যাপী সুষম সৃষ্টির একক বিধান অর্থাৎ সে দেখিতে পাইবে যে, সৃষ্টিজগতের প্রতিটি বস্তুর গঠন-কৌশল অত্যন্ত সুষম এবং বিশেষ বিশেষ উদ্দেশ্যে বিশেষ এক নিয়ম-নীতির অধীনে সেইগুলিকে গড়িয়া তোলা হইয়াছে। কোন বস্তুই উদ্দেশ্যবিহীন নহে, কল্যাণকর ছাড়া নহে। এই সৃষ্টিজগতে অহেতুক ও অনিয়ম কোন কিছুই নাই। যদি তাহা হইত, তাহা হইলে নিখিল সৃষ্টির ভিতরে এই সুনিবিড় ঐক্য, সামঞ্জস্য ও ধারাবাহিক শৃঙ্খলার পরিচয় পাইতাম না এবং সব কিছুই সার্থক ও কল্যাণকর হইয়া আত্মপ্রকাশ করিত না।

خَلَقَ السَّمٰوٰت وَالْاَرْضَ بِالْحَقِّ - اِنَّ فِىْ ذَالِكَ لَاٰيٰت لِلْمُؤْمِنِيْنَ

আল্লাহ্ আকাশ ও পৃথিবীকে সুকৌশলে কল্যাণকর করিয়া সৃষ্টি করিয়াছেন। ইহার ভিতরে নিশ্চয়ই ঈমানদারদের জন্য (সত্য লাভের) বহু নিদর্শন রহিয়াছে।

সূরা 'আল্-'ইমরান'-এর বিখ্যাত আয়াতে আকাশ ও পৃথিবীর বিচিত্র নিদর্শনাবলির গবেষণায় নিরত হইয়া যাহারা সত্যানুসন্ধানে তৎপর থাকেন, তাঁহাদের স্বতঃস্ফূর্ত ঘোষণা এইরূপ ব্যক্ত করা হইয়াছে ঃ

رَبَّنَا مَا خَلَقْتَ هٰذَا بَاطِلاً -

—হে আমাদের প্রতিপালক ! তুমি এই বিশাল সৃষ্টির কিছুই তো অহেতুক সৃষ্টি কর নাই।

কুরআনের অন্যত্র 'অনর্থক সৃষ্টি'-কে খেল-তামাশা বলিয়া আখ্যায়িত করা হইয়াছে! অর্থাৎ এমন বাজে কাজ, যাহার পেছনে কোন জ্ঞানের পরিচয় কিংবা কল্যাণকর উদ্দেশ্য থাকে না।

وَمَا خَلَقْنَا السَّمٰوٰت وَالْاَرْضَ وَمَا بَيْنَهُمَا لٰعِبِيْنَ - مَا خَلَقْنٰهُمَا اِلاَّ بِالْحَقِّ وَلٰكِنْ اَكْثَرُ هُمْ لاَ يَعْلَمُوْنَ -

—আমি আকাশ, পৃথিবী ও উহার ভিতরের যাবতীয় বস্তু খেল-তামাশার জন্য সৃষ্টি করি নাই। আমি বিশেষ বিজ্ঞতার সহিত কল্যাণকর করিয়াই এইগুলি সৃষ্টি করিয়াছি। কিন্তু অধিকাংশ লোকই এই সত্যটির খবর রাখে না।

তারপর বিভিন্ন স্থানে এই 'সার্থক সৃষ্টি' সম্পর্কে বিশ্লেষণ দান করা হইয়াছে। যেমন এক স্থানে এই সার্থক সৃষ্টির কল্যাণকর দিকটির দিকে দৃষ্টি আকর্ষণ করা হইয়াছে। বলা হইয়াছে, নিখিল সৃষ্টির সব কিছুই কল্যাণের বার্তা বহন করিয়া চলিয়াছে এবং প্রকৃতি চায়, যাহাই সৃষ্টি হউক, তাহা যেন জীবজগতের উপকারে আসে, জীবনকে সুখকর করে।

خَلَقَ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضَ بِالْحَقِّ - يُكَوِّرُ اللَّيْلَ عَلَى النَّهَارِ وَيُكَوِّرُ النَّهَارَ عَلَى اللَّيْلِ وَسَخَّرَ الشَّمْسَ وَالْقَمَرَ - كُلٌّ يَّجْرِىْ لِاَجَلٍ مُّسَمًّى - اَلاَ هُوَ الْعَزِيْزُ الْغَفَّارُ -

—তিনি আকাশ ও পৃথিবী বিশেষ নৈপুণ্যের সহিত কল্যাণকর করিয়া সৃষ্টি করিয়াছেন। তিনি রাত্রি ও দিবসের আত্মপ্রকাশের এইরূপ ব্যবস্থা করিয়াছেন যে কখনও রাত্রি বড় হইয়া দিবসের অংশ গ্রাস করে এবং কখনও দিবস বড় হইয়া রাত্রির অংশ গ্রাস করিয়া লয়। তাঁহারই সৃষ্টি নৈপুণ্য চাঁদ ও সুরুজকে মহাশূন্যে ঝুলাইয়া রাখিয়াছে। সৌরজগতের সবকিছুই তাহাদের জন্য নির্ধারিত সময়ের ভিতরে নিজ নিজ কক্ষপথে পরিভ্রমণ করিতেছে। খবরদার ! তিনি সর্বোপরি ক্ষমতাবান, অথচ অত্যন্ত ক্ষমাশীল।

দ্বিতীয় এক স্থানে বিশেষভাবে সৌরজগতের কল্যাণকর দিকগুলির দিকে দৃষ্টি আকর্ষণ করা হইয়াছে। আর সেইগুলিকে 'সার্থক সৃষ্টি' বলিয়া আখ্যায়িত করা হইয়াছে।

هُوَ الَّذِىْ جَعَلَ الشَّمْسَ ضِيَاءً وَّالْقَمَرَ نُوْرًا وَ قَدَّرَهُ مَنَازِلَ لِتَعْلَمُوْا عَدَدَ السِّنِيْنَ وَالْحِسَابَ - مَا خَلَقَ اللّٰهُ ذَالِكَ اِلاَّ بِالْحَقِّ يُفَصِّلُ الْاٰيَاتِ لِقَوْمٍ يَّعْلَمُوْنَ -

তিনি আল্লাহ্ যিনি সূর্যকে কিরণোজ্জ্বল ও চন্দ্রকে মধুর আলোদায়ক করিয়া সৃষ্টি করিয়াছেন। তারপর চাঁদের পরিভ্রমণের জন্য কক্ষপথ ও সময় নির্ধারিত করিয়া দিয়াছেন যেন তোমরা বর্ষ ও সময়ের হিসাব করিতে পার। ইহা নিশ্চিত যে, আল্লাহ্ তা'আলা এইগুলিকে সার্থক সৃষ্টিরূপে গড়িয়াছেন। এইসব বস্তু অনুসন্ধিৎসুদের জন্য স্রষ্টার নিদর্শনাবলিরূপে প্রতিভাত হইবে।

আরেক স্থানে প্রকৃতির সৌন্দর্য ও শৃঙ্খলাবোধের প্রতি দৃষ্টি আকর্ষণ করা হইয়াছে। তাহাকেও সার্থক সৃজনী প্রতিভা বলিয়া আখ্যায়িত করা হইয়াছে। অর্থাৎ বিশ্ব প্রকৃতির ভিতরে সৌন্দর্য ও শৃঙ্খলার বিধান সক্রিয় রহিয়াছে। সেই বিধান চায় যে, যাহা কিছুই সৃষ্টি হইবে, সৌন্দর্য ও শৃঙ্খলার পূর্ণ প্রতীকরূপে প্রতীয়মান হইবে।

خَلَقَ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضَ بِالْحَقِّ وَصَوَّرَكُمْ فَاَحْسَنَ صُوَرَكُمْ -

—তিনি আকাশ ও পৃথিবী ঠিক ভাবে সৃষ্টি করিয়াছেন এবং তোমাদের রূপদান করিতে গিয়াও তিনি যথার্থ সৌন্দর্য রক্ষা করিয়াছেন।

এইভাবে তিনি কর্মফলের বিধান বর্ণনা করিতে গিয়াও এই 'যথার্থ সৃষ্টি'র সাহায্যে প্রমাণ দান করিয়াছেন। আপনারা দেখিতেছেন যে, পৃথিবীতে প্রতিটি বস্তুর একটি বৈশিষ্ট্য ও পরিণতি রহিয়াছে। প্রতিটি বৈশিষ্ট্যে বিশেষ পরিণতিটি যেমনি অপরিহার্য, তেমনি অলংঘনীয়। সুতরাং ইহা কিরূপ হইতে পারে যে, প্রতিটি কাজের

ভাল ও মন্দ বৈশিষ্ট্যের অপরিহার্য পরিণতিরূপে সুফল ও কুফল দেখা দিবে না ? কেন ইহা সুনিশ্চিত ও অলংঘনীয় হইবে না ? প্রকৃতির যেই বিধান পৃথিবীর প্রতিটি বস্তুর ভিতরে ভাল ও মন্দের পার্থক্য সৃষ্টি করিয়াছে, তাহা কি মানুষের কাজের ভিতরে সেই পার্থক্য বহাল রাখিতে ভুল করিবে ?

اَمْ حَسِبَ الَّذِيْنَ اجْتَرَحُوْا السَّيِّئَاتِ اَنْ نَّجْعَلَهُمْ كَالَّذِيْنَ اٰمَنُوْا وَعَمِلُوْا الصّٰلِحٰتِ - سَوَاءً مَّحْيَاهُمْ وَمَمَاتُهُمْ - سَاءَ مَا يَحْكُمُوْنَ وَ خَلَقَ اللّٰهُ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضَ بِالْحَقِّ وَ لِتُجْزٰى كُلُّ نَفْسٍ بِمَا كَسَبَتْ وَهُمْ لاَ يُظْلَمُوْنَ -

—যাহারা অন্যায় কার্যাবলি করিয়া বেড়াইতেছে, তাহারা কি মনে করিতেছে যে, যাহারা ঈমান আনিয়া ভাল কাজ করিয়াছে, তাহাদের সমান পরিণাম দান করা হইবে ? অর্থাৎ জীবনে ও মরণে তাহারা সমান অবস্থায় কাটাইবে ? যদি তাহাদের বুদ্ধি-বিবেক এই সিদ্ধান্তেই পৌঁছিয়া থাকে, তাহা বড়ই ভুল সিদ্ধান্ত অথচ সত্য ঘটনা এই, আল্লাহ্ তা'আলা আসমান ও যমীন অত্যন্ত বিজ্ঞতার সহিত নিতান্ত উদ্দেশ্যপূর্ণ করিয়া সৃষ্টি করিয়াছেন এবং তাহা এইজন্যই করিয়াছেন যে, প্রত্যেকে যেন নিজ নিজ উপার্জিত ফল ভোগ করে ও সেক্ষেত্রে কোনরূপ জুলুম দেখা না দেয়।

পুনরুত্থান অর্থাৎ মরণের পরে পুনর্জীবন লাভ সম্পর্কেও প্রমাণ দান করিতে গিয়া এই অর্থপূর্ণ সৃষ্টিজগতের সাহায্য লওয়া হইয়াছে। সৃষ্টি-জগতের সব বস্তুরই একটি লক্ষ্য ও শেষ পরিণতি রহিয়াছে। সুতরাং মানব দেহেরও একটা উদ্দেশ্য ও শেষ পরিণতি থাকা স্বাভাবিক। সেই শেষ পরিণতিই হইল পারলৌকিক জীবন। কারণ ইহা তো হইতেই পারে না যে, সৃষ্টিজগতের এই সেরা সৃষ্টি মানুষকে শুধু জন্ম নিয়া মরণের বুকে চিরতরে বিলুপ্ত হইবার জন্য গড়িয়া তোলা হইয়াছে ?

اَوَ لَمْ يَتَفَكَّرُوْا فِيْ اَنْفُسِهِمْ - مَا خَلَقَ اللّٰهُ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضَ وَمَا بَيْنَهُمَا اِلاَّ بِالْحَقِّ وَاَجَلٍ مُّسَمًّى - وَاِنَّ كَثِيْرًا مِّنَ النَّاسِ بِلِقَاءِ رَبِّهِمْ لَكٰفِرُوْنَ -

তাহারা কি আপন মনে এই ব্যাপারটি ভাবিয়া দেখে না যে, এই আকাশ ও পৃথিবী এবং উহার ভিতরের সবকিছু আল্লাহ্ তা'আলা অহেতুক সৃষ্টি করেন নাই ? অবশ্যই এই সব তাঁহার অর্থপূর্ণ সৃষ্টি এবং এই গুলির জন্য তিনি সময়ও নির্দিষ্ট করিয়া দিয়াছেন। আসল কথা হইল এই, অধিকাংশ মানুষই তাহাদের প্রতিপালকের সহিত যে দেখা হইবে এই কথাটি অস্বীকার করিতেছে।

প্রমাণের উৎস

স্থূল কথা, কুরআনের প্রমাণ উৎসগুলি এই ঃ

১. কুরআন মজীদ অবতীর্ণ হইবার সময়ে ধর্ম ও আল্লাহ্ অর্চনার যেসব সাধারণ ধ্যান-ধারণা প্রচলিত ছিল, তাহা শুধু জ্ঞানের স্পর্শশূন্যই ছিল না, পরন্তু তাহার সকল ভিত্তিই অযৌক্তিক কুসংস্কারে পরিণত হইয়াছিল। কুরআন আসিয়া আল্লাহ্ অর্চনার ব্যাপারটি জ্ঞান ও যুক্তিভিত্তিক করিয়া তুলিল।

২. কুরআনের যাবতীয় আহ্বানের মূল কথা হইল চিন্তা ও গবেষণায় নিমগ্ন হওয়া। উহাতে বিশেষ করিয়া সৃষ্টিজগৎ অধ্যয়ন ও উহা লইয়া গবেষণা করার প্রেরণা দান করা হইয়াছে।

৩. কুরআন বলে, সৃষ্টিজগতের অধ্যয়ন ও গবেষণায় মানুষের কাছে 'অর্থপূর্ণ' সৃষ্টির সকল রহস্যের দ্বার উদ্‌ঘাটিত হয়। সে দেখিতে পায় যে, এই নিখিল সৃষ্টির ভিতরে এমন কোন বস্তু নাই যাহা উদ্দেশ্যহীন ও অর্থহীন এবং যাহা বিশেষ এক নিয়ম-নীতি অনুসরণ করিয়া গড়িয়া উঠে নাই। এখানে যাহা কিছুই দেখা যাইতেছে, বিশেষ এক শৃঙ্খলা ও ধারাবাহিকতার সঙ্গে উদ্দেশ্য ও তাৎপর্যের জগতজোড়া রজ্জুতে আবদ্ধ হইয়া রহিয়াছে।

কুরআন বলে, যদি মানুষ এই সব তাৎপর্য উদ্দেশ্য লইয়া চিন্তা-ভাবনা করে, তাহা হইলে সত্যের দ্বার তাহার কাছে আপনা-আপনি খুলিয়া যাইবে এবং মূর্খতা ও কুসংস্কারের বিভ্রান্তি হইতে মুক্তি লাভ করিবে।

রবুবিয়াতের দলীল

বস্তুত এই ব্যাপারে কুরআন সৃষ্টিজগতের উদ্দেশ্য ও তাৎপর্য হইতে যত দলীল পেশ করিয়াছে, বেশির ভাগই আল্লাহ্ প্রদত্ত রবুবিয়াত সম্পর্কে করা হইয়াছে। এইজন্যই ইহাকে আমরা 'রবুবিয়াতের দলীল' নামে আখ্যায়িত করিতে পারি। কুরআন বলে, সৃষ্টিজগতের সকল কাজ ও দৃশ্যকে যে আমরা প্রতিপালন ও জীবন দানের ক্ষেত্রে নিয়োজিত দেখিতে পাই আর স্থান-কাল-পাত্রের সহিত সঙ্গতি রক্ষা করার যে এক ব্যাপক প্রতিপালন বিধির অস্তিত্ব অনুভব করি, ইহা অবশ্যই আমাদের মানব সমাজের সহজাত জ্ঞানকে একটি নিশ্চিত ধারণা দান করিতেছে। তাহা এই যে, এই বিশাল সৃষ্টিজগতের এক মহান প্রতিপালক রহিয়াছেন এবং তিনি এইরূপ নিখুঁত ও সর্বাঙ্গীণ সুন্দর সৃষ্টির কারখানা পরিচালনার যাবতীয় গুণে গুণান্বিত ও মহিমান্বিত।

কুরআন বলে, মানুষের স্বাভাবিক জ্ঞান কি ইহা স্বীকার করিতে পারে যে, এই বিশাল লালন-পালনের নিখুঁত কারখানাটি আপনা-আপনি গড়িয়া উঠিয়াছে ? কোন জীবনী-শক্তি, কোন ইচ্ছাশক্তি কিংবা কোন তাৎপর্য উহার পিছনে সক্রিয় নহে ? ইহা কি সম্ভব যে, সৃষ্টির এই কারখানাটির ভিতরে স্বাভাবিক বিকাশ ও বর্ধনের অন্তর্নিহিত শক্তিটিই সব কিছু, ইহার বাহিরে কোন প্রতিপালক, কোন মহাশক্তি বিরাজমান

নহেন? শুধু একটি অন্ধ প্রাকৃতিক শক্তি, একটি নিষ্প্রাণ জড় বস্তু, একটি নির্বোধ ইলেকট্রন কণিকার সমষ্টি হইতেই কি বিরাট এই কারখানাটির সৃজন, প্রতিপালন ও লয়ের রূপটি বিকাশ লাভ করিতেছে ? ইচ্ছা ও চিন্তার অধিকারী কোন অস্তিত্ব কি ইহার পিছনে কাজ করিতেছে না ?

লালন-পালন চলিতেছে যথাযথভাবেই অথচ কোন প্রতিপালক নাই ! লীলাখেলা চলিতেছে অথচ কোন লীলাময় নাই ! দয়ার প্লাবন বহিয়া যাইতেছে অথচ কোন দয়ালু নাই। কলাকৌশল দেখিতেছি, কিন্তু কোন কুশলী নাই ? এক কথায় সব কাজ আছে, কিন্তু কোন কাযী নাই।

কর্মী ছাড়া কাজ, কর্তা ছাড়া শৃঙ্খলা, রাজমিস্ত্রী ছাড়া দালান, চিত্রকর ছাড়া চিত্র, প্রতিষ্ঠাতা ছাড়া প্রতিষ্ঠান, মোটকথা নাই অথচ সব হইতেছে মানুষের প্রকৃতি কখনও ইহা মানিতে পারে না। তাহার স্বাভাবিক বুদ্ধি দাবি করে, এইরূপ হইতেই পারে না। মানুষের প্রকৃতির ধাতই এই ছাঁচে গঠিত যে, এইরূপ হইতে পারে না। এই বিশ্বাসই সেখানে ঢুকিতে পারে কিন্তু ইহাতে সন্দিহান হইয়া থাকিতে পারে না। ইহা অস্বীকারও করিতে পারে না।

কুরআন বলে, এই ব্যাপারটি মানুষের স্বাভাবিক বিশ্বাসের বিপরীত যে, রবুবিয়াতের এই বিধান অধ্যয়ন করিবে অথচ নিখিল সৃষ্টির এক প্রতিপালকের অস্তিত্ব তাহার অন্তরে জাগ্রত হইবে না ! সে আরও বলে, একটি মানুষের নাফরমানী ও পাপাচারের অতল সমুদ্রে ডুবিয়া বসিতে পারে, এমন কি সে সব কিছুই অস্বীকার করিতে পারে কিন্তু নিজ স্বভাব-প্রকৃতির বিরুদ্ধে হাতিয়ার ধারণ করিতে পারে না। সব কিছুর বিরুদ্ধেই সে যুদ্ধ করিতে পারে কিন্তু নিজের প্রকৃতির বিরুদ্ধে যুদ্ধ করিতে পারে না। সে যখনই নিজের চতুর্দিকে জীবন ও প্রতিপালন লীলার বিরাট কারখানাটি দেখিতে পায়, তখন তাহার প্রকৃতি কি ঘোষণা করে ? তাহার অন্তরের প্রতিটি অণু-পরমাণুতে কোন্ ধারণাটি ছড়াইয়া পড়ে ? ইহাই কি নহে যে, এক মহা প্রতিপালক বিদ্যমান এবং এই সব তাঁহারই লীলাখেলা ?

ইহা স্মরণ রাখা দরকার যে, কুরআন মজীদ কখনো থিওরি বা কল্পিত ব্যাপার উত্থাপনপূর্বক যুক্তি-তর্কের মারপ্যাঁচে আবদ্ধ করিয়া পাঠককে উহা সমর্থনের জন্য বাধ্য করার নীতি অনুসরণ করে নাই। কুরআনের সকল আহবান মানুষের সহজাত জ্ঞান ও রুচিকে উদ্দেশ্য করিয়া দেখা দিয়াছে। সে বলে, আল্লাহ্ অর্চনার প্রেরণা মানুষের স্বভাবসুলভ। যদি মানুষ ইহা অস্বীকার করে, তাহা হইলে বুঝা যাইবে, সে আত্মভোলা হইয়াছে এবং তাহাকে সচেতন করিয়া দেওয়া প্রয়োজন। সেইজন্য দলীল পেশ করিতে হয়। দলীল-প্রমাণও এইরূপ হওয়া উচিত নহে যাহা শুধু কল্পনার জগতে ধূম্রজাল সৃষ্টি করিবে বরং এরূপ দলীল চাই যাহা তাহার ভিতরকার অবচেতন চেতনাকে চাঙ্গা করিয়া তুলিবে। যদি তাহার সহজাত জ্ঞান চাঙ্গা হয়, তাহা হইলে

আর দাবি প্রতিষ্ঠার জন্য লম্বা বহাস চালাইবার প্রয়োজন দেখা দিবে না ! তাহার স্বাভাবিক জ্ঞানই তাহাকে সেই সত্য পর্যন্ত পৌঁছাইয়া দিবে।

بَلِ الْاِنْسَانُ عَلٰى نَفْسِهٖ بَصِيْرَةٌ - وَ لَوْ اَلْقٰى مَعَاذِيْرَهٗ -

বরং মানুষের অস্তিত্ব স্বয়ং উহার (উহাদের স্রষ্টা সম্পর্কিত ভুল সংশয়ের) বিপরীত প্রমাণ হইয়া রহিয়াছে। সে যতই না (নিজের স্বাভাবিক বুদ্ধির বিরুদ্ধে) বাহানা ও অজুহাত খুঁজিয়া বেড়াক।

এইজন্য কুরআন মজীদ এখানে সেখানে মানব প্রকৃতিতে লক্ষ করিয়া স্বীয় দাবি পেশ করিয়াছে এবং তাহার নিকটেই জবাব শুনিতে চাহিয়াছে।

قُلْ مَنْ يَّرْزُقُكُمْ مِّنَ السَّمَاءِ وَالْاَرْضِ اَمَّنْ يَّمْلِكُ السَّمْعَ وَالْاَبْصَارَ وَمَنْ يُّخْرِجُ الْحَيَّ مِنَ الْمَيِّتِ وَيُخْرِجُ الْمَيِّتَ مِنَ الْحَيِّ وَمَنْ يُّدَبِّرُ الْاَمْرَ فَسَيَقُوْلُوْنَ اللّٰهُ - فَقُلْ اَفَلَا تَتَّقُوْنَ فَذٰلِكُمُ اللّٰهُ رَبُّكُمُ الْحَقُّ فَمَاذَا بَعْدَ الْحَقِّ اِلَّا الضَّلٰلُ فَاَنّٰى تُصْرَفُوْنَ

—বল, আকাশের (বুকে সম্প্রসারিত জীবনলীলার কারখানা) ও পৃথিবীর (বুক হইতে উৎপন্ন ফসলাদির) প্রশস্ত ক্ষেত্র হইতে কে তোমাদিগকে খোরাক যোগাইতেছে ? তোমাদের দেখা ও শোনার সব ক্ষমতা কাহার মুঠায় রহিয়াছে ? নির্জীব বস্তুকে কে জীবন দান করেন এবং সজীবকে কে নির্জীবে পরিণত করেন ? নিখিল সৃষ্টির এই কারখানাটিকে কে এত শৃঙ্খলার সহিত সুন্দরভাবে পরিচালনা করিতেছেন ? (হে রসূল) নিশ্চয়ই তাহারা (স্বতঃস্ফূর্তভাবে, অজ্ঞাতভাবে, অজ্ঞাতসারে) বলিয়া উঠিবে, তিনি আল্লাহ্ (আল্লাহ্ ছাড়া আর কেহই নহেন)। আচ্ছা, আপনি তাহাদের বলুন, এই কথাটি যখন তোমরা অস্বীকার করিতেছ না, তখন ঔদাসীন্য ও নাফরমানী ছাড়িতেছ না কেন ? হ্যাঁ—নিশ্চয়ই এসবের মূলে আল্লাহ্ তা'আলাই রহিয়াছেন—যিনি তোমাদের মহান প্রতিপালক। ইহা যখন সত্য তখন এইরূপ উজ্জ্বল সত্যকে অস্বীকার করা প্রকাশ্য গোমরাহী ছাড়া আর কি হইতে পারে ? (তোমাদের বিবেক-বুদ্ধিকে শত ধিক) তোমরা সত্য হইতে মুখ ফিরাইয়া কোথায় যাইতেছ ? (১০ ঃ ৩১-৩২)

অন্যত্র ইরশাদ হইয়াছে ঃ

اَمَّنْ خَلَقَ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضَ وَ اَنْزَلَ لَكُمْ مِّنَ السَّمَاءِ مَاءً - فَاَنْبَتْنَا بِهٖ حَدَائِقَ ذَاتَ بَهْجَةٍ - مَا كَانَ لَكُمْ اَنْ تُنْبِتُوْا شَجَرَهَا - ءَاِلٰهٌ مَّعَ اللّٰهِ - بَلْ هُمْ قَوْمٌ يَّعْدِلُوْنَ - اَمَّنْ جَعَلَ الْاَرْضَ قَرَارًا وَّجَعَلَ خِلٰلَهَا اَنْهَارًا وَّ جَعَلَ لَهَا رَوَاسِيَ وَّ جَعَلَ بَيْنَ الْبَحْرَيْنِ

حَاجِزًا - ءَاِلٰهٌ مَّعَ اللّٰهِ - بَلْ اَكْثَرُهُمْ لاَ يَعْدِلُوْنَ - اَمَّنْ يُّجِيْبُ الْمُضْطَرَّ اِذَا دَعَاهُ وَ يَكْشِفُ السُّوْءَ وَ يَجْعَلُكُمْ خُلَفَاءَ الْاَرْضِ - ءَاِلٰهٌ مَّعَ اللّٰهِ - قَلِيْلاً مَّا تَذَكَّرُوْنَ - اَمَّنْ يَّهْدِيْكُمْ فِىْ ظُلُمٰتِ الْبَرِّ وَالْبَحْرِ وَ مَنْ يُّرْسِلُ الرِّيٰحَ بُشْرًا بَيْنَ يَدَىْ رَحْمَتِهٖ - ءَاِلٰهٌ مَّعَ اللّٰهِ - تَعٰلَى اللّٰهُ عَمَّا يُشْرِكُوْنَ - اَمَّنْ يَّبْدَؤُا الْخَلْقَ ثُمَّ يُعِيْدُهٗ وَمَنْ يَّرْزُقُكُمْ مِّنَ السَّمَاءِ وَالْاَرْضِ - ءَاِلٰهٌ مَّعَ اللّٰهِ - قُلْ هَاتُوْا بُرْهَانَكُمْ اِنْ كُنْتُمْ صٰدِقِيْنَ -

—এই আকাশ ও পৃথিবী কে সৃষ্টি করিয়াছে ? কে তোমাদের জন্য আকাশ হইতে পানি বর্ষণ করিল এবং সেই পানির সাহায্যে সবুজ শস্যের বাগ-বাগিচা সৃজন করিল ? বাগানের এই গাছ সৃষ্টি করা কিছুতেই তোমাদের সাধ্যে খুলাইত না। বল দেখি, এই সব কাজে আল্লাহ্‌কে কে সাহায্য করিয়াছে ? (আক্ষেপ, তাহাদের জ্ঞানের উপর!) সত্য এত উজ্জ্বল হওয়া সত্ত্বেও তাহারা কুটিল সম্প্রদায় সাজিল।

আচ্ছা বল তো, পৃথিবীকে স্থির রাখার জন্য কে সুউচ্চ পাহাড় সৃষ্টি করিয়াছে ? কে এই পৃথিবীকে (সুজলা-সুফলা রাখার জন্য) নদী-নালা পূর্ণ করিয়া রাখিয়াছে? কে দুই নদীকে (একই খাতে প্রবাহিত করিয়া) দেওয়াল ছাড়াই পৃথক করিয়া রাখিতেছে ? এই সব কাজে আল্লাহ্‌র কি কোন সহকারী আছে ? (আক্ষেপ, কত পরিষ্কার ব্যাপার!) অথচ তাহাদের অধিকাংশ লোকই ইহার খবর রাখে না।

আচ্ছা বল তো, কে অধীর প্রাণের ফরিয়াদ শুনিয়া থাকে ? যখন সব দিক হইতে সে ব্যর্থ ও হতাশ হইয়া কেবল আল্লাহ্‌কেই ডাকিতে থাকে, তখন কে তাহাকে দুঃখভার হইতে মুক্ত করে ? কে তোমাদিগকে এই পৃথিবীর খিলাফত দান করিয়াছে ? এই সব ব্যাপারে আল্লাহ্‌র কি সঙ্গী আছে ? (আক্ষেপ, তোমাদের ঔদাসীন্যের প্রতি !) উপদেশ গ্রহণ তো খুব নগণ্য লোকই করিয়া থাকে।

আচ্ছা বল তো, কে তোমাদের জলে-স্থলে, গভীর অন্ধকারে পথপ্রদর্শন করে ? কে রহমতের বারিধারা বর্ষণের প্রাক্‌কালে ঠাণ্ডা হাওয়া পাঠাইয়া তোমাদের সেই সুসংবাদ আগেই দান করে ? আল্লাহ্ ছাড়া কি আর কেহ ইহা করে ? (কখনই নহে) আল্লাহ্ কারোর সাহায্য গ্রহণের প্রয়োজনমুক্ত রহিয়াছেন। যাহাদের তোমরা তাঁহার সহকারী মনে কর, তাহাদের চাইতে তিনি অনেক উর্ধ্বে রহিয়াছেন।

আচ্ছা বল দেখি, কে এই শূন্য পৃথিবী নূতন সৃষ্টির দ্বারা পরিপূর্ণ করিয়াছে এবং বারংবার উহার পরিবর্তন ঘটাইতেছে ? কে আকাশ ও পৃথিবী জোড়া কারখানা হইতে তোমাদের খোরাক দান করে ? আল্লাহ্ ছাড়া আর কোন প্রভু তোমাদের আছে কি ? হে রসূল ! আপনি তাহাদের বলিয়া দিন, যদি তোমাদের কার্যধারা

সত্য হয়, জগৎজোড়া সৃষ্টির সাক্ষ্যদানের বিরুদ্ধে তোমাদের যদি কোন প্রমাণ থাকিয়া থাকে, তাহা হইলে তাহা পেশ কর।

এই প্রশ্নগুলির প্রত্যেকটিই স্বতন্ত্র একটি দলীলস্বরূপ। কারণ এইগুলির সবটির জবাব শুধু একটি কথাই হইতে পারে। সেইটা মানব প্রকৃতির সার্বজনীন ও সর্বসম্মত প্রতীতি। আমাদের পূর্বসূরিদের দৃষ্টি এই দিকে পড়ে নাই বলিয়াই তাঁহারা কুরআনের এই যুক্তি-প্রমাণের ধারাটি উপলব্ধি করিতে পারেন নাই। সুতরাং তাঁহারা এই সবের ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণ দান করিতে গিয়া এদিক-সেদিক দূর-দূরান্তরে চলিয়া গিয়াছেন।

যাহা হউক, কুরআনের বহু স্থানে সৃষ্টিজগতের প্রতিপালন ও তাহার রবুবিয়াতের বিধানের যে সব বিচিত্র কার্যাবলির উল্লেখ রহিয়াছে, মূলত তাহা এই সত্যটির প্রামাণ্য দলীল হিসাবেই উল্লেখ করা হইয়াছে।

فَلْيَنْظُرِ الْاِنْسَانُ اِلٰى طَعَامِهٖ - اَنَّا صَبَبْنَا الْمَاءَ صَبًّا - ثُمَّ شَقَقْنَا الْاَرْضَ شَقًّا - فَاَنْبَتْنَا فِيْهَا حَبًّا - وَّ عِنَبًا وَّ قَضْبًا - وَّ زَيْتُوْنًا وَّ نَخْلاً - وَّ حَدَائِقَ غُلْبًا - وَّ فَاكِهَةً وَّ اَبًّا - مَّتَاعًا لَّكُمْ وَ لِاَنْعَامِكُمْ - (٨٠ : ١٤-٣٢)

মানুষের উচিত, নিজ খাদ্যাদির দিকে যেন দৃষ্টিপাত করে (কারণ দিন-রাত সেগুলি তাহাদের সামনে হাযির হয়)। আমি প্রথমে যমীনের উপর পানি বর্ষণ করি ; তারপর যমীনের উপরিভাগ (পানির স্রোতে) দীর্ণ-বিদীর্ণ করি। অতঃপর যমীন উর্বরা করিয়া উহাতে নানা প্রকারের ফসল উৎপন্ন করি। শস্যের বীজ, আঙুরের লতা, খেজুরের গাছ, তরি-তরকারি, যয়তুনের তৈল, বৃক্ষের কানন, নানা ধরনের ফলমূল, বিভিন্ন ধরনের গুল্ম ও চারা তোমাদের ও তোমাদের প্রাণীর কল্যাণের জন্য সৃষ্টি করি। (—সূরা 'আবাসা ঃ আয়াত ২৪-৩২)।

এই আয়াতে 'মানুষের লক্ষ করা উচিত' কথাটির উপর জোর দান প্রসঙ্গটি ভাবিয়া দেখুন। মানুষ যতই উদাসীন হউক, যতই ঘাড় ফিরাইয়া থাকুক কিন্তু সত্যের দলীল-প্রমাণগুলি এরূপ ব্যাপকভাবে পরিব্যাপ্ত হইয়া রহিয়াছে যে, কিছুতেই তাহা এড়াইতে পারে না। একটি মানুষ পৃথিবীর সব ব্যাপারেই চক্ষু বন্ধ করিয়া চলিতে পারে, কিন্তু নিজের দিন-রাতের আহার্যের দিক হইতে তো আর চক্ষু ফিরাইয়া রাখিতে পারে না। যে খাদ্য তাহার সামনে তুলিয়া ধরা হয়, তাহার দিকেই সে দৃষ্টিপাত করিয়া দেখুক—ইহা কি চীজ ? শস্যকণা। আচ্ছা, একটি শস্যকণাই হাতে তুলিয়া উহার জন্ম হইতে শুরু করিয়া পক্বতা ও পূর্ণতা পর্যন্ত সব অবস্থা ও অবস্থান সম্পর্কে চিন্তা করুক। যদি সৃষ্টির গোটা কারখানাটি বিশেষ নিয়ম-নীতিতে ইহার জন্য সক্রিয় না থাকিত, তাহা হইলে এই সামান্যতম শস্যকণাটি কি রূপ লাভ করিতে পারিত ? যদি পৃথিবীতে রবুবিয়াতের এই সুশৃঙ্খল বিধানটি সর্বত্র বিরাজমান দেখিতে পাই,

তাহা হইলে ইহার মূলে একজন 'রব' (প্রতিপালক)-এর অস্তিত্ব অস্বীকার করার কোন উপায় আছে কি ?

সূরা 'নাহ্‌লে' এই উদাহরণটি অন্য পদ্ধতিতে উত্থাপন করা হইয়াছে ঃ

وَاِنَّ لَكُمْ فِى الْاَنْعَامِ لَعِبْرَةً - نُسْقِيْكُمْ مِّمَّا فِىْ بُطُوْنِهٖ مِنْ بَيْنِ فَرْثٍ وَّ دَمٍ لَّبَنًا خَالِصًا سَائِغًا لِّلشّٰرِبِيْنَ - وَمِنْ ثَمَرٰتِ النَّخِيْلِ وَالْاَعْنَابِ تَتَّخِذُوْنَ مِنْهُ سَكَرًا وَّ رِزْقًا حَسَنًا - اِنَّ فِىْ ذٰلِكَ لَاٰيَةً لِّقَوْمٍ يَّعْقِلُوْنَ - وَاَوْحٰى رَبُّكَ اِلَى النَّحْلِ اَنِ اتَّخِذِىْ مِنَ الْجِبَالِ بُيُوْتًا وَّ مِنَ الشَّجَرِ وَمِمَّا يَعْرِشُوْنَ - ثُمَّ كُلِىْ مِنْ كُلِّ الثَّمَرٰتِ فَاسْلُكِىْ سُبُلَ رَبِّكِ ذُلُلًا - يَخْرُجُ مِنْ بُطُوْنِهَا شَرَابٌ مُّخْتَلِفٌ اَلْوَانُهٗ فِيْهِ شِفَاءٌ لِّلنَّاسِ - اِنَّ فِىْ ذٰلِكَ لَاٰيَةً لِّقَوْمٍ يَّتَفَكَّرُوْنَ - (١٦ : ٦٦-٦٩) (٥)

(আর দেখ, এই) চতুষ্পদ জন্তুর (তোমাদেরই গৃহপালিত জন্তু) ভিতরেও তোমাদের উপদেশ গ্রহণের, চিন্তা-ভাবনার অনেক কিছুই নিহিত রহিয়াছে। উহার উদরে রক্ত ও অপবিত্র বস্তুর মধ্য হইতে পবিত্র দুগ্ধ সৃষ্টি করিয়া দেই। যাহারা পান করে, পরম তৃপ্তি লাভ করে। (এইভাবে) খেজুর ও আঙুর ফল হইতে তোমরা মাদক দ্রব্য তৈরি কর এবং উত্তম আহার্যরূপেও পাইয়া থাক।[৫] নিশ্চয়ই এই সব কিছুর ভিতরে চিন্তাশীল মনীষীদের জন্য (আল্লাহ্‌র প্রতিপালন পদ্ধতির) বিরাট নিদর্শন রহিয়াছে। আবার দেখ, তোমাদের প্রভু মধুমক্ষিকার অন্তরে এই কথা জাগ্রত করিয়া দিয়াছে যে, পাহাড়ে, বৃক্ষে ও এই উদ্দেশ্যে সৃষ্ট সুউচ্চ স্থানে নিজেদের বাসা বাঁধিবে। তারপর বিভিন্ন ফুল হইতে রস শুষিয়া স্বীয় প্রভুর নির্ধারিত পদ্ধতি অনুসারে সঞ্চিত করিয়া রাখিবে। (বস্তুত তোমরা দেখিতে পাইতেছ যে) উহাদের পেট হইতে বিভিন্ন ধরনের মধু বাহির হয়। তাহা মানুষের

---

৫. এখানে এই মূলনীতিটি স্মরণ রাখিতে হইবে যে, যেইভাবে সৃষ্টি জগতের প্রত্যেকটি বস্তুর ভিন্ন ভিন্ন বৈশিষ্ট্য ও দিক রহিয়াছে, তেমনি কুরআনের যে কোন উদাহরণের ভিতরে একই সময়ে ভিন্ন ভিন্ন দিকের ইঙ্গিত নিহিত থাকে। অবশ্য বিশেষ স্থানে বিশেষ একটি দিকের উপরেই জোর দেওয়া হয়। যেমন মধু সৃষ্টি ও মধুমক্ষিকার কার্যাবলির বিভিন্ন দিক রহিয়াছে। মধু একটি উপকারী ও সুস্বাদু আহার্য— ইহা রবুবিয়াতের পরিচায়ক।

আর একটি সাধারণ পতঙ্গ কত বিরাট বিজ্ঞতা ও নৈপুণ্যের সহিত স্বীয় দায়িত্ব প্রতিপালন করে, ইহা জ্ঞান ও উপলব্ধি দানের একটি বিস্ময়কর দৃশ্য! সুতরাং ইহা স্রষ্টার বিজ্ঞতা ও ক্ষমতার দিকে ইঙ্গিত দান করে। এই বাণীগুলির সাধারণ অর্থ ও অন্তর্নিহিত তাৎপর্য বলিয়া দেয় যে, এখানে রবুবিয়াতে ইলাহীর দিকেই অধিকতর দৃষ্টি আকর্ষণ করা হইয়াছে। কিন্তু সঙ্গে সঙ্গে স্রষ্টার বিজ্ঞতা ও ক্ষমতার উপরেও আলোকপাত করা হইয়াছে। এইভাবে প্রায় সবখানেই রবুবিয়াত, হিকমত, রহ্‌মত ও কুদরতের মিলিত প্রকাশ ঘটিয়াছে। তবে বিশেষ কোন একটির উপরে বিশেষ গুরুত্ব আরোপ করা হইয়াছে।

বিভিন্ন রোগের প্রতিষেধক হিসাবেও ব্যবহৃত হয়। নিঃসন্দেহে ইহার ভিতরে চিন্তাশীলদের জন্য (আল্লাহ্‌র রবুবিয়াতের আশ্চর্য কুদরতের) বিরাট নিদর্শন রহিয়াছে।

প্রতিপালন-বিধির সাহায্যে একত্ববাদ প্রমাণ

এইভাবে কুরআন মজীদ নিযামে রবুবিয়াতের (প্রতিপালন-বিধি) দ্বারা আল্লাহ্‌র একত্ববাদ প্রমাণ করে। সমগ্র সৃষ্টিজগৎ একই নিয়মে সুশৃঙ্খলভাবে প্রতিপালিত হইতেছে। তাই সবাই মনেপ্রাণে একজন বিশ্বপ্রতিপালকের স্বীকৃতি দিয়া আসিতেছে সুতরাং তিনি ছাড়া আর কে এই সৃষ্টিজগতের প্রণতি ও উপাসনা দাবি করিতে পারে ?

يَاَيُّهَا النَّاسُ اعْبُدُوْا رَبَّكُمُ الَّذِىْ خَلَقَكُمْ وَالَّذِيْنَ مِنْ قَبْلِكُمْ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُوْنَ - اَلَّذِىْ جَعَلَ لَكُمُ الْاَرْضَ فِرَاشًا وَّالسَّمَاءَ بِنَاءً وَّ اَنْزَلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً فَاَخْرَجَ بِهٖ مِنَ الثَّمَرٰتِ رِزْقًا لَّكُمْ - فَلاَ تَجْعَلُوْا لِلّٰهِ اَنْدَادًا وَّ اَنْتُمْ تَعْلَمُوْنَ - (٢ : ٢١ - ٢٢)

—হে মানুষ! তোমাদের সেই প্রতিপালকের ইবাদত কর যিনি তোমাদের ও তোমাদের পূর্ববর্তীদের সৃষ্টি করিয়াছেন। তোমাদের তিনি আল্লাহ্‌ভীরু মুত্তাকী হইবার জন্য সৃষ্টি করিয়াছেন। তিনিই তোমাদের জন্য পৃথিবীকে বিছানার মত পাতিয়া দিয়াছেন, আর আকাশকে ছাদের মত তৈরি করিয়া দিয়াছেন। আর সেই আকাশ হইতে তিনি পানি বর্ষণ করেন, যাহার ফলে তোমাদের বিভিন্ন রূপ খাদ্যশস্য উৎপন্ন হয়। (যখন সৃজন ও পালনকর্তা একমাত্র তিনিই) অন্য কাহাকেও তাঁহার সমান মর্যাদায় অধিষ্ঠিত করিও না। অথচ তোমরা ব্যাপারটি না জান, এমন নহে। (—সূরা বাকারা ঃ আয়াত ২১-২২)

অথবা সূরা ফাতিরে দেখিতে পাই ঃ

يَاَيُّهَا النَّاسُ اذْكُرُوْا نِعْمَتَ اللّٰهِ عَلَيْكُمْ - هَلْ مِنْ خَالِقٍ غَيْرُ اللّٰهِ يَرْزُقُكُمْ مِنَ السَّمَاءِ وَالْاَرْضِ - لاَ اِلٰهَ اِلاَّ هُوَ فَاَنّٰى تُؤْفَكُوْنَ - (٣ : ٣٥)

—হে মানুষ ! আল্লাহ্ তোমাদের যে সব নিয়ামত দান করিয়াছেন, তাহা লইয়া ভাবিয়া দেখ যে, তিনি ছাড়া তোমাদের স্রষ্টা কি আর কেহ থাকিতে পারে ? তিনি তোমাদের আকাশ মণ্ডলী ও পৃথিবী হইতে খাদ্যের ব্যবস্থা করেন। না, তিনি ছাড়া তোমাদের আর কোন ইলাহ্ নাই। সুতরাং কোথায় ছুটিতেছ ? (—সূরা ফাতির ঃ আয়াত ৩)

নিযামে রবুবিয়াতের সাহায্যে ওহী ও রিসালতের প্রয়োজনীয়তা প্রমাণ

এইভাবে কুরআন প্রতিপালন-বিধানের কার্যকলাপ দ্বারা মানুষের পাপ-পুণ্যের মূলনীতি এবং ওহী ও রিসালতের প্রয়োজনীয়তা সম্পর্কে প্রমাণ দান করে। যেই পরওয়ারদিগার তোমাদের দেহের প্রতিপালনের জন্য এইরূপ প্রতিপালন বিধির প্রবর্তন করিয়াছেন, তিনি তোমাদের আত্মার মঙ্গলামঙ্গলের জন্য কি কোন বিধান প্রবর্তন করেন নাই ? তোমাদের দেহের যেইরূপ বিভিন্ন প্রয়োজন দেখা দেয়, তেমনি তোমাদের আত্মারও বিভিন্ন চাহিদা রহিয়াছে। সেক্ষেত্রে তোমাদের দেহের পালন-বর্ধনের সর্ব ব্যবস্থা বিদ্যমান থাকা সত্ত্বেও আত্মার পালন-বর্ধনের কোন ব্যবস্থা কিরূপে না থাকিয়া পারে ?

যদি তিনি নিখিল সৃষ্টির প্রতিপালক হন, যদি তাঁহার প্রতিপালন কার্যের ব্যাপ্তি প্রতিটি অণু-পরমাণু ও কীট-পতঙ্গ গ্রাস করিয়া থাকে, তাহা হইলে মানুষের আত্মিক লালন ও উন্নয়নের জন্য তিনি কোন ব্যবস্থাই রাখেন নাই, তাহা কি করিয়া ধারণা করা যায় ? যাহার প্রতিপালন-রীতি দেহের লালন-পালনের জন্য আকাশ হইতে অজস্র ধারায় পানি বর্ষণ করে, আত্মার প্রতিপালনের জন্য তিনি কি এক ফোঁটা অনুগ্রহও বর্ষণ করেন না ? আপনারা দেখিতেছেন যে, মাটি যখন সজীবতা হারাইয়া বিশুষ্ক ও দীর্ণ-বিদীর্ণ হয়, তখন এই বিধান দেখা যায়, বৃষ্টি নামিয়া মাটির প্রতিটি কণা সজীব করিয়া দেয়। তাহা হইলে মানব জগত যখন পথপ্রদর্শন ও পুণ্য অর্জনের সৌভাগ্য হইতে বঞ্চিত হইয়া জীবন্মৃত অবস্থায় উপনীত হয়, তখন কি এই বিধান দেখা দিবে না যে, আল্লাহ্‌র অনুগ্রহ বর্ষিত হইয়া মৃত আত্মাগুলি আবার নূতন জীবন লাভ করিয়া ধন্য হইবে ? আত্মিক কল্যাণ সাধনের এই বৃষ্টির স্বরূপ কি ? কুরআন বলে—আল্লাহ্‌র ওহী। আপনারা যখন বৃষ্টির ধারা বর্ষণের ফলে মৃত যমীনকে সজীব ও শস্য-শ্যামল হইতে দেখিয়া অবাক হন না, তখন কেন আল্লাহ্‌র ওহী অবতীর্ণ হইবার সঙ্গে সঙ্গে মৃত আত্মাগুলি নূতন জীবন লাভ করিলে স্তম্ভিত হইয়া যান ?

حٰمٓ - تَنْزِيْلُ الْكِتَابِ مِنَ اللّٰهِ الْعَزِيْزِ الْحَكِيْمِ - اِنَّ فِي السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ لَاٰيَاتٍ لِّلْمُؤْمِنِيْنَ - وَفِيْ خَلْقِكُمْ وَمَا يَبُثُّ مِنْ دَابَّةٍ اٰيٰتٌ لِّقَوْمٍ يُّوْقِنُوْنَ - وَاخْتِلَافِ اللَّيْلِ وَالنَّهَارِ وَمَا اَنْزَلَ اللّٰهُ مِنَ السَّمَاءِ مِنْ رِّزْقٍ فَاَحْيَا بِهِ الْاَرْضَ بَعْدَ مَوْتِهَا وَتَصْرِيْفِ الرِّيَاحِ اٰيَاتٌ لِّقَوْمٍ يَّعْقِلُوْنَ - تِلْكَ اٰيٰتُ اللّٰهِ نَتْلُوْهَا عَلَيْكَ بِالْحَقِّ - فَبِاَيِّ حَدِيْثٍ بَعْدَ اللّٰهِ وَاٰيٰتِهٖ يُؤْمِنُوْنَ - (٤٥ : ١ - ٦)

—হা-মীম, আল্লাহ্‌র নিকট হইতে এই গ্রন্থ অবতীর্ণ। তিনি পরাক্রমশালী প্রজ্ঞাময়। নিঃসন্দেহে ঈমানদারদের জন্য আসমান ও যমীনে (সত্যের পরিচয় লাভের)

অনেক নিদর্শন রহিয়াছে। এমন কি তোমাদের জন্মের ভিতরেও আর যে সমস্ত চতুষ্পদ জীব তিনি পৃথিবীতে ছড়াইয়া রাখিয়াছেন, তাদের ভিতরেও আস্থাশীলদের জন্য যথেষ্ট নিদর্শন রহিয়াছে। এইভাবে পর্যায়ক্রমে রাত্রি ও দিবসের পরিবর্তনের ভিতরে, আকাশ হইতে পানি বর্ষণের ফলে বিশুষ্ক মাটি উর্বর হইয়া যে শস্যভাণ্ডারের সৃষ্টি করে তাহার ভিতরে এবং বায়ুর গতি পরিবর্তনের ভিতরেও জ্ঞানীদের জন্য নিদর্শন রহিয়াছে। (হে রসূল) এই সব আল্লাহ্‌র পরিচয় বহন করে ; আমি ঠিকভাবে আপনাকে সেইগুলি বর্ণনা করিতেছি। আল্লাহ্ এবং তাঁহার এইসব নিদর্শনের সম্যক পরিচয় লাভের পরেও এমন আর কি কথা থাকিতে পারে, যাহা তাহাদের বিশ্বাস সৃষ্টির পক্ষে সহায়ক হইবে ? (—সূরা জাছিয়া ঃ আয়াত ১-৬)

আল্লাহ্‌র ওহীর কথা শুনিয়া যাহারা বিস্ময় বোধ করে, তাহাদের সূরা 'আন আমে' এইভাবে উল্লেখ করা হইয়াছে ঃ

وَمَا قَدَرُوْا اللّٰهَ حَقَّ قَدْرِهٖ اِذْ قَالُوْا مَا اَنْزَلَ اللّٰهُ عَلٰى بَشَرٍ مِّنْ شَىْءٍ - (٦-٩١)

—আল্লাহ্‌র কার্যাবলির যতটুকু মর্যাদা তাহাদের দেওয়া উচিত ছিল, তাহা তাহারা দেয় নাই। কারণ তাহারা বলে, কোন মানুষের উপরে তিনি কিছু অবতীর্ণ করেন নাই। (—সূরা আন্'আম ঃ আয়াত ৯১)

তারপর তাওরাত ও কুরআন অবতরণ সম্পর্কিত আলোচনার পরে নিম্নরূপ বর্ণনা শুরু হয় ঃ

اِنَّ اللّٰهَ فَالِقُ الْحَبِّ وَالنَّوٰى - يُخْرِجُ الْحَىَّ مِنَ الْمَيِّتِ وَمُخْرِجُ الْمَيِّتِ مِنَ الْحَىِّ - ذَالِكُمُ اللّٰهُ فَاَنّٰى تُؤْفَكُوْنَ - فَالِقُ الْاِصْبَاحِ - وَجَعَلَ اللَّيْلَ سَكَنًا وَّ الشَّمْسَ وَالْقَمَرَ حُسْبَانًا - ذٰلِكَ تَقْدِيْرُ الْعَزِيْزِ الْعَلِيْمِ - وَهُوَ الَّذِىْ جَعَلَ لَكُمُ النُّجُوْمَ لِتَهْتَدُوْا بِهَا فِىْ ظُلُمَاتِ الْبَرِّ وَالْبَحْرِ - قَدْ فَصَّلْنَا الْاٰيَاتِ لِقَوْمٍ يَّعْلَمُوْنَ - (٦ : ٩٥ - ٩٩)

—নিশ্চয়ই আল্লাহ্‌তা'আলা বীজ বিদীর্ণ করিয়া বৃক্ষের অঙ্কুর উদ্‌গারিত করেন। তিনিই মৃত বস্তু হইতে প্রাণীর সৃষ্টি করেন এবং জীবিতদের মৃতে পরিণত করেন। হ্যাঁ তিনিই তোমাদের খোদা। সুতরাং তোমরা ঘাড় ফিরাইয়া কোথায় যাইতেছ ? হ্যাঁ, তিনিই (রাত্রির যবনিকা ছিন্ন করিয়া) উষার আলোর প্রতিফলন ঘটান। তিনিই রাত্রিকে আরাম গ্রহণের জন্য সৃষ্টি করিয়াছেন। তিনিই চন্দ্র ও সূর্যকে নিজ নিজ কক্ষপথে এরূপ নিয়মিতভাবে পরিভ্রমণ করাইতেছেন যে, উহারা কালের হিসাব সংরক্ষণের মাপকাঠি হইয়া দাঁড়াইয়াছে। ইহা সেই সর্বজয়ী ও সর্বজ্ঞ

শক্তিরই নির্ধারিত পরিমাপ ব্যবস্থা। (আবার দেখ) তিনিই তোমাদের জন্য তারকারাজি সৃষ্টি করিয়াছেন যেন জলে কি স্থলে তোমরা উহার সাহায্যে দিক নির্ণয় করিতে পার। যাহারা যথার্থ জানেশোনে, তাহাদের জন্য নিশ্চয়ই আমি সবকিছু খোলাখুলি বর্ণনা করিয়া দিয়াছি। (—সূরা আন'আম ঃ আয়াত ৯৫-৯৯)।

আপনারা যে ভাবে বিশ্বপ্রতিপালকের প্রতিপালন ব্যবস্থা ও অনুগ্রহ-অবদানের অজস্র কীর্তি দিনরাত দেখিতেছেন তাহার পরেও ইহা কি করিয়া সম্ভবপর হইতে পারে যে, আপনাদের জড়দেহের প্রতিপালন ও পরিচালনের জন্য এত কিছু করিলেও আপনাদের আত্মিক জগতের পালন ও চালনের জন্য কোন কিছুই তাঁহার করিবার নাই ? মাটির নির্জীবতাকে সজীবতায় পরিণত করেন তিনি, আর আপনাদের নির্জীব আত্মাকে সজীব করিবেন না ? তারকার আলোকে যিনি জলে ও স্থলে অন্ধকারে পথের নির্দেশ দান করেন, তিনি আপনাদের আত্মিক জগতের অন্ধকারে পথের নির্দেশ লাভের জন্য কোন আলোর ব্যবস্থাই রাখেন নাই ? ক্ষেতে শস্যকে দোলায়িত দেখিয়া কিংবা আকাশে তারার দ্যুতি দেখিয়া আপনারা কোনদিন অবাক হইয়া যান না। অথচ মানব জাতির পথপ্রদর্শনের জন্য আল্লাহ্‌র ওহী নাযিল হইবার কথা শুনিলেই আপনাদের তাক লাগিয়া যায় কেন ? যদি ইহাতে আপনারা বিস্ময় বোধ করেন, তাহার কারণ এই যে, আল্লাহ্‌কে যেইভাবে সর্বগুণে বিচার-বিশ্লেষণ করিয়া দেখা উচিত, তাহা আপনারা দেখেন না। আপনাদের ধারণায় এ কথাটি সহজেই আসে যে, তিনি এমনকি একটি পিপীলিকা প্রতিপালনের জন্য গোটা সৃষ্টির কারখানা খুলিয়া বসিয়াছেন। অথচ এতটুকু জ্ঞানে আসে না যে, মানবজাতির পথপ্রদর্শনের জন্য তিনি ওহীর ধারাও অব্যাহত রাখিতেন।

নিযামে রবুবিয়াত দ্বারা পরকালের প্রমাণ

এইভাবে কুরআন মজীদ রবুবিয়াতের কার্যকলাপের সাহায্যে পরকালের প্রমাণ দান করে ! যেই বস্তু যত বেশি যত্ন ও গুরুত্ব সহকারে সৃষ্টি করা হয়, তাহা তত বেশি মূল্যে ব্যবহৃত ও গুরুত্বপূর্ণ উদ্দেশ্যে সুরক্ষিত হয়। উত্তম শিল্প-কার্য তাহাই, যাহার ব্যবহার ও উদ্দেশ্য মূল্যবান ও গুরুত্বপূর্ণ হয়। সুতরাং যেই মানুষ বিশ্বের সর্বোত্তম সৃষ্টি এবং সৃষ্টিজগতের সৌন্দর্য নির্বাস, যাহার দৈহিক ও আত্মিক পালন-বর্ধনের প্রয়োজনে সৃষ্টি জোড়া কারখানার এই বিরাট আয়োজন, দুনিয়ার দুই দিনের জীবনের জন্যই তাহাদের সৃষ্টি, কোন বৃহত্তর উদ্দেশ্য তাহাদের নাই, এই কথা কি করিয়া সম্ভবপর হইতে পারে ? যদি সৃষ্টিকর্তা নিখিল সৃষ্টির প্রতিপালক হন, প্রতিপালনের সর্ববিধ ব্যবস্থা তিনিই সম্পন্ন করিয়া চলেন, তাহা হইলে এত বিরাট আয়োজনে প্রতিপালিত মানুষকে শুধুমাত্র উদ্দেশ্যবিহীন ও অর্থহীন জীবরূপে সৃষ্টি করিয়াছেন, তাহা কি করিয়া ধারণা করা যায় ?

اَفَحَسِبْتُمْ اَنَّمَا خَلَقْنٰكُمْ عَبَثًا وَّاَنَّكُمْ اِلَيْنَا لَا تُرْجَعُوْنَ - فَتَعٰلَى اللّٰهُ الْمَلِكُ الْحَقُّ - لَا اِلٰهَ اِلَّا هُوَ رَبُّ الْعَرْشِ الْكَرِيْمِ - (٢٣ : ١١٥-١١٦)

—তোমরা কি ইহাই ধারণা করিয়া বসিয়াছ যে, আমি তোমাদের উদ্দেশ্যবিহীন ও অর্থহীন করিয়া সৃষ্টি করিয়াছি ? তোমরা কি আবার আমার কাছে ফিরিয়া আসিবে না ? নিখিল সৃষ্টিজগতের প্রকৃত মালিক আল্লাহ্ অনর্থক কিছু করার স্তর হইতে অনেক উর্ধ্বে রহিয়াছেন। পবিত্র 'আরশের অধিপতি মহান প্রভু ছাড়া আর কোন ইলাহ্ নাই। (—সূরা মুমিনুন ঃ আয়াত ১১৫-১১৬)

আমি কুরআনের সরল-সহজ বর্ণনারীতি অনুসারে এখানে সহজ ও সরল অর্থ প্রকাশ করিয়াছি। কিন্তু এই সোজা অনুবাদটিকে জ্ঞান ও শিক্ষাগত বিচার-বিশ্লেষণের সাহায্যে এইভাবে প্রকাশ করা যাইতে পারে যে, মানব জাতি পৃথিবীর যাবতীয় সৃষ্টি-শৃঙ্খলের সর্বশেষ ও সর্বশ্রেষ্ঠ আংটা স্বরূপ। যদি মানুষের জীবনের প্রারম্ভ থেকে পূর্ণতা লাভ পর্যন্ত পূর্ণ ইতিহাসের ধারাটি লক্ষ করা যায়, তাহা নিশ্চয়ই অসংখ্য দিনের ধারাবাহিক প্রতিপালন ও উন্নয়নের এক বিরাট দাস্তান হইবে। মনে হয়, যেন প্রকৃতি লক্ষ কোটি বছর ধরিয়া অজস্র সাধনা ও কারুকার্যের সাহায্যে যেই সর্বোত্তম সৃষ্টিটি রূপদান করিয়াছে, তাহা এই মানুষ।

দূর অতীতের একটি বিশেষ ক্ষণের কথা মনে করুন, যখন আমাদের এই পৃথিবী সবেমাত্র সূর্য হইতে বিচ্ছিন্ন হইয়া পড়িয়াছিল। কত বছর যে ইহার ঠাণ্ডা হইয়া সঠিক রূপ পরিগ্রহের ব্যাপারে কাটিয়া গেল, তাহা কে জানে ? কে জানে কত কাল পরে ইহা জীবজগতের বসবাস ও লালন-পালনের উপযোগী হইয়াছিল ? কে জানে, কত কাল পরে ভূপৃষ্ঠে জীবনের প্রথম অঙ্কুর 'প্রোটোপ্লাজম' অস্তিত্ব লাভ করিয়া প্রতিপালিত হইবার বিশেষ পরিবেশ অর্জন করিয়াছিল ? তারপর উহার বাহ্যিক রূপায়ণ অর্থাৎ অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ ও শাখা-প্রশাখায় পূর্ণরূপে বিকাশ লাভে কত কাল পার হইল ? কত কাল ধরিয়া পালন-বর্ধনের ক্ষুদ্রতম ধাপ হইতে বৃহত্তম ধাপ অতিক্রম করিল, তাহাই বা কে বলিতে পারে ? জীবনের সেই ক্ষুদ্রতম অংকুরটি বিভিন্ন অস্তিত্বের ভিতর দিয়া বিবর্তনবাদের ধারা বাহিয়া কত কাল পরে প্রাণীরূপ ধারণ করিল তাহাও সঠিকভাবে বলা সুকঠিন। তারপর প্রাণিজগতের বিভিন্ন ধাপ অতিক্রম করিয়া ক্রমোন্নয়নের এই ধারা কত লক্ষ বছর পরে যে জীবশ্রেষ্ঠ মানুষের স্তরে আসিয়া পৌছিয়াছে, তাহাও কাহারো জানা নাই। তারপর মানুষের দৈহিক রূপায়ণ পূর্ণ হইলে জ্ঞান-জগতে উৎকর্ষ অর্জনের ধারা শুরু হয়। তাহাতে দীর্ঘকাল কাটিয়া যায়। অবশেষে অজস্র যুগের সামগ্রিক প্রয়াস ও দৈহিক-মানসিক উন্নয়ন মিলিয়া পৃথিবীর এই সুসভ্য ও বিজ্ঞ মানুষের ঐতিহাসিক আবির্ভাব ঘটিল।

মনে হয় যেন মাটির সৃষ্টি হইতে শুরু করিয়া সুসভ্য মানুষের এই পরিণত অধ্যায় পর্যন্ত যাহা কিছু ঘটিয়াছে ও যত ভাঙা-গড়া হইয়াছে, সবই মানুষের জন্ম ও পূর্ণতা লাভের ইতিকথা মাত্র।

এখন প্রশ্ন হইল এই, যেই মানুষকে রূপদানের জন্য প্রকৃতির এত বিরাট আয়োজন; তাহা কি শুধু এইজন্য যে, মানুষ জন্ম নিবে, পাহানার করিবে ও মরিয়া চিরতরে নিশ্চিহ্ন হইয়া যাইবে ? 'সৃষ্টিজগতের প্রকৃত নিয়ন্তা বাজে কাজ করার স্তর হইতে অনেক উর্ধ্বে রহিয়াছেন। পবিত্র 'আরশের মালিক সেই একক প্রভু ছাড়া আর কোন উপাস্য নাই।'

স্বাভাবিকভাবেই আরেকটি প্রশ্ন দেখা দেয় যে, যদি অতীতে জীবদেহের একের পর এক করিয়া পরিবর্তন ও উন্নয়ন ঘটিয়া মানুষের এই স্তর দেখা দিয়া থাকে, তাহা হইলে এই বিবর্তন উন্নয়নের ধারা ভবিষ্যতেও অব্যাহত গতিতে চলিতে থাকিবে না কেন ? যদি অতীত জীবনে আমাদের এত ভাঙা-গড়া ও উন্নয়নের নিত্য নূতন পর্যায় ভাবিতে আমাদের বিস্ময় বোধ না হয়, তাহা হইলে ভবিষ্যতেও আমাদের এই স্তরের বিলোপ ও ইহা হইতে কোন উন্নততর স্তরের আবির্ভাব শুনিলে বিস্ময়ে তাক লাগিবার কি কারণ থাকিতে পারে ?

اَيَحْسَبُ الْاِنْسَانُ اَنْ يُّتْرَكَ سُدًى - اَلَمْ يَكُ نُطْفَةً مِّنْ مَّنِيٍّ يُّمْنٰى - ثُمَّ كَانَ عَلَقَةً فَخَلَقَ فَسَوّٰى - (٧٥ - ٣٦ - ٣٨)

—মানুষ কি ভাবিতেছে যে, তাহাদের নিরর্থক ছাড়িয়া দেওয়া হইবে ? (এই জীবনের পরে তাহাদের আরেক জীবনে উন্নীত করা হইবে না ?) তাহারা কি তাহাদের বিবর্তনের এই ধারাটি লক্ষ করে নাই যে, জন্মের পূর্বস্তরে শুক্র হইতে রক্তপিণ্ড ও রক্তপিণ্ড হইতে মাংসপিণ্ডে পরিণত হইবার পরে তাহাদের সঠিক রূপ দান করা হইয়াছে ? (—সূরা কিয়ামা ঃ আয়াত ৩৬-৩৮)

সূরা 'যারিয়াত' সম্পূর্ণই প্রতিদান সম্পর্কিত বর্ণনায় পরিপূর্ণ।

اِنَّمَا تُوْعَدُوْنَ لَصَادِقٌ - وَّاِنَّ الدِّيْنَ لَوَاقِعٌ -

যত সব প্রতিশ্রুতি রহিয়াছে, অবশ্যই তাহা সত্য হইবে। প্রতিদান দিবসও নিশ্চয়ই দেখা দিবে।

এই সত্যটিকে রবুবিয়াতের কার্যকলাপ অর্থাৎ হাওয়ার ঘূর্ণন ও বৃষ্টির বর্ষণ দ্বারা প্রমাণ করা হইয়াছে।

وَالذّٰرِيٰتِ ذَرْوًا - فَالْحٰمِلٰتِ وِقْرًا - فَالْجٰرِيٰتِ يُسْرًا - فَالْمُقَسِّمٰتِ اَمْرًا - (٥١ : ١ - ٤)

—শপথ সেই ঘূর্ণি হাওয়ার যখন তাহা সব কিছু উড়াইয়া নেয়। তারপর উহা বৃষ্টিগর্ভ হয়। অতঃপর ঠাণ্ডা মৃদুমলয় প্রবাহিত হয়। অবশেষে বিতরণকারী

আল্লাহ্‌র নির্দেশ মতে বারি বণ্টনকল্পে বর্ষণ ঘটায়। (—সূরা যারিয়াত ঃ আয়াত ১-৪)

কুরআন আবার যখন আসমান ও যমীনের বিভিন্ন অবদানের দিকে এবং স্বয়ং মানুষের সৃষ্টি-কৌশলের দিকে দৃষ্টি আকর্ষণ করিয়াছে, তখন বলিয়াছে ঃ

وَفِى الْاَرْضِ اٰيٰتٌ لِّلْمُوْقِنِيْنَ - وَفِىْ اَنْفُسِكُمْ - اَفَلاَ تُبْصِرُوْنَ - وَ فِىْ السَّمَاءِ رِزْقُكُمْ وَمَا تُوْعَدُوْنَ - (٥١ : ٢٠ - ٢٢)

—ভূপৃষ্ঠে বিশ্বাসীদের জন্য অনেক নিদর্শন রহিয়াছে। তোমাদের নিজেদের ভিতরেও তো—তোমরা কি দেখ না ? আর আকাশে তোমাদের রিযিকের উপকরণ ও সব প্রতিশ্রুত বস্তু রহিয়াছে। (—ঐ ঃ আয়াত ২০-২২)

ইহার পরেই কুরআন বলিতেছে ঃ

فَوَ رَبِّ السَّمَاءِ وَالْاَرْضِ اِنَّهُ لَحَقٌّ مِّثْلُ مَا اَنَّكُمْ تَنْطِقُوْنَ - (٥١ : ٢٣)

—আকাশমণ্ডলী ও পৃথিবীর প্রতিপালক প্রভুর শপথ ! (কুরআন আকাশ ও পৃথিবীর প্রতিপালকের প্রতিপালন কার্যের সাক্ষ্য দিতেছে) নিশ্চয়ই তাহা (প্রতিদান দিবস) সত্য। যে ভাবে তোমাদের বাকশক্তি সত্য, ঠিক তদ্রূপই সত্য। (—ঐ ঃ আয়াত ২৩)

আল্লাহ্ তা'আলা এই আয়াতে প্রতিদান দিবস প্রমাণের জন্য স্বয়ং নিজের অস্তিত্বের শপথ গ্রহণ করিয়াছেন। আর সেখানে নিজকে 'রব' (প্রতিপালক) বলিয়া আখ্যায়িত করিয়াছেন। আরবীতে শপথ গ্রহণের অর্থ এই, একটি সত্যের দ্বারা অপর একটি সত্যের সাক্ষ্য দান করা। সুতরাং মর্ম দাঁড়াইল এই, বিশ্ব প্রতিপালকের প্রতিপালনরূপ সার্বজনীন সত্য সাক্ষ্য দান করিতেছে যে, প্রতিদান দিবসও সত্য। এ সাক্ষ্য কিসের ? সেই রবুবিয়াতের সাহায্য দানের। কথা হইল এই, যদি পৃথিবীতে প্রতিপালন থাকিয়া থাকে প্রতিপালিতরাও বর্তমান থাকে আর তাহাদের প্রতিপালকও বিদ্যমান থাকেন তাহা হইলে আর প্রতিদান দিবস অসত্য হইতে পারে না। অর্থাৎ মানুষকে কোন পরিণতি ব্যতিরেকেই ছাড়া যাইতে পারে না। যেহেতু অন্যান্যের দৃষ্টি এই সত্যটির দিকে আকৃষ্ট হয় নাই, তাই তাঁহারা আয়াতে শপথ ও শপথের বস্তুর ভিতরে সঠিক সম্পর্ক নির্ণয়ে ব্যর্থ হইয়াছেন।

বিজ্ঞ কুরআনের দলীল-প্রমাণের উপরে দৃকপাত করিতে গিয়া সব সময়ে এই সত্যটি সামনে রাখা দরকার যে, উহার প্রমাণ দানের পদ্ধতি তর্কশাস্ত্রের মত কয়েকটি বাক্যজালের সৃষ্টি করিয়া অন্তত কল্পনার ক্ষেত্রে দাবির সত্যতা প্রমাণের অনুরূপ নহে। কুরআন সদা সর্বদা সরল-সহজ পদ্ধতিতে স্বাভাবিক ঘটনা হইতে শিক্ষাদান করিয়া থাকে। সাধারণত উহার যুক্তিগুলো বর্ণনা ও বর্ণনাভঙ্গীর ভিতরে নিহিত থাকে। কোন

উদ্দেশ্য সাধনের জন্য হয় সে এরূপ বর্ণনাভঙ্গী অনুসরণ করে, যাহাতে যুক্তি-প্রমাণগুলি উজ্জ্বলরূপে ধরা দেয় ; অন্যথায় তার জন্য বিশেষ জোর দিয়া এমন এক শব্দ ব্যবহার করে, যাহার ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণের ভিতরে তখন সকল যুক্তির সন্নিবেশ ঘটে আপনা হইতেই উদ্দিষ্ট ব্যক্তির দৃষ্টি সেদিকে আকৃষ্ট হয় !

ইহার একটি উজ্জ্বল উদাহরণ হইল 'রবুবিয়াত' শব্দটির বিভিন্ন স্থানের প্রয়োগ। যখন সে আল্লাহ্‌র সত্তার উল্লেখ করিতে গিয়া 'রব' শব্দ ব্যবহার করে, তখন একদিকে আল্লাহ্‌র একটি গুণবাচক নামের প্রকাশ ঘটে, অন্যদিকে সে যুক্তি উত্থাপন করে যে, যেই বিশ্ব প্রতিপালন লীলা তোমাদের চারিদিকে ছড়াইয়া রহিয়াছে, এমনকি তোমাদের নিজেদের ভিতরেও যাহা ঘর বাঁধিয়াছে, সেই মহান পালক ভিন্ন আর কে তোমাদের 'ইবাদত লাভের যোগ্যতা রাখে ?

বস্তুত কুরআনের যে সব বাক্যে এই ধরনের বক্তব্য রহিয়াছে, ' হে মানুষ ! তোমাদের প্রতিপালকের উপাসনা কর—সেই আল্লাহ্‌র উপাসনা কর, যিনি আমার এবং তোমাদের সকলের প্রতিপালক—নিশ্চয়ই আল্লাহ্ তা'আলা আমার ও তোমাদের সবার প্রতিপালক, সুতরাং তাঁহার 'ইবাদত কর—এই আল্লাহ্‌ই তোমাদের প্রতিপালক, তাই তাঁহার উপাসনা কর—নিশ্চয়ই তোমাদের এই দল একই দলের অন্তর্ভুক্ত এবং আমি তোমাদের প্রতিপালক, তাই 'ইবাদত কর—বলিয়া দাও, তোমরা আল্লাহ্‌কে লইয়া ঝগড়া করিতেছ ? তিনি আমাদের এবং তোমাদের সকলের প্রতিপালক—ইত্যাদি, তখন সেইগুলিকে শুধুমাত্র বক্তব্য ও নির্দেশ ভাবিলে চলিবে না বরং তাহা খেতাব ও প্রমাণ—উভয় উদ্দেশ্যই সাধন করিতেছে। কারণ 'প্রতিপালক' শব্দটি প্রতিপালনজনিত প্রমাণটির দিকে আপনা-আপনি দৃষ্টি আকর্ষণ করিয়া থাকে। আক্ষেপের বিষয় এই যে, আমাদের তাফসীরকারদের দৃষ্টি এই দিকে নিবদ্ধ হয় নাই। কারণ মন্তেকী (তর্কশাস্ত্রের) যুক্তি-প্রমাণের মোহ তাহাদিগকে কুরআনের যুক্তি-প্রমাণের সহজ পদ্ধতি হইতে দূরে সরাইয়া নিয়াছে। ফল এই দাঁড়াইল কুরআনের এই সব স্থানের অনুবাদ ও ব্যাখ্যাগুলি কুরআনের বর্ণনারীতির সত্যিকারের প্রাণশক্তির পরিচয় দানে ব্যর্থ হইয়াছে এবং প্রমাণ দানের এই সহজ পদ্ধতিটি হরেক রকমের ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণের মারপ্যাঁচে বিলুপ্ত হইয়া গিয়াছে।

চার

আর্-রহমানির-রহীম

'আর্-রহ্মান' ও 'আর-রহীম' উভয়ের ধাতুমূল হইল 'রহম'। আরবী ভাষায় রহমত অন্তর্জগতের এরূপ একটি নম্র ও উচ্ছ্বসিত অবস্থার ইঙ্গিত দেয়, যাহার ফলে অন্য কাহারো জন্য মহানুভবতা ও প্রীতির ইচ্ছাটি প্রবল হইয়া উঠে। তাই রহমতের ভিতরে স্নেহ-প্রীতি, অনুগ্রহ-অবদান সব কিছুরই অর্থ নিহিত রহিয়াছে। পক্ষান্তরে শুধু 'মহব্বত' অনুগ্রহ-অবদান হইতে ভিন্নতর অর্থেই ব্যবহৃত হয়।

যদিও দুইটি নামেরই ব্যুৎপত্তিস্থল 'রহ্মত,' তথাপি 'রহ্মত' শব্দটির দুইটি দিক রহিয়াছে। আরবীতে 'ফা'লানুন' ওজনের শব্দ এমন সব গুণের জন্য ব্যবহৃত হয়, যাহা শুধু বাহ্যিক গুণ অর্থাৎ যে গুণ বাহিরের প্রভাবে সাময়িকভাবে দেখা দেয়। যেমন পিপাসার্তের জন্য 'আতশান,' ক্রোধান্বিতের জন্য 'গজবান,' ক্লান্তির জন্য 'হয়রান' ও নেশাগ্রস্তের জন্য 'ছুকরান' শব্দের ব্যবহার ঘটে। কিন্তু 'ফা'ঈলুন' ওজনের শব্দ দ্বারা স্থায়ী গুণের প্রকাশ ঘটে। অর্থাৎ সাধারণত তাহা এমন সব গুণের জন্য ব্যবহৃত হয়, যাহা বাহিরের প্রভাবে সাময়িকভাবে সৃষ্টি না হইয়া বরং আভ্যন্তরীণ স্থায়ী গুণরূপে প্রতীয়মান হয়। যেমন কৃপাশীলের জন্য 'করিম,' মহত্ত্বের জন্য 'আজীম' ও বিজ্ঞের জন্য 'হাকীম' শব্দের ব্যবহার। সুতরাং আর্-রহ্মান বলিতে যাঁহার ভিতরে সাময়িক দয়া দেখা দিয়াছে, তাঁহাকে বুঝায় এবং 'রহীম' বলিতে যাঁহার ভিতরে সর্বদা করুণার ঝর্ণাধারা প্রবাহিত, প্রতিমুহূর্তে যদ্দ্বারা নিখিল সৃষ্টি-সিঞ্চিত, তাঁহাকেই বুঝায়।

'রহ্মত'কে দুইটি পৃথক নামে প্রকাশ করা হইল কেন ? এইজন্য যে কুরআন আল্লাহ্ সম্পর্কে যে ধারণা সৃষ্টি করিতে চায়, তাহার ভিতরে সব চাইতে বেশি স্পষ্ট ও ব্যাপক গুণের প্রকাশ 'রহমত' শব্দেই মিলে। পরন্তু, বলা চলে যে, তাঁহার সব কিছুই মূলত রহ্মত ছাড়া অন্য কিছু নহে।

وَرَحْمَتِىْ وَسِعَتْ كُلَّ شَىْءٍ –

—অনন্তর আমার রহ্মত দুনিয়ার সব কিছুই ঘিরিয়া রাখিয়াছে। (–সূরা আ'রাফ : আয়াত ১৫৬)

সুতরাং বিশেষভাবে তাঁহার এই গুণগত ও কর্মগত দুইটি দিকই উজ্জ্বল করিয়া তোলা প্রয়োজন ছিল। গুণগত দিক প্রকাশ করার জন্য তিনি হইলেন 'আর-রহমান' অর্থাৎ তাঁহার ভিতরে রহমত বিদ্যমান। কিন্তু শুধু তাহাই নহে। পরন্তু সদা সর্বদা তাঁহার রহ্মতের ধারা শত-সহস্রভাবে উৎসারিত হইয়া চলিয়াছে। এইজন্য তিনি 'আর্-রাহীম'ও।

আল্লাহ্‌র রহমত কি বস্তু ? কুরআন বলে, সৃষ্টিজগতের ভিতরে যাহা কিছু সৌন্দর্য ও কৃতিত্ব দেখা যায় তাহা সবই আল্লাহ্‌র রহমতের বিকাশ ছাড়া অন্য কিছু নহে।

যখনই আমরা সৃষ্টিজগতের কার্যাবলি ও নিদর্শনগুলি লইয়া চিন্তা-ভাবনা করি তখন সর্বপ্রথম আল্লাহ্‌র রবুবিয়াতের বিধানই আমাদের চোখের সামনে উজ্জ্বল হইয়া উঠে। কারণ প্রতিপালিত হইবার প্রয়োজনেই প্রকৃতির সহিত আমাদের প্রথম পরিচয় লাভ ঘটে। তাহার পর যখন শিক্ষা ও জ্ঞানের ক্ষেত্রে আমরা কিছুটা অগ্রসর হই, তখন দেখিতে পাই যে, রবুবিয়াত ছাড়াও এরূপ ব্যাপকতর কিছু এখানে সক্রিয় রহিয়াছে, রবুবিয়াত যাহার একটি কণামাত্র।

রবুবিয়াত ও উহার বিধান বলিতে কি বুঝায় ? বুঝায় সৃষ্টিজগতের প্রতিপালন ব্যবস্থা। কিন্তু সৃষ্টিজগতে তো শুধু প্রতিপালন কার্যই চলিতেছে না। বরং প্রতিপালন কার্য হইতেও ব্যাপকতর কিছু ইহাকে গড়া, সাজানো ও কল্যাণ দানের কাজে সক্রিয় রহিয়াছে।

আমরা দেখিতেছি, উহার প্রকৃতির সৃজনকর্ম রহিয়াছে এবং সেই সৃজন-কর্মের ভিতরে সৌন্দর্য ও শিল্প-নৈপুণ্যের পরিচয় রহিয়াছে। বিশেষত উহার স্বভাবের ভিতরে পূর্ণ সামঞ্জস্য বিদ্যমান। উহার কার্যকলাপে বিশেষত্ব আছে,আকৃতিতে সৌন্দর্য আছে, আওয়াজের ভিতরে সুর আছে, ঘ্রাণের ভিতরে সুগন্ধি আছে, এক কথায় উহাতে এমন কিছুই নাই যাহা এই বিরাট কারখানাটির সৃজন ও সংশোধনের জন্য কল্যাণকর নহে। সুতরাং সৃজন ও দানের ক্ষেত্রে রবুবিয়াত হইতে ব্যাপকতর ও সার্বজনীন এই যে শক্তিটির অস্তিত্ব অনুভব করি, কুরআন তাহার নাম দিয়াছে 'রহ্‌মত'। উহাতে স্রষ্টার একাধারে 'রহমানিয়াত' ও 'রহীমিয়াত'-এর বিকাশ ঘটিয়াছে।

সৃষ্টির সৃজন ও সৌন্দর্য রহ্‌মতেরই ফল

প্রাণী ও প্রাণচাঞ্চল্যের এই বিশ্বজোড়া কারখানাটির অস্তিত্বই দেখা যাইত না যদি প্রকৃতির ভিতরে সৃজন, সাজান ও সর্ববিধ সংস্কার-সংশোধনের বিশেষত্ব না থাকিত। নিখিল সৃষ্টির প্রকৃতিতে এই বিশেষত্বটি কেন ? কারণ সে গড়া চায়—ভাঙা নহে, সংশোধন চায়—ধ্বংস নহে। কিন্তু প্রকৃতি ভাঙার বদলে গড়া এবং ধ্বংসের বদলে সংশোধন চায় কেন ? যাহা কিছু হইতেছে, সঠিক ও সুন্দরভাবে হইতেছে, ত্রুটিপূর্ণ ও কুৎসিৎ হইতেছে না কেন ? মানুষের শিক্ষা ও জ্ঞানের পরিধি আজ পর্যন্ত এই জটিলতার সমাধান দিতে পারে নাই। দর্শন ও গবেষণার পদচারণা যখনই এই স্তরে আসিয়া পৌঁছিয়াছে, নিস্তব্ধ হইয়া গিয়াছে। কিন্তু কুরআন বলিতেছে, তাহার কারণ এই যে, সৃজনের প্রকৃতির ভিতরে 'রহ্‌মত' কাজ করিতেছে। আর রহ্‌মতের দাবিই হইল, সৌন্দর্য ও সংস্কার—কদর্য ও ধ্বংস নহে।

মানুষের শিক্ষা ও জ্ঞানের পরিধি আমাদিগকে বলিয়া দিতেছে, সৃষ্টি জগতের এই সৃজনলীলা ও সাজসজ্জা মূলত প্রকৃতির আদি উপাদানের গঠন রীতি ও উহার সমতা

সংরক্ষণের ফলস্বরূপ দেখা দিতেছে। সৃষ্টির মূল উপাদানের পরিমাপে সমতা রহিয়াছে, স্বভাবে সামঞ্জস্য রহিয়াছে। এই সমতা ও সামঞ্জস্য হইতেই সবকিছু সঠিক ও সুন্দরভাবে হইতেছে। পৃথিবীর যাবতীয় সৃষ্টির মূলে এই সামঞ্জস্য ও সমন্বয় সক্রিয় রহিয়াছে। অস্তিত্ব, জীবন, স্বাস্থ্য, সৌন্দর্য, ঘ্রাণ, সুর, সৃজন, কল্যাণ বিভিন্ন নামে ইহার বিকাশ। সব কিছুর মূল একটি মাত্র—সমতা ও সমন্বয়।

কিন্তু প্রকৃতির ভিতরে এই সমতা ও সমন্বয় কেন ? কেন সূক্ষ্মাতিসূক্ষ্ম উপাদানগুলি পূর্ণ সমতা রক্ষা করিয়া সমন্বিত হয় ? কেন উপাদানগুলির বৈশিষ্ট্য সমতা ও সমন্বয় না হইয়া অসংযোগ ও অসামঞ্জস্য হইল না ? এখানে আসিয়াও মানুষের বিদ্যার দৌড় নিস্তব্ধ হয়। তবে কুরআন বলে, ইহার কারণ এই, স্রষ্টার ভিতরে রহ্‌মত আছে এবং তাহা সদা সর্বদা প্রকাশ পাইতেছে। যাহার ভিতরে রহ্‌মত আছে আর উহার প্রকাশ ঘটিতেছে, সে যাহা কিছু করিবে, সুন্দর ও উত্তম হইবে, নিখুঁত ও খাঁটি হইবে এবং তাহাতে সমতা ও সমন্বয় থাকিবেই। কখনই ইহার ব্যতিক্রম ঘটিবে না।

দর্শনশাস্ত্র আমাদিগকে শিখাইতেছে, সৃজন ও সৌন্দর্যবৃত্তি প্রকৃতির মূল বৈশিষ্ট্য। সৃজন-বৈশিষ্ট্য চায় সৃষ্টি আর সৌন্দর্য-বৈশিষ্ট্য তাহাতে সৌন্দর্য ও নৈপুণ্য কামনা করে এবং এই দুইটি বৈশিষ্ট্য 'প্রয়োজনের বিধানে'র (থিওরি অব ইউটিলিটির) ফলস্বরূপ দেখা দেয়। সৃষ্টিজগতের প্রকাশ ও পূর্ণতার জন্য সৃজনের প্রয়োজন দেখা দিল ! আর ইহার প্রয়োজন ছিল যে, যাহা কিছু হইবে সুন্দর ও সুনিপুণ শিল্প হইয়া উঠিবে। সুতরাং এই 'প্রয়োজন'ই স্বতন্ত্র একটি কারণ হইয়া দাঁড়াইল এবং এই কারণেই প্রকৃতির যাহা কিছু দেখা দেয়, যে ভাবে দেখা দেওয়া প্রয়োজন, সেই ভাবেই দেখা দেয়।

কিন্তু এই ধরনের ব্যাখ্যায় তো মূল জটিলতার সমাধান হইল না। প্রশ্ন যেখানে দেখা দিয়াছিল, তাহা হইতে যেন আরেক ধাপ আগাইয়া গেল। দার্শনিক বলিতেছেন, যাহা কিছু হইতেছে, প্রয়োজন-রীতির ধারা বাহিয়া হইতেছে। কিন্তু প্রশ্ন দেখা দিল যে, 'প্রয়োজন-রীতি'ই বা কেন বিরাজ করিতেছে ? যাহা কিছু হইবে, প্রয়োজন অনুসারেই হইবে, ইহার দরকার কিসে ? আর সে 'প্রয়োজন-রীতি' ইহাই চাহিবে কেন যে, সুন্দর ও সঠিক হইবে, অসুন্দর ও অঠিক হইবে না ? মানুষের জ্ঞানের বহর ইহার জবাব দানে অক্ষম। এক বিখ্যাত দার্শনিকের ভাষায় বলা চলে, "যেখানেই এই 'কেন' শুরু হইবে, সেখানেই দর্শনের চিন্তা-গবেষণার সীমারেখা শেষ হইবে।" কিন্তু কুরআন এই প্রশ্নের জবাব দেয়। সে-ই বলে, এই 'প্রয়োজন' রহমত ও বখ্‌শিশের 'প্রয়োজন'। রহমত চাহে, যাহা কিছু আত্মপ্রকাশ করিবে, উত্তম ও কল্যাণকর হইবে। এই কারণেই যাহা কিছু হয় উত্তম ও কল্যাণকর হয়।

এই সত্যটি আমাদের সামনে পরিষ্কার থাকা চাই যে, পৃথিবীতে জীবন ধারণের জন্য যাহা কিছু দরকার, সৌন্দর্য ও পারিপাট্য তাহা হইতে অতিরিক্ত—ফালতু দান।

অথচ আমরা তাহাও পাইতেছি। সুতরাং ইহা তো 'প্রয়োজনরীতি'র ধারা বাহিয়া আসে নাই। কারণ হওয়া ও বাঁচার জন্য যাহা দরকার 'প্রয়োজনবিধি' কেবল তাহাই দাবি করিবে। সৌন্দর্য ও পারিপাট্য সেক্ষেত্রে কিসে দরকার ? তাই সৌন্দর্য ও পারিপাট্য 'প্রয়োজন-রীতি'র দরকারে হয় নাই, বরং ইহা বিশ্বপ্রকৃতির এক অতিরিক্ত অনুগ্রহ ও অবদান। ফলে জানা গেল যে, প্রকৃতি শুধু জীবনই দান করে না, জীবনকে সুন্দর ও পরিপাটি করিয়া দেখিতে চায়। সুতরাং ইহা 'প্রয়োজন-রীতি'র চাহিদা হিসাবে আসে নাই, তাহা হইতে ভিন্নতর কোন এক প্রয়োজনে ইহার আবির্ভাব ঘটিয়াছে। তাহা হইল রহ্‌মত ও বখ্‌শিশের প্রয়োজন। কুরআন বলে রহ্‌মত চায় যে, যাহা কিছু হইবে, তাহা সুন্দর হইবে, সুখকর হইবে।

قُلْ لِّمَنْ مَّا فِيْ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ - قُلْ لِلّٰهِ - كَتَبَ عَلٰى نَفْسِهِ الرَّحْمَةَ - (٦ : ١٢)

—বল, আকাশ ও পৃথিবীতে যাহা কিছু আছে, তাহা কাহার ? (হে রসূল) বলিয়া দিন, সেই আল্লাহ্‌র, যিনি নিজের জন্য রহ্‌মতের কার্যকে প্রয়োজনীয় করিয়া নিয়াছে। (—সূরা আন 'আম ঃ আয়াত ১২)

وَ رَحْمَتِيْ وَسِعَتْ كُلَّ شَيْءٍ - (٧ : ١٥٦)

—আমার রহ্‌মত সব বস্তুই জুড়িয়া রহিয়াছে। (—সূরা আ'রাফ ঃ আয়াত ১৫৬)

প্রকৃতির কল্যাণকর দিক

এই ক্ষেত্রে সর্বপ্রথম আমাদের সামনে যে সত্যটি উজ্জ্বল হইয়া ধরা দেয়, তাহা হইল নিখিল সৃষ্টির সব বস্তুর কল্যাণকর দিক। অর্থাৎ আমরা দেখিতেছি যে, প্রকৃতির সব কিছুতেই পূর্ণ শৃঙ্খলা ও ঐক্যের সঙ্গে কল্যাণকর ও কার্যকারিতার বৈশিষ্ট্যও পাওয়া যাইতেছে। যদি সামগ্রিকভাবে সব কিছুর উপরে দৃষ্টিপাত করা হয়, তাহা হইলে মনে হইবে, যেন সমগ্র সৃষ্টির কারখানাটি আমাদের কল্যাণ দানের ও আমাদের যাবতীয় প্রয়োজন মিটাইবার কাজে ব্যাপৃত রহিয়াছে।

وَ سَخَّرَ لَكُمْ مَّا فِى السَّمٰوٰتِ وَمَا فِى الْاَرْضِ جَمِيْعًا مِّنْهُ - اِنَّ فِيْ ذٰلِكَ لَاٰيٰتٍ لِّقَوْمٍ يَّتَفَكَّرُوْنَ - (٤٥ : ١٣)

আকাশ ও পৃথিবীতে যাহা কিছু আছে, সমস্ত কিছুই আল্লাহ্‌তা'আলা তোমাদের জন্য অনুগত করিয়া রাখিয়াছেন। (অর্থাৎ এইগুলির শক্তি ও প্রভাব তোমাদের এতখানি আয়ত্তাধীন করিয়া দেওয়া হইয়াছে যে, তোমরা যে ভাবে চাও, সেইভাবেই উহা তোমাদের কাজে লাগাইতে পার।) যাহারা চিন্তশীল ও গবেষক, নিশ্চয়ই

তাহাদের জন্য ইহাতে (সত্যের পরিচয় লাভের) নিদর্শন রহিয়াছে।[৬] (—সূরা জাছিয়া ঃ ১৩)

আমরা দেখিতে পাই যে, সৃষ্টিজগতে যাহা কিছু রহিয়াছে, আর যাহা কিছু দিন দিন আত্মপ্রকাশ করিতেছে, তাহার প্রতিটি বস্তুই কোন না কোন বৈশিষ্ট্যের অধিকারী এবং প্রতিটি বস্তুই কোন না কোন প্রভাব সৃষ্টি করার ক্ষমতা রাখে। আমরা আরও দেখিতেছি যে, প্রতিটি বস্তুর এই বৈশিষ্ট্য আমাদের কোন না কোন প্রয়োজনে আসে এবং উহার প্রভাব ও ফলাফল আমাদের কোন না কোন দানে ধন্য করে। সূর্য, চন্দ্র, তারকা, বায়ু, বৃষ্টি, নদী, সমুদ্র, পাহাড় ইত্যাদি সব কিছুরই বৈশিষ্ট্য ও উপকারিতা রহিয়াছে এবং এই সব বস্তু আমাদের বিভিন্নরূপ সুখ-স্বাচ্ছন্দ্যের উপকরণ দান করে।

اَللّٰهُ الَّذِىْ خَلَقَ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضَ وَاَنْزَلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً فَاَخْرَجَ بِهٖ مِنَ الثَّمَرٰتِ رِزْقًا لَّكُمْ - وَسَخَّرَ لَكُمُ الْفُلْكَ لِتَجْرِىَ فِى الْبَحْرِ بِاَمْرِهٖ - وَ سَخَّرَ لَكُمُ الْاَنْهٰرَ -

---

৬ এই আয়াতে এবং এইরূপ অর্থবোধক সকল আয়াতে سخر শব্দটি ব্যবহার করা হইয়াছে। অর্থাৎ সকল বস্তুই তোমাদের জন্য অনুগত করিয়া রাখা হইয়াছে। আরবীতে سخر শব্দটি কোন বস্তুকে কাহারো জন্য এরূপভাবে অনুগত করিয়া রাখা যেন যাহার জন্য রাখা হইয়াছে, সে তাহা যেভাবে ইচ্ছা ব্যবহার করিতে পারে। এখন ভাবিয়া দেখুন যে, মানবীয় মর্যাদা ও ক্ষমতা উর্ধ্বে তুলিয়া ধরার জন্য ইহা হইতে উপযুক্ত শব্দ আর কি হইতে পারে?

কুরআন অবতীর্ণ হইবার আগে বিভিন্ন সম্প্রদায়ের ভিতরে প্রচলিত ধর্মমতগুলির ধারণা ও বিশ্বাস মানুষের বিবেক-বুদ্ধির সরাসরি প্রতিকূল ছিল। কুরআন আসিয়া মানুষের শুধু বিবেক বুদ্ধির অনুকূল মতই প্রকাশ করে নাই ; পরন্তু, মানুষের জ্ঞান ও মনোবলকে এতখানি উঁচু করিয়া তুলিয়া ধরিয়াছে যে, আজও উহা হইতে উত্তম কোন ধারণা মানুষ নিজেও সৃষ্টি করিতে পারে নাই। আকাশমণ্ডলী ও পৃথিবীতে যাহা কিছু আছে, সবই মানুষের অনুগত করিয়া দেওয়া হইয়াছে, যেন মানুষ ঐগুলি নিজেদের ইচ্ছানুসারে কাজে ব্যবহার করিতে পারে। মানুষের জ্ঞান ও চিন্তার জন্য ইহার চাইতে বড় মূলনীতি আর কি হইতে পারে?

আবার চিন্তা করুন, ' তাসখীর' শব্দটি মানুষের জ্ঞানের রাজ্য বিস্তারের ক্ষেত্রে কতখানি গুরুত্বপূর্ণ শব্দ। এই 'তাসখীর' শব্দটির প্রাচীন নমুনা হইল এই, মানুষের একটি ছোট্ট শিশু দুই গজের দুইখানা কাঠের তক্তা একত্রে বাঁধিয়া সমুদ্রের বিশাল বুকে চাপিয়া বসিত। উহার আধুনিক নিদর্শন এই আগুন, পানি, বায়ু, বিদ্যুৎ সব কিছুর উপরে সে আধিপত্য জমাইয়া নিয়াছে।

অবশ্য এই কথাটি স্মরণ রাখা চাই যে, কুরআন যেখানেই 'তাসখীর' শব্দটি ব্যবহার করিয়াছে, উহার সম্পর্ক শুধু পৃথিবীর সব সৃষ্টি ও সৌরজগতের দৃশ্যমান বা অনুভূত বস্তুর সহিত সংশ্লিষ্ট। ইহা বলা হয় নাই যে, আল্লাহ্‌র যাবতীয় সৃষ্টিকেই অনুগত করা হইয়াছে। কিংবা যাবতীয় সৃষ্টির ভিতরে মানুষ শ্রেষ্ঠতম মর্যাদার অধিকারী। কারণ এই কথা সর্বজনবিদিত যে, এই পৃথিবী আল্লাহ্‌র সৃষ্টি-সমুদ্রের একটি বিন্দুমাত্র।

وَمَا يَعْلَمُ جُنُوْدَ رَبِّكَ اِلَّا هُوَ -

তোমার প্রভুর অসংখ্য সেনানীর (সৃষ্টির) খবর তিনি ভিন্ন আর কেহই রাখেন না।

সুতরাং মানুষের শ্রেষ্ঠত্ব শুধু এই পৃথিবীর সৃষ্ট বস্তুগুলির ভিতরে সীমাবদ্ধ।

وَ سَخَّرَ لَكُمُ الشَّمْسَ وَالْقَمَرَ دَآئِبَيْنِ - وَ سَخَّرَ لَكُمُ اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ - وَاٰتٰكُمْ مِّنْ كُلِّ مَا سَاَلْتُمُوْهُ - وَاِنْ تَعُدُّوْا نِعْمَتَ اللّٰهِ لاَ تُحْصُوْهَا - اِنَّ الْاِنْسَانَ لَظَلُوْمٌ كَفَّارٌ - (١٤ : ٣٢ - ٣٤)

—তিনিই আল্লাহ্ যিনি এই আকাশমণ্ডলী ও পৃথিবী সৃষ্টি করিয়াছেন। তিনিই আকাশ হইতে পানি বর্ষণ করিয়া তোমাদের জন্য খাদ্যশস্যরূপে নানারূপ ফলমূল উৎপাদন করিয়াছেন। এইভাবে তিনি সমুদ্রে ভাসমান জাহাজগুলিকে তোমাদের ইচ্ছাধীন রাখিয়া তাঁহারই হুকুমে পরিচালিত করিতেছেন। তেমনি সমুদ্রকেও তোমাদের কাজ আদায়ের জন্য আয়ত্তাধীন করিয়া রাখিয়াছেন। (শুধু তাহাই নহে, ভাবিয়া দেখ) চন্দ্র সূর্যকেও তোমাদের স্বার্থে বিশেষ এক রীতিতে আবর্তিত করিতেছেন। রাত্র ও দিন তোমাদেরই স্বার্থে সৃষ্টি হইতেছে। মোটকথা, তোমাদের যাহা কিছু চাহিদা ছিল, তিনি সব কিছুই মিটাইয়াছেন। যদি তোমরা আল্লাহ্র নিয়ামত গণনা করিতে চাও, সক্ষম হইবে না। উহা অসংখ্য। অথচ নিশ্চয়ই মানুষ বড় অবিচারক ও অকৃতজ্ঞ। (—সূরা ইবরাহীম ঃ আয়াত ৩২-৩৪)

ভূ-পৃষ্ঠের দিকে তাকাইলে দেখিবে, উহা ফলফুলে পরিপূর্ণ। উহার তলদেশে পরিষ্কার সুমিষ্ট পানি প্রবাহিত হইতেছে। ভূগর্ভে স্বর্ণ-রৌপ্যের খনি রহিয়াছে। যদিও পৃথিবীর গঠন গোলাকার তথাপি উহার প্রত্যেকটি অংশ দেখিলে মনে হইবে মানুষের বসবাসের জন্য বিছানো একখণ্ড সমতল ভূমি।

اَلَّذِىْ جَعَلَ لَكُمُ الْاَرْضَ مَهْدًا وَّ جَعَلَ لَكُمْ فِيْهَا سُبُلاً لَّعَلَّكُمْ تَهْتَدُوْنَ - (٤٣ : ١٠)

—তিনিই তোমাদের জন্য ভূ-পৃষ্ঠকে বিছানার মত করিয়া গড়িয়া দিয়াছেন এবং তাহাতে (সুবিধাজনকভাবে) বিচরণের জন্য বিভিন্ন সমতল পথ সৃষ্টি করিয়া দিয়াছেন। (—সূরা যুখরুফ : আয়াত ১০)

وَهُوَ الَّذِىْ مَدَّ الْاَرْضَ وَجَعَلَ فِيْهَا رَوَاسِىَ وَاَنْهَارًا - وَمِنْ كُلِّ الثَّمَرٰتِ جَعَلَ فِيْهَا زَوْجَيْنِ اثْنَيْنِ يُغْشِى اللَّيْلَ النَّهَارَ - اِنَّ فِىْ ذٰلِكَ لَاٰيٰتٍ لِّقَوْمٍ يَّتَفَكَّرُوْنَ - وَفِى الْاَرْضِ قِطَعٌ مُّتَجَاوِرَاتٌ وَّجَنّٰتٌ مِّنْ اَعْنَابٍ وَّ زَرْعٌ وَّ نَخِيْلٌ صِنْوَانٌ وَّ غَيْرُ صِنْوَانٍ يُّسْقٰى بِمَاءٍ وَّاحِدٍ - وَنُفَضِّلُ بَعْضَهَا عَلٰى بَعْضٍ فِى الْاُكُلِ - اِنَّ فِىْ ذٰلِكَ لَاٰيٰتٍ لِّقَوْمٍ يَّعْقِلُوْنَ -

—ইহা তো প্রতিপালকেরই প্রতিপালন লীলা যে, তিনি ভূপৃষ্ঠকে (তোমাদের জন্য) প্রশস্ত করিয়া বিছাইয়াছেন এবং উহার উপরে পাহাড় চাপা দিয়াছেন, নদীনালা প্রবাহিত করিয়াছেন। তদুপরি প্রত্যেক ধরনের ফল জোড়ায় জোড়ায় সৃষ্টি করিয়াছেন। ইহাও তাঁহারই লীলাখেলা যে, (রাত ও দিন একের পর এক আসা-যাওয়া করে) রাত্রির অন্ধকার আসিয়া দিনের আলো গ্রাস করিয়া লয়। চিন্তাশীলদের জন্য নিশ্চয়ই ইহার ভিতরে (সত্যকে চিনিবার) যথেষ্ট নিদর্শন রহিয়াছে।

আবার দেখ ভূপৃষ্ঠকে এরূপভাবে সৃষ্টি করা হইয়াছে যে, উহার (বসবাসযোগ্য) খণ্ডগুলি কাছাকাছি রাখা হইয়াছে। আর তাহাতে আঙুরের বাগান, শস্যক্ষেত্র ও খেজুরের ছড়া জন্ম নিয়াছে। গাছপালাগুলির ভিতরে কতক শাখা-প্রশাখায় পূর্ণ ও কতক শাখা শূন্য রহিয়াছে। যদিও সব গাছই একই ধরনের পানি দ্বারা সিঞ্চিত, তথাপি ফলগুলি এক ধরনের নহে। আমি ফলের স্বাদভেদে এক ধরনের গাছের উপরে অন্য ধরনের গাছকে মর্যাদা দান করিয়াছি। নিশ্চয়ই এই সবের ভিতরে জ্ঞানী লোকদের জন্য (আল্লাহ্‌কে চিনিবার) নিদর্শন বিদ্যমান রহিয়াছে।

وَ لَقَدْ مَكَّنّٰكُمْ فِى الْاَرْضِ وَ جَعَلْنَا لَكُمْ فِيْهَا مَعَايِشَ - قَلِيْلاً مَّا تَشْكُرُوْنَ - (٧ : ١٠)

—আবার দেখ, আমি পৃথিবীতে প্রতিষ্ঠা ও আধিপত্য দান করিয়াছি এবং জীবনের সব সরঞ্জাম পয়দা করিয়া দিয়াছি। (কিন্তু, আক্ষেপ) খুব কম লোকই আল্লাহ্‌র এই অবদানের জন্য কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করে! (—সূরা আ'রাফ : আয়াত ১০)

সমুদ্রের দিকে দৃষ্টি ফিরাইলে উহার পৃষ্ঠে জাহাজগুলি সাঁতরাইয়া ফিরিতেছে। সমুদ্রগর্ভে মাছগুলি হৈ-হল্লা করিয়া ছুটিতেছে এবং তলদেশে মণি-মুক্তা ও মূল্যবান পাথর লালিত-পালিত হইতেছে।

وَهُوَ الَّذِىْ سَخَّرَ الْبَحْرَ لِتَاْكُلُوْا مِنْهُ لَحْمًا طَرِيًّا وَ تَسْتَخْرِجُوْا مِنْهُ حِلْيَةً تَلْبَسُوْنَهَا - وَتَرَى الْفُلْكَ مَوَاخِرَ فِيْهِ وَلِتَبْتَغُوْا مِنْ فَضْلِهٖ - لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُوْنَ - (١٦ : ١٤)

—তিনিই সমুদ্রকে তোমাদের জন্য অনুগত করিয়া রাখিয়াছেন, যেন তাজা মৎস্যাদি পাইতে পার এবং পরিধানের অলঙ্কারাদির জন্য মূল্যবান সামগ্রী উদ্ধার করিতে পার। তোমরা আরও দেখিতে পাও যে, জাহাজগুলি সমুদ্রের তরঙ্গরাজি বিদীর্ণ করিয়া চলিয়া যায় এবং তাহার সাহায্যে তোমরা জীবনের সুখ-স্বাচ্ছন্দ্যের জন্য আল্লাহ্‌র দান তালাশ করিয়া ফির যেন আল্লাহ্‌র নিয়ামত লাভ করিয়া তাঁহার প্রতি কৃতজ্ঞ থাক। (—সূরা নহল ঃ আয়াত ১৪)

প্রাণিজগতের দিকে তাকাইলে দেখিবে, মাটিতে চতুষ্পদ জীব, বায়ুতে পাখি, পানিতে মাছ এইজন্য বিচরণ করিতেছে, যেন সবাই আমাদের কল্যাণে আসে। খোরাকের জন্য উহার দুধ ও মাংস, আরোহণ করিয়া বেড়াইবার জন্য উহার পিঠ, আত্মরক্ষার জন্য উহার পাহারা, পরিধানের জন্য উহার চামড়া এমন কি উহার হাড় পর্যন্ত আমাদের কল্যাণ দান করিয়া থাকে।

وَالْاَنْعَامَ خَلَقَهَا - لَكُمْ فِيْهَا دِفْءٌ وَّ مَنَافِعُ وَمِنْهَا تَاْكُلُوْنَ - وَلَكُمْ فِيْهَا جَمَالٌ حِيْنَ تُرِيْحُوْنَ وَحِيْنَ تَسْرَحُوْنَ - وَ تَحْمِلُ اَثْقَالَكُمْ اِلٰى بَلَدٍ لَّمْ تَكُوْنُوْا بٰلِغِيْهِ اِلَّا بِشِقِّ الْاَنْفُسِ - اِنَّ رَبَّكُمْ لَرَءُوْفٌ رَّحِيْمٌ - وَّ الْخَيْلَ وَالْبِغَالَ وَالْحَمِيْرَ لِتَرْكَبُوْهَا وَزِيْنَةً - وَ يَخْلُقُ مَا لَا تَعْلَمُوْنَ - (١٦ : ٥ ـ ٨)

—আর বিভিন্ন ধরনের জীব পয়দা করিয়াছেন, যাহা হইতে তোমাদের শীত-পোশাক ও অন্যান্য কল্যাণকর কাজ সাধিত হয় এবং উহা হইতে তোমরা খাদ্যদ্রব্যও পাইয়া থাক। যখন সেইগুলি সকালে চরিয়া খাইবার জন্য এবং সন্ধ্যায় ঘরে ফিরিবার জন্য পাল বাঁধিয়া যাতায়াত করে, তখন তাহা দেখিয়া তোমাদের নয়ন তৃপ্ত হয়। উহাদের ভিতরে এমন জানোয়ারও আছে যাহারা তোমাদের বোঝা বহন করিয়া দূর-দূরান্তরের শহরে পৌঁছাইয়া দেয়। তোমরা তাহা কঠোর পরিশ্রম ছাড়া পারিতে না। নিশ্চয়ই তোমাদের প্রভু অত্যন্ত মহৎপ্রাণ ও দয়াবান ! আবার দেখ, ঘোড়া, খচ্চর, গাধা সৃষ্টি করা হইয়াছে যেন তোমরা কাজে লাগাইতে পার এবং তোমাদের অলংকাররূপে বিরাজ করে। তিনি এইভাবে আরও নানা ধরনের প্রাণী সৃষ্টি করিয়াছেন, যাহার তোমরা খবরও রাখ না। (—সূরা নহল ঃ আয়াত ৫-৮)

وَاِنَّ لَكُمْ فِى الْاَنْعَامِ لَعِبْرَةً - نُسْقِيْكُمْ مِّمَّا فِىْ بُطُوْنِهٖ مِنْ بَيْنِ فَرْثٍ وَّ دَمٍ لَّبَنًا خَالِصًا سَائِغًا لِّلشّٰرِبِيْنَ - (١٦ : ٦٦)

চতুষ্পদ জীবের ভিতরে তোমাদের জন্য (বুদ্ধি ও দূরদৃষ্টির) অবশ্যই উপদেশ রহিয়াছে। সেই জন্তুর দেহে রক্ত ও অপবিত্র বস্তুর মধ্য হইতে আমি পাক-পবিত্র দুগ্ধ সৃষ্টি করিয়া দিই, যাহা পানকারীদের জন্য উপাদেয় পানীয় হয়। (সূরা নহ্ল ঃ আয়াত ৬৬)

وَاللّٰهُ جَعَلَ لَكُمْ مِّنْ بُيُوْتِكُمْ سَكَنًا وَّ جَعَلَ لَكُمْ مِّنْ جُلُوْدِ الْاَنْعَامِ بُيُوْتًا تَسْتَخِفُّوْنَهَا يَوْمَ ظَعْنِكُمْ وَ يَوْمَ اِقَامَتِكُمْ - وَ مِنْ اَصْوَافِهَا وَ اَوْبَارِهَا وَاَشْعَارِهَا اَثَاثًا وَّ مَتَاعًا اِلٰى حِيْنٍ -

দেখ, আল্লাহ্ তোমাদের থাকার জন্য ঘরের ব্যবস্থা করিয়াছেন এবং (যাহারা শহরে থাকে না, তাহাদের জন্য এমন সরঞ্জামের ব্যবস্থা করা হইয়াছে যে,) চতুষ্পদ জন্তুর চামড়া দ্বারা তাঁবুর ব্যবস্থা করিয়াছেন, যাহা আবাসে কি প্রবাসে সবখানেই সহজসাধ্য হয়। এইভাবে জানোয়ারের চামড়া, হাড় ও লোম দ্বারা নানা ধরনের উপকরণ সৃষ্টি করেন ; বিশেষ বিশেষ সময়ে তাহা তোমাদের কাজে আসে। (—সূরা নহল : আয়াত ৮০)

একটি মানুষ যতই সংকীর্ণ অসভ্য জীবন যাপন করুক না কেন, তাহার চারিপাশ হইতে দিন-রাত সে যেসব কল্যাণ লাভ করিতেছে, তাহা সে কিছুতেই না জানিয়া পারে না। এক কাঠুরিয়া নিজের কুটিরে বসিয়া দৃষ্টি ফিরাইলে হয়তো সৃষ্টিজগতের সব তত্ত্ব পরিষ্কারভাবে বুঝিতে পাইবে না। তবে এই সত্যটি অবশ্যই উপলব্ধি করিবে যে, অসুখ হইলে সে লতা, পাতা, শিকড় বাটিয়া খাইয়া বাঁচে। রৌদ্রের দাবানল হইতে সে গাছের ছায়ার আশ্রয় লইয়া ত্রাণ পায়। বেকার অবস্থায় গাছের সবুজ পাতা ও রঙ-বে-রঙের ফুল-ফল দেখিয়া চোখ জুড়ায়। তরুণ গাছ তাহাকে সুস্বাদু ফল দান করে। পরিণত অবস্থায় গাছগুলি আবার তক্তায় পরিণত হয়। শুকাইয়া গেলে সেগুলি আগুনের শিখা সৃষ্টি করে। একই গাছ কখনো দর্শকের নয়ন জুড়ায়, কখনো ঘ্রাণে হাওয়া সুগন্ধি করে, কখনো সুস্বাদু ফল দান করে, কখনো তক্তা হইয়া ঘরের সরঞ্জাম হয়, কখনো আবার শুকাইয়া জ্বালানি কাষ্ঠরূপে আগুনের শিখা সৃষ্টি করে, চুলা গরম করে, শীত দূর করে, অসংখ্য বস্তু পাকায়, গলায় ও তপ্ত করে।

الَّذِىْ جَعَلَ لَكُمْ مِّنَ الشَّجَرِ الْاَخْضَارِ نَارًا فَاِذَا اَنْتُمْ مِّنْهُ تُوْقِدُوْنَ - (٣٦ : ٨٠)

—আবার দেখ, তিনি তোমাদের জন্য তরুতাজা গাছকে তোমাদের আগুনের প্রয়োজন মিটাইবার যোগ্য করিয়াছেন। তোমরা তদ্দ্বারা আগুন জ্বালাইয়া থাক। (—সূরা ইয়াসীন ঃ ৮০)

এই সব উপকার ও কল্যাণ তো আমরা আজ পর্যন্ত উপলব্ধি করিতে পারিয়াছি। ইহা ছাড়া আরও কত কল্যাণ যে এই সবে নিহিত রহিয়াছে, আরও কোন কোন কাজে প্রকৃতি এত সব বস্তু সৃষ্টি করিয়াছে, তাহা কে বলিতে পারে ? লীলাময় স্রষ্টা তাঁহার এত সব সৃষ্টিকে কোন্ কাজে লাগাইতেছেন এবং কোন্ কাজে আপাতত লাগাইতেছেন না, তাহা কে বলিতে পারে ?

وَمَا يَعْلَمُ جُنُوْدَ رَبِّكَ اِلاَّ هُوَ - (٧٤ : ٣١)

অনন্তর তোমার প্রতিপালক (সৃষ্টির এই বিরাট কারখানা পরিচালনার জন্য) যত সেনানী সৃষ্টি করিয়াছেন, সেই সবের তত্ত্ব তিনি ছাড়া কে রাখিতে পারে ? (—সূরা মুদ্দাস্সির : আয়াত ৩১)

তারপর এই সত্যটিও সামনে রাখা দরকার যে, প্রকৃতি নিখিল সৃষ্টির কল্যাণকর ও দান-দক্ষিণার দিকটি সকলের জন্য সমানভাবে একই সময়ে মুক্ত করিয়া থাকেন। যদি কোন ব্যক্তি সুবৃহৎ অট্টালিকায় বসিয়া বুঝিতে থাকে যে, এই গোটা সৃষ্টির কারখানাটি কেবল তাহারই স্বার্থে কাজ করিয়া চলিয়াছে, তাহা হইলে একটি ক্ষুদ্র পিপীলিকাও নিজের গর্তে বসিয়া সেইরূপ ভাবিতে পারে। সেই ক্ষেত্রে পিপীলিকাকে কে মিথ্যুক বলিতে পারে ? সূর্য কি তাহাকে আলো ও তাপ দিতে ব্যস্ত নহে ? বৃষ্টি কি তাহার জন্য আর্দ্রতার ব্যবস্থা করিতে তৎপর নহে ? বায়ু কি পিপড়ার নাকে চিনির ঘ্রাণ পৌঁছাইয়া দিতে প্রবহমান নহে ? মাটি কি বিভিন্ন মওসুমে তাহার থাকার যথোপযুক্ত ব্যবস্থাপনায় নিয়োজিত নহে ?

আসলে প্রকৃতির দান ও বিধান এরূপ ব্যাপক ও সার্বজনীন হইয়া দেখা দেয় যে, তাহা একই সময়ে সকলের সমানভাবে পরিপোষকতা করে। সবাই সমান ভাবে কল্যাণ পাইতে থাকে আর মনে করে যে, সৃষ্টির এই বিরাট কারখানাটি শুধু আমার স্বার্থেই কাজ করিয়া যাইতেছে।

وَمَا مِنْ دَابَّةٍ فِى الْاَرْضِ وَلَاطَائِرٍ يَّطِيْرُ بِجَنَاحَيْهِ اِلاَّ اُمَمٌ اَمْثَالُكُمْ -

—আর মাটিতে বিচরণকারী যাবতীয় জীব ও দুই পাখায় ভর করিয়া যেই সব পাখি উড়িয়া বেড়ায়, সবাই তোমাদের মত এক একটি জাতি ছাড়া অন্য আর কিছুই নহে।

সৃষ্টির ভাঙা-গড়ার প্রয়োজন

এই কথাটি ভুলিয়া গেলে চলিবে না যে, পৃথিবীটি ভাঙা-গড়ার কারখানা মাত্র। এখানে প্রতিটি সৃষ্টির সহিত ধ্বংস ও ঐক্যের সহিত অনৈক্য ওতপ্রোতভাবে জড়িত। যেভাবে ভাস্কর্যের ক্ষেত্রে ভাঙা-চুরা ও জোড়া-তালির ব্যাপারটি বস্তুটিকে অধিকতর সুন্দর ও সুঠাম করিয়া তোলে, তেমনি সৃষ্টি জগতের সব ধ্বংসলীলার পিছনে সুন্দরভাবে নূতন করিয়া গড়িবার উদ্দেশ্য সক্রিয় থাকে। তোমরা একটি দালান তৈরি কর। কিন্তু উহা তৈরি করার পিছনে তোমাদের কি উদ্দেশ্য প্রচ্ছন্ন থাকে ? সেই উদ্দেশ্যে কি তোমরা বহু গড়া জিনিসকে ভাঙিয়া ফেল না ? অনেক গাছ কাটিয়া যদি এই স্থানটি পরিষ্কার না করা হইত, মাটি কাটিয়া যদি ইট তৈরি করিয়া আগুনে না জ্বালানো হইত, তাহা হইলে দালানটি গড়িয়া উঠিত কি ? তখন দালানে থাকার শান্তি ও নিরাপত্তা তোমরা কি ভাবে অর্জন করিতে ? এ কথা সুনিশ্চিত যে, ভাঙা-গড়ার এই হাঙ্গাম ও প্রয়াস যদি না থাকিত, তাহা হইলে মানুষ এরূপ অনেক কিছু হইতেই বঞ্চিত থাকিত।

ঠিক এই অবস্থাই আমরা দেখিতে পাই বিশ্ব প্রকৃতির ভাঙা-গড়ার হাঙ্গামা ও প্রয়াসে। সে সৃষ্টির এই বিরাট সৌধটির একদিক ভাঙে ও আরেক দিক গড়ে। সুন্দর

করার জন্য এখানে সেখানে ভাঙা-গড়ার কাজ তাহার নিয়তই চলিতে থাকে। আর এই গড়ার প্রয়োজনে ভাঙার কাজই তোমাদের কাছে ভয়াবহ হইয়া দেখা দেয়। অথচ এখানে নিছক ধ্বংস কোথায় কখন দেখিয়াছ ? যেদিকেই তাকাও শুধু সৃষ্টির সৃষ্টি। সমুদ্রে তরঙ্গোচ্ছ্বাস নদীতে ঝড়ের মত্ততা, পাহাড়ে আগ্নেয়লীলা, শীতে তুষারপাত, গরমে সায়মুম, বর্ষায় বজ্র ও বৃষ্টি তোমাদের কাছে যতই অপ্রীতিকর হইয়া দেখা দিক, উহার ভিতরে সৃষ্টির সংস্কার ও পুনর্গঠনের এমন কল্যাণকর উপাদান রহিয়াছে, যাহা পৃথিবীর যে কোন কল্যাণকর বস্তু হইতে অধিকতর ফলপ্রসূ হয়।

যদি সমুদ্রে তুফান দেখা না দিত, তাহা হইলে মাঠঘাটগুলি একবিন্দু পানিও পাইত না। ফলে তাহা সুজলা-সুফলা হইয়া নূতন জীবনে উদ্দীপিত হইয়া দেখা দিত না। যদি মেঘের গর্জন ও বিদ্যুতের চমক না হইত, তাহা হইলে বৃষ্টিরূপ অনুগ্রহের দেখা মিলিত না। যদি পাহাড় অগ্ন্যুৎপাত না ঘটাইত, তাহা হইলে ভূগর্ভের উত্তপ্ত পদার্থ পুঞ্জীভূত হইয়া গোটা পৃথিবীকে ধ্বংসস্তূপে পরিণত করিত। তোমরা হয়তো প্রশ্ন তুলিবে, উত্তপ্ত পদার্থ ভূগর্ভে সৃষ্টি করা হইল কেন ? তোমাদের জানা প্রয়োজন যে, মাটির উর্বরতার তথা পালন-বর্ধন ক্ষমতার পিছনে যেই সব উপাদান কাজ করিতেছে, উত্তপ্ত পদার্থের অবর্তমানে সেইগুলির বিশেষ প্রয়োজনীয় অংশটি উধাও হইত ; এই সত্য তত্ত্বটির দিকেই কুরআন বিভিন্ন স্থানে ইঙ্গিত দান করিয়াছে। সূরা 'রূম'-এ বলা হইয়াছে ঃ

وَمِنْ اٰيٰتِهٖ يُرِيْكُمُ الْبَرْقَ خَوْفًا وَّ طَمَعًا وَّ يُنَزِّلُ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً فَيُحْيِ بِهِ الْاَرْضَ بَعْدَ مَوْتِهَا - اِنَّ فِيْ ذٰلِكَ لَاٰيٰتٍ لِّقَوْمٍ يَّعْقِلُوْنَ -

—(লক্ষ কর) তাঁহার (ক্ষমতা ও বিজ্ঞতার) নিদর্শনগুলির অন্যতম হইল এই, তিনি বিদ্যুতের চমক ও গর্জন সৃষ্টি করিয়া তোমাদের ভিতরে যুগপৎ ভয় ও আশার সঞ্চার করেন। অনন্তর তিনি আকাশ হইতে পানি বর্ষণ করেন এবং তাহার প্রভাবে মৃত পৃথিবী নূতন জীবন লাভ করে। এই ঘটনার ভিতরে অবশ্যই জ্ঞানী লোকদের জন্য (খোদায়ী বিজ্ঞানের) বড় নিদর্শন রহিয়াছে ।

প্রকৃতির সৌন্দর্য

প্রকৃতির কল্যাণময় অবদানের সেরা হইল বিশ্বব্যাপী সৌন্দর্যলীলা। প্রকৃতি শুধু সৃষ্টিই করে না, শুধু সাজায় না, বরং তাহার এই সৃজন ও সাজানো হয় সৌন্দর্যপূর্ণ এবং যাহা কিছু আত্মপ্রকাশ করে, নয়ন জুড়ায়। সামগ্রিকভাবে সৃষ্টিজগতের উপরে দৃষ্টি ফিরান কিংবা উহার এক একটি অংশের উপরে দৃষ্টিপাত করুন, সবখানেই সৌন্দর্যের চাদর জড়ানো দেখিতে পাইবেন। তারকারাজির বিন্যাস ও গতিবিধি সূর্যের রশ্মিপাত ও আলোর খেলা, চাদের পরিভ্রমণ ও চরাই-উতরাই, আকাশের বিশালতা ও রঙ-বে-রঙের আনাগোনা, বর্ষার সমাগম ও বিবর্তন-ধারা, সমুদ্রের দৃশ্য ও নদীর

কলতান, পাহাড়ের উচ্চতা ও প্রান্তরের শ্যামলতা, জানোয়ারের রূপ ও দেহের বৈচিত্র্য, গাছপালার রূপসজ্জা ও ফুলবাগানের নয়নাভিরাম দৃশ্য, ফুলের সৌরভ ও পাখির কাকলি, প্রভাতের অরুণ আলোর নির্মল হাসি আর সন্ধ্যার সোনালি পর্দার ঠাঁট, এক কথায় গোটা সৃষ্টিই যেন অপার সৌন্দর্যের লীলা নিকেতন! মনে হয় যেন এই বিশাল সৃষ্টির কারখানাটির পিছনে এক বিরাট সৌন্দর্য-রসিক শিল্পী সক্রিয় থাকিয়া সবকিছুই সৌন্দর্য-মণ্ডিত করিয়া পাঠাইতেছেন। তিনি যেন ইহার প্রতিটি অংশকে দর্শক, শ্রোতা ও বোদ্ধাদের জন্য তৃপ্তি ও আনন্দের এক বেহেশ্‌তরূপে প্রকাশ করিতে চাহিতেছেন।

মূলত সৃষ্টিজগতের গোড়ায়ই সৌন্দর্য ও সজ্জা বিদ্যমান । প্রকৃতি যে ভাবে এই সব সৃষ্টির জন্য জড় উপাদান গড়িয়াছে, তেমনি উহার সৌন্দর্য ও সাজ-সজ্জার জন্য কিছু আত্মিক বা গুণগত উপাদান সৃষ্টি করিয়াছে। আলো, রঙ, ঘ্রাণ, সুর ও সৌন্দর্য ইত্যাদির সাহায্যে প্রকৃতি স্বতঃস্ফূর্ত সাজ-সজ্জায় নিয়ত ব্যস্ত রহিয়াছে।

صُنْعَ اللّٰهِ الَّذِىْ اَتْقَنَ كُلَّ شَىْءٍ –

—ইহা সেই আল্লাহ্‌রই কর্ম নিদর্শন, যিনি সব কিছুই সৌন্দর্য ও শৃঙ্খলার সহিত সৃষ্টি করিয়াছেন।

ذٰلِكَ عَالِمُ الْغَيْبِ وَالشَّهَادَةِ الْعَزِيْزُ الرَّحِيْمُ – اَلَّذِىْ اَحْسَنَ كُلَّ شَىْءٍ خَلَقَهُ –

—এই সেই আল্লাহ্, যিনি জ্ঞাত ও অজ্ঞাত সব কিছুরই খবর রাখেন। তিনি ক্ষমতাবান ও দয়ালু। তিনি যাহা কিছু সৃষ্টি করিয়াছেন, সুন্দর ও সুসজ্জিতভাবে সৃষ্টি করিয়াছেন।

বুলবুলের মিষ্টি কণ্ঠ বনাম কাক-চিলের চেঁচামেচি

সন্দেহ নাই, প্রকৃতির এমন সব দানও রহিয়াছে, বাহ্যত যাহাতে আপনারা সৌন্দর্যের কিছুই দেখিতে পান না। আপনারা বলিবেন, বুলবুল ও কবুতরের গানের সহিত কাক ও চিলের চেঁচামেচির মিল কোথায় ? কিন্তু আপনারা ভুলিয়া যান যে, সৃষ্টির সেতারে বিচিত্র সুরের সমাবেশ ঘটা চাই। আপনাদের সুরযন্ত্রে যেরূপ উঁচু-নীচু সব ধরনের সুরই ধরা দেয়, তেমনি প্রকৃতির সেতারেও সুরের চরাই-উতরাই বিদ্যমান। তাহাতে সব চাইতে সূক্ষ্ম ও হাল্কা সুরও আছে, আবার সবচাইতে রুক্ষ্ম ও মোটা সুরও রহিয়াছে ! এই সব সুর মিলাইয়া গানের সুরমাধুরী আত্মপ্রকাশ করে। কারণ দুনিয়ার আর সব বস্তুর মত গানের প্রকৃতিও বিভিন্ন মৌলিক উপাদানের সংমিশ্রণে গঠিত। শুধুমাত্র একটি সুর কখনো সেই সুর মাধুরী সৃষ্টি করিতে পারে না। যদি আপনি সেতার তুলিয়া শুধু উচ্চ সুরটি ছড়াইতে থাকেন কিংবা পিয়ানোর ভারী আওয়াজের বিকাশ ঘটাইতে থাকেন, তাহা হইলে তাহাতে সুর মাধুরীর বদলে কর্কশ সুরই শুনিতে

পাইবেন। প্রকৃতির সংগীতলীলারও এই অবস্থা। আপনারা কাকের কা কা ও চিলের চিৎকারের ভিতরে আর্কষণীয় কিছু দেখিতে পাইবেন না ঠিকই কিন্তু প্রকৃতির সংগীতযন্ত্রের চরাই-উতরাই সৃষ্টির জন্য কোকিল ও কাক উভয়ের সুরের প্রয়োজন রহিয়াছে। হাল্কা সুরের জন্য বুলবুল ও কবুতর এবং ভারী সুরের জন্য কাক ও চিল প্রকৃতির জন্য অপরিহার্য।

بر اهل ذوق در فیض در نمی بندد !
نواے بلبل اکر نیست صوت زغ شنو !

সঙ্গীত পিপাসুর জন্য সঙ্গীতের দ্বার রুদ্ধ হয় না,
বুলবুলের সুর না মিলিলে কাকের স্বরই শ্রবণ কর !

تُسَبِّحُ لَهُ السَّمٰوٰتُ السَّبْعُ وَالْاَرْضُ وَ مَنْ فِيْهِنَّ - وَاِنْ مِّنْ شَيْءٍ اِلَّا يُسَبِّحُ بِحَمْدِهٖ وَلٰكِنْ لَّا تَفْقَهُوْنَ تَسْبِيْحَهُمْ - اِنَّهٗ كَانَ حَلِيْمًا غَفُوْرًا - (١٧ : ٤٤)

সাত আসমান ও যমীন আর তাহার ভিতরকার সব কিছুই (প্রত্যেকের গঠন-কৌশল ও শিল্প-বৈশিষ্ট্যের জন্য) আল্লাহ্‌র শ্রেষ্ঠত্ব ও পবিত্রতা (বাস্তব ভাষায়) স্বীকার করিতেছে এবং (শুধু তাহাই নহে, পরন্তু, নিখিল সৃষ্টির মধ্যে) কোন কিছুই এমন নাই, যাহা (নিজ অবস্থার ভিতর দিয়া) তাঁহার সপ্রশংস পবিত্রতা ও মহিমা ঘোষণা করে না। কিন্তু (আক্ষেপ !) তোমরা (স্বীয় মূর্খতার কারণে) উহাদের পবিত্রতা ও মহিমা ঘোষণা বুঝিতে পার না। নিশ্চয়ই আল্লাহ্ তা'আলা সহনশীল ও ক্ষমাশীল। (—সূরা বনী ইসরাঈল : আয়াত ৪৪)

প্রকৃতির রূপসজ্জা ও আল্লাহ্‌র রহ্‌মতের দান

আসুন, কয়েক মুহূর্তের জন্য পিছনে ফেলিয়া আসা প্রশ্নগুলি আরেকবার ভাবিয়া দেখি। প্রকৃতির এত সব রূপসজ্জা ও জাঁকজমক কেন ? কেন বিশ্ব প্রকৃতি স্বয়ং সুন্দর এবং তাহা হইতে যাহা কিছু প্রকাশ পায়, সবই সুন্দর দেখায় ? রঙের ঝলক, ঘ্রাণের মাদকতা ও সুরের প্রাণ-চাঞ্চল্য ছাড়া কি এই সৃষ্টির কারখানাটি চলিত না ? প্রান্তরের শ্যামলতা ও ফুলের রূপসজ্জা এবং বুলবুলের সঙ্গীত লহরী ছাড়া কি অন্য সব নিয়া সৃষ্টি অপূর্ণ থাকিত ? বিশ্ব সৃষ্টির প্রয়োজনে নিশ্চয়ই ইহার গুরুত্ব আদৌ নাই যে, হরেক রঙের পালকবিশিষ্ট বিচিত্র রঙের পাখিগুলি গাছের শাখায় নানা সুরের ঝঙ্কার তুলিতে থাকিবে। ইহাও হইতে পারিত যে, রঙিন ফুল, সবুজ পাতা, ধারা বাহিকভাবে সাজানো শাখা-প্রশাখা আন্দাজমাফিক প্রসারতা ও উচ্চতা ছাড়াই গাছ সৃষ্টি হইত। কেন সব প্রাণী নিজ নিজ অবস্থা ও পরিবেশ অনুসারে দেহ ও অঙ্গ-প্রত্যঙ্গের

প্রয়োজনীয় গড়ন পাইয়া থাকে ? কেন প্রত্যেক বস্তুর কোন না কোন বৈশিষ্ট্য দেখা দেয় ?

মানুষের জ্ঞানের সীমারেখা এখনও সৃষ্টির সহিত সৌন্দর্যের সংযোগ ব্যাপারটির তত্ত্বকথাটি পর্যন্ত গিয়া পৌঁছে নাই। কিন্তু কুরআন বলিতেছে,এই সব তো এইজন্য ঘটিতেছে যে, নিখিল সৃষ্টির মহান স্রষ্টা রহীম ও রহ্‌মান। অর্থাৎ ইহাই রহ্‌মত এবং রহমতের স্বভাবই হইল বিকাশ লাভ ও ফলপ্রসূ হওয়া। রহ্‌মত চায় দান, অবদান, মহানুভবতা ও ঔদার্য। তাই রহ্‌মত একদিকে আমাদিগকে জীবন ও জীবনের সব অনুভূতি উপলব্ধি দান করে, যদ্দ্বারা আমরা সুন্দর ও কুৎসিতের পার্থক্য বুঝিয়া সৌন্দর্যমুগ্ধ হই। অন্যদিকে সৃষ্টির কারখানাটিকে স্বীয় রূপমাধুরী ও প্রাণ-চাঞ্চল্য দ্বারা এরূপ সাজাইয়া রাখিয়াছে যে, আমরা যেদিকেই তাকাই, তাহা যেন দর্শকের জন্য জান্নাত, শ্রোতার জন্য মাধুরীময় ও প্রাণের জন্য তৃপ্তিদায়ক হইয়া দেখা দেয়।

فَتَبَارَكَ اللّٰهُ اَحْسَنُ الْخَالِقِيْنَ –

আর কত পবিত্র সেই আল্লাহ্—তিনিই সর্বোত্তম স্রষ্টা।

প্রকৃতির দান ও অকৃতজ্ঞ মানুষ

আমরা জীবনে কৃত্রিম সুখ-স্বাচ্ছন্দ্য অর্জনের প্রয়োজনে নিজেদের এত বেশি নিয়োজিত রাখিতেছি যে, প্রকৃতিদত্ত স্বাভাবিক সুখ-স্বাচ্ছন্দ্য লাভের দিকটি নিয়া ভাবিয়া দেখার অবকাশও আমাদের মিলে না। অধিকাংশ সময়ে এমনকি আমরা তাহার আদৌ মূল্য দিতে প্রস্তুত হই না। কিন্তু কয়েক মুহূর্তের জন্যও যদি আপনি এই ঔদাসীন্য ত্যাগ করিতে পারেন, তাহা হইলে জানিতে পাইবেন যে, সৃষ্টিজগতের প্রাকৃতিক সৌন্দর্য এক বিরাট দান ছাড়া অন্য কিছুই নহে। যদি তাহা না হইত, যদি আমরা সেই সৌন্দর্য সুখের সন্ধান না পাইতাম, তাহা হইলে এ জীবন জীবন না হইয়া হয়তো অন্য কিছুতে রূপান্তরিত হইত। হয়তো মৃত্যুর দুরবস্থার একটা ধারাবহিক পথ উন্মুক্ত থাকিত।

একটি মুহূর্তের জন্য ভাবুন, পৃথিবী আছে বটে—সৌন্দর্যহীন কুৎসিৎ ! আকাশ আছে বটে—রঙহীন, অন্ধকার ! তারকা আছে বটে—দ্যুতিহীন, নিষ্প্রভ। বৃক্ষ আছে, শ্যামলতা নাই। ফুল আছে, সৌন্দর্য বা সৌরভ নাই ! বস্তুর সামঞ্জস্য নাই, আওয়াজে মিষ্টতা নাই, আলো ও রঙের মনোহর রূপ নাই। এক কথায় সবই আছে, নাই সৌন্দর্য। কিংবা তাহা আমরা বুঝিতে পারি না। ভাবিয়া দেখুন, এমন এক পৃথিবীতে জীবন যাপন করা কত ভয়াবহ ব্যাপার ! এমন এক জীবন যাহাতে না রূপ আছে, না রূপের অনুভূতি, চক্ষু তৃপ্তি পায় না, কান মাধুর্য লাভ করে না, অনুভূতি আনন্দ পায় না, নিশ্চয়ই তাহার কল্পনায়ও অসহনীয়।

কিন্তু যেই প্রকৃতি আমাদের জীবন দান করিয়াছে, জীবনের প্রয়োজনে সে সৌন্দর্য দান করাকে অপরিহার্য ভাবিয়াছে। এক দিকে সে আমাদিগকে সৌন্দর্যবোধ দান

করিয়াছে, অপরদিকে গোটা পৃথিবীকে সৌন্দর্য নিকেতনে পরিণত করিয়াছে। এই সত্যটিই আমাদিগকে 'রহমত' সম্পর্কে অবহিত রাখিয়াছে। যদি সৃষ্টিজগতের অন্তরালে শুধু স্রষ্টাই থাকিতেন, তাঁহার রহ্‌মত না থাকিত, সৃষ্টি হইবার বা করার একটি শক্তি মাত্র থাকিত, সুন্দর ও কল্যাণময় করার কোন ইচ্ছা সেখানে সক্রিয় না থাকিত তাহা হইলে কিছুতেই বিশ্বব্যাপী এত সুন্দর অবদানের প্রকাশ ঘটিত না।

اَلَمْ تَرَوْا اَنَّ اللّٰهَ سَخَّرَ لَكُمْ مَّا فِى السَّمٰوٰتِ وَمَا فِى الْاَرْضِ وَاَسْبَغَ عَلَيْكُمْ نِعَمَهٗ ظَاهِرَةً وَّ بَاطِنَةً - وَمِنَ النَّاسِ مَنْ يُّجَادِلُ فِى اللّٰهِ بِغَيْرِ عِلْمٍ وَّ لَا هُدًى وَّ لَا كِتٰبٍ مُّنِيْرٍ - (٣١ : ٢٠)

—তোমরা কি কখনো এই কথাটি ভাবিয়া দেখ নাই যে, আকাশমণ্ডলী ও পৃথিবী জুড়িয়া যাহা কিছু আছে, সব কিছুই আল্লাহ্ তোমাদের আয়ত্তাধীন করিয়া দিয়াছেন এবং তিনি তাঁহার প্রকাশ্য ও অপ্রকাশ্য সব অবদানই পূর্ণ করিয়া দিয়াছেন। একদল মানুষ না জানিয়াই আল্লাহ্ সম্বন্ধে ঝগড়া করে অথচ তাহাদের না আছে শিক্ষা, না আছে দীক্ষা, না আছে কোন দীপ্তিমান কিতাব। (—সূরা লুকমান : আয়াত ২০)

মানুষের একটা স্বাভাবিক ত্রুটি এই—যতক্ষণ কোন নিয়ামত তাহাদের তাহছাড়া না হয়, ততক্ষণ তাহারা উহার সঠিক মূল্য দিতে চায় না। আপনি গঙ্গা নদীর তীরে বাস করেন বলিয়াই আপনার কাছে পানির দাম নাই অথচ যদি আপনি এমন জায়গায় চলিয়া যান, যেখানে চব্বিশ ঘণ্টায়ও এক বিন্দু পানি পাইবার সম্ভাবনা না থাকে, তখনই টের পাইবেন যে, পানি কত অমূল্য বস্তু। প্রকৃতির সৌন্দর্য-অবদানেরও এই দর্শা। উহার ব্যাপক ও অকৃপণ প্রভা দিন-রাত আমাদের সামনে আসা-যাওয়া করিতেছে বলিয়া উহার যথাযথ মূল্যায়ন আমাদের দ্বারা সম্ভবপর হইতেছে না। ঊষা প্রত্যহ সুসজ্জিত হইয়া আমাদের সামনে হাযির হয় বলিয়া আমরা সেই দিকে মাথা তুলিয়া দেখিবার প্রয়োজন ভাবি না। পূর্ণ চাঁদ জ্যোৎস্নার মাধুরী লইয়া প্রত্যেক রাত্রে আমাদের দুয়ারে হানা দেয় বলিয়া আমরা দুয়ার বন্ধ করিয়া অঘোরে নিদ্রা যাইতে দ্বিধা বোধ করি না। যদি ইহা আমাদের জন্য দুষ্প্রাপ্য হইত কিংবা আমরা দৃষ্টিশক্তি অথবা অনুভূতি শক্তি হারাইয়া এই নির্মল সৌন্দর্য হইতে বঞ্চিত হইতাম, তাহা হইলে বুঝিতাম যে, ইহা কত অপরিহার্য হইয়া দেখা দেয়।

যে রোগী নড়া-চড়ার শক্তি হারাইয়া শয্যায় চিৎ হইয়া পড়িয়া আছে, সে বলিয়া দিবে, আকাশের ওই নীলিমা তাহার প্রাণে কত সুখ-শান্তির অমূল্য পয়গাম পাঠাইয়া দেয়। জন্মের বেশ কিছু পরে যে চোখ হারাইয়াছে, সে বলিয়া দিবে, সূর্যের আলো ও ফুলবাগানের মনোরম দৃশ্য না দেখিয়া বাঁচিয়া থাকা কত কঠিন বিপদ।

আপনারা অনেক সময় জীবনের জন্য কৃত্রিম উপায়ে সৃষ্ট সামান্য সুখের জন্য ছট্-ফট্ করিতে থাকেন, আর ভাবিতে থাকেন, সোনা-রূপার স্তূপই সব সুখ-শান্তির মূল। কিন্তু আপনারা ভুলিয়া যান যে, জীবনে প্রকৃত আনন্দ দানের জন্য প্রকৃতি আপনা হইতে যে সব আয়োজন করিয়াছে, সোনা-রূপার স্তূপ তো দূরে, দুনিয়ায় এমন কোন্ সম্পদ রহিয়াছে যাহার বিনিময়ে তাহা কেহ সৃষ্টি করিতে পারিত ? মানুষ যদি এই অমূল্য সম্পদ অমূল্যেই পাইয়া যায়, তাহা হইলে তাহার পাবার আর কি অবশিষ্ট থাকিতে পারে ?

যে পৃথিবীতে প্রত্যহ সূর্য উজ্জ্বল হইয়া দেখা দেয়, যেখানে নিত্য হাস্য-মুখর ঊষা ও পর্দানশীন সন্ধ্যা হাযিরা দেয়, যেখানের রাত আকাশের প্রদীপমালা বুকে ধরিয়া দেখা দেয়, যেখানে চাঁদের স্নিগ্ধ আলো মায়ার জাল ছড়ায়, যেখানে শ্যামলতা ও ফুলের সৌরভে ভরপুর হইয়া বসন্ত জাগে, যেখানে ক্ষেতের শস্যশীষ হাওয়ার দোলায় তরঙ্গ তোলে, যেখানে আলোর চমক আছে, রঙের খেলা আছে, ঘ্রাণের মাদকতা আছে, গানে আছে রাগ ও সুর, সেই পৃথিবীতে কি কেহ সুখ-সম্পদ হইতে বঞ্চিত হইতে পারে ? যাহার চোখ আছে, আছে অনুভূতি শক্তি, সে কি এই দুনিয়ায় নিজেকে ব্যর্থ ও ভাগ্যাহত বলিয়া অভিযোগ তুলিবে ? কুরআন নানা জায়গায় মানুষের এই অকৃতজ্ঞতার কথাই উল্লেখ করিয়াছে ঃ

وَاٰتٰكُمْ مِّنْ كُلِّ مَا سَاَلْتُمُوْهُ - وَاِنْ تَعُدُّوْا نِعْمَتَ اللّٰهِ لَا تُحْصُوْهَا - اِنَّ الْاِنْسَانَ لَظَلُوْمٌ كَفَّارٌ -

তিনি তোমাদের প্রয়োজনীয় সব বস্তুই দান করিয়াছেন। যদি তোমরা আল্লাহ্‌র নিয়ামত গণনা করিতে চাও, তাহা অগণ্য হইবে। নিশ্চয়ই মানুষ বড় অবিচারক ও অকৃতজ্ঞ।

আভ্যন্তরীণ সৌন্দর্য

তারপর প্রকৃতির আরেকটি দিক লক্ষ করুন। প্রকৃতি যেইভাবে প্রতিটি সৃষ্টির দৈহিক সৌন্দর্য-সজ্জা দান করে, তেমনি আভ্যন্তরীণ সৌন্দর্য-সজ্জাও দান করিয়া থাকে। বাহ্যিক সৌন্দর্য বলিতে দেহের সৌষ্ঠব অঙ্গ-প্রত্যঙ্গের সামঞ্জস্য বুঝাইতেছে। আর আভ্যন্তরীণ সৌন্দর্য বলিতে প্রত্যেক বস্তুর ভিতরকার অবস্থা ও শক্তির ভিতরে সমতাকে বুঝায়। আভ্যন্তরীণ অবস্থার এই সঙ্গতি হইতেই বস্তুর বৈশিষ্ট্য ও গুণ প্রকাশ পায়। এই সমতাই প্রাণীদের ভিতরে ইচ্ছা ও অনুভূতি শক্তির স্ফুরণ ঘটায় এবং মানুষের স্তরে পৌঁছিয়া তাহাই জ্ঞান ও চিন্তার মশাল হইয়া দেখা দেয়।

وَاللّٰهُ اَخْرَجَكُمْ مِّنْ بُطُوْنِ اُمَّهٰتِكُمْ لَا تَعْلَمُوْنَ شَيْئًا - وَّ جَعَلَ لَكُمُ السَّمْعَ وَالْاَبْصَارَ وَالْاَفْئِدَةَ - لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُوْنَ -

আর আল্লাহ্‌তা'আলাই তোমাদেরকে তোমাদের মাতৃগর্ভ হইতে বাহির করেন, তোমরা তখন কিছুই বুঝিতে পাও না। তারপর আল্লাহ্ তোমাদের চক্ষু, কর্ণ ও অন্তর দান করেন, যদ্দ্বারা তোমরা দেখ, শোন ও বুঝিতে পাও। ইহা তো এইজন্য দেওয়া হইয়াছে, যেন তোমরা আল্লাহ্‌র কাছে সকৃতজ্ঞ থাক।

সৃষ্টিজগতের রহস্য ও গূঢ়তত্ত্ব অনেক—অসংখ্য। তন্মধ্যে প্রাণিজগতের প্রাণস্পন্দন ও অনুভূতি শক্তির তত্ত্বটি সর্বাপেক্ষা জটিল ও অসাধ্য সমস্যা হইয়া দেখা দিয়াছে। জীবজগতের কীটপতঙ্গ পর্যন্ত সবাই অনুভূতি শক্তির অধিকারী। আর মানুষের মগজে তো জ্ঞান ও চিন্তার মশাল প্রজ্বলিত থাকে। এই অনুভূতি-শক্তি, উপলব্ধি-শক্তি ও চিন্তাশক্তি কি করিয়া জন্ম নেয় ? জড় উপাদানে গড়া বস্তুর ভিতরে এই অজড় রত্ন কোথা হইতে আসিল ? পিপীলিকা দেখুন, উহার মস্তিষ্কের খোলস সুঁইয়ের আগা হইতে সামান্য বড় হইতে পারে। কিন্তু জড় উপাদানে গড়া এই ক্ষুদ্রতম খোলসটির ভিতরে অনুভূতি ও উপলব্ধি, পরিশ্রম ও দৃঢ়তা, ধারাবাহিকতা ও যোগাযোগ, শৃঙ্খলা ও পারিপাট্য, শিল্পচাতুর্য ও আবিষ্কার ইত্যাকার সব শক্তিরই সমাবেশ ঘটিয়াছে। ফলে, সে তাহার কর্মকুশলতা ও শিল্পচাতুর্য দ্বারা আমাদের ভিতরে যথেষ্ট বিস্ময়ের উদ্রেক করে। মৌমাছির কার্যকলাপ নিত্য আপনাদের সামনে দেখা দেয়। কোন্ বস্তু এত ক্ষুদ্র একটি মৌমাছির ভিতরে সংগঠন ও সৌন্দর্য বিধানের এরূপ সুবিন্যস্ত শক্তি সৃষ্টি করিল ?

কুরআন বলে, ইহার মূলে রহিয়াছে সেই 'রহ্‌মত' যাহা সৌন্দর্য দাবি করে। বাহ্যিক সৌন্দর্য দ্বারা যে ভাবে রহ্‌মত জগৎ পূর্ণ করিয়া দিয়াছে, তেমনি আভ্যন্তরীণ সৌন্দর্য দ্বারাও সে প্রতিটি সৃষ্টিকে ধন্য করিয়াছে।

ذٰلِكَ عَالِمُ الْغَيْبِ وَالشَّهَادَةِ الْعَزِيْزُ الرَّحِيْمُ - اَلَّذِىْ اَحْسَنَ كُلَّ شَىْءٍ خَلَقَهٗ وَ بَدَاَ خَلْقَ الْاِنْسَانِ مِنْ طِيْنٍ - ثُمَّ جَعَلَ نَسْلَهٗ مِنْ سُلٰلَةٍ مِّنْ مَّاءٍ مَّهِيْنٍ - ثُمَّ سَوّٰهُ وَ نَفَخَ فِيْهِ مِنْ رُّوْحِهٖ وَجَعَلَ لَكُمُ السَّمْعَ وَالْاَبْصَارَ وَالْاَفْئِدَةَ - قَلِيْلاً مَّا تَشْكُرُوْنَ -

—জ্ঞাত ও অজ্ঞাত সব কিছুর খবর সেই ক্ষমতাবান ও দয়ালু প্রভু রাখেন। তিনিই যাহা কিছু সৃষ্টি করিয়াছেন, সুন্দর ও সুষম করিয়া গড়িয়া তুলিয়াছেন। মানুষকে মাটি দ্বারা আরম্ভ করা তাঁহারই ক্ষমতা ও বিজ্ঞতার পরিচয় বহন করে। তারপর তাহাদের বংশানুক্রমিক বৃদ্ধির ধারা খালেস রক্ত হইতে ক্ষুদ্রতম একটি পানির বিন্দুর সাহায্যে অব্যাহত রাখিয়াছেন। অতঃপর তাহাদের সব কিছু ঠিকঠাক করিয়া দিয়া তাহাতে প্রাণ ফুঁকিয়া দিলেন। এইভাবে তাহাদের দৃষ্টি, শ্রবণ ও অনুভূতিশক্তি সৃষ্টি করিলেন। কিন্তু (মানুষের ঔদাসীন্যের প্রতি শত ধিক !) খুব কম মানুষই (আল্লাহ্‌র রহমতের জন্য) সকৃতজ্ঞ হয়।

যোগ্যতমের প্রতিষ্ঠা লাভ

সৃষ্টিজগতের সংগঠন, সৌন্দর্য ও উন্নয়ন কিছুতেই অব্যাহত গতিতে চলিত না, যদি তাহাতে উত্তমের প্রতিষ্ঠা ও অধমের বিলোপ সাধনের জন্য একটি অটল শক্তি সক্রিয় না থাকিত। এই শক্তিটি কি ? প্রকৃতি সর্বদা ছাঁটাই কার্যে ব্যস্ত রহিয়াছে। প্রতিটি ক্ষেত্রে সে কেবল উত্তম ও নিখুঁতকে অবশিষ্ট রাখে এবং ত্রুটিপূর্ণ ও ক্ষতিকর বস্তুকে বিলুপ্ত করে। আমরা প্রকৃতির এই মনোনয়ন সম্পর্কে অবহিত রহিয়াছি। আমরা উহাকে 'যোগ্যতমের প্রতিষ্ঠা রীতি' নাম দিয়াছি। ইংরাজিতে নাম দিয়াছি Survival of the fittest.

কিন্তু কুরআনে 'যোগ্যতমের প্রতিষ্ঠা' না বলিয়া 'কল্যাণের প্রতিষ্ঠা' বলা হইয়াছে। সে বলে, এই সুন্দর সুন্দর অবদানের কেবল সেই বস্তুই টিকিয়া থাকে, যাহার ভিতরে কল্যাণ নিহিত রহিয়াছে। কারণ এখানে রহ্‌মত সক্রিয় রহিয়াছে আর রহ্‌মত চায় কল্যাণ প্রতিষ্ঠিত হউক ! রহ্‌মত কখনও ক্ষতিকর কিছু সহ্য করিতে পারে না। আপনারা স্বর্ণকে অগ্নিতে ফেলিয়া দেখিয়াছেন, খারাপ যাহা কিছু লুপ্ত হইয়া খাঁটি সোনা টিকিয়া যায়। প্রকৃতির নির্বাচনও ঠিক তাই। ভাল-মন্দে বিমিশ্রিত সৃষ্টি-জগতের যাহা ভাল, তাহা টিকিয়া থাকে এবং যাহা মন্দ তাহা লোপ পায়।

اَنْزَلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً فَسَالَتْ اَوْدِيَةٌ بِقَدَرِهَا فَاحْتَمَلَ السَّيْلُ زَبَدًا رَّابِيًا - وَمِمَّا يُوْقِدُوْنَ عَلَيْهِ فِى النَّارِ ابْتِغَاءَ حِلْيَةٍ اَوْ مَتَاعٍ زَبَدٌ مِّثْلُهٗ - كَذٰلِكَ يَضْرِبُ اللّٰهُ الْحَقَّ وَالْبَاطِلَ - فَاَمَّا الزَّبَدُ فَيَذْهَبُ جُفَاءً - وَ اَمَّا مَا يَنْفَعُ النَّاسَ فَيَمْكُثُ فِى الْاَرْضِ - (١٣ : ١٧)

—আল্লাহ্ তা'আলা আকাশ হইতে পানি বর্ষণ করেন। নদী-নালাগুলি পরিমাণমত পূর্ণ হয় ! অতঃপর পানির প্লাবনে আবর্জনাগুলি ভাসাইয়া লইয়া যায়। এইভাবে অলঙ্কার গড়ার জন্য মিশ্রিত ধাতুগুলি আগুনে ফেলিয়া আবর্জনা জ্বালাইয়া খাঁটি ধাতু বাহির করা হয়। এইভাবেই আল্লাহ্ তা'আলা সত্য ও মিথ্যার উদাহরণ পেশ করেন। আবর্জনা বিলোপ হইয়া যাইবে (কারণ তাহাতে কল্যাণ নাই) শুধু কল্যাণকর বস্তুই টিকিয়া থাকিবে। (—সূরা রা'দ ঃ আয়াত ১৭)

অবকাশ ও দীর্ঘ সূত্রিতা

যদি একটু গভীর দৃষ্টিতে তলাইয়া দেখেন, প্রকৃতির কল্যাণপ্রসূ অবদানের এই তত্ত্বটি শুধু এইরূপ দুই একটি উদাহরণেই সীমিত নহে ; বরং প্রকৃতির গোটা কারখানার সব কার্যরীতিই এই ভিত্তিতে পরিচালিত হইতেছে।

আপনারা দেখিতে পাইতেছেন প্রকৃতির সব কিছুই এমনভাবে প্রকাশ পাইয়া চলিয়াছে যে, আপনি তাহাকে শুধু 'কৃপা' ও 'দান' নামে আখ্যায়িত করিতে পারেন। ইহা ছাড়া আর কিছুই বলা যায় না। যেমন, প্রকৃতির কোন কার্যবিধি হঠাৎ দেখা দেয় না। প্রকৃতি সব কিছুই ধীরেসুস্থে করে। তাহার এই ধীরেসুস্থে কাজ করার রীতিটি পৃথিবীর জন্য অবকাশ ও সুযোগের পয়গাম বহিয়া আনে। অর্থাৎ উহার প্রতিটি বিধান সুযোগের পর সুযোগ দান করিয়া অবশেষে বাস্তব রূপ পরিগ্রহ করে। তাহার প্রত্যেক কাজ ক্ষমা ও মার্জনার শেষ সীমা পর্যন্ত অপেক্ষা করে। অথচ উহার বিধান অটল। সেখানে বিন্দুমাত্র পরিবর্তন দেখা দিবে না।

مَا يُبَدَّلُ الْقَوْلُ لَدَيَّ - (٥٠ : ٢٩)

—আমার কথার রদবদল হয় না। (—সূরা কাফ : আয়াত ২৯)

এইজন্যই আপনারা মনে করেন, বিধানের এই অটল ব্যবস্থা নির্দয়তারই পরিচয় বহন করে। অথচ আপনারা এতটুকু চিন্তা করেন না, বিধান অটল হইলেও তাহা কার্যকর করার ব্যাপারে ধৈর্য, ক্ষমা ও সংশোধন প্রয়াস কতখানি অবকাশ দান করে। তাই আয়াতের শেষভাগে বলা হইয়াছে ঃ

وَمَا اَنَا بِظَلَّامٍ لِّلْعَبِيْدِ - (٥٠ : ٢٩)

—আর আমি আমার বান্দাদের প্রতি কোন জুলুম করি না। (—সূরা কাফ : আয়াত ২৯)

প্রকৃতি যদি ইচ্ছা করিত, তাহা হইলে সব অবস্থা একই সময়ে আত্মপ্রকাশ করিত। অর্থাৎ উহার অটল বিধানগুলি হঠাৎ ও তাড়াতাড়ি কার্যকর করা হইত। কিন্তু আপনারা দেখিতেছেন, সেরূপ হইতেছে না। প্রতিটি অবস্থা, প্রতিটি প্রতিক্রিয়া, প্রতিটি কর্মফল পরিণতি লাভ ও আত্মপ্রকাশের জন্য নির্দিষ্ট সময় পর্যন্ত অপেক্ষা করিতে থাকে। সেইজন্য ধীরেসুস্থে তাহা বিভিন্ন স্তর পার হইয়া আসে। প্রত্যেকটি স্তরই বিশেষভাবে পরিদৃষ্ট হয় এবং ভাবী পরিণতি সম্পর্কে ইঙ্গিত দান করিতে থাকে। জীবন ও মৃত্যুর বিধানের প্রতি লক্ষ করুন ! কিভাবে ধীরে ধীরে জীবনের বিকাশ ও লালন-পালন ঘটে। কিভাবে আবার তাহা ধাপে ধাপে বিভিন্ন মঞ্জিল অতিক্রম করিয়া অগ্রসর হইতে থাকে। তারপর মৃত্যুর, দুর্বলতার ও ক্ষয়প্রাপ্তির সুদীর্ঘ পথ কিভাবে ধীরে ধীরে গোড়া হইতে আত্মপ্রকাশ করিতে থাকে। একের পর এক বিভিন্ন মঞ্জিল অতিক্রম করিয়া অবশেষে তাহা পূর্ণত্ব প্রাপ্ত হয়। আপনারা অসতর্ক হওয়া মাত্রই মৃত্যু হঠাৎ আপনাদিগকে গ্রাস করে না ; বরং সেখান হইতে আপনার জন্য বিলুপ্তির দ্বার উন্মুক্ত হয় মাত্র। তারপর ধীরে ধীরে এক পা এক পা করিয়া আপনারা নিজেদের মৃত্যুর কোলে সঁপিয়া দেন। সকলের জন্য আবার তাহা সমান ধারায় আসে না।

গাছপালাকে দেখুন। সেইগুলি যদি প্রয়োজনীয় পানি না পায় কিংবা ক্ষতিগ্রস্ত হইবার অন্য কোন কারণ দেখা দেয়, তাহা হইলে তখনি তাহা মরিয়া যায় না। কিংবা

কোন গাছ হঠাৎ উপড়াইয়া পড়ে না। বরং ধীরে ধীরে এক নির্দিষ্ট সময় পর্যন্ত তাহা শুকাইয়া চলে। শুকাইয়াও কিছুদিন দাঁড়াইয়া থাকে। তারপর এক সময় শিকড় পচিয়া উপড়াইয়া পড়ে। এইরূপ ধারাবাহিক গতিতে তাহার চরম মৃত্যু আসে।

কুরআনের পরিভাষায় 'আজাল'

সৃষ্টির সকল পরিবর্তন ও পরিণতির ধারা ইহাই। এমন কোন পরিবর্তন আসে না, যাহা ধারাবাহিকতা রক্ষা করে না। সব কিছুই ধীরে ধীরে আত্মপ্রকাশ করে, আবার ধীরে ধীরে লোপ পায়। ভাঙা বা গড়া কোনটিই একটি নির্দিষ্ট সময় পর্যন্ত অপেক্ষা না করিয়া পূর্ণত্ব প্রাপ্ত হয় না। সব কিছুর জন্য নির্ধারিত এই সময়টিকে কুরআনের পরিভাষায় 'আজাল' অর্থাৎ 'নির্দিষ্ট কাল' বলা হয়। ইহা বিভিন্ন ক্ষেত্রে ভিন্ন ভিন্ন অবস্থায় আলাদা রূপ ধারণ করে। কোন কোন ক্ষেত্রে উহা এত দীর্ঘ হইয়া দেখা দেয় যে, আমরা আমাদের জন্য নির্ধারিত সময়ের ভিতরে তাহা দেখিয়া যাইতে পারি না। কুরআন তাহা এইভাবে বুঝাইয়া থাকে যে, যেই দিনটিকে তোমরা এক হাজার কিংবা পঞ্চাশ হাজার বছর বলিয়া ভাবিবে, সেইরূপ দিনের সমন্বয়ে যেই মাস ও বৎসর দেখা দিবে, তাহার হিসাব তোমরা কি করিয়া কষিবে ?

وَاِنَّ يَوْمًا عِنْدَ رَبِّكَ كَاَلْفِ سَنَةٍ مِّمَّا تَعُدُّوْنَ - (٢٢ : ٤٧)

নিশ্চয়ই তোমাদের হাজার বছর তোমাদের প্রতিপালকের কাছে একদিন সমতুল্য। (—সূরা হজ্জ : আয়াত ৪৭)

তাক্‌ভীর

প্রকৃতির এই ধীরে সুস্থের কার্যরীতিকে কুরআনের পরিভাষায় 'তাক্‌ভীর' বলা হয়। 'তাক্‌ভীর' অর্থ কোন কিছু ধীরে ধীরে আচ্ছাদন করা ! কুরআন বলে, দিনের আলো হঠাৎ দেখা দেয় না আর রাত্রের আঁধারও হঠাৎ ঝাঁপাইয়া পড়ে না। প্রকৃতি দিন ও রাত্রির আত্মপ্রকাশকে এরূপ ধারাবাহিকভাবে রূপদান করিতেছে, যেন রাত্র ধীরে ধীরে আসিয়া দিনকে আচ্ছাদন করিয়া নেয়। তেমনি দিনও ধীরে ধীরে আসিয়া রাত্রকে আচ্ছাদন করে।

خَلَقَ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضَ بِالْحَقِّ يُكَوِّرُ الَّيْلَ عَلَى النَّهَارِ وَيُكَوِّرُ النَّهَارَ عَلَى الَّيْلِ وَسَخَّرَ الشَّمْسَ وَالْقَمَرَ - كُلٌّ يَّجْرِىْ لِاَجَلٍ مُّسَمًّى - (٣٩ : ٥)

আল্লাহ্ তা'আলা শূন্যমণ্ডলী ও পৃথিবীকে অত্যন্ত বিজ্ঞতার সহিত যথাযথভাবে সৃষ্টি করিয়াছেন। তিনি দিন ও রাত্রকে ক্রমাগত এমনভাবে আসার ব্যবস্থা করিয়াছেন যে, রাত আসিয়া দিনকে জড়াইয়া ও দিন আসিয়া রাতকে জড়াইয়া

নেয়। তেমনি চন্দ্র-সূর্যকে তিনি এক বিশেষ পদ্ধতিতে স্থাপন করিয়াছেন। সবই নিজ নিজ পথে নির্ধারিত সময়ের মধ্যে চলাচল করে। (—সূরা যুমার : আয়াত ৫)

কুরআন এই ধীরে-সুস্থের কার্যধারাকে সুযোগ দান, ক্ষমা ও মার্জনা এবং নির্দিষ্ট কাল পর্যন্ত জীবনের অবকাশ প্রদান বলিয়া অভিহিত করিয়াছে। সে ইহার কারণ দর্শাইয়া বলে, যেহেতু সৃষ্টিজগতের ভিতরে দান ও অনুগ্রহ ইহাই চাহে যে, প্রত্যেক ভুল-ভ্রান্তির সংশোধনের জন্য, প্রত্যেক ত্রুটি-বিচ্যুতির প্রতিকারের জন্য, প্রত্যেক স্খলন-পতনকে সামলাইয়া নিবার জন্য যত বেশি সম্ভব সময় পাইতে থাকা উচিত। এই সুযোগ হইতে কাহাকেও বঞ্চিত করা যেন না হয়।

কুরআন বলে, দীর্ঘ সূত্রিতা ও অবকাশের এই সুযোগ ও অনুগ্রহ যদি না থাকিত, তাহা হইলে পৃথিবীতে কোন মানুষই জীবনের অবকাশ হইতে উপকার লাভ করিত না। সব ভুল, সব দুর্বলতা, সব ত্রুটি, সব অন্যায় হঠাৎ ধ্বংসের কারণ হইয়া দেখা দিত।

وَلَوْ يُؤَاخِذُ اللّٰهُ النَّاسَ بِمَا كَسَبُوْا مَا تَرَكَ عَلَى ظَهْرِهَا مِنْ دَابَّةٍ وَّ لٰكِنْ يُّؤَخِّرُهُمْ اِلٰى اَجَلٍ مُّسَمًّى - فَاِذَا جَاءَ اَجَلُهُمْ فَاِنَّ اللّٰهَ كَانَ بِعِبَادِهٖ بَصِيْرًا - (٣٥ : ٤٥)

—অনন্তর মানুষ স্বীয় কার্যকলাপ দ্বারা যে পরিমাণ ফল উপার্জন করে, যদি আল্লাহ্‌তা'আলা সঙ্গে সঙ্গে তাহা বাস্তবায়ন করেন, তাহা হইলে বিশ্বাস কর, পৃথিবীতে একটি প্রাণীও বাঁচিতে পারিত না। কিন্তু (ইহা তাঁহার অনুগ্রহ যে) তিনি এক নির্দিষ্ট সময় পর্যন্ত জীবনের অবকাশ দান করিয়া রাখিয়াছেন। অবশ্য যখন সেই নির্দিষ্ট সময় উপস্থিত হইবে, (জানিয়া রাখ) তখনকার কথা ভিন্ন। আল্লাহ্ তা'আলা নিশ্চয়ই বান্দার কার্যকলাপ সম্পর্কে উদাসীন নহেন। তাঁহার দৃষ্টিতে প্রত্যেক মুহূর্তের প্রত্যেকটি ব্যাপারের সব কিছুই ধরা পড়ে। (—সূরা ফাতির : ৪৫)

স্বভাবত এই অবকাশ ও দীর্ঘসূত্রিতা ভাল ও মন্দ—সবার বেলায়ই সমানভাবে দেখা দেয়। ভালকে পুরোপুরি পরিণতি লাভের জন্য ও মন্দকে সংশোধনের জন্য সুযোগ দান করা হয়।

كُلًّا نُّمِدُّ هٰؤُلَاءِ وَ هٰؤُلَاءِ مِنْ عَطَاءِ رَبِّكَ - وَمَا كَانَ عَطَاءُ رَبِّكَ مَحْظُوْرًا - (١٧ : ٢٠)

—ইহাদের এবং উহাদের (ভাল ও মন্দ) সবাই তোমার প্রতিপালকের দানে ধন্য হয়। তোমার প্রতিপালকের দানের দুয়ার কাহারও জন্য বন্ধ হয় না। (—সূরা বনি ইসরাঈল : ২০)

যদি প্রকৃতির বিধানের এই অবকাশকে কাজে লাগাইয়া ত্রুটি-বিচ্যুতির সংশোধন করা হয় অর্থাৎ কেহ যদি অসতর্কতা ছাড়িয়া সঠিক কার্যধারা অনুসরণ করে, তাহা হইলে প্রকৃতি তাহা মানিয়া লয় এবং অসতর্কতার ফলে যে অশুভ পরিণতি সৃষ্টি হইতেছিল, সহসা তাহা বন্ধ হইয়া যায়। শুধু তাহাই নহে, যদি যথাসময়ে যথাযথভাবে ভ্রম সংশোধন ঘটে, তাহা হইলে অতীতের কৃতকর্মের ফলে যে অনিবার্য ক্ষতির আশঙ্কা দেখা দিয়াছিল, তাহা এরূপভাবে লোপ পায়, যেন তাহা আদৌ সৃষ্টি হইয়াছিল না। কিন্তু যদি প্রকৃতিদত্ত এই সুযোগের সদ্ব্যবহার করা না হয়, বারংবার ধাপে ধাপে সুযোগ পাইয়াও তাহা ব্যর্থ করা হয়, তাহা হইলে অবশ্যই উহার চূড়ান্ত পরিণাম আত্মপ্রকাশ করিবে। আর যখন তাহা আত্মপ্রকাশের চরম মুহূর্ত দেখা দেয় তখন আর তাহাতে বিলম্ব কিংবা পরিবর্তন ঘটে না।

فَاِذَا جَاءَ اَجَلُهُمْ لاَ يَسْتَاْخِرُوْنَ سَاعَةً وَّ لاَ يَسْتَقْدِمُوْنَ –

—তারপর যখন তাহাদের জন্য নির্ধারিত সময় আসিয়া উপস্থিত হইবে, তখন তাহা এক মূহূর্তও আগ-পিছ হইবে না (অর্থাৎ ঠিক সময়ে ব্যাপারটি আত্মপ্রকাশ করিবে।) (—সূরা নহল : আয়াত ৬১)

জীবনের শান্তি

জীবন-সংগ্রাম

খাইয়া-পরিয়া কোথাও মাথা গুঁজিয়া মান-ইয্যত লইয়া বাঁচিয়া থাকার জন্য যে প্রতিনিয়ত সংগ্রাম করিয়া চলিতে হয়, সেইটাই মানুষের জীবন। সংগ্রামই জীবন। তাই প্রকৃতির সর্বত্র কন্টকাকীর্ণ। মোটামুটিভাবে দেখিতে গেলে সদা ব্যস্ততা ও ক্রমাগত সংগ্রামেই জীবনের প্রকৃত রূপ ধরা পড়ে।

لَقَدْ خَلَقْنَا الْاِنْسَانَ فِىْ كَبَدٍ – (٩ : ٤)

—নিশ্চয়ই মানুষের জীবনকে কন্টকাকীর্ণ করিয়া রাখা হইয়াছে। (–সূরা বালাদ : ৪)

তথাপি, প্রকৃতি জীবিকার কারখানাটি এরূপ ঢঙে গড়িয়া দিয়াছে এবং জীবের স্বভাবে এরূপ বাসনা-কামনা ও আকর্ষণ-উত্তেজনা মিশাইয়া দিয়াছে যে, জীবজগতের সর্বত্রই কর্মচাঞ্চল্য ও সংগ্রামমুখরতা অব্যাহত গতিতে চলিয়াছে। জীবের এই প্রকৃতিদত্ত স্বভাব তাহাদের শুধু কর্মব্যস্তই রাখে না, পরন্তু উহার ভিতরে তাহারা প্রচুর আনন্দ ও উৎসাহ-উদ্দীপনা লাভ করে। পরিশ্রম যত বাড়িয়া যায়, আকর্ষণ-উত্তেজনা তাহাদের ততই বাড়িয়া চলে। যদি কোন মানুষ বেকার হইয়া পড়ে, তাহার মনে হয় যেন জীবনের সব আনন্দ-উদ্দীপনা হইতে সে বঞ্চিত হইল। তখন বাঁচিয়া থাকাই তাহার পক্ষে বোঝাস্বরূপ মনে হয়।

আবার দেখুন, সৃষ্টির কারখানার কী এক আশ্চর্যলীলা যে, ক্ষেত্র ভিন্ন, পাত্র ভিন্ন , কাজ ভিন্ন, অবস্থা ভিন্ন, উদ্দেশ্য ভিন্ন, অথচ জীবনের আকর্ষণ ও কর্মচাঞ্চল্য সর্বত্র একই রূপ অনূভূত হইতে থাকে ! নর-নারী, বালক-যুবক, আমীর-ফকীর, আলিম-জাহিল, সবল-দুর্বল, রুগ্ন-সুস্থ, নিঃসঙ্গ-সসঙ্গ, গর্ভবতী-স্তন্যদাত্রী ইত্যাদি সবাই নিজ নিজ কাজে গভীরভাবে ব্যস্ত রহিয়াছে। কেহই নিজকে কর্মমুক্ত পাইতেছে না। আমীর তাহার সুখ-স্বাচ্ছন্দ্যের জীবনে ও ফকীর তাহার দুঃখ-দুর্দশার জীবনে সমানভাবেই কাজের প্রতি আকর্ষণ অনুভব করিতেছে। কে যে বেশি কাজ করিতেছে আর কে বা কম কাজ করিতেছে, তাহা কেহ বলিতে পারে না। একজন ব্যবসায়ী যতখানি গুরুত্ব সহকারে নিজের লক্ষ টাকার আমদানি হিসাব করিয়া থাকে, ততখানি গুরুত্ব লইয়াই একজন শ্রমিক তাহার সারাদিনের পারিশ্রমিকটুকু হিসাব করিয়া লয়। উভয়ের কাছেই জীবনটি সমান প্রিয়। একজন বিজ্ঞানীকে দেখুন, জ্ঞান চর্চা ও গবেষণায় কী ভাবে নিমগ্ন থাকিতেছেন। পক্ষান্তরে একজন চাষী দুপুর বেলা রৌদ্রের ভিতরে খালি মাথায় ততখানি মনোযোগের সহিত হাল জুড়িতেছে। এখন বলুন, জীবন-সংগ্রামে কাহার আকর্ষণ কম বা বেশি ?

আবার দেখুন, সন্তান জনক-জননীর জন্য কতখানি মারাত্মক বিপদের ব্যাপার হইয়া দেখা দেয়। সন্তান প্রতিপালন ও রক্ষণাবেক্ষণ জনক-জননীর নিজের উপার্জিত দুঃখ-কষ্টের এক সুদীর্ঘ অধ্যায় হইয়া দাঁড়ায়। তথাপি এই সম্পূর্ণ ব্যাপারটিকে এরূপ আগ্রহ ও উৎসাহব্যঞ্জক করিয়া রাখা হইয়াছে যে, প্রত্যেক নারীর ভিতরেই জননী হইবার আকাঙ্ক্ষাটি স্বাভাবিক হইয়া দেখা দেয়। প্রত্যেক মাতাই সন্তান প্রতিপালন ও রক্ষণাবেক্ষণের ব্যাপারে আপনভোলা সাজে। সে জীবনের প্রচণ্ডতম যাতনা সহ্য করিতে গিয়াই সবচাইতে আনন্দ লাভ করে ! সে যখন নিজ জীবনের সব আরাম-আয়েশ কুরবান করিয়া নিজের প্রতিবিন্দু রক্ত দুধরূপে সন্তানকে পান করাইয়া চলে, তখন তাহার হৃদয়ের প্রতিটি তন্ত্রী যেন জীবনের সব চাইতে আনন্দকর উপলব্ধিতে নাচিয়া উঠে।

আবার প্রকৃতির লীলাখেলার এই দিকটি লক্ষ করুন যে, বিক্ষিপ্ত ও স্বতন্ত্র মানুষ কিভাবে সামাজিক বন্ধনে আবদ্ধ হইয়া একত্রে জীবন যাপন করিতেছে। প্রকৃতি কিভাবে অসংখ্য মানুষকে আত্মীয়তার বন্ধনে জুড়িয়া রাখিয়াছে।

ধরুন, জীবন ও জীবন-সংগ্রামের ক্ষেত্রে এই আকর্ষণ-অনুপ্রেরণা নাই। তখন কি অবস্থা দাঁড়াইত ? কিন্তু কুরআন বলে, তাহা হইতে পারে না। কারণ সৃষ্টিজগতের ভিতরে রহ্‌মত সক্রিয় রহিয়াছে এবং রহ্‌মত ইহাই চায়। কষ্টের ভিতরে আরাম, দুঃখের ভিতরে আনন্দ, কঠিনের ভিতরে কোমলতা সৃষ্টি রহ্‌মতেরই লীলাখেলা।

বস্তুত, কুরআনে জীবনের শান্তি সম্পর্কে বিভিন্ন দিক হইতে বিভিন্ন ভাবে দৃষ্টি আকর্ষণ করা হইয়াছে। তাহার ভিতরে সৃষ্টির বৈচিত্র্য অন্যতম। মানুষ একঘেয়েমিতে

বিরক্তি বোধ করে। ইহাই মানুষের স্বভাবগত বৈশিষ্ট্য। বৈচিত্র্যেই মানুষের আনন্দ। তাই প্রকৃতির সর্বত্রই এই বৈচিত্র্যের আয়োজন দেখা যায়। কালের বৈচিত্র্য, ঋতুর বৈচিত্র্য ও বিভিন্ন সৃষ্টির বৈচিত্র্যের ভিতরে মানুষের জীবনে আনন্দ ও শান্তি দানও অন্যতম উদ্দেশ্য।

گاهائے رنگ رنگ سے هے زینت چمن !
اے ذوق اس جهاں میں هے زیب اختلاف سے !!

রঙ্ বে-রঙের ফুল সেজে হয় গুলবাগ মনোরম,
বৈচিত্র্যের সমারোহে তাই ধাখরানি অনুপম।

বস্তুত, এই ব্যাপারে কুরআন রাত ও দিনের পার্থক্যটি উল্লেখ করিয়াছে। কুরআন বলিতেছে, যদি তোমরা কিছুটা চিন্তা খরচ কর, তাহা হইলে দেখিবে, ইহার ভিতরে খোদায়ী কারিগরির কত বড় নিদর্শন নিহিত রহিয়াছে। রাত-দিনের আসা যাওয়ায় দুইটি পৃথক অবস্থা সৃষ্টি করে। নির্দিষ্ট সময়ে সুনিয়ন্ত্রিতভাবে তাহাদের অদল-বদল ঘটে। জীবনের জন্য স্বস্তি ও শান্তির কারণ হইয়া দেখা দেয়। যদি সময়ের এই আলো-আঁধারের বৈচিত্র্য না থাকিত তাহা হইলে পৃথিবীতে বসবাস করা খুবই কঠিন হইয়া দাঁড়াইত। মেরু অঞ্চলের যেখানে দিন-রাতের এই পার্থক্যটুকু অনুভূত হয় না, সেখানে যদি আপনারা যান তাহা হইলে অবশ্যই বুঝিতে পারিবেন যে, দিন-রাতের এই পার্থক্যটুকু জীবন ধারণের জন্য কত বড় একটি নিয়ামত !

اِنَّ فِىْ خَلْقِ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ وَاخْتِلَافِ الَّيْلِ وَالنَّهَارِ لَاٰيٰتٍ لِّاُوْلِى الْاَلْبَابِ - (٣ : ١٩)

—নিশ্চয়ই আকাশ ও পৃথিবীর সৃজনকার্যের ভিতরে এবং দিন ও রাত্রির পর পর আগমনের ভিতরে জ্ঞানীদের জন্য (আল্লাহ্‌র কারিগরির) বিরাট নিদর্শন রহিয়াছে। (—সূরা আলে 'ইমরান : ১৯০)

রাত-দিনের পার্থক্য মানুষের জীবন ব্যবস্থাকে দুই ভাগে ভাগ করিয়াছে। দিনের আলো মানুষের ভিতরে সংগ্রাম-সাধনার প্রেরণা যোগায় এবং রাত্রির অন্ধকার অবকাশ ও আরামের বিছানা পাতিয়া দেয়। প্রতিটি দিনের শ্রান্তির পরে রাত্রির শান্তি দেখা দেয় এবং প্রত্যেক রাত্রির বিশ্রামের পর নূতন দিনের নবীন উদ্দীপনা দেখা দেয়।

وَمِنْ رَّحْمَتِهٖ جَعَلَ لَكُمُ الَّيْلَ وَالنَّهَارَ لِتَسْكُنُوْا فِيْهِ وَلِتَبْتَغُوْا مِنْ فَضْلِهٖ وَ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُوْنَ - (٢٨ : ٧٣)

—আর (দেখ) ইহাও তাঁহারই রহ্‌মতে তোমাদের জন্য রাত্র ও দিনকে তিনি আলাদাভাবে নির্ধারিত করিয়া দিয়াছেন। তোমরা যেন রাত্রে বিশ্রাম নিয়া ও দিনে

আল্লাহ্‌র দান কুড়াইয়া (জীবিকা সংগ্রহ করিয়া) তাঁহার কৃতজ্ঞতা প্রকাশে তৎপর থাক। (—সূরা কাসাস : ৭৩)

তারপর দেখুন, পার্থক্য শুধু রাত্র ও দিনেই নয়, বরং দিন-রাত্র প্রত্যেকেরই আবার অভিন্ন অবস্থা দেখা যায়। প্রত্যেকটি অবস্থারই আবার বিশেষত্ব রহিয়াছে। ঊষা নিজ বৈশিষ্ট্যে আত্মপ্রকাশ করে ও বৈকাল নিজ স্বাতন্ত্র্যে প্রকাশমান। সময়ের এই দৈনন্দিন বৈচিত্র্য আমাদের অনুভূতি জগতের রুচির পরিবর্তন ঘটাইতে থাকে। একঘেয়েমির অবসাদ দূর করিয়া বৈচিত্র্য ও নূতনত্বের আনন্দ ও উৎসাহের সঞ্চার করে।

فَسُبْحٰنَ اللّٰهِ حِيْنَ تُمْسُوْنَ وَحِيْنَ تُصْبِحُوْنَ - وَلَهُ الْحَمْدُ فِى السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ وَعَشِيًّا وَّ حِيْنَ تُظْهِرُوْنَ - (٣٠ : ١٧ - ١٨)

সুতরাং তোমরা আল্লাহ্‌র পবিত্রতা ও মহিমা ঘোষণা কর সন্ধ্যায় ও সকালে এবং অপরাহ্নে ও জুহরের সময়ে, আর আকাশ মণ্ডলী ও পৃথিবীতে সকল প্রশংসা তো তাঁহারই। (—সূরা রূম : আয়াত ৭)

প্রাণিজগতে বৈচিত্র্য

মানুষ স্বয়ং নিজের এবং অন্যান্য প্রাণীর দিকে দৃষ্টিপাত করিলে দেখিতে পাইবে নানাবিধ বৈচিত্র্যের সমাবেশে তাহা কত আকর্ষণীয় হইয়া ধরা দিয়াছে।

وَمِنَ النَّاسِ وَالدَّوَابِّ وَالْاَنْعَامِ مُخْتَلِفٌ اَلْوَانُهٗ - (٣٥ : ٢٨)

—মানুষ, জীব-জন্তু ও গৃহপালিত পশুকে বিভিন্ন রূপ দান করা হইয়াছে। (—সূরা ফাতির : আয়াত ২৮)

গাছপালার বৈচিত্র্য

উদ্ভিদ জগতের দিকে দৃষ্টিপাত করুন। গাছপালাগুলির আকার-আকৃতি, রঙ-ঢঙ, ফুল-ফল, ঘ্রাণ ইত্যাদি সবকিছুতেই বৈচিত্র্য রহিয়াছে।

اَوَلَمْ يَرَوْا اِلَى الْاَرْضِ كَمْ اَنْۢبَتْنَا فِيْهَا مِنْ كُلِّ زَوْجٍ كَرِيْمٍ - (٢٦ : ٧)

—তাহারা কি কখনো ভূপৃষ্ঠের উপরে দৃষ্টিপাত করিয়া দেখিতে পায় নাই যে, আমি জোড়া জোড়া উত্তম গাছপালা কত অসংখ্য সৃষ্টি করিয়া দিয়াছি ? (—সূরা শু'আরা : আয়াত ৭)

وَمَا ذَرَاَ لَكُمْ فِى الْاَرْضِ مُخْتَلِفًا اَلْوَانُهٗ - اِنَّ فِىْ ذٰلِكَ لَاٰيَةً لِّقَوْمٍ يَّذَّكَّرُوْنَ - (١٦ : ١٣)

—আর (দেখ) আল্লাহ্ তা'আলা তোমাদের জন্য বিভিন্ন রঙের শস্য পৃথিবীর বুকে উৎপন্ন করিয়া দিয়াছেন। নিশ্চয়ই এইগুলির ভিতরে চিন্তাশীলদের জন্য (আল্লাহ্র) নিদর্শন রহিয়াছে। (—সূরা নহল : আয়াত ১৩)

وَهُوَ الَّذِىْ اَنْشَا جَنّٰتٍ مَّعْرُوْشٰتٍ وَّ غَيْرَ مَعْرُوْشٰتٍ وَّ النَّخْلَ وَالزَّرْعَ مُخْتَلِفًا اُكُلُهٗ -(٦ : ١٤١)

—সেই (বিজ্ঞ ও ক্ষমতাবান) প্রভুই (বিচিত্র ধরনের) বাগ-বাগিচা সৃষ্টি করিয়া দিয়াছেন। তাহার কতকগুলি উপত্যকায় ও কতকগুলি সমতল ভূমিতে অবস্থিত। ইহার ভিতরে খেজুর গাছ ও নানা ধরনের শস্য ও ফলের গাছে বিভিন্ন রঙের ও ভিন্ন ভিন্ন স্বাদের ফল দেখা যায়। (—সূরা আন'আম : আয়াত ১৪১)

জড় জগৎ

শুধু জীবজগৎ ও প্রাণিজগৎ কেন, জড় বস্তুর ভিতরেও প্রকৃতির এই বৈচিত্র্য লীলা সক্রিয় রহিয়াছে।

وَ مِنَ الْجِبَالِ جُدَدٌ بِيْضٌ وَّ حُمْرٌ مُّخْتَلِفٌ اَلْوَانُهَا وَ غَرَابِيْبُ سُوْدٌ - (٣٥ : ٢٧)

—আর পাহাড়গুলিও দেখ, কত ধরনের পাহাড়। কতক সাদা, কতক লাল ও কতক আবার নিকষ কালো। (—সূরা ফাতির : আয়াত ২৭)

জোড়া জোড়া হইবার বিধান

এই বৈচিত্র্যের বিধানের একটি দিক ইহাও যে, সব বস্তুই জোড়া জোড়া সৃষ্টি করা হইয়াছে। আমরা তাহাকে দ্বিবচনের বিধান বলিতে পারি অর্থাৎ সব বস্তুই তাহার বিপরীত বস্তুসহ বিদ্যমান। প্রকৃতির যেদিকেই তাকাইবে, এই বিধান সক্রিয় দেখিতে পাইবে। রাত্রের সহিত দিন, উষার সহিত সন্ধ্যা, নরের সহিত নারী, জীবনের সহিত মৃত্যু পাশাপাশি বিরাজমান।[৭]

وَمِنْ كُلِّ شَىْءٍ خَلَقْنَا زَوْجَيْنِ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُوْنَ - (٥١ : ٤٩)

—সব কিছুরই আমি জুটি সৃষ্টি করিয়া দিয়াছি (বিপরীত জুটি) যেন তোমরা সকৃতজ্ঞ থাক। (—সূরা যারিয়াত : আয়াত ৪৯)

سُبْحَانَ الَّذِىْ خَلَقَ الْاَزْوَاجَ كُلَّهَا مِمَّا تُنْبِتُ الْاَرْضُ وَمِنْ اَنْفُسِهِمْ وَ مِمَّا لَا يَعْلَمُوْنَ - (٣٦ : ٣٦)

---

৭. কুরআন পরকালের অস্তিত্ব সম্পর্কে যে সকল প্রমাণ উত্থাপন করিয়াছে, তাহার অন্যতম হইল এই, সব কিছুরই একটি বিপরীত দিক রহিয়াছে।

—পবিত্রতা ও মর্যাদা শুধু তাঁহারই, যিনি ভূপৃষ্ঠের উদ্ভিদ, মানুষ ও মানুষের অজ্ঞাত বস্তু সব কিছু জোড়া জোড়া সৃষ্টি করিয়াছেন। (—সূরা ইয়াসীন : আয়াত ৩৬)

নর-নারী

প্রকৃতির এই বিধানই মানুষকে নর ও নারী রূপে দুই ভাগে ভাগ করিয়া দিয়াছে। আর তাহাদের উভয়ের ভিতরে এরূপ আকর্ষণ ও উপলব্ধি সৃষ্টি করিয়া দিয়াছে, যেন সর্বদা একে অপরকে কামনা করে এবং উভয়ের মিলনে যেন মানবীয় জীবন পূর্ণত্ব প্রাপ্ত হয়।

فَاطِرُ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ - جَعَلَ لَكُمْ مِّنْ اَنْفُسِكُمْ اَزْوَاجًا وَّ مِنَ الْاَنْعَامِ اَزْوَاجًا - (٤٢ : ١١)

—আকাশমণ্ডলী ও ধরণীর তিনিই স্রষ্টা। তিনিই তোমাদের অস্তিত্ব হইতে তোমাদের জুটি সৃষ্টি করিয়া দিয়াছেন (অর্থাৎ নরের জন্য নারী ও নারীর জন্য নর)। এই ভাবে চতুষ্পদ জীবেরও জুটি পয়দা করিয়াছেন। (—সূরা শুরা : আয়াত ১১)

সুতরাং নশ্বর দুনিয়ার অস্থায়ী জীবনেরও বিপরীত দিক থাকা চাই। তাহা হইল অবিনশ্বর পরকালের অনন্ত জীবন। তাই, কোন কোন সূরায় এই বিপরীত বস্তুর উপমা আনিয়া প্রমাণ দান করা হইয়াছে। সূরা 'ওয়াশ-শামস'-এ আমরা তাহা দেখিতে পাই।

কুরআন বলে, ইহার কারণ হইল যে, ভালবাসা ও সুখ-শান্তি বিরাজ করুক। আর উভয়ের মেলামেশা ও ঘনিষ্ঠতায় জীবন সংগ্রামের দুঃখ-কষ্ট ও পরিশ্রম যেন সহনীয় ও সহজতর হয়।

وَ مِنْ اٰيٰتِهٖٓ اَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِّنْ اَنْفُسِكُمْ اَزْوَاجًا لِّتَسْكُنُوْٓا اِلَيْهَا وَ جَعَلَ بَيْنَكُمْ مَّوَدَّةً وَّ رَحْمَةً - اِنَّ فِيْ ذٰلِكَ لَاٰيٰتٍ لِّقَوْمٍ يَّتَفَكَّرُوْنَ - (٣٠ : ٢١)

আর (দেখ) তাঁহার রহ্‌মতের অন্যতম নিদর্শন ইহাও যে, তিনি তোমাদের অস্তিত্ব হইতে তোমাদের জুটি সৃষ্টি করিয়াছেন (অর্থাৎ পুরুষের জন্য স্ত্রী ও স্ত্রীর জন্য পুরুষ) যেন তোমাদের ভিতরে স্বস্তি ও শান্তি সৃষ্টি হয়। আর (তাঁহার এই লীলাটিও দেখ) তোমাদের ভিতরে যিনি দয়া ও ভালবাসার প্রেরণা সৃষ্টি করিয়া দিয়াছেন। নিশ্চয়ই ইহার ভিতরে চিন্তাশীলদের জন্য (আল্লাহ্‌র) নিদর্শন রহিয়াছে। (—সূরা রূম : আয়াত ২১)

জন্মলাভ ও জন্মদান

তারপর এই দাম্পত্য জীবন হইতে জন্মলাভ ও জন্মদানের এইরূপ এক ধারার সূত্রপাত হয় যে, প্রত্যেকেই জন্মগ্রহণ করে এবং সন্মদান করে। একদিকে সে

বংশধারা রক্ষা করিয়া আসে, অপরদিকে তাহা সম্প্রসারিত করিয়া চলে। তাহার সম্পর্ক যেরূপ সন্তান হিসাবে পূর্বসূত্রে গ্রথিত থাকে, তেমিন জামাতা হিসাবে ভাবী সূত্রেও গ্রথিত হয়। এইভাবে একের অস্তিত্ব বহুর সহিত জড়াইয়া যায় এবং এক হইতে সৃষ্ট সকল মানুষের সম্পর্কই এক সূত্রে গাঁথা পড়ে।

وَهُوَ الَّذِىْ خَلَقَ مِنَ الْمَاءِ بَشَرًا فَجَعَلَهٗ نَسَبًا وَّ صِهْرًا – (٢٥ : ٥٤)

—এবং তিনিই পানি হইতে মানুষ সৃষ্টি করিয়াছেন (অর্থাৎ মণি হইতে)। তারপর তাহাকে (এই জন্ম সম্পর্ক দ্বারা) বংশ ও রক্তের সম্পর্কে জড়িত করিয়া দেন। (—সূরা ফুরকান : আয়াত ৫৪)

আত্মীয়তা ও পারিবারিক পরিবেশ

আবার দেখুন, এই বংশগত ও আত্মীয়তার সম্পর্ক কি ভাবে পরিবার ও গোত্র গড়িয়া তোলে। আত্মীয়তার বাঁধন মানুষকে কি আশ্চর্যজনকভাবে গাঁথিয়া লয় এবং পরস্পরের ভিতরে প্রীতি ও সৌহার্দ্যমূলক পরিবেশ সৃষ্টি করে ! মোটকথা, মানুষের সামাজিক জীবনের গোটা কারখানাটাই এই আত্মীয়তা ও গোত্রের বাঁধনে প্রতিষ্ঠিত রাখে।

يٰاَيُّهَا النَّاسُ اتَّقُوْا رَبَّكُمُ الَّذِىْ خَلَقَكُمْ مِّنْ نَّفْسٍ وَّاحِدَةٍ وَّ خَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا وَ بَثَّ مِنْهُمَا رِجَالاً كَثِيْرًا وَّ نِسَاءً – وَاتَّقُوْا اللّٰهَ الَّذِىْ تَسَاءَلُوْنَ بِهٖ وَالْاَرْحَامَ – اِنَّ اللّٰهَ كَانَ عَلَيْكُمْ رَقِيْبًا – ٤٠ : ١)

—হে মানব সন্তান ! তোমাদের প্রতিপালককে ভয় কর (এবং তাঁহার নির্ধারিত সম্পর্ক ভুলিয়া যাইও না) যিনি তোমাদিগকে একটি মাত্র মানুষ হইতে সৃষ্টি করিয়াছেন (অর্থাৎ পিতা হইতে জোড়া সৃষ্টি করিয়াছেন।) ও যিনি তাহা হইতে তাহার সৃষ্টি করেন, যিনি তাহাদের দুইজন হইতে বহু নর ও নারীর সৃষ্টি করিয়া সর্বত্র ছড়াইয়া দিয়াছেন। (এইভাবে একজন হইতে একটি পরিবার ও গোত্রের উদ্ভব হইয়াছে।) সুতরাং সেই পরোয়ারদিগারের দোহাই পাড়িয়া তোমরা একে অপরের দয়া ও প্রীতি চাও, তাঁহাকে ভয় কর। নিশ্চয়ই আল্লাহ্‌তা'আলা তোমাদের সর্ব অবস্থার পর্যবেক্ষক। (—সূরা নিসা ঃ আয়াত ১)

وَاللّٰهُ جَعَلَ لَكُمْ مِّنْ اَنْفُسِكُمْ اَزْوَاجًا وَّ جَعَلَ لَكُمْ مِّنْ اَزْوَاجِكُمْ بَنِيْنَ وَحَفَدَةً – (١٦ : ٧٢)

আর (দেখ) আল্লাহ্ তা'আলাই তোমাদের জন্য তোমাদের অস্তিত্ব হইতেই জুটি সৃষ্টি করিয়া দিয়াছেন। তারপর তোমাদের দাম্পত্য জীবনের ফলে পুত্র ও পৌত্রের ধারা প্রতিষ্ঠিত করিয়াছেন। (—সূরা নহল ঃ আয়াত ৭২)

জীবনের বিভিন্ন রূপান্তর ও বিবর্তন

এইভাবে একটি মানুষের জীবনে বিভিন্ন রূপান্তর ও পরিবর্তনের ভিতরে জীবনের সুখ-শান্তির একটি বিরাট সূত্র নিহিত রাখা হইয়াছে। প্রতিটি জীবনই শৈশব, যৌবন, প্রৌঢ়ত্ব ও বার্ধক্যের বিভিন্ন ধাপ অতিক্রম করিয়া থাকে। আর প্রত্যেক ধাপেই নূতন অনুভূতি, নব চেতনা, নূতন গোত্র ও নব কর্মধারা লাভ করে। ফলে আমাদের জীবন সৃষ্টিজগতের এক আকর্ষণীয় সফরের সন্ধান লাভ করে। সেখানে এক মঞ্জিলের সফর শেষ না হইতেই আরেক মঞ্জিল দেখা দেয় এবং এইভাবে আয়ুর দৈর্ঘ তাহার অনুভব করারই অবকাশ হয় না।

هُوَ الَّذِىْ خَلَقَكُمْ مِّنْ تُرَابٍ ثُمَّ مِنْ نُّطْفَةٍ ثُمَّ مِنْ عَلَقَةٍ ثُمَّ يُخْرِجُكُمْ طِفْلاً ثُمَّ لِتَبْلُغُوْا اَشُدَّكُمْ ثُمَّ لِتَكُوْنُوْا شُيُوْخًا - وَمِنْكُمْ مَّنْ يُّتَوَفّٰى مِنْ قَبْلُ وَلِتَبْلُغُوْا اَجَلاً مُّسَمًّى وَّ لَعَلَّكُمْ تَعْقِلُوْنَ (٤٠ : ٦٧)

—সেই পরোয়ারদিগারই প্রথমে তোমাদের মাটি হইতে সৃষ্টি করিয়াছেন। তারপর মনি হইতে জোঁকের মত এক পদার্থে এবং জোঁক হইতে শিশুতে রূপান্তরিত করিয়া মায়ের উদর হইতে মুক্তিদান করে। তারপর তোমরা প্রাপ্তবয়স্ক হও এবং পরে পরিণত বয়স লাভ করিয়া বৃদ্ধ হও। কেহ বার্ধক্যের ধাপে পৌঁছার আগেই মৃত্যুরবণ কর এবং কাহাকে আবার নির্ধারিত আয়ূ পূর্ণ করার জন্য অবকাশ দান করা হয়। হয়তো তোমরা ব্যাপারটি অনুধাবন করিবে। (—সূরা মু'মিন ঃ আয়াত ৬৭)

ধন-সম্পদ ও সন্তান-সন্ততি

এইভাবে জীবনকে আকর্ষণীয় ও কর্মমুখর করিয়া রাখার জন্য হাজার ধরনের আশা-আকাঙক্ষা, বাসনা-কামনা, ধন-সম্পদ লিপ্সা ও সন্তান-সন্ততির মায়া ইত্যাদির আয়োজন করা হইয়াছে।

زُيِّنَ لِلنَّاسِ حُبُّ الشَّهَوَاتِ مِنَ النِّسَاءِ وَالْبَنِيْنَ وَالْقَنَاطِيْرِ الْمُقَنْطَرَةِ مِنَ الذَّهَبِ وَالْفِضَّةِ وَالْخَيْلِ الْمُسَوَّمَةِ وَالْاَنْعَامِ وَالْحَرْثِ - ذٰلِكَ مَتَاعُ الْحَيٰوةِ الدُّنْيَا - وَاللّٰهُ عِنْدَهٗ حُسْنُ الْمَاٰبِ- (٣ : ٤)

—মানুষের জন্য নারী-পুরুষের সম্পর্কের ভিতরে, সন্তান-সন্ততি ও স্বর্ণ-রৌপ্যের ব্যবহার্য রূপের ভিতরে, বাছা বাছা ঘোড়ার ভিতরে, চতুষ্পদ প্রাণী ও শস্যক্ষেত্রের ভিতরে আকর্ষণ সৃষ্টি করিয়া দেওয়া হইয়াছে। অবশ্য এই সব হইল পার্থিব (নশ্বর) জীবনের (অস্থায়ী) সম্পদ। উত্তম ঠিকানা তো শুধু আল্লাহ্‌র সন্নিধানে রহিয়াছে। (—সূরা আলে 'ইমরান ঃ আয়াত ১৪)

জীবিকা পদ্ধতির বৈচিত্র্য

এইভাবে বিভিন্ন জীবিকাধারা ও উহার বিবিধ স্তর মানুষকে আকৃষ্ট ও সক্রিয় রাখার ব্যাপারে এক বিরাট প্রভাব সৃষ্টি করে। কারণ ইহার ফলে জীবনে পরিশ্রম ও প্রতিযোগিতার স্পৃহা সৃষ্টি হয়। জীবন সংগ্রামের দুঃখ-কষ্ট সহ্য করাও সহজ হয়। পরন্তু, এরূপ ক্ষেত্রে পরিশ্রম ও কষ্টের ভিতরে মানুষ আনন্দ ও উদ্দীপনা লাভ করে।

وَهُوَ الَّذِىْ جَعَلَكُمْ خَلٰئِفَ الْاَرْضِ وَ رَفَعَ بَعْضَكُمْ فَوْقَ بَعْضٍ دَرَجٰتٍ لِيَبْلُوَكُمْ فِىْ مَا اٰتٰكُمْ - اِنَّ رَبَّكَ سَرِيْعُ الْعِقَابِ - وَاِنَّهٗ لَغَفُوْرٌ رَّحِيْمٌ - (٦ : ١٦٥)

—আর সেই প্রভুই তোমাদিগকে পৃথিবীর বুকে পূর্ববর্তীদের স্থলাভিষিক্ত করিয়াছেন এবং তোমাদের একদলের উপরে অন্যদলের আধিপত্য ও শ্রেষ্ঠত্ব দান করিয়াছেন। উদ্দেশ্য এই, তাহার সদ্ব্যবহার কর কি না, তোমাদের তাহা পরীক্ষা করা। নিশ্চয়ই আল্লাহ্ তা'আলা যথাসময়ে শাস্তিদানে বিন্দুমাত্র বিলম্ব ঘটান না (কর্মফল কার্যকারণের ধারা বাহিয়া দ্রুতগতিতেই আসিবে) এবং সঙ্গে সঙ্গে তিনি ক্ষমাশীল ও দয়াবানও। (—সূরা আন'আম ঃ আয়াত ১৬৫)

দান ও দয়ার দলীল

বস্তুত এই কারণেই কুরআন যেরূপ রবুবিয়াতের কার্যধারা ও নিদর্শন দ্বারা দলীল উত্থাপন করিয়াছে, তেমনি রহ্মতের প্রভাব ও লক্ষণ দ্বারাও বিভিন্ন ব্যাপারে দলীল পেশ করিয়াছে। রবুবিয়াতের দলীলের মত রহ্মতের দলীলও উহার আহ্বান ও নির্দেশের ক্ষেত্রে ব্যাপকভাবে ব্যবহৃত হইয়াছে ঃ কুরআন বলে, সৃষ্টিজগতের সব কিছুর ভিতরে নির্দিষ্ট নিয়মে রহমত ও বখশিশের পরিচয় বর্তমান থাকাটা স্বাভাবিকভাবেই মানুষকে এই বিশ্বাস দান করে যে, রহ্মতের মালিকের হস্ত ইহাতে সক্রিয় রহিয়াছে। কারণ দয়া ও দানের বিরাট কারবার চলিতেছে অথচ কোন দয়ালু দাতা নাই, ইহা হইতে পারে না। বস্তুত যে সব জায়গায় সৃষ্টিজগতের কল্যাণ ও মঙ্গল, রূপ ও সৌন্দর্য, সামঞ্জস্য ও সমতা, যাথার্থ্য ও সার্থকতা, পূর্ণতা ইত্যাদির উল্লেখ করা হইয়াছে, সেখানে এই সব দয়া ও দানের মূলের দিকেই ইঙ্গিত দান করা হইয়াছে।

وَاِلٰهُكُمْ اِلٰهٌ وَّاحِدٌ - لَا اِلٰهَ اِلَّا هُوَ الرَّحْمٰنُ الرَّحِيْمُ - اِنَّ فِىْ خَلْقِ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ وَاخْتِلَافِ الَّيْلِ وَالنَّهَارِ وَالْفُلْكِ الَّتِىْ تَجْرِىْ فِى الْبَحْرِ بِمَا يَنْفَعُ النَّاسَ وَمَا اَنْزَلَ اللّٰهُ مِنَ السَّمَاءِ مِنْ مَّاءٍ فَاَحْيَا بِهِ الْاَرْضَ بَعْدَ مَوْتِهَا وَ بَثَّ فِيْهَا مِنْ كُلِّ دَابَّةٍ وَّ تَصْرِيْفِ الرِّيَاحِ وَالسَّحَابِ الْمُسَخَّرِ بَيْنَ السَّمَاءِ وَالْاَرْضِ لَاٰيٰتٍ لِّقَوْمٍ يَّعْقِلُوْنَ - (٢ : ١٦٣ - ١٦٤)

আর দেখ, তোমাদের প্রভুই একমাত্র প্রভু, তিনি ছাড়া আর কোন প্রভুই নাই; তিনি দয়াবান ও দানশীল ! নিশ্চয়ই, আকাশমণ্ডলী ও পৃথিবী সৃজনের ভিতরে, পর পর রাত্র ও দিনের যাতায়াতের ভিতরে, মানুষের কল্যাণকর সমুদ্রগামী জাহাজের ভিতরে, নভোমণ্ডল হইতে মৃত ধরণীকে সঞ্জীবিতকারী বর্ষার পতনের ভিতরে, বিবিধ ধরনের প্রাণী পৃথিবীতে ছড়াইয়া রাখার ভিতরে, বিভিন্নমুখী হাওয়ার চলাচলের ভিতরে এবং মেঘকে আকাশ ও পৃথিবীর মাঝখানে ঝুলাইয়া রাখার ভিতরে জ্ঞানীদের জন্য আল্লাহ্‌র অস্তিত্ব ও তাঁহার দান-দয়ার বহু নিদর্শন রহিয়াছে। (—সূরা বাকারা ঃ আয়াত ১৬৩-১৬৪)

অনুরূপ আরেকটি স্থানে দেখুন, বিশেষভাবে প্রকৃতির সৌন্দর্যের দ্বারা দলীল দান করা হইয়াছে ঃ

اَفَلَمْ يَنْظُرُوْا اِلَى السَّمَاءِ فَوْقَهُمْ كَيْفَ بَنَيْنٰهَا وَ زَيَّنّٰهَا وَمَا لَهَا مِنْ فُرُوْجٍ - وَالْاَرْضَ مَدَدْنٰهَا وَاَلْقَيْنَا فِيْهَا رَوَاسِيَ وَاَنْبَتْنَا فِيْهَا مِنْ كُلِّ زَوْجٍ بَهِيْجٍ - تَبْصِرَةً وَّ ذِكْرٰى لِكُلِّ عَبْدٍ مُّنِيْبٍ - (٥٠ : ٦ - ٨)

—তাহারা কি কখনও আকাশের দিকে দৃষ্টিপাত করিয়া দেখিতে পায় নাই যে, কিভাবে আমি তাহা সৌন্দর্য-বিমণ্ডিত করিয়া গড়িয়া তুলিয়াছি ? উহার কোথাও ফাটল নাই। তেমনি আবার পৃথিবীর দিকে তাকাইয়া দেখ, আমি উহাকে প্রশস্ত বিছানার মতই পাতিয়া রাখিয়াছি এবং পাহাড় চাপা দিয়া স্থির রাখিয়াছি। তারপর উহাতে বিবিধ ধরনের উদ্ভিদ ও গুল্ম সৃষ্টি করিয়া দিয়াছি। সত্যানুসন্ধানীদের জন্য ইহার ভিতরে ভাবিবার ও উপদেশ লাভের অনেক কিছুই রহিয়াছে। (—সূরা কাফ ঃ আয়াত ৬-৮)

আবার দেখুন ঃ

وَلَقَدْ جَعَلْنَا فِى السَّمَاءِ بُرُوْجًا وَّ زَيَّنّٰهَا لِلنّٰظِرِيْنَ - (١٥ : ١٦)

—আর (দেখ) আকাশমণ্ডলীতে (গ্রহ-উপগ্রহের পরিভ্রমণের জন্য) কক্ষপথ তৈরি করিয়া দিয়াছি এবং দর্শকের জন্য সুসজ্জিত করিয়া রাখিয়াছি। (—সূরা হিজ্‌র ঃ আয়াত ১৬)

وَلَقَدْ زَيَّنَّا السَّمَاءَ الدُّنْيَا بِمَصَابِيْحَ - (٦٧ : ٥)

—আর (দেখ) আমি ভূমণ্ডলের আকাশে নক্ষত্রের প্রদীপ জ্বালাইয়া সুসজ্জিত করিয়াছি। —সূরা মুল্‌ক : আয়াত ৫)

কিংবা ঃ

وَلَكُمْ فِيْهَا جَمَالٌ حِيْنَ تُرِيْحُوْنَ وَحِيْنَ تَسْرَحُوْنَ - (١٦ : ٦)

—আর (দেখ) তোমাদের চতুষ্পদ জীবগুলি সকাল ও সন্ধ্যায় যখন (পাল বাঁধিয়া) মাঠে যায় ও ঘরে ফিরে, তাহার ভিতরে যথেষ্ট সৌন্দর্য রাখা হইয়াছে। (—সূরা নহল ঃ আয়াত ৬)

সঠিক ও সুষম গড়ন

সৌন্দর্য বলিতে আমরা কি বুঝি ? সৌন্দর্য কাহাকে বলে ? তাহা হইল কোন কিছুর সঠিক ও সুষম গড়ন। সব সৌন্দর্যের মূল কথা ইহাই।

وَاَنْبَتْنَا فِيْهَا مِنْ كُلِّ شَيْءٍ مَّوْزُوْنٍ - (١٥ : ١٩)

—আর (দেখ) আমি পৃথিবীতে সব কিছুরই সঠিক ও সামঞ্জস্যপূর্ণ বিকাশ ঘটাইয়াছি। (—সূরা হিজর ঃ আয়াত ১৯)

কুরআন এই অর্থে 'তাস্‌ভিয়া' শব্দও ব্যবহার করিয়াছে। 'তাস্‌ভিয়া' বলিতে কোন কিছু এরূপ ঠিকঠাক করিয়া গড়িয়া তোলাকে বুঝায়, যাহার সব কিছুই সুন্দর ও আকর্ষণীয় হইয়া উঠে।

اَلَّذِىْ خَلَقَ فَسَوّٰى - وَالَّذِىْ قَدَّرَ فَهَدٰى - (٨٧ : ٢ - ٣)

—সেই প্রতিপালকই প্রত্যেক বস্তু ঠিক ঠিক ভাবে সুন্দর ও সুষম করিয়া গড়িয়াছেন। আর যিনি প্রত্যেকের জন্য একটি পরিমাণ নির্দিষ্ট করিয়া দিয়াছেন। তারপর তাহার জন্য (জীবন ধারণের) পথ খুলিয়া দিয়াছেন। (—সূরা 'আলা ঃ আয়াত ২-৩)

اَلَّذِىْ خَلَقَكَ فَسَوّٰكَ فَعَدَلَكَ - فِىْ اَىِّ صُوْرَةٍ مَّا شَاءَ رَكَّبَكَ - (٨٢ : ٧ - ٨)

সেই প্রতিপালকই তোমাকে সৃষ্টি করিয়া সঠিক রূপদান করিয়াছেন। তারপর তোমার ভিতর ও বাহিরের সমতা ও সামঞ্জস্য বিধান করিয়াছেন। ঠিক যেরূপ আকৃতি-প্রকৃতি হওয়া উচিত, সেইভাবেই সাজাইয়া তুলিয়াছেন। (—সূরা ইনফিতর ঃ আয়াত ৭-৮)

কুরআন ইহার অপর নাম দিয়াছে 'ইতকান'। অর্থাৎ সৃষ্টিজগতের সব কিছুই এরূপ সঠিক ও সামঞ্জস্যপূর্ণভাবে হওয়া চাই, যেন কোথাও কোন ত্রুটি বা অসমতা পরিলক্ষিত না হয় ! দেখিলেই যেন মনে হয় যাহা যেখানে যতটুকু হইলে সুন্দর দেখাইতে পারে, তাহা সবই ঠিকঠাক মত বিদ্যমান।

صُنْعَ اللّٰهِ الَّذِىْ اَتْقَنَ كُلَّ شَيْءٍ - (٢٧ : ٨٨)

—ইহা সেই আল্লাহ্ তা'আলারই সৃষ্টি-নৈপুণ্য, যিনি সব কিছুই সঠিক ও সামঞ্জস্যপূর্ণভাবে গড়িয়া তুলিয়াছেন। (—সূরা নমল ঃ আয়াত ৮৮)

مَا تَرٰى فِىْ خَلْقِ الرَّحْمٰنِ مِنْ تَفَاوُتٍ - فَارْجِعِ الْبَصَرَ - هَلْ تَرٰى مِنْ فُطُوْرٍ - ثُمَّ ارْجِعِ الْبَصَرَ كَرَّتَيْنِ يَنْقَلِبْ اِلَيْكَ الْبَصَرُ خَاسِئًا وَّ هُوَ حَسِيْرٌ - (٦٧ : ٣ - ٤)

—তুমি আররহমানের সৃষ্টির ভিতরে কোথাও কোন অসামঞ্জস্য দেখিতে পাইবে না (কারণ সৃষ্টির সর্বত্র রহ্‌মত সক্রিয় রহিয়াছে)। ঠিক আছে, তুমি চোখ তুলিয়া ভালভাবে তাকাইয়া দেখ, একবার নহে, বারংবার দেখ, কোন ত্রুটি-বিচ্যুতি দেখিতে পাইতেছ কি ? এইভাবে একের পর এক করিয়া চোখ ফিরাইয়া দেখিতে দেখিতে তোমার দৃষ্টি অবশ ও আচ্ছন্ন হইলেও কোথাও কোন ত্রুটি খুঁজিয়া পাইবে না। (—সূরা মুল্‌ক ঃ আয়ত ৩-৪)

'ফী খালকির রহমান' বলিয়া ইহাই বুঝানো হইয়াছে যে, এই সুষম সৌন্দর্যের মূলে আররহ্‌মানের রহ্‌মতের লীলাখেলা সক্রিয় রহিয়াছে রহমত তো চায়ই যে, সব সুন্দর হউক, সার্থক হউক। সুতরাং ইহার ব্যতিক্রম হইতে পারে না।

রহমত পরকালের প্রমাণ দিতেছে

কুরআন আল্লাহ্ ও তাঁহার একত্বের প্রমাণ দানের পরে রহ্‌মত দ্বারা পরকালের প্রমাণও দান করিতেছে। রহ্‌মত যদি পৃথিবীতে এরূপ সার্থক ও সুন্দর সৃষ্টির উদ্ভব কামনা করিয়া থাকে, তাহা হইলে তাহা দুই দিন পরেই অর্থহীনভাবে নিশ্চিহ্ন হইতে দিবে কেন ? রহ্‌মতের বদৌলতে সৃষ্ট এই সেরা সুন্দর মানুষের স্থায়িত্বের কামনা কি রহ্‌মতের ভাণ্ডারে মওজুদ থাকিবে না ?

اَوَ لَمْ يَرَوْا اَنَّ اللّٰهَ الَّذِىْ خَلَقَ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضَ قَادِرٌ عَلٰى اَنْ يَّخْلُقَ مِثْلَهُمْ وَجَعَلَ لَهُمْ اَجَلاً لاَّ رَيْبَ فِيْهِ - فَاَبَى الظّٰلِمُوْنَ الاَّ كُفُوْرًا - قُلْ لَّوْ اَنْتُمْ تَمْلِكُوْنَ خَزَائِنَ رَحْمَةِ رَبِّىْ اِذًا لاَّمْسَكْتُمْ خَشْيَةَ الْاِنْفَاقِ - (١٧ : ٩٩ - ١٠٠)

তাহারা কি এই ব্যাপারটি লইয়া চিন্তা করে নাই যে, যেই আল্লাহ্ তা'আলা আকাশমণ্ডলী ও পৃথিবী সৃষ্টি করিয়াছেন, তিনি তাহাদের মত মানুষ দ্বিতীয়বার সৃষ্টি করার ক্ষমতা অবশ্যই রাখেন ? তিনি যে তাহাদের জন্য আয়ুষ্কালও নির্দিষ্ট করিয়া দিয়াছেন, তাহাতেও কোন সন্দেহ নাই। (আক্ষেপ এই যে, এতসব সত্ত্বেও) জালিমরা সত্যকে অস্বীকার করা ছাড়া আর কোন পথ গ্রহণ করিতে অস্বীকার করিল। (হে রাসূল ! তাহাদের) বলেন, 'যদি আমার প্রতিপালকের রহমতের ভাণ্ডার তোমাদের হাতে থাকিত, তাহা হইলে নিশ্চয়ই তোমরা খরচ হইবার ভয়ে হাত গুটাইয়া রাখিতে (কিন্তু শুধু আল্লাহ্ তা'আলাই তাঁহার রহমতের

ভাণ্ডারকে সদা উন্মুক্ত ও অফুরন্ত করিয়া রাখিয়াছেন)। (—সূরা বনী ইসলাঈল ঃ আয়াত ৯৯-১০০)

রহমত 'ওহী'র দলীল

এইভাবে কুরআন রহমতকে ওহী অবতীর্ণ হইবার দলীল হিসাবেও দাঁড় করিয়াছে। সে বলে, যেই রহমত সৃষ্টির কারখানাটির সবকিছু সঞ্জীবিত ও সুন্দর রাখার জন্য উৎসধারা রূপে বিরাজ করিতেছে, মানুষের আত্মিক পথের সন্ধান দানের ব্যাপারে তাহার কোনই হাত নাই, তাহা কি করিয়া হইতে পারে ? কি করিয়া তাহা মানুষকে ক্ষতিকর ও নিরর্থক ধ্বংসের মুখে ঠেলিয়া দিবে ? আপনি যদি দশ জায়গায় রহমতের হাত দেখিতে পান, তাহা হইলে একাদশ জায়গায় দেখিতে পাইবেন না কেন ? এই কারণেই কুরআনে এখানে-সেখানে ওহী নাযিল, গ্রন্থ প্রেরণ ও আম্বিয়ার আবির্ভাবকে 'রহমত' নামে আখ্যায়িত করা হইয়াছে।

وَلَئِنْ شِئْنَا لَنَذْهَبَنَّ بِالَّذِىْ اَوْحَيْنَا اِلَيْكَ ثُمَّ لاَ تَجِدُ لَكَ بِهٖ عَلَيْنَا وَكِيْلاً - اِلاَّ رَحْمَةً مِّنْ رَّبِّكَ - اِنَّ فَضْلَهٗ كَانَ عَلَيْكَ كَبِيْرًا - (١٧ : ٨٦ - ٨٧)

—আর (হে রাসূল) আমি যদি চাহিতাম, তোমার উপরে ওহী নাযিলের ধারা বন্ধ করিয়া দিতাম এবং তোমাদের ভিতরে কাহাকেও এরূপ পাইতে না, যাহার সাহায্যে এই ব্যাপারে আমাকে বাধ্য করিতে পারিতে। কিন্তু তোমার প্রভুর রহমত হিসেবেই ওহীর ধারা অব্যাহত থাকিতেছে। নিশ্চিত বিশ্বাস রাখ যে, ইহা তোমাদের উপরে আল্লাহ্‌র এক বিরাট দানস্বরূপ। (—সূরা বনী ইসরাঈল ঃ আয়াত ৮৬-৮৭)

আরেক স্থানে দেখুন ঃ

تَنْزِيْلَ الْعَزِيْزِ الرَّحِيْمِ - لِتُنْذِرَ قَوْمًا مَّا اُنْذِرَ اٰبَاؤُهُمْ فَهُمْ غٰفِلُوْنَ - (٣٦ : ٥ - ٦)

—এই কুরআন আযীয ও রহীমের পক্ষ হইতে অবতীর্ণ হইয়াছে। কারণ যাহাদের বাপ-দাদাকেও কেহ সতর্ক করে নাই, সেই গাফিলদের তুমি সতর্ক করিবে।

তাওরাত, ইঞ্জীল ও কুরআন সম্পর্কে বিভিন্ন স্থানে বলা হইয়াছে যে, এই সব গ্রন্থের অবতীর্ণ হওয়া আল্লাহ্‌র রহমত ছাড়া কিছুই নহে।

وَمِنْ قَبْلِهٖ كِتٰبُ مُوْسٰى اِمَامًا وَّ رَحْمَةً - (١١ : ١٧)

—আর ইহার (কুরআনের) আগে মূসা (আ)-এর গ্রন্থ (মানব জাতির জন্য) পথপ্রদর্শক ও রহমত ছিল।

يٰاَيُّهَا النَّاسُ قَدْ جَاءَتْكُمْ مَّوْعِظَةٌ مِّنْ رَّبِّكُمْ وَ شِفَاءٌ لِّمَا فِى الصُّدُوْرِ - وَهُدًى وَّ رَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِيْنَ - قُلْ بِفَضْلِ اللّٰهِ وَ بِرَحْمَتِهٖ فَبِذٰلِكَ فَلْيَفْرَحُوْا - هُوَ خَيْرٌ مِّمَّا يَجْمَعُوْنَ - (١٠ : ٥٧ - ٥٨)

—হে মানব সন্তান ! নিশ্চয়ই তোমাদের উপরে অবতীর্ণ এই বস্তু তোমাদের জন্য হিতোপদেশ ও তোমাদের মানসিক ব্যাধিগ্রস্তদের জন্য প্রতিষেধক স্বরূপ। আর যাহারা ঈমানদার, তাহাদের জন্য পথনির্দেশক ও রহমত। (হে রসূল, তাহাদের) বলিয়া দিন, এইসব কিছুই আল্লাহ্‌র অনুগ্রহের দান ছাড়া অন্য কিছু নহে। সুতরাং ইহা পর্যবেক্ষণ করিয়া তোমাদের খুশি হওয়া উচিত। তোমাদের জন্য কল্যাণকর ভাবিয়া যাহা কিছু পুঁজি সংগ্রহ করিতেছ, তাহা হইতে ইহা অনেক উত্তম। (—সূরা য়ুনুস ঃ আয়াত ৫৭-৫৮)

هٰذَا بَصَائِرُ لِلنَّاسِ وَهُدًى وَّ رَحْمَةً لِّقَوْمٍ يُّوْقِنُوْنَ - (٤٥ : ٢٠)

—ইহা (কুরআন) মানুষের জন্য সুস্পষ্ট প্রমাণের আলোকবর্তিকা আর দৃঢ় বিশ্বাসীদের জন্য পথপ্রদর্শক ও অনুগ্রহ। (—সূরা জাছিয়া ঃ আয়াত ২০)

اَوَ لَمْ يَكْفِهِمْ اَنَّا اَنْزَلْنَا عَلَيْكَ الْكِتَابَ يُتْلٰى عَلَيْهِمْ - اِنَّ فِىْ ذَالِكَ لَرَحْمَةً وَّ ذِكْرٰى لِقَوْمٍ يُّؤْمِنُوْنَ - (٢٩ : ٥١)

—তাহাদের জন্য এই নিদর্শন কি যথেষ্ট নহে যে, আমি তোমার উপরে যে গ্রন্থ অবতীর্ণ করাইয়াছি তাহা সর্বদা তাহাদের শোনানো হইতেছে ? যাহারা আস্থাশীল, তাহাদের জন্য তো ইহাতে (কুরআনে) পরিপূর্ণ অনুগ্রহ ও উপদেশ রহিয়াছে। (—সূরা আনকাবুত ঃ আয়াত ৫১)

বস্তুত এই কারণেই কুরআন ইসলামের পয়গম্বরকে আল্লাহ্‌র অনুগ্রহ (রহমত) বলিয়া আখ্যায়িত করিয়াছে ঃ

وَمَا اَرْسَلْنٰكَ اِلاَّ رَحْمَةً لِّلْعَالَمِيْنَ - (٢١ : ١٠٧)

—আর (হে রাসূল) আমি আপনাকে নিখিল সৃষ্টি জগতে আমার রহ্‌মতের প্রতিভূ করিয়া পাঠাইয়াছি। (—সূরা আম্বিয়া ঃ আয়াত ১০৭)

যোগ্যতমের প্রতিষ্ঠালাভ ও রহ্‌মতের নিদর্শন

এইভাবে রহ্‌মতের বাহ্যিক নিদর্শন দ্বারা মানুষের কার্যাবলির আভ্যন্তরীণ বিধান সম্পর্কেও প্রমাণ দান করা হয়। কুরআন বলে, যেই রহ্‌মতের দাবি অনুসারে পৃথিবীতে যোগ্যতমের প্রতিষ্ঠালাভের বিধান জারি হইয়াছে অর্থাৎ কল্যাণকর বস্তুই টিকিয়া থাকে, সেই রহ্‌মত মানুষের কার্যাবলি সম্পর্কে উদাসীন থাকিবে এবং কল্যাণকর ও অকল্যাণকর কাজের ভিতরে পার্থক্য সৃষ্টি করিবে না, তাহা কি করিয়া হইতে পারে ?

সুতরাং জড়জগতের ব্যাপারে এই রহ্‌মতের প্রতিষ্ঠিত বিধান মানুষের আভ্যন্তরীণ ব্যাপারেও ঠিক ঠিক ভাবে সক্রিয় রহিয়াছে।

এই ব্যাপারে সে দুইটি শব্দ ব্যবহার করে—সত্য ও মিথ্যা (হক ও বাতিল)। যেই সূরা 'রা'আদে' যোগ্যতমের প্রতিষ্ঠার বিধান উল্লেখ করা হইয়াছে, সেখানে ইহাও বলিয়া দেওয়া হইয়াছে যে, হক ও বাতিলের মূলতত্ত্ব উদ্‌ঘাটনই এই বর্ণনার উদ্দেশ্য।

كَذَالِكَ يَضْرِبُ اللّٰهُ الْحَقَّ وَالْبَاطِلَ – (١٣ : ١٧)

এইভাবে আল্লাহ্ তা'আলা সত্য মিথ্যার উপমা বর্ণনা করেন। (—সূরা রা'দ ঃ আয়াত ১৭)

সঙ্গে সঙ্গে বিস্তারিত বিবরণ দান করা হইয়াছে ঃ

فَاَمَّا الزَّبَدُ فَيَذْهَبُ جُفَاءً – وَ اَمَّا مَا يَنْفَعُ النَّاسَ فَيَمْكُثُ فِى الْاَرْضِ – كَذَالِكَ يَضْرِبُ اللّٰهُ الْاَمْثَالَ – لِلَّذِيْنَ اسْتَجَابُوْا لِرَبِّهِمُ الْحُسْنٰى – وَالَّذِيْنَ لَمْ يَسْتَجِيْبُوْا لَهٗ لَوْ اَنَّ لَهُمْ مَّا فِى الْاَرْضِ جَمِيْعًا وَّ مِثْلَهٗ مَعَهٗ لَافْتَدَوْا بِهٖ اُولٰئِكَ لَهُمْ سُوْءُ الْحِسَابِ –

—তারপর (দেখ) আবর্জনা ভাসিয়া যায় (কারণ উহাতে মানুষের কোন কল্যাণ) নাই কিন্তু যেই বস্তুর ভিতরে মানুষের কল্যাণ রহিয়াছে, তাহা যমীনে অবশিষ্ট থাকে। এই ভাবেই আল্লাহ্ (স্বীয় কর্মনীতির) উদাহরণ দান করেন। (সুতরাং) যাহারা নিজ প্রতিপালকের নির্দেশ মান্য করিয়াছে, তাহাদের কঠিন হিসাবের সম্মুখীন হইতে হইবে। যদি তাহাদের হাতে পৃথিবীর সব কিছু বিনিময় স্বরূপ দিতে চাহে, তথাপি তাহারা বাঁচিতে পারিবে না। (—সূরা রা'দ ঃ আয়াত ১৭-১৮)

আরবীতে 'হাক্কাকা' শব্দের অর্থ হইল প্রমাণ ও প্রতিষ্ঠা। অর্থাৎ যাহা প্রমাণিত, অটল ও সুপ্রতিষ্ঠিত, তাহাকেই সত্য (হক) বলে। বাতিল (মিথ্যা) ঠিক উহার বিপরীত অর্থ প্রকাশ করে। অর্থাৎ এমন কিছু যাহার প্রমাণ নাই ও যাহা প্রতিষ্ঠিত হয় না। তাহা টলিয়া যায় ও মিটিয়া যায়, টিকিয়া থাকে না। বস্তুত স্বয়ং কুরআনে বিভিন্ন স্থানে বলা হইয়াছে ঃ

لِيُحِقَّ الْحَقَّ وَ يُبْطِلَ الْبَاطِلَ – (٨ : ٨)

—এইজন্য যে, সত্যকে প্রতিষ্ঠা করা হইবে ও মিথ্যাকে বিলীন করা হইবে। (—সূরা আনফাল ঃ আয়াত ৮)

ন্যায়বিচার

কুরআন বলে, যেভাবে সব জড়জগতের প্রকৃতির ছাঁটাই করার এই রীতি দেখিতে পাওয়া যায় যে, উহা অকল্যাণকে বাদ দিয়া কল্যাণকে বাঁচাইয়া রাখে, তেমনি রীতি

আত্মিক জগতেও অনুসৃত হইয়া থাকে পুরোপুরিভাবেই। যাহা সত্য, তাহা স্থির থাকিবে ও প্রতিষ্ঠিত হইবে এবং যাহা মিথ্যা তাহা বিলীন হইয়া যাইবে। যখনই সত্য ও মিথ্যায় সংঘাত বাধিবে, সত্যই টিকিয়া থাকিবে। কুরআন ইহাকে নাম দিয়াছে ন্যায়বিচার। প্রকৃতি সত্যের পক্ষে রায় দিবে, মিথ্যার পক্ষে নহে।

فَاِذَا جَاءَ اَمْرُ اللّٰهِ قُضِىَ بِالْحَقِّ وَ خَسِرَ هُنَالِكَ الْمُبْطِلُوْنَ - (٧٨ : ٣٠)

তারপর যখন আল্লাহ্‌র বিধান প্রকাশের সময় আসিল, সত্যের বিধান জারি হইল, তখন অসত্য অনুসারীদের মরণ দেখা দিল। (—সূরা মু'মিন ঃ আয়াত ৭৮)

কুরআন এই সত্যটিকে 'হক' ও 'বাতিল' শব্দ দ্বারা ব্যক্ত করিয়াছে। এই শব্দদ্বয়ের ভিতর দিয়াই ব্যাপারের মূল প্রকৃতি প্রকাশ পাইতেছে। 'হক' বলিতে যাহা টিকিয়া থাকার তাহাই বুঝায়। পক্ষান্তরে 'বাতিল' বলিতে লোপ পাইবার বস্তুকেই বুঝায়। তাই যখনই কুরআন কোন কিছুকে 'হক' বলিয়া আখ্যায়িত করে, তখন শুধু তাহা দাবি হিসাবেই পেশ করে না ; পরন্তু তাহা নির্ধারণের একটা বাটখারাও উপস্থিত করে। অর্থাৎ যাহা টিকিয়া থাকে, তাহাই 'হক' আর যাহা লোপ পায়, তাহাই 'বাতিল'। ঠিক এই নিয়মই হক ও বাতিলের প্রশ্নে সবাই দেখিতে পাইবে। আল্লাহ্‌র নাম দেওয়া হইয়াছে 'আল্-হক'। কারণ তাঁহার চাইতে স্থির ও অটল সত্য আর কি হইতে পারে ?

فَذَالِكُمُ اللّٰهُ رَبُّكُمُ الْحَقُّ - (١٠ : ٣٢)

—এই হইতেছেন তোমাদের প্রতিপালক আল্লাহ্ যিনি 'আল্-হক'! (সূরা য়ূনুস ঃ আয়াত ৩২)

فَتَعَالَى اللّٰهُ الْمَلِكُ الْحَقُّ - (٢٠ : ١١٤)

অনন্তর আল্লাহ্ তা'আলার মর্তবা কতই উচ্চ যিনি 'আল্-মালিকুল হক' (সত্য বাদশাহ্)। (সূরা তা'হা ঃ আয়াত ১১৪)

ওহী অবতীর্ণ হওয়া 'আল-হক্'

ওহী অবতীর্ণ হওয়াকেও কুরআন 'আল্-হক' বলিয়া আখ্যা দেয়। কারণ পৃথিবীর বুকে উহা এক সুপ্রতিষ্ঠিত সত্য। যে সব শক্তি উহার বিলোপ কামনা করিয়াছে, তাহারাই বিলুপ্ত হইয়াছে। এমন কি আজ তাহাদের নাম-নিশানাও নাই। পক্ষান্তরে অবতীর্ণ ওহী সর্বদা বাঁচিয়া থাকিবে, যেমনটি আজও বর্তমান রহিয়াছে।

قُلْ يٰاَيُّهَا النَّاسُ قَدْ جَاءَكُمُ الْحَقُّ مِنْ رَّبِّكُمْ - فَمَنِ اهْتَدٰى فَاِنَّمَا يَهْتَدِىْ لِنَفْسِهٖ - وَمَنْ ضَلَّ فَاِنَّمَا يَضِلُّ عَلَيْهَا وَ مَا اَنَا عَلَيْكُمْ

بِوَكِيْلٍ - وَ اتَّبِعْ مَا يُوْحٰى اِلَيْكَ وَاصْبِرْ حَتّٰى يَحْكُمَ اللّٰهُ - وَ هُوَ خَيْرُ الْحٰكِمِيْنَ - (١٠ : ١٠٨ - ١٠٩)

—(হে রাসূল) আপনি ঘোষণা করুন—হে মানব ! নিশ্চয়ই তোমাদের প্রতিপালকের নিকট হইতে 'হক' জিনিস আসিয়াছে। এখন যদি কেহ সোজা পথ অনুসরণ করে, তাহা নিজের কল্যাণেই করিবে এবং যদি কেহ ভ্রান্ত পথ অনুসরণ করে, সে তাহা নিজ দায়িত্বেই করিবে। (আমার কাজ তো শুধু সত্য পথ দেখানো) আমাকে তোমাদের জিম্মাদার করিয়া পাঠানো হয় নাই (তাই তোমাদের জোর-জবরদস্তি করিয়া ঠিক পথে রাখা আমার কাজ নহে)। আর (হে রাসূল) আপনার উপর যে ওহী অবতীর্ণ হইয়াছে, আপনি ধৈর্য সহকারে তাহা অনুসরণ করিয়া চলুন, যদ্দিন স্বয়ং আল্লাহ্‌র বিচার না দেখা দেয় ; আল্লাহ্‌ই উত্তম বিচারক।

وَبِالْحَقِّ اَنْزَلْنَاهُ وَ بِالْحَقِّ نَزَلَ - (١٧ : ١٠٥)

—আর (হে রাসূল) আমার নিকট হইতে উহার (কুরআনের) অবতীর্ণ হওয়া সত্য এবং সত্য লইয়াই উহা অবতীর্ণ হইয়াছে।

কুরআনের পরিভাষায় 'আল-হক'

এভাবে যখনই 'হক্' শব্দটি নির্দিষ্ট বাচক 'আল্' চিহ্নসহ ব্যবহৃত হয়, তখন তাহা দ্বারা এই সত্যটিই বুঝানো হয়। এইজন্যই কুরআন অধিকাংশ ক্ষেত্রে শুধু 'আল্-হক' বলিয়াই চুপ হইয়া গিয়াছে এবং কিছু বলা প্রয়োজন মনে করে নাই। কারণ প্রকৃতির নিয়ম যদি ইহাই হয় যে, সত্য-মিথ্যার সংঘাতে সত্যই টিকিয়া থাকে, তখন কোন কিছুর স্থায়িত্ব সম্পর্কে এতটুকু বলাই যথেষ্ট যে, এইটি সত্য অর্থাৎ ইহা টিকিয়া থাকার বস্তু এবং স্থায়িত্বই ইহার সত্যতা ঘোষণা করিবে।

সত্য ও মিথ্যার সংগ্রাম

কুরআন এখানে সেখানে যে সত্য ও মিথ্যার সংগ্রাম সম্পর্কে উল্লেখ করিয়াছে এবং নীতি-নিয়ম হিসাবে সত্যের সফলতা ও মিথ্যার বিলোপ নির্ধারণ করিয়াছে, তাহাও সত্যের পক্ষে রায়দানের বিধানেরই ব্যাখ্যা স্বরূপ। এই তথ্যের আলোকেই ব্যাপারটি বিবেচনা করিতে হইবে।

بَلْ نَقْذِفُ بِالْحَقِّ عَلَى الْبَاطِلِ فَيَدْمَغُهُ فَاِذَا هُوَ زَاهِقٌ -

আর আমার বিধান হইল এই, সত্য মিথ্যার সহিত টক্কর লাগায় এবং উহাকে চূর্ণ-বিচূর্ণ করিয়া দেয়। ফলে সহসা মিথ্যা উধাও হইয়া যায়।

وَ قُلْ جَاءَ الْحَقُّ وَ زَهَقَ الْبَاطِلُ اِنَّ الْبَاطِلَ كَانَ زَهُوْقًا - (١٧ : ٨١)

—আর বলিয়া দাও, সত্য আত্মপ্রকাশ করিয়াছে এবং মিথ্যা লোপ পাইয়াছে। নিশ্চয়ই মিথ্যা লোপ পাইবার বস্তু। (—সূরা বনী ইসরাঈল ঃ আয়াত ৮১)

আল্লাহ্‌র সাক্ষ্যদান

সত্য ও সততার জন্য আল্লাহ্‌র এই সাক্ষ্যই যথাসময়ে আত্মপ্রকাশ করে এবং সত্য কাহার সঙ্গে ছিল আর কাহার সঙ্গে ছিল না আর কাহারা মিথ্যার পূজারী ছিল, তাহা বলিয়া দেয় অর্থাৎ ন্যায়বিচারের মানদণ্ডে সত্যকে প্রতিষ্ঠিত ও মিথ্যাকে লোপ করিয়া প্রকৃত সত্য ঘোষণা করা হয়।

قُلْ كَفٰى بِاللّٰهِ بَيْنِىْ وَ بَيْنَكُمْ شَهِيْدًا - يَعْلَمُ مَا فِى السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ - وَالَّذِيْنَ اٰمَنُوْا بِالْبَاطِلِ وَكَفَرُوْا بِاللّٰهِ اُولٰئِكَ هُمُ الْخٰسِرُوْنَ - (٢٩ : ٥٢)

(হে রাসূল) তাহাদের বলিয়া দাও, আমার ও তোমাদের মধ্যে আল্লাহ্ তা'আলা যে সাক্ষী রহিয়াছেন, ইহাই যথেষ্ট। আসমান ও যমীনের সব কিছুই তাঁহার জানা আছে। সুতরাং যাহারা সত্য ছাড়িয়া মিথ্যার উপর আস্থা স্থাপন করিয়াছে এবং আল্লাহ্‌র সত্যতা অস্বীকার করিয়াছে, তাহারা অবশ্যই ক্ষতিগ্রস্ত হইল !

অন্যত্র তাঁহাকেই কোন কিছুর মীমাংসার প্রশ্নে সর্বশ্রেষ্ঠ সাক্ষী বলা হইয়াছে ঃ

قُلْ اَىُّ شَىْءٍ اَكْبَرُ شَهَادَةً - قُلِ اللّٰهُ - شَهِيْدٌ بَيْنِىْ وَبَيْنَكُمْ - (٦ : ١٩)

—সব চাইতে বড় সাক্ষ্য কি ? (হে রাসূল) বলিয়া দাও, আল্লাহ্‌র সাক্ষ্য। তিনিই তোমাদের ও আমার মধ্যে সাক্ষী হইয়া আছেন। (—সূরা আন'আম ঃ আয়াত ১৯)

ন্যায়বিচার জড় ও আত্মিক জগতের সার্বজনীন বিধান

কুরআন বলে, এই বিধানকে তোমরা কি করিয়া অস্বীকার করিতে পার ? কারণ আকাশ ও পৃথিবীর গোটা কারখানাই এই নীতির ভিত্তিতে পরিচালিত হইতেছে। যদি সৃষ্টিজগতের প্রকৃতি ক্ষতিকর ও খারাপ বস্তুকে ছাঁটাই করিতে না থাকিত, আর যদি কল্যাণকর ও ভাল বস্তুর জন্য স্থায়িত্ব না হইত তাহা হইলে গোটা সৃষ্টির কারখানাই লণ্ডভণ্ড হইত। বাস্তব জগতে যখন আপনারা প্রকৃতির এই কানূন দেখিতেছেন, তখন আত্মিক জগতে ইহার অস্তিত্ব অস্বীকার করিবেন কেন ?

وَ لَوِاتَّبَعَ الْحَقُّ اَهْوَاءَهُمْ لَفَسَدَتِ السَّمٰوٰتُ وَالْاَرْضُ وَمَنْ فِيْهِنَّ - (٢٣ : ٧١)

যদি সত্য তাহাদের খেয়াল-খুশি অনুসরণ করে, তাহা হইলে বিশ্বাস কর, আকাশ ও পৃথিবী অবশ্যই সব কিছু সহ লণ্ডভণ্ড হইয়া যাইত।

এইজন্য কুরআনে অপেক্ষা করিতে নির্দেশ দান করা হইয়াছে যেন স্বাভাবিক গতিতেই সত্য ও মিথ্যার সংগ্রামের পরিণতি আত্মপ্রকাশ করে। বলা হইয়াছে ঃ

قُلْ فَانْتَظِرُوْا اِنِّىْ مَعَكُمْ مِّنَ الْمُنْتَظِرِيْنَ - (١٠ : ١٠٢)

—(হে রাসূল) বলিয়া দাও, অপেক্ষা কর, নিশ্চয়ই আমিও তোমাদের সঙ্গে (স্বাভাবিক পরিণতি দেখা দেওয়া পর্যন্ত) অপেক্ষা করিব। (—সূরা য়ূনুস ঃ আয়াত ১০২)

ন্যায়বিচার ও অবকাশ দান

কিন্তু 'ন্যায়বিচার'-এর পরিণতি কি যখন তখন মিথ্যাকে লোপ ও সত্যকে প্রতিষ্ঠা করিয়া দেয় ? কুরআন বলে—না, এইরূপ হইতে পারে না। কারণ 'রহমত' তাহা চায় না। বস্তুজগতে রহ্‌মত যেরূপ অবকাশ দীর্ঘসূত্রিতার নিয়ম চালু রাখিয়াছে, তেমনি আত্মিক জগতেও তাহা সক্রিয় রহিয়াছে। সৃষ্টিজগতের জড় ও অজড় সর্বত্র একই নিয়ম চলিতেছে। তাহা না হইলে পৃথিবীতে অন্যায় করিয়া কেহ জীবনে মুহূর্তকালও রেহাই পাইত না ।

وَلَوْ يُعَجِّلُ اللّٰهُ لِلنَّاسِ الشَّرَّ اسْتِعْجَالَهُمْ بِالْخَيْرِ لَقُضِىَ اِلَيْهِمْ اَجَلُهُمْ - (١٠ : ١١)

—আর যেভাবে মানুষ স্বার্থ লাভের জন্য তাড়াহুড়া করে, তেমিন তাড়াহুড়া যদি তাহাদের শাস্তি দানের বেলায় আল্লাহ্ তা'আলা করিতেন, তাহা হইলে পাপী পাপ করিয়া মুহূর্তকালও অবকাশ পাইত না। সঙ্গে সঙ্গে নির্ধারিত পরিণাম দেখা দিত। (—সূরা য়ুনুস ঃ আয়াত ১১)

আজাল বা নির্ধারিত কাল

কুরআন বলে, জড় জগতের সব কিছুই যেভাবে বিভিন্ন অবস্থায় ধীরে ধীরে উন্নীত হয় এবং এক অবস্থা হইতে অন্য অবস্থায় পরিণতি লাভ করিতে বিশেষ এক সময় পর্যন্ত অপেক্ষা করে, ঠিক সেইভাবেই প্রত্যেক কাজের পরিণতি দেখা দিবার জন্যও বিশেষ সময় নির্ধারিত রহিয়াছে। তাহা বিশেষ সময়ে নির্দিষ্টভাবে পরিণতি লাভ করিয়া আত্মপ্রকাশ করে।

যেমন প্রকৃতির বিধান হইল এই, আগুনের ওপর পানি রাখিলে তাহা গরম হইয়া টগবগ করিতে থাকে। কিন্তু সেইজন্য বিশেষ সময় কাটাইয়া বিশেষ পরিমাণে গরম হবার পরেই তাহা অপরিহার্য হইয়া দেখা দিবে—অন্যথায় নহে। তেমনি মানুষের

কাজের ফলাফলও নির্দিষ্ট ধারা বাহিয়া বিশেষ সময় অতিক্রম করার পরে রূপলাভ করে। ততক্ষণ পর্যন্ত অপেক্ষা করা অপরিহার্য হইয়া দাঁড়ায়।

এইরূপ অবস্থায় স্বভাবতই অবকাশ ও দীর্ঘসূত্রিতার অবস্থা সৃষ্টি হয়। সত্য ও মিথ্যার জন্য তাই নির্ধারিত কাল অপেক্ষা করা অপরিহার্য হইয়া দাঁড়ায়। সত্য প্রকাশের জন্য অপেক্ষা করার কারণ এই যে, উহা জয়ী হইবার যথাযথ শক্তি অর্জনের অবকাশ চাহে। তেমনি মিথ্যার পরিণতি দেখা দিতে বিলম্ব এইজন্য দেখা দেয় যে, উহা ধ্বংস লাভের মত দুর্বলতা দেখা দিতে সময়ের প্রয়োজন। এই অবকাশের কোন সুনির্দিষ্ট সময় নাই। প্রত্যেকটি অবস্থার বিশেষত্ব ও উহার পরিবেশ অনুসারে সময় কম বা বেশি হইয়া থাকে।

فَاِنْ تَوَلَّوْا فَقُلْ اٰذَنْتُكُمْ عَلٰى سَوَاءٍ - وَاِنْ اَدْرِىْ اَقَرِيْبٌ اَمْ بَعِيْدٌ مَّا تُوْعَدُوْنَ - اِنَّهٗ يَعْلَمُ الْجَهْرَ مِنَ الْقَوْلِ وَ يَعْلَمُ مَا تَكْتُمُوْنَ - وَاِنْ اَدْرِىْ لَعَلَّهٗ فِتْنَةٌ لَّكُمْ وَ مَتَاعٌ اِلٰى حِيْنٍ - (٢١ : ١٠٩ - ١١١)

—তারপর তাহারা যদি ঘাড় ফিরাইয়া নেয়, তাহা হইলে তাহাদের বলিয়া দাও—আমি তোমাদের সবাইকে (সত্য ব্যাপার) একই ভাবে জানাইয়া দিয়াছি। আমি জানি না যে, তোমাদের কুকর্মের প্রতিশ্রুত পরিণতি কি নিকটবর্তী, না দূরে রহিয়াছে। তোমরা প্রকাশ্য যাহা বল কিংবা গোপনে যাহা কর, আল্লাহ্ সব কিছুরই খবর রাখেন। আমি আর কি জানি ? হইতে পারে তোমাদের পরিণাম ফল লাভে বিলম্ব করার ভিতরে তোমাদের পরীক্ষা করা হইতেছে। অথবা আরও কিছু সময়ের জন্য তোমাদের মজা লুটিবার সময় দেওয়া হইতেছে। (—সূরা আম্বিয়া ঃ আয়াত ১০৯-১১১)

প্রকৃতির বিধানের কাল নির্ণয়

কুরআন বলে, তোমরা নিজেদের কাল নির্ণয় যন্ত্রের সাহায্যে প্রকৃতির গতিবিধির কাল নির্ণয়ের প্রয়াস পাইও না ; কাল প্রকৃতির কার্যধারার প্রসারতা এত বেশি যে, তোমাদের কাল নির্ণয় ব্যবস্থায় সব চাইতে যে দীর্ঘ কালের নির্দেশ রহিয়াছে, তাহা প্রকৃতির কালের পঞ্জিকায় একদিনের বেশি বলিয়া স্বীকার করা হয় নাই।

وَيَسْتَعْجِلُوْنَكَ بِالْعَذَابِ وَ لَنْ يُّخْلِفَ اللّٰهُ وَعْدَهٗ - وَاِنَّ يَوْمًا عِنْدَ رَبِّكَ كَاَلْفِ سَنَةٍ مِمَّا تَعُدُّوْنَ - وَ كَاَيِّنْ مِّنْ قَرْيَةٍ اَمْلَيْتُ لَهَا وَهِىَ ظَالِمَةٌ ثُمَّ اَخَذْتُهَا - وَاِلَىَّ الْمَصِيْرُ - (٢٢ : ٤٧ - ٤٨)

—এই লোকগুলি শাস্তিলাভের জন্য ব্যস্ত-সমস্ত হইয়া উঠিয়াছে (অর্থাৎ নাফরমানী করিয়া বলিতেছে, যদি ইহাতে শাস্তি পাইতে হয়, তাহা হইলে তাহা দেখিতেছি না কেন ?) অথচ আল্লাহ্ তাঁহার ওয়াদা কখনও খেলাফ করেন না। কিন্তু কথা

হইল এই, তোমার প্রভুর একটি দিন তোমাদের হাজার বৎসরের সমান। বস্তুত, কত জনপদকে পাপ পূর্ণ হবার পরেও সুযোগ দেওয়া হইয়াছে অথচ অধিবাসীরা ছিল জালিম। তারপর যখন কর্মফল দেখা দিবার সময় উপস্থিত হইল, আমি তাহাদের পাকড়াও করিলাম। বলা বাহুল্য, আমারই কাছে সবাইকে প্রত্যাবর্তন করিতে হয়। (—সূরা হজ্জ ঃ আয়াত ৪৭-৪৮)

এই আয়াতে মানুষের চিন্তাধারার যে ভ্রান্তিটিকে 'শাস্তিলাভের ব্যস্ততা' বলিয়া আখ্যায়িত করা হইয়াছে, তাহা শুধু রসূলুল্লাহ্ (সা)-এর যুগের সত্যদ্রোহী মানুষগুলির মধ্যেই যে সীমাবদ্ধ ছিল, তাহা নহে। বরং সর্বযুগের মানুষের ভিতরেই এই বিভ্রান্তি দেখা যায়। অধিকাংশ ক্ষেত্রে মানুষ প্রকৃতির এই অবকাশ দানের সুযোগ লাভ করিয়া সংশোধন হওয়ার বদলে অন্যায় ও অনাচার আরও বাড়াইয়া তোলে এবং সদম্ভে বলিয়া বেড়ায়, সত্য ও মিথ্যার প্রতিশ্রুত ফলাফল কিছু থাকিলে তাহা দেখা দেয় না কেন ? এক্ষুণি কেন তাহা আমাদের সামনে প্রকাশ পাইতেছে না ? কুরআন বারংবার সত্যদ্রোহীদের এই কথা উল্লেখ করিয়া বলিয়া দিয়াছে, যদি সৃষ্টিজগতে 'রহমত'-এর আনাগোনা না হইত, তাহা হইলে কোন পাপীই পাপ করিয়া মুহূর্তকালের জন্য রেহাই পাইত না। কিন্তু রহমতের দাবি হইল এই, সত্যের মত মিথ্যাকেও জীবন ও জীবিকা দান করিতে হইবে এবং মিথ্যার পূজারীদের তওবা করিয়া ফিরিয়া আসার জন্য প্রয়োজনীয় অবকাশ দান করিতে হইবে। রহ্মতের লীলাখেলা বিরাজ করায় কর্মফল প্রকাশের সময় নির্ধারণ কাহারও পক্ষে সম্ভবপর হইতেছে না।

وَ يَقُوْلُوْنَ مَتٰى هٰذَا الْوَعْدُ اِنْ كُنْتُمْ صٰدِقِيْنَ - قُلْ عَسٰى اَنْ يَّكُوْنَ رَدِفَ لَكُمْ بَعْضُ الَّذِىْ تَسْتَعْجِلُوْنَ - وَاِنَّ رَبَّكَ لَذُوْ فَضْلٍ عَلَى النَّاسِ وَلٰكِنَّ اَكْثَرَهُمْ لاَ يَشْكُرُوْنَ - (٢٥ : ٧١ - ٧٣)

—আর (হে রাসূল) এই (সত্য-বিস্মৃত মানুষগুলি) বলিতেছে, যদি তুমি (বিদ্রোহ ও অত্যাচারের ভীষণ পরিণাম সম্পর্কে ভয় প্রদর্শনের কাজে) সত্যবাদী হও, তাহা হইলে কবে তাহা দেখা দিবে ? (তাহাদের) বলিয়া দাও, (চিন্তিত হইও না) যাহা পাইবার জন্য তোমরা ব্যতিব্যস্ত হইয়া পড়িয়াছ, তাহার কিছু হয়তো কাছাকাছি আসিয়া পৌঁছিয়াছে। আর (হে রাসূল) তোমার প্রতিপালক মানুষের উপরে বড়ই দয়াশীল (প্রত্যেক সময়ে তাহাদের সংশোধন ও প্রত্যাবর্তনের সুযোগ দান করেন।) কিন্তু আক্ষেপ ! অধিকাংশ লোক আল্লাহ্ প্রদত্ত এই সুযোগের কৃতজ্ঞতা আদায় করে না (ইহার সদ্ব্যবহার করিয়া সংশোধিত হয় না)। (—সূরা ফুরকান ঃ আয়াত ৭১-৭৩)

وَ يَسْتَعْجِلُوْنَكَ بِالْعَذَابِ -وَ لَوْلاَ اَجَلٌ مُّسَمًّى لَّجَاءَهُمُ الْعَذَابُ - وَلَيَاْتِيَنَّهُمْ بَغْتَةً وَّ هُمْ لاَ يَشْعُرُوْنَ -

—আর এই লোকগুলি শাস্তি পাইবার জন্য তাড়া করিতেছে। (অর্থাৎ অন্যায় ও অনাচার বাড়াইয়া দিয়া চ্যালেঞ্জ করিতেছে যে, ইহাতে আজাব পাইতে হইলে তাহা এখনও পাইতেছি না কেন ?) অথচ ব্যাপার এই, যদি এইজন্য সময় নির্ধারিত না থাকিত, তবে আগেই তাহা আসিত। আর বিশ্বাস কর, যখন তাহা আসার সময় হইবে, তখন এইরূপ হঠাৎ আসিয়া উপস্থিত হইবে যে, তাহারা ভাবিয়া দেখিবারও অবকাশ পাইবে না।

وَمَا نُؤَخِّرُهُ اِلاَّ لِاَجَلٍ مَّعْدُوْدٍ - (١١ : ١٠٤)

—আর (স্মরণ রাখিও) যদি আমি এই ব্যাপারে বিলম্ব ঘটাই, তাহা এইজন্য যে, উহার পরিণতিটির পূর্ণতা লাভের জন্য আমি একটি সময় নির্দিষ্ট করিয়া দিয়াছি। (—সূরা হুদ ঃ আয়াত ১০৪)

কুরআন বলে, এখানে সবাই সমানভাবে জীবন ও কর্মের ক্ষেত্রে সুযোগ ও অবকাশ লাভ করিবে। কারণ ইহাই রহমতের দাবি। এই কারণে এইরূপ ভুল ধারণা করিয়া বসা উচিত নহে যে, কর্মফলের বিধান বলিতে কিছু নাই। লক্ষ করা উচিত, অবশেষে কোন্ কাজের কি ফল দেখা দেয়।

قُلْ يَا قَوْمِ اعْمَلُوْا عَلٰى مَكَانَتِكُمْ اِنِّىْ عَامِلٌ - فَسَوْفَ تَعْلَمُوْنَ - مَنْ تَكُوْنُ لَهُ عَاقِبَةُ الدَّارِ اِنَّهُ لاَ يُفْلِحُ الظّٰلِمُوْنَ - (٦ : ١٣٥)

—(হে রাসূল ! তুমি তাহাদের) জানাইয়া দাও—দেখ, (আমাদের পরস্পরের কার্যাবলির ফলাফল আল্লাহ্‌র হাতে) তোমরা যাহা কিছু করিতেছ, করিতে থাক আর আমার কাজ আমি করিতে থাকি। শীঘ্রই জানা যাইবে, অবশেষে সফল ঠিকানা কাহার জন্য। নিশ্চয়ই তাঁহার বিধান অনুসারে জালিমরা কখনও কল্যাণ পায় না। (—সূরা আন'আম ঃ আয়াত ১৩৫)

জালিমদের কল্যাণ নিষিদ্ধকারী আয়াতসমূহ

এখানে স্মরণ রাখা উচিত যে, কুরআনে যতখানে ভাল কাজের জন্য সুসংবাদ ও মন্দ কাজের জন্য দুঃসংবাদ দান করিয়াছে, তাহাও প্রকৃতির এই বিধানের ভিত্তিতে করিয়াছে। যেমন ঃ

اِنَّهُ لاَ يُفْلِحُ الظّٰلِمُوْنَ - (٦ : ٢١)

নিশ্চয়ই জালিম সম্প্রদায় কল্যাণ লাভ করিবে না। (—সূরা আন'আম ঃ আয়াত ২১)

اِنَّهُ لاَ يُفْلِحُ الْمُجْرِمُوْنَ - (١٠ : ١٧)

নিশ্চয়ই অপরাধী সম্প্রদায় কল্যাণ হইতে বঞ্চিত হইবে। (—সূরা য়ুনুস ঃ আয়াত ১৭)

اِنَّهٗ لاَ يُفْلِحُ الْكَافِرُوْنَ - (٢٣ : ١١٧)

—নিশ্চয়ই আল্লাহ্‌দ্রোহী সম্প্রদায় মঙ্গল পাইবে না। (—সূরা মু'মিনুন ঃ আয়াত ১১৭)

لاَ يُصْلِحُ عَمَلَ الْمُفْسِدِيْنَ - (١٠ : ٨١)

—বিবাদ-বিসম্বাদ সৃষ্টিকারীদের কাজ কখনো সঠিক ফল পায় না। (—সূরা য়ূনুস ঃ আয়াত ৮১)

وَاللّٰهُ لاَيَهْدِىْ الْقَوْمَ الْكَافِرِيْنَ - (٩ : ٣٧)

—আল্লাহ্ তা'আলা কাফিরদের পথপ্রদর্শন করেন না ইত্যাদি। (—সূরা তওবা ঃ আয়াত ৩৭)

অর্থাৎ আল্লাহ্‌তা'আলার বিধানই এইরূপ। এমন নহে যে, তিনি এই সব লোকের জন্য হিদায়ত ও রহ্‌মতের দ্বার রুদ্ধ করিয়া রাখেন। বরং অনুসৃত কার্যধারার স্বাভাবিক পরিণতি ইহা ছাড়া অন্য কিছু নহে। দুর্ভাগ্য তাহাদের যে, কুরআনের ব্যাখ্যাদাতাগণ এই ক্ষেত্রে গভীর চিন্তা-ভাবনার আশ্রয় না নেওয়ার মূল তাৎপর্য অনুধাবন করিতে ব্যর্থ হইয়াছেন।

কুরআনের পরিভাষায় ইহাকেই 'তামাত্তু' বলা হইয়াছে। অর্থাৎ জীবন সম্ভোগ ও উপভোগের ক্ষেত্রে সবাইকে নির্দিষ্ট কালের জন্য সুযোগ দান করা।

بَلْ مَتَّعْنَا هٰؤُلاَءِ وَاٰبَاءَهُمْ حَتّٰى طَالَ عَلَيْهِمُ الْعُمُرُ - (٢١ : ٤٤)

—বরং কথা হইল এই, আমি তাহাদের ও তাহাদের বাপ-দাদাদের জীবন সম্ভোগের জন্য সুযোগ দান করিয়াছি। ফলে এমন কি সুখ-স্বাচ্ছন্দ্যে তাহারা দীর্ঘ জীবন অতিবাহিত করিয়াছে। (—সূরা আম্বিয়া ঃ আয়াত ৪৪)

এইভাবে কুরআনে এখানে সেখানে বলা হইয়াছে ঃ

مَتَّعْنَاهُمْ اِلٰى حِيْنٍ - (١٠ : ٩٨)

—জীবন সম্ভোগের জন্য আমি কিছুকাল সুযোগ দিলাম। (—সূরা য়ূনুস ঃ আয়াত ৯৮)

مَتَاعًا اِلٰى حِيْنٍ - (٦٣ : ٤٤)

—কিছু কালের সম্ভোগ। (—সূরা ইয়াসীন ঃ আয়াত ৪৪)

فَتَمَتَّعُوْا - فَسَوْفَ تَعْلَمُوْنَ - (١٦ : ٥٥)

—তাই কিছুকাল জীবন সম্ভোগে মত্ত থাক, তারপর শীঘ্রই (সঠিক অবস্থা) টের পাইবে। (—সূরা নহল ঃ আয়াত ৫৫)

এইসব বক্তব্যের মাধ্যমে উপরোক্ত সত্যটিকেই কুরআন স্পষ্ট করিয়া তুলিয়াছে।

সমাজ ও জাতিগত ন্যায়বিচার

এইভাবে কুরআন ন্যায়বিচারকে দল ও জাতির উত্থান-পতনের সঙ্গে জুড়িয়া দিয়াছে। কুরআন বলে, যেভবে প্রকৃতির নির্বাচন রীতি ব্যক্তি ও বস্তুর ভিতরে ব্যাপ্ত রহিয়াছে, তেমনি দল ও জাতির ভিতরেও সক্রিয় রহিয়াছে, যেভাবে প্রকৃতি কল্যাণকর জিনিস বাঁচাইয়া রাখে এবং অকল্যাণকর বস্তু ছাঁটাই করিয়া ফেলে , তেমনি দলের ভিতরে কেবল কল্যাণকামী দলই টিকিয়া থাকে এবং অকল্যাণকর দলগুলি নিশ্চিহ্ন হয় । সে বলে, ইহাই প্রকৃতির ভিতরকার 'রহ্‌মত'। এই রহ্‌মত বিরাজ না করিলে গোটা পৃথিবী অত্যাচার ও অনাচারে ভরিয়া যাইত।

وَ لَوْلاَ دَفْعُ اللّٰهِ النَّاسَ بَعْضَهُمْ بِبَعْضٍ لَّفَسَدَتِ الْاَرْضُ وَلٰكِنَّ اللّٰهَ ذُفَضْلٍ عَلَى الْعٰلَمِيْنَ - (٢ : ٢٥١)

—আর (লক্ষ কর) আল্লাহ্‌তা'আলা যদি (দল ও জাতির ভিতরে পারস্পরিক দ্বন্দ্ব বহাল না রাখিতেন) একদল লোক দ্বারা অন্য দলকে শায়েস্তা করার ব্যবস্থা না করিতেন, তাহা হইলে অবশ্যই পৃথিবী অনাচারে ভরপুর হইয়া যাইত। কিন্তু আল্লাহ্‌তা'আলা সৃষ্টিজগতের জন্য দান ও দয়ার ভাণ্ডার মুক্ত রাখিয়াছেন। (—সূরা বাকারা ঃ আয়াত ২৫১)

অন্য এক স্থানে এই সত্যটির উপর আরও জোর দিয়া বলা হইয়াছে ঃ

وَلَوْلاَ دَفْعُ اللّٰهِ النَّاسَ بَعْضَهُمْ بِبَعْضٍ لَّهُدِّمَتْ صَوَمِعُ وَ بِيَعٌ وَّصَلَوٰتٌ وَّ مَسٰجِدُ يُذْكَرُ فِيْهَا اسْمُ اللّٰهِ كَثِيْرًا - وَلَيَنْصُرَنَّ اللّٰهُ مَنْ يَّنْصُرُهٗ - اِنَّ اللّٰهَ لَقَوِيٌّ عَزِيْزٌ - (٢٢ : ٤٠)

—আল্লাহ্ যদি মানব জাতির একদলকে অন্য দল দ্বারা প্রতিহত না করিতেন তাহা হইলে বিধ্বস্ত হইয়া যাইত খানকা, গির্জা, মন্দির ও মসজিদ ইত্যাদি যে সব স্থানে আল্লাহ্‌র যিক্‌র অধিক হইয়া থাকে। আল্লাহ্ নিশ্চয়ই তাহাকে সাহায্য করেন যে তাঁহাকে সাহায্য করে। আল্লাহ্ নিশ্চয়ই শক্তিমান পরাক্রমশালী। (—সূরা হজ্জ ঃ আয়াত ৪০)

কুরআন বলে, সৃষ্টিজগতের সর্বত্র যেরূপ সময় সুযোগ দানের নীতি অব্যাহত রহিয়াছে, তেমনি দল ও জাতির ব্যাপারেও তাহা সক্রিয় রহিয়াছে। রহ্‌মতের চাহিদা মুতাবিক এ ক্ষেত্রেও ত্রুটিবিচ্যুতি সংশোধন পূর্বক সঠিক পথে ফিরিয়া আসার জন্য সময় ও সুযোগ দান করা হয়।

وَقَطَّعْنَاهُمْ فِى الْاَرْضِ اُمَمًا - مِنْهُمُ الصّٰلِحُوْنَ وَ مِنْهُمْ دُوْنَ ذٰلِكَ ، وَ بَلَوْنٰهُمْ بِالْحَسَنٰتِ وَالسَّيِّاٰتِ لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُوْنَ - (٧ : ١٦٨)

—আর আমি এরূপ অবস্থা সৃষ্টি করিয়াছি যে, মানুষের বিভিন্ন দল বিচ্ছিন্ন হইয়া বিভিন্ন দিকে ছড়াইয়া গিয়াছে। তাহাদের কোন দল পুণ্যবান ছিল আর অন্য দল ভিন্ন পথ অবলম্বন করিয়াছে। তারপর আমি তাহাদিগকে ভাল ও মন্দ কাজে সুযোগ দিয়া পরীক্ষা করিয়াছি যেন সবাই অন্যায় হইতে বিরত হবার অবকাশ পায়। (—সূরা আ'রাফ ঃ আয়াত ১৬৮)

যেভাবে বস্তুজগতের প্রত্যেকটি পরিবর্তনের জন্য প্রকৃতি বিশেষ সময়, কারণ ও উপলক্ষ নির্দিষ্ট করিয়া দেয়, তেমনি কোন জাতির পতন ও ধ্বংসের জন্যও পর্যাপ্ত কারণ, পরিবেশ ও সময় নির্ধারণ করিয়া থাকে। ইহাকেই 'আজাল' বা নির্ধারিত কাল বলা হয়। যতক্ষণ পর্যন্ত এই 'আজাল' উপস্থিত না হয়, ততক্ষণ খোদায়ী নীতি একের পর এক করিয়া সতর্কবাণী উচ্চারণ করিতে থাকে ও সংশোধনের অবকাশ দিতে থাকে।

اَوَلَايَرَوْنَ اَنَّهُمْ يُفْتَنُوْنَ فِى كُلِّ عَامٍ مَّرَّةً اَوْ مَرَّتَيْنِ ثُمَّ لَايَتُوْبُوْنَ وَ لَاهُمْ يَذَّكَّرُوْنَ - (٩ : ١٢٦)

—তাহারা কি দেখিতে পায় না, তাহাদের উপরে এমন কোন বছর অতিবাহিত হয় না যে, আমি তাহাদের একবার কিংবা একাধিকবার পরীক্ষার সম্মুখীন না করি (অর্থাৎ তাহাদের খারাপ কাজের কিছুটা পরিণতি দেখা না দেয়)। তথাপি তাহারা না তওবা করে, না সংশোধিত হয়। (—সূরা তওবা ঃ আয়াত ১২৬)

কিন্তু যখন এই সতর্কতা ও অবকাশ দান ব্যর্থ হয়, তাহা হইতে উদাসীন দল যদি কোন উপকার লাভ না করে, তখনই অন্যায় কাজের চরম পরিণতি আত্মপ্রকাশ করে। আর যখন সেই শেষ মুহূর্ত আসিয়া দেখা দেয়, তখনই প্রকৃতির চরম ও অটল বিধান দেখা দেয়। উহা এক মুহূর্ত আগে কিংবা পরে আসিতে পারে না।

وَلِكُلِّ اُمَّةٍ اَجَلٌ - فَاِذَا جَاءَ اَجَلُهُمْ لَايَسْتَاخِرُوْنَ سَاعَةً وَّ لَايَسْتَقْدِمُوْنَ - (٧ : ٣٤)

—আর (লক্ষ কর) প্রত্যেক জাতির জন্য একটি সময় নির্ধারণ করিয়া রাখা হইয়াছে। যখন সেই নির্দিষ্ট সময় উপস্থিত হইবে, এক মুহূর্তও আগ-পিছ হইবে না। (—সূরা আ'রাফ ঃ আয়াত ৩৪)

وَمَآ اَهْلَكْنَا مِنْ قَرْيَةٍ اِلَّا وَ لَهَا كِتَابٌ مَّعْلُوْمٌ - مَا تَسْبِقُ مِنْ اُمَّةٍ اَجَلَهَا وَمَا يَسْتَاْخِرُوْنَ - (١٥ : ٤ -٥)

—আর আমি কোন জনপদ নির্ধারিত সময়ের আগে বিধ্বস্ত করি নাই। কোন জাতিই তাহার নির্ধারিত সময়ের পিছে থাকিতে পারে না এবং আগেও যাইতে পারে না। (—সূরা হিজর ঃ আয়াত ৪-৫)

এভাবে কল্যাণকরের টিকিয়া থাকার ন্যায়বিচারের বিধান পূর্ববর্তী জাতিকে বিলীন করিয়া সেখানে নূতন জাতির পত্তন ঘটায়। আর তাহা রহ্‌মতের দাবি মিটাইবার জন্যই ঘটে।

ذَالِكَ اَنْ لَّمْ يَكُنْ رَّبُّكَ مُهْلِكَ الْقُرٰى بِظُلْمٍ وَّ اَهْلُهَا غَافِلُوْنَ - وَلِكُلٍّ دَرَجٰتٌ مِّمَّا عَمِلُوْا - وَمَا رَبُّكَ بِغَافِلٍ عَمَّا يَعْمَلُوْنَ - وَ رَبُّكَ الْغَنِىُّ ذُوْ الرَّحْمَةِ - اِنْ يَّشَاْ يُذْهِبْكُمْ وَ يَسْتَخْلِفْ مِنْۢ بَعْدِ كُمْ مَّا يَشَاءُ كَمَا اَنْشَاكُمْ مِّنْ ذُرِّيَّةِ قَوْمٍ اٰخَرِيْنَ - (٦ : ١٣١-١٣٣)

—ইহা (প্রচার ও প্রদর্শনের যাবতীয় ধারা) এইজন্য যে, তোমার প্রভুর অন্যায়ভাবে কোন বস্তি ধ্বংস করার অভিপ্রায় নাই। তিনি চাহেন না যে, বস্তির অধিবাসীরা প্রকৃত অবস্থা সম্পর্কে অজ্ঞ থাকুক। (তাঁহার নিয়ম হইল এই) যে যেরূপ কাজ করিবে, সেই কাজের মর্যাদা অনুসারেই ভাল-মন্দ ফলাফল আত্মপ্রকাশ করিতে থাকিবে আর স্মরণ রাখিও, যে যাহা করে, তোমার প্রভুর তাহা অজানা নহে। তোমার প্রভু অভাবহীন অথচ দয়াবান। ইচ্ছা হইলে তিনি তোমাদের সরাইয়া অন্যদল তোমাদের স্থলাভিষিক্ত করেন, যেভাবে তিনি তোমাদের পূর্ববর্তী বংশধরদের স্থলাভিষিক্ত করিয়াছেন। (—সূরা আন'আম ঃ আয়াত ১৩১-১৩৩)

ব্যক্তি-জীবনে পার্থিব প্রতিকার

এইভাবে কুরআন বলে, ব্যক্তি জীবনের ভাল বা মন্দ কাজের ফলাফল যে পার্থিব জীবনের সাথে না জুড়িয়া পরকালের জীবনের জন্য ঝুলাইয়া রাখা হইয়াছে এবং পৃথিবীতে যে ভাল ও মন্দ সবার জন্যই অবকাশ ও জীবিকার ব্যবস্থা রাখা হইয়াছে, তাহা আল্লাহ্‌র রহ্‌মতের কারণেই বটে। দয়া ও দান শ্রেণীভেদ চাহে না এবং জাতি-ধর্ম নির্বিশেষে সবাইকে আওতাভুক্ত দেখিতে চাহে। উহা ব্যক্তি-জীবনকে দুই ভাগে ভাগ করিয়া দিয়াছে ! একটি হইল পার্থিব জীবন, যেখানে তাহাদের পুরোপুরি সুযোগ দান করা হইয়াছে। দ্বিতীয়টি হইল পরকালের জীবন। সকল কর্মফল সেখানেই দেখা দিবে। এই সত্যটি কুরআন অন্যত্র এইভাবে প্রকাশ করিয়াছে ঃ

وَ رَبُّكَ الْغَفُوْرُ ذُو الرَّحْمَةِ - لَوْ يُؤَاخِذُ هُمْ بِمَا كَسَبُوْا لَعَجَّلَ لَهُمُ الْعَذَابَ - بَلْ لَّهُمْ مَوْعِدٌ لَّنْ يَّجِدُوْا مِنْ دُوْنِهٖ مَوْئِلاً - (١٨ : ٥٨)

—আর (হে রাসূল ! নিশ্চিত বিশ্বাস রাখ) তোমার প্রভু বড়ই ক্ষমাশীল ও দয়াবান। যদি তিনি তাহাদের কার্যকলাপ অনুসারে ধর-পাকড় করিতেন, তাহা হইলে সঙ্গে সঙ্গে তাহাদের উপর আজাব নাযিল হইত। কিন্তু সেইজন্য তিনি সময় নির্দিষ্ট করিয়া রাখিয়াছেন এবং যখন সেই সময় আসিয়া উপস্থিত হইবে,

তখন তাহাদের আশ্রয় নিবার কোন স্থানই থাকিবে না। (—সূরা কাহ্ফ ঃ আয়াত ৫৮)

هُوَ الَّذِىْ خَلَقَكُمْ مِّنْ طِيْنٍ ثُمَّ قَضٰى اَجَلاً - وَاَجَلٌ مُّسَمًّى عِنْدَهٗ -

—তিনিই (প্রভু) যিনি তোমাদের মাটি দ্বারা সৃষ্টি করিয়াছেন। তারপর তোমাদের জীবনের জন্য একটি সময় নির্দিষ্ট করিয়া দিয়াছেন। তেমনি তাঁহার কাছে আরও একটি নির্দিষ্ট দিন রহিয়াছে (অর্থাৎ কিয়ামতের দিন)। (—সূরা আন'আম ঃ আয়াত ২)

কুরআন বলে, জড়জগতে যেভাবে প্রকৃতি দুর্বলতা ও অনাচারের জন্য একটি অপরিহার্য পরিণতি রাখিয়াও শোধরাবার অবকাশ হইতে কাহাকেও বঞ্চিত করে নাই এবং সুযোগের পর সুযোগ দান করিতেছে, এমন কি সময় মতে তদ্‌বীর হইলে প্রকৃতি তাহা মানিয়া লইতেছে, ঠিক তেমনিভাবেই এক্ষেত্রে তাওবা ও প্রত্যাবর্তনের দ্বার খোলা হইয়াছে। কোন খারাপ কাজ, কোন অপরাধ বা কোন উচ্ছৃংখলতা তাহা যত বড় আকারে যত বেশি হইয়া দেখা দিক, যখনই মানুষের ভিতরে তওবা ও প্রত্যাবর্তনের অনুভূতি জাগে, আল্লাহ্‌র অপার দয়া তখনই তাহা কবূল করিয়া লয়। আর অনুশোচনার একবিন্দু অশ্রু পাপাচার ও অনাচারের অসংখ্য দাগ এমন ভাবে ধুইয়া-মুছিয়া নেয়, যেন সেখানে কোন দিন কোন দাগ দেখাই যায় নাই! তাই বলা হইয়াছে ঃ

اَلتَّائِبُ مِنَ الذَّنْبِ كَمَنْ لاَّ ذَنْبَ لَهٗ -

পাপ হইতে তওবাকারী তাহারই মত যে ব্যক্তির কোনই পাপ নাই।

اِلاَّ مَنْ تَابَ وَاٰمَنَ وَعَمِلَ عَمَلاً صَالِحًا فَاُولٰئِكَ يُبَدِّلُ اللّٰهُ سَيِّاٰتِهِمْ حَسَنٰتٍ - وَ كَانَ اللّٰهُ غَفُوْرًا رَّحِيْمًا - (٢٥ : ٧٠)

—হ্যাঁ, কিন্তু যে ব্যক্তি তওবা করিয়াছে, ঈমান আনিয়া পরবর্তীকালে ভাল কাজ করিয়াছে, তাহাদের মন্দ কাজগুলি আল্লাহ্ তা'আলা ভাল কাজ দ্বারা বদলাইয়া দেন। সত্যই আল্লাহ্ বড় ক্ষমাশীল ও অত্যন্ত দয়াবান। (—সূরা ফুরকান ঃ আয়াত ৭০)

কুরআন এক্ষেত্রে আল্লাহ্‌র দয়া ও ক্ষমার যে বিশাল ব্যাপ্তির কথা উল্লেখ করিয়াছে, তাহার কোন সীমা-পরিসীমা নাই। পাপ যতই হউক, যত বড়ই হউক আর যত পুরাতনই হউক কিন্তু যখনই পাপী তাঁহার রহ্‌মতের দুয়ারে হাত পাতিবে, ক্ষমা ছাড়া সেখান হইতে আর কোন জবাব পাইবে না।

قُلْ يَا عِبَادِىَ الَّذِيْنَ اَسْرَفُوْا عَلٰى اَنْفُسِهِمْ لاَتَقْنَطُوْا مِنْ رَّحْمَةِ اللّٰهِ - اِنَّ اللّٰهَ يَغْفِرُ الذُّنُوْبَ جَمِيْعًا - اِنَّهٗ هُوَ الْغَفُوْرُ الرَّحِيْمُ - (٣٩ : ٥٣)

—হে আমার ভৃত্যদল ! যাহারা পাপাচারে নিজের জীবনকে যথেষ্ট নিপীড়ন দান করিয়াছে, তোমাদের অনাচার যত কঠিন ও যত বেশি হউক না কেন, আল্লাহ্‌র দয়া হইতে নিরাশ হইও না। নিশ্চয়ই আল্লাহ্ তা'আলা তোমাদের সমস্ত পাপ মাফ করিয়া দিবেন। অবশ্যই তিনি অত্যন্ত ক্ষমাশীল ও নিতান্ত দয়াবান। (—সূরা যুমার ঃ আয়াত ৫৩)

ইসলামে 'রহমত' সম্পর্কিত ধারণা

এই কারণেই আমরা দেখিতে পাই যে, কুরআন মানুষের জন্য যে ধর্মবিশ্বাস ও কর্মনীতি ঘোষণা করিয়াছে, তাহার ভিত্তি সর্বতোভাবেই রহ্‌মত ও মহব্বতের (দয়া ও ভালবাসার) উপর প্রতিষ্ঠিত। কারণ কুরআন মানুষের আত্মিক জীবন ও বিশ্বপ্রকৃতির এই বিরাট কারাখানাটিকে বিচ্ছিন্ন দুইটি আলাদা বস্তু বলিয়া স্বীকার করে নাই। পরন্তু বিশ্ব প্রকৃতিরই সংশ্লিষ্ট একটি এলাকা বলিয়া মনে করে। কুরআন তাই বলে, গোটা বিশ্ব প্রকৃতির বুনিয়াদ যখন রহ্‌মতের উপরে প্রতিষ্ঠিত রহিয়াছে, তখন উহার এই সশ্লিষ্ট অংশটিতেও তাহার রহমতের বিধানই আগাগোড়া সক্রিয় থাকিবে।

আল্লাহ্ ও বান্দার প্রেমের সম্পর্ক

বস্তুত কুরআন নানা স্থানে এই সত্যটি উজ্জ্বল করিয়া তুলিয়া ধরিয়াছে যে, আল্লাহ্ ও বান্দার ভিতরকার সম্পর্ক হইল ভালবাসার। সত্যিকারের আবিদ সে , যাহার কাছে প্রভু শুধু প্রভুই নহেন, প্রিয়ও।

وَمِنَ النَّاسِ مَنْ يَّتَّخِذُ مِنْ دُوْنِ اللّٰهِ اَنْدَادًا يُّحِبُّوْنَهُمْ كَحُبِّ اللّٰهِ- وَالَّذِيْنَ اٰمَنُوْا اَشَدُّ حُبًّا لِّلّٰهِ - (٢ : ١٦٥)

—আর (লক্ষ কর) মানুষের ভিতরে এমন একদল মানুষ আছে যাহারা আল্লাহ্‌র সমান মর্যাদায় অন্য কিছুকেও ভাবিয়া থাকে। তাহারা আল্লাহ্‌কে যেভাবে কামনা করা উচিত, সেই বস্তুকে ঠিক তেমনিভাবেই কামনা করে। পক্ষান্তরে যাহারা ঈমান আনিয়াছে, তাহাদের আকর্ষণ শুধু আল্লাহ্‌তা'আলারই জন্য দেখা দেয়। (—সূরা বাকারা ঃ আয়াত ১৬৫)

قُلْ اِنْ كُنْتُمْ تُحِبُّوْنَ اللّٰهَ فَاتَّبِعُوْنِىْ يُحْبِبْكُمُ اللّٰهُ وَ يَغْفِرْلَكُمْ ذُنُوْبَكُمْ - وَاللّٰهُ غَفُوْرٌ رَّحِيْمٌ - (٣ : ٣١)

—(হে রাসূল ! তাহাদের) বলিয়া দাও, তোমরা যথার্থই আল্লাহ্‌কে ভালবাস, তাহা হইলে আমাকে অনুসরণ কর, (আমি তোমাদের আল্লাহ্‌কে ভালবাসার সঠিক পথ প্রদর্শন করিতেছি। তোমরা যদি তাহা কর, তাহা হইলে শুধু যে আল্লাহ্‌কে ভালবাসিতে শিখিবে, তাহাই নহে) পরন্তু আল্লাহ্ ও তোমাদিগকে

ভালবাসিতে থাকিবেন এবং তোমাদের গুনাহ্ মাফ করিয়া দিবেন। অনন্তর আল্লাহ্ তা'আলা বড়ই ক্ষমাশীল ও দয়াবান। (—সূরা আল'ইমরান ঃ আয়াত ৩১)

কুরআন বিভিন্ন স্থানে জোর দিয়া বলে, আল্লাহ্র উপরে ঈমান আনার পরিণতিই হইল তাঁহাকে ভালবাসা ও তাঁহার প্রিয়পাত্র হওয়া।

يَاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا مَنْ يَّرْتَدَّ مِنْكُمْ عَنْ دِيْنِهٖ فَسَوْفَ يَأْتِى اللّٰهُ بِقَوْمٍ يُّحِبُّهُمْ وَيُحِبُّوْنَهٗ - (٥ : ٥٤)

—হে ঈমানের আহ্বান অনুসারীবৃন্দ ! যদি তোমাদের ভিতরে কেহ আল্লাহ্র পথ হইতে সরিয়া যাও, (তাহা হইলে সে যেন মনে না কর যে, তাহার ফিরিয়া যাওয়ার ফলে সত্য খুব ক্ষতিগ্রস্ত হইল) শীঘ্রই আল্লাহ্ তা'আলা এমন একটি দল গড়িয়া তুলিবেন, যাহারা আল্লাহ্কে ভালবাসিবে এবং আল্লাহ্ও তাহাদিগকে ভালবাসিবেন। (—সূরা মায়িদা ঃ আয়াত ৫৪)

আল্লাহ্কে ভালবাসিলে বান্দাকেও ভালবাসিবে

আল্লাহ্কে ভালবাসিবার বাস্তব পথ হইল আল্লাহ্র বান্দাকে ভালবাসা। আল্লাহ্র বান্দাকে ভালবাসার মাধ্যমেই মানুষ আল্লাহ্র ভালবাসা লাভের পথ খুঁজিয়া পায়।

وَاٰتَى الْمَالَ عَلٰى حُبِّهٖ - (٢ : ١٧٧)

—আর যে ব্যক্তি নিজের সম্পত্তি আল্লাহ্র ভালবাসায় (মানুষের জন্য) খরচ করিয়া থাকে। (—সূরা বাকারা ঃ আয়াত ১৭৭)

وَ يُطْعِمُوْنَ الطَّعَامَ عَلٰى حُبِّهٖ مِسْكِيْنًا وَّ يَتِيْمًا وَّ اَسِيْرًا - اِنَّمَا نُطْعِمُكُمْ لِوَجْهِ اللّٰهِ لَا نُرِيْدُ مِنْكُمْ جَزَاءً وَّ لَاشُكُوْرًا - (٧٦ : ٨ - ٩)

—আর আল্লাহ্কে ভালবাসিয়া তাহারা মিস্কীন, ইয়াতীম ও কয়েদীদের খাওয়াইয়া থাকে, (আর বলিয়া থাকে) আমরা শুধু আল্লাহ্র খাতিরেই খাওয়াইতেছি। তাই আমরা তোমাদের কাছে ইহার জন্য কোন বিনিময় বা কৃতজ্ঞতা কামনা করি না।

এক হাদীসে এই সত্যটিকে অত্যন্ত আকর্ষণীয়ভাবে ফুটাইয়া তোলা হইয়াছে ঃ

يا ابن ادم مرضت فلم تعدنى قال كيف اعودك وانت رب العلمين ؟ قال اما علمت ان عبدى فلانا مرض فلم تعده ؟ اما علمت انك لوعدته لوجدتنى عنده ؟ يا ابن ادم استطعمتك فلم تطعنى قل يا رب كيف اطعمك وانت رب العلمين ؟ قال اما علمت انه استطعمك عبدى فلان فلم تطعمه ؟ اما علمت انك لو

اطعمته لوجدت ذالك عندى ؟ يا ابن ادم استسقيتك فلم تسقنى ، قال كيف اسقيتك وانت رب العلمين ؟ قال استسقاك عبدى فلان فلم تسقه اما انك لو سقيته لوجدت ذلك عندى - (مسلم عن ابى هريرة)

—কিয়ামতের দিন আল্লাহ্ তা'আলা এক ব্যক্তিকে ডাকিয়া বলিবেন,হে আদম সন্তান! আমি রোগশয্যায় শায়িত ছিলাম কিন্তু তুমি আমার সেবা-শুশ্রূষা কর নাই। বান্দা অবাক হইয়া বলিবে, হায় ! তাহা কি করিয়া হইতে পারে ? তুমি তো নিখিল সৃষ্টির প্রতিপালক প্রভু ! আল্লাহ্ জবাব দিবেন, তোমার কি জানা নাই যে, তোমার অমুক প্রতিবেশী রোগশয্যায় শায়িত ছিল এবং তুমি তাহার খবর লও নাই ? তুমি যদি তাহার সেবা-শুশ্রূষার জন্য যাইতে, তাহা হইলে আমাকে সেখানে পাইতে ! এ ভাবে আল্লাহ্ আবার বিলবেন—হে আদম সন্তান ! আমি তোমার কাছে আহার্য চাহিয়াছিলাম কিন্তু তুমি আমাকে খাইতে দাও নাই। বান্দা আরয করিবে—আচ্ছা, তাহা কি করিয়া হইতে পারে ? তোমারও কোন কিছুর অভাব হইতে পারে ? আল্লাহ্ তখন বলিবেন—তোমার কি স্মরণ নাই যে, আমার অমুক ভুখা বান্দা তোমার কাছে খাইতে চাহিয়াছিল এবং তুমি সাফ অস্বীকার করিয়াছিলে ? যদি তুমি তাহাকে খাদ্য দিতে , তাহা হইলে আমাকে সেখানে পাইতে। এভাবে আল্লাহ্ আবার প্রশ্ন করিবেন—হে আদম সন্তান ! আমি তৃষ্ণার্ত হইয়া তোমার কাছে পানি পান কিরতে চাহিয়াছিলাম। কিন্তু তুমি আমাকে পানি পান করাও নাই। বান্দা বিনীতভাবে জবাব দিবে—হায়, তাহা কি করিয়া হইতে পারে ? তুমি স্বয়ং সৃষ্টিজগতের প্রতিপালক ! তোমার কি করিয়া পিপাসা লাগিতে পারে ? তখন আল্লাহ্ জবাব দিবেন—আমার অমুক পিপাসার্ত বান্দা তোমার কাছে পানি ভিক্ষা চাহিয়াছিল কিন্তু তুমি তাহাকে পানি পান করাও নাই। তাহাকে পানি পান করাইলে আমাকে সেখানেই পাইতে।

এইভাবে কুরআন ইবাদত ও আমলের যে রীতি ও নক্শা চিত্রিত করিয়াছে, চরিত্র ও স্বভাবের ভিতরে যেইগুলির উপরে জোর দিয়াছে এবং আদেশ ও নিষেধের যে সব নীতিকে ভিত্তি হিসাবে নির্ধারিত করিয়াছে, সেই সব কিছুর ভিতরেই এই সত্য সক্রিয় রহিয়াছে। আর এই ব্যাপারটি এত সুস্পষ্ট হইয়া ধরা দিয়াছে যে, তাহা লইয়া বিতর্ক বা বর্ণনা কোন কিছুরই প্রয়োজন দেখা দেয় নাই।

এই কারণেই কুরআনে আল্লাহ্র এই 'দয়া' গুণটির মত আর কোন গুণ এত অধিক বার উল্লেখ করে নাই এবং এই রহ্মতের মত এত উজ্জ্বল হইয়াও কোন পৃষ্ঠায় অন্য কিছু ধরা দেয় নাই ! কুরআনের যে সব স্থানে 'রহ্মত' শব্দের উল্লেখ করা হইয়াছে, তাহা একত্র করিলে তিন শতাধিক হইবে। আর যদি 'রহ্মত'-এর

মর্ম ধরা হয়, তাহা হইলে কুরআনের আগাগোড়াই রহ্‌মতের বর্ণনায় ভরপুর বলা যায়।

আমি এখানে ইচ্ছা করিয়াই হাদীসের বর্ননাগুলি পরিহার করিয়া যাইতেছি। কারণ এখানে ব্যাপক আলোচনা পর্যালোচনার অবকাশ নাই। ইসলামের মহান পয়গম্বর (সা) তাঁহার কথা ও কাজ দ্বারা ইসলামের যে তত্ত্ব আমাদের কাছে তুলিয়া ধরিয়াছেন, তাহা মোটামুটি এই, একক আল্লাহ্‌র উপাসনা করা এবং তাঁহার বান্দাকে ভালবাসা ও দয়া করা। প্রত্যেক ওয়াজ-নসিহতকারীর মুখে আমরা যে বিখ্যাত হাদীসটি শুনিয়া থাকি তাহা এই ঃ

اِنَّمَا يَرْحَمُ اللّٰهُ مِنْ عِبَادِهِ الرُّحَمَاءَ –

—আল্লাহ্‌র রহ্‌মত তাহাদের জন্য যাহারা বান্দার প্রতি মেহেরবান।

হযরত ঈসা (আ)-এর বিখ্যাত বাণী এই ঃ বিশ্ববাসীর উপরে সদয় হও। তাহা হইলে যিনি আকাশে আছেন, তোমাদের উপরে সদয় থাকিবেন।

ঠিক এরূপ মর্মই রাসূলুল্লাহ্ (সা) হইতে শুনিতে পাই ঃ

الرحمن تبارك وتعالى ارحموا من فى الارض يرحمكم من فى السماء –

—মহান সেই পবিত্র দয়াবান। বিশ্বে যাহা কিছু আছে, তাহার প্রতি দয়া প্রদর্শন কর। তাহা হইলে আকাশের অধিপতি তোমাদের উপর দয়া প্রদর্শন করিবেন। শুধু তাহাই নহে। পরন্তু ইসলাম রহ্‌মত ও মহব্বতের যে ভাবধারা সৃষ্টি করিতে চাহিয়াছে, তাহার ব্যাপকতা এমন কি বোবা পশু-পাখি পর্যন্ত আওতাভুক্ত করিয়াছে। একাধিক হাদীস এই মর্মে পাওয়া যায় যে, আল্লাহ্‌র দয়া শুধু দয়ালু মানুষের উপরেই হইবে না, তিনি সামান্য পাখির প্রতিও দয়ালু।

من رحم ولو ذبيحة عصفور رحمه الله يوم القيامة –

—সামান্য পাখি হত্যার ব্যাপারেও যে সদয় হয়, আল্লাহ্ কিয়ামতে তাহার প্রতি সদয় হইবেন।

মোদ্দাকথা এই, কুরআন আল্লাহ্ অর্চনার ভিত্তি এই অনুভূতির উপরে স্থাপন করিয়াছে যে, মানুষ নিজের ভিতরে আল্লাহ্‌র গুণাবলি পূর্ণমাত্রায় অর্জন করিতে সচেষ্ট হইবে। কুরআন মানুষের অস্তিত্ব সেখান হইতে শুরু করিয়াছে, যেখানে এসে পশুত্বের স্তর শেষ হইয়া গিয়াছে। পশুর পরবর্তী উন্নত স্তরেই মানুষ অবস্থান করিতেছে। কুরআন বলে, মানুষের যে মনুষ্যত্ব যত পশুত্বের উর্ধ্বে অবস্থিত, তাহাতে আল্লাহ্‌র গুণাবলির তত সন্নিবেশ ভিন্ন আর কিছুই নহে। তাই পূর্ণ মানবতা বলিতে আমরা যথাসম্ভব আল্লাহ্‌র গুণাবলির অধিকতর সন্নিবেশকেই বুঝিয়া থাকি। এই কারণেই কুরআন যেখানেই মানুষের কোন গুণের উল্লেখ করিয়াছে, সোজাসুজি তাহা আল্লাহ্‌র সহিত সম্পৃক্ত করিয়াছে। এমন কি মানুষের মৌলিক উপাদান আল্লাহ্‌র ফুঁক হইতে সৃষ্টি বলিয়া ব্যক্ত করা হইয়াছে।

ثُمَّ سَوّٰهُ وَ نَفَخَ فِيْهِ مِنْ رُّوْحِهٖ وَجَعَلَ لَكُمُ السَّمْعَ وَالْاَبْصَارَ وَالْاَفْئِدَةَ - (٣٢ : ٩)

—পরে তিনি উহাকে (আদমকে) সুঠাম করিয়াছেন এবং উহাতে (আদম-এর ভিতরে) তাঁহার রূহ্ ফুঁকিয়া দিয়াছেন আর তোমাদের দিয়াছেন কর্ণ, চক্ষু ও অঃকরণ। (—সূরা সাজ্‌দা ঃ আয়াত ৯)

در ازل پر تو حسنت از تجلی دم زد
عشق پیدا شد و اتش به همه عالم زد !

স্রষ্টার জ্যোতির ফুঁকে রূপ পেল আদি সৃষ্টি তাই।
প্রেমের লীলায় জন্ম নিয়ে সৃষ্টি নিল বিশ্বে ঠাঁই।

তথাপি কুরআন যে আমাদের ভিতরে আল্লাহ্‌র 'রহ্‌মত' গুণটি সৃষ্টি করিতে চায়, তাহা এইজন্য যে, আপাদমস্তক যেন দয়া ও ভালবাসার পূর্ণ প্রতীক হইয়া দাঁড়ায়। কুরআন বারংবার আমাদের সামনে আল্লাহ্‌প্রদত্ত রবুবিয়াতের লীলাখেলা এইজন্য তুলিয়া ধরে যে, আমাদের ভিতরেও রবুবিয়াত গুণটির পূর্ণ বিকাশ ঘটুক। সে আমাদের সামনে আল্লাহ্‌র অপার ভালবাসা, অনুগ্রহ, অনুকম্পা দান-দক্ষিণা, ক্ষমা ও মহানুভবতার চিত্র এইজন্য অঙ্কিত করে যে, আমাদের ভিতরেও আল্লাহ্‌র এই অনুপম গুণাবলির প্রভাব ও প্রতিক্রিয়া সৃষ্টি হউক। বারংবার ক্ষমা ও দয়ার কথা শুনাইয়া কুরআন আমাদিগকে এই প্রেরণাই যোগায় যে, মানুষের উপরে মানুষ যেন ক্ষমাশীল ও দয়াবান হয়। যে ব্যক্তি অপরাধীকে দয়া করিয়া ক্ষমা করিতে পারে না, কি করিয়া আল্লাহ্‌র কাছে নিজ অপরাধের জন্য সে দয়া ও ক্ষমা আশা করিতে পারে ?

শরীআতের হুকুম-আহ্‌কাম অবশ্য এ কথা বলে না যে, দুশমনকে ভালবাস। কারণ ইহা অবাস্তব হইয়া দাঁড়ায়। কিন্তু কুরআন সেখানে বলে, দুশমনকেও ক্ষমা কর। কারণ দুশমনকে যে ক্ষমা করিতে শিখিবে, তাহার অন্তর মানুষের প্রতি কখনো হিংসা-বিদ্বেষ পোষণ করিবে না।

وَ الْكَاظِمِيْنَ الْغَيْظَ وَالْعَافِيْنَ عَنِ النَّاسِ - وَاللّٰهُ يُحِبُّ الْمُحْسِنِيْنَ - (٣ : ١٣٤)

—আর ক্রোধ দমনকারী ও শত্রুকে ক্ষমা প্রদর্শনকারী —আল্লাহ্‌তা'আলা (এই সব) মহানুভবদের ভালবাসেন।

وَالَّذِيْنَ صَبَرُوْا ابْتِغَاءَ وَجْهِ رَبِّهِمْ وَ اَقَامُوْا الصَّلٰوةَ وَ اَنْفَقُوْا مِمَّا رَزَقْنٰهُمْ سِرًّا وَّ عَلَانِيَةً وَّ يَدْرَءُوْنَ بِالْحَسَنَةِ السَّيِّئَةَ اُولٰئِكَ لَهُمْ عُقْبَى الدَّارِ - (١٣ : ٢٢)

—আর যাহারা আল্লাহ্‌কে ভালবাসিয়া (তিক্ততা ও অসহনীয়তা) সহ্য করিয়া যায়, নামায আদায় করে, আল্লাহ্ প্রদত্ত রুজি প্রকাশ্যে ও গোপনে দান করে এবং দুর্ব্যবহারের জবাব সদ্ব্যবহার দ্বারা দিয়া থাকে, তাহাদের জন্যই পরকালের উত্তম নিবাস।

وَلَمَنْ صَبَرَ وَ غَفَرَ اِنَّ ذَالِكَ لَمِنْ عَزْمِ الْاُمُوْرِ – (٤٢ : ٤٣)

—আর (লক্ষ কর) যে ব্যক্তি সহ্য করিল ও ক্ষমা করিল, নিশ্চয়ই ইহা অত্যন্ত উন্নত মনের ও সৎসাহসের পরিচায়ক।

وَ لَاتَسْتَوِى الْحَسَنَةُ وَلَا السَّيِّئَةُ – اِدْفَعْ بِالَّتِىْ هِىَ اَحْسَنُ فَاِذَا الَّذِىْ بَيْنَكَ وَ بَيْنَهٗ عَدَاوَةٌ كَاَنَّهٗ وَلِىٌّ حَمِيْمٌ – وَمَا يُلَقّٰهَا الَّذِيْنَ صَبَرُوْا – وَمَا يُلَقّٰهَا اِلَّا ذُوْ حَظٍّ عَظِيْمٍ – (٤١ : ٣٤ – ٣٥)

—আর (ভাবিয়া দেখ) ন্যায় ও অন্যায় এক হইতে পারে না। যদি কেহ কোন অন্যায় করে, তবে তাহার জবাব ন্যায় দ্বারা দিও। যদি এরূপ কর, তাহা হইলে দেখিতে পাইবে, যে ব্যাক্তির সহিত তোমার শত্রুতা, সহসা সে তোমার বন্ধু হইয়া যাইবে। অবশ্য ইহা (মানবতার এই স্তর) ধৈর্যশীলরাই করিতে পারে। আর পুণ্য ও সৌভাগ্যের বদৌলতে বিরাট সৌভাগ্যবানরাই তাহা পারে।

ইহা নিঃসন্দেহে বলা চলে যে, ইহাতে প্রতিকার ও প্রতিশোধ স্পৃহা বন্ধ করার কথা বলা হয় নাই, তাহা সম্ভবও নহে। কারণ এই স্পৃহা মানুষের সহজাত ও মজ্জাগত। তাই যেখানে এই স্বাভাবিক বৃত্তিটি সম্পাদনের অনুমোদন দান করা হইয়াছে, সেখানেই ক্ষমা ও দয়ার ব্যবহার এবং অন্যায়ের জবাবে ন্যায় পথ অনুসরণের প্রেরণাও দান করা হইয়াছে। আর তা এমনিভাবে বলা হইয়াছে যে, আল্লাহ্‌ভীরু বান্দার পক্ষে তাহা উপেক্ষা করা কিছুতেই সম্ভবপর নহে।

وَاِنْ عَاقَبْتُمْ فَعَاقِبُوْا بِمِثْلِ مَا عُوْقِبْتُمْ بِهٖ – وَلَئِنْ صَبَرْتُمْ لَهُوَ خَيْرٌ لِّلصّٰبِرِيْنَ – (١٦ : ١٢٦)

—আর (লক্ষ কর) যদি তোমরা প্রতিশোধ লইতে চাও, তাহা ইহলে যতটুকু তোমার সহিত অন্যায় করা হইয়াছে, ঠিক ততটুকু প্রতিশোধ গ্রহণ করিতে পার (যেন বাড়াবাড়ি আদৌ না হয়)। কিন্তু যদি তোমরা সহ্য কর এবং প্রতিশোধ না লও, তাহা হইলে (মনে রাখিও) সহ্যকারীদের সহ্য করার ভিতরেই মঙ্গল নিহিত রহিয়াছে। (—সূরা নহল ঃ আয়াত ১২৬)

وَجَزٰؤُا سَيِّئَةٍ سَيِّئَةٌ مِّثْلُهَا – فَمَنْ عَفَا وَاَصْلَحَ فَاَجْرُهٗ عَلَى اللّٰهِ– (٤٠ : ٤٢)

—আর অন্যায় কার্যের বদলা ঠিক ততটুকু অন্যায় সাধনে হইতে পারে। কিন্তু যে ব্যক্তি ক্ষমা করিয়াছে এবং ব্যাপারটি বাড়াইবার স্থলে মিটাইয়া নিয়াছে, তাহার সুফল স্বয়ং আল্লাহ্‌র হাতে রহিয়াছে। (—সূরা শুরা ঃ আয়াত ৪০)

ইঞ্জিল ও কুরআন

আমি কুরআনের দয়া ও ক্ষমা প্রদর্শনের আয়াত উদ্ধৃত করিয়া সঙ্গে সঙ্গে ইহাও বলিয়াছি যে, কুরআন শত্রুর সহিত প্রেম করিতে বলে না। কারণ তাহা বাস্তবসম্মত নহে। মুখে অবশ্য বলা যাইতে পারে এবং উহা লোক-দেখানো ব্যাপার হইতে পারে। এই কথাটির সংক্ষেপে কিছুটা বিশ্লেষণ দরকার।

হযরত ঈসা (আ) ইহুদীদের বাহ্যিক অনুষ্ঠানের অন্তঃসারশূন্যতা ও নৈতিক দুর্বলতার স্থলে দয়া ও প্রেম এবং ক্ষমা ও মার্জনার উপরে জোর দিয়াছিলেন। তাহার সত্যের ডাকের মূল প্রাণ ইহাই ছিল। বস্তুত ইঞ্জিলের স্থানে স্থানে এই ধরনের নসীহতই আমরা দিখেতি পাই ঃ তোমরা শুনিয়া থাকিবে যে, আগেকার উম্মতদের বলা হইয়াছিল, দাঁতের বদলে দাঁত, ছোখের বদলে চোখ নেওয়া হইবে—কিন্তু আমি বলিতেছি, দুষ্টের মুকাবিলা করিও না। অথবা শুধু প্রতিবেশীকেই নহে, শত্রুকেও ভালবাসিবে। অথবা—যদি কেহ তোমার এক গালে চড় লাগায়, তাহা হইলে আরেক গাল আগাইয়া দেওয়া চাই।

প্রশ্ন জাগে, এসব নসীহতের ভিত্তিমূল কি ছিল ? ইহা কি চারিত্রিক মর্যাদা সৃষ্টির জন্য একটি আত্মোৎসর্গী প্রেরণা মাত্র ছিল, না শরীআতের প্রবর্তন এরূপ বিধানই প্রবর্তন করিয়াছিলেন ?

আক্ষেপ এই, ইঞ্জিলের ভুক্ত ও ব্যাখ্যাতা উভয় দলই এখানে হোঁচট খাইয়াছেন। উভয় দলই এই ভুল ধারণা লইয়া আছে যে, ইহা শরীআতের বিধান ছিল। তাই উভয় দলকেই শেষ পর্যন্ত স্বীকার করিতে হইয়াছে যে, শরীআতের এই বিধানটি অবাস্তব ও কার্যকরী হইবার অযোগ্য। ভক্তদের বিশ্বাস যে, যদিও অবাস্তব, তথাপি ঈসায়ী শরীআতের বিধান ইহাই। ইহার কার্যকারিতা সম্পর্কে এতটুকু ধারণা রাখাই যথেষ্ট যে, ঈসায়ী ধর্মের প্রারম্ভে কয়েকজন সাধক ও শহীদ এই আইন পালন করিয়া গিয়াছেন। সমালোচকদের বিশ্বাস, ইহা একটি অবাস্তব বিধান। বলা যত সহজ ও সুমুধুর, করা তত কঠিন ও অসাধ্য। মানুষের প্রকৃতির ইহা সম্পূর্ণ বিপরীত শিক্ষা। শুধু শিক্ষার খাতিরেই এই শিক্ষা দেওয়া যায়।

মূলত মানবতার ইতিহাসের এই মহান শিক্ষকের সহিত মানব জাতির ইহা বড় বেদনাদায়ক অবিচার বটে। নির্দয় সমালোচকরা যেভাবে তাঁহাকে বুঝিতে প্রয়াস পায় নাই, তেমনি মূর্খ ভক্তেরাও নিজেদের বুদ্ধি-বিবেচনা প্রয়োগে ব্যর্থতা দেখাইয়াছে।

কিন্তু কুরআনের সত্যিকারের কোন অনুসারী কি এরূপ ধারণা করিতে পারে যে, হযরত ঈসা (আ)-এর শিক্ষা মানব প্রকৃতির বিরোধী ও অবাস্তব ছিল ? সত্য কথা

এই, কুরআনের সত্যতা স্বীকার করিয়া কেহই এরূপ কুরআন বিরোধী ধারণা পোষণ করিতে পারে না। যদি আমরা মুহূর্তের জন্যও ইহা মানিয়া লই, তাহা হইলে হযরত ঈসা (আ)-এর শিক্ষার যথার্থতা তাহাতে অস্বীকার করা হয়। কারণ যে শিক্ষা মানব প্রকৃতির বিরোধী, তাহা কখনও যথার্থ ও সত্য শিক্ষা হইতে পারে না। এরূপ ধারণা তাই শুধু যে কুরআনের শিক্ষার বিপরীত তাহাই নহে, পরন্তু, উহার আহবানের মূলনীতি বানচাল করিয়া দেয়। কুরআনের আহ্বানের মূলনীতি হইল এই, দুনিয়ার সব নবী ও রসূলের সমান মর্যাদার স্বীকৃতি দান করা এবং সবাইকে একই আল্লাহ্র সত্য বাণীবাহক বলিয়া ঘোষণা করা। সে বলে ধর্মানুসারীদের সব চাইতে মারাত্মক ভ্রান্তি হইল, রাসূলদের ভিতরে ব্যবধান সৃষ্টি করা। অর্থাৎ ঈমান ও ধ্যান-ধারণার দিক হইতে আল্লাহ্র রাসূলদের ভিতরে ব্যবধান সৃষ্টি করা, একজনকে মান্য করা ও অন্যান্যকে মিথ্যা প্রমাণ করা কিংবা সবাইকে মান্য করিয়া কোন একজনকে অস্বীকার করা অপরাধের কাজ। তাই কুরআন সুস্পষ্ট ভাষায় ঘোষণা করে ঃ

لَا نُفَرِّقُ بَيْنَ اَحَدٍ مِّنْهُمْ - وَ نَحْنُ لَهٗ مُسْلِمُوْنَ - (٣ : ٨٤)

—আমরা আল্লাহ্র রাসূলদের কাহাকেও পৃথকভাবে দেখি না এবং আমরা আল্লাহ্র (যে কোন বিধি-ব্যবস্থাই মানিবার জন্য) কাছে মাথা ঝুঁকাইয়া দিয়াছি। (—সূরা আল'ইমরান ঃ আয়াত ৮৪)

তাহা ছাড়া স্বয়ং মহান কুরআনও হযরত ঈসা (আ)-এর প্রচারের এই দিকটি উল্লেখ করিয়াছে যে, তিনি রহমত ও মহব্বতের খোদায়ী দূত ছিলেন। তাই সে ইহুদী চরিত্রের কাঠিন্য ও নিষ্ঠুরতার স্থলে ঈসায়ী চরিত্রের সারল্য ও দয়ার্দ্রতার প্রশংসা করিয়াছে।

وَ لِنَجْعَلَهٗ اٰيَةً لِّلنَّاسِ وَ رَحْمَةً مِّنَّا - وَ كَانَ اَمْرًا مَّقْضِيًّا - (١٩ : ٢١)

—আর আমার উদ্দেশ্য হইল, তাহাকে [হযরত ঈসা (আ)-কে] মানুষের জন্য এই উদাহরণ ও আমার রহমতের একটি বাস্তব মূর্তিরূপে প্রতীয়মান করিব এবং ব্যাপারটি (আল্লাহ্র ধারণায়) পূর্ব-নির্ধারিত ছিল। (—সূরা মারয়াম ঃ আয়াত ২১)

وَ جَعَلْنَا فِىْ قُلُوْبِ الَّذِيْنَ اتَّبَعُوْهُ رَاْفَةً وَّ رَحْمَةً - (٥٧ : ٢٧)

—আর তাহাদের [হযরত ঈসা (আ)-এর অনুসারীদের] অন্তরে আমি প্রেম ও দয়া ঢালিয়া দিয়াছি। (—সূরা হাদীদ ঃ আয়াত ২৭)

এখানে এই কথাটিও স্মরণ রাখা চাই যে, কুরআন নিজের ব্যাপারে যে সব গুণ বর্ণনা করিয়াছে, পূর্ণ আন্তরিকতার সহিত সেই সব গুণ, তাওরাত ও ইঞ্জিল সম্পর্কেও বর্ণনা করিয়াছে। কুরআন যেমনি নিজকে পথপ্রদর্শক, আলোধারী উপদেষ্টা জাতির

নায়ক ও আল্লাহ্‌ভীরুদের পথনির্দেশক বলিয়া আখ্যায়িত করিয়াছে, ঠিক তেমনি আগেকার ঐশী গ্রন্থগুলিকেও উল্লিখিত গুণাবলিতে ভূষিত করিয়াছে। বস্তুত ইঞ্জিল সম্পর্কে আমরা কুরআনে দেখিতে পাই ঃ

وَ اٰتَيْنٰهُ الْاِنْجِيْلَ فِيْهِ هُدًى وَّ نُوْرٌ - وَمُصَدِّقًا لِّمَا بَيْنَ يَدَيْهِ مِنَ التَّوْرٰةِ وَّ مَوْعِظَةً لِّلْمُتَّقِيْنَ -

আর আমি তাহাকে [ঈসা (আ)-কে] ইঞ্জিল দান করিয়াছি। তাহাতে পথের সন্ধান রহিয়াছে, আলো আছে এবং উহার সামনে যেসব ঐশী গ্রন্থ বিদ্যমান, সেইগুলিকে সত্য বলিয়া প্রচার করে। তেমনি তাওরাতেও পথের সন্ধান রহিয়াছে, রহিয়াছে ধর্মপ্রাণদের জন্য যুক্তিযুক্ত উপদেশ।

ঈসায়ী প্রচারের মূল তত্ত্ব

মূলত হযরত ঈসা (আ)-এর এই সব শিক্ষাকে ভুল বুঝা হইয়াছে। ভুল বুঝার চাইতে অস্বীকার করা বড় বিভ্রান্তি হইতে পারে না।

হযরত ঈসা (আ)-এর আবির্ভাব তখনই ঘটিয়াছিল, যখন ইহুদীদের চারিত্রিক পতন চরমে পৌঁছিয়াছিল। তখন তাহারা আত্মিক পবিত্রতা ও চারিত্রিক সততার চাইতে বাহ্যিক ধর্মীয় আচার-অনুষ্ঠানের উপর অধিক গুরুত্ব আরোপ করিতেছিল। ইহুদী ভিন্ন আশেপাশে যেসব সভ্য জাতি বিরাজ করিত (যথা, রুমী, মিসরী, আশুরী, ইত্যাদি) তাহারাও মানবতা প্রীতি ও সহৃদয়তার সহিত সম্পূর্ণ অপরিচিত ছিল। মানুষ তখন এ কথাটি জানিয়া নিয়াছিল যে, অপরাধীকে শাস্তি দিতে হয়। কিন্তু এ কথাটি জানিত না যে, প্রেম-প্রীতি ও দয়া-মার্জনা দ্বারা অপরাধের মূলোচ্ছেদ করা যাইতে পারে। নরহত্যার লীলাখেলা দেখা, নানা প্রকার ভয়াবহ শাস্তির দ্বারা অপরাধীকে ধ্বংস করা, জীবিত মানুষকে হিংস্র পশুর সামনে নিক্ষেপ করা, আবাদ শহরকে অহেতুক আগুন লাগাইয়া জ্বালাইয়া দেওয়া, নিজ সম্প্রদায় ছাড়া দুনিয়ার সকল মানুষকে গোলাম মনে করা ও ক্রীতদাস করিয়া রাখা, দয়া-প্রেম ও ধৈর্য-কৃপার স্থলে অন্তরে নিষ্ঠুরতা ও নির্দয়তা নিয়া গর্ব করা রোমক সভ্যতার নৈকিত বৈশিষ্ট্য ও মিসরী-আশুরী দেবতাদের পসন্দনীয় কাজ ছিল।

সুতরাং অপরিহার্য ছিল যে, তখন মানব জাতিকে সত্য পথের সন্ধান দিবার জন্য যে ঐশীদূত প্রেরিত হইবেন, তিনি আগাগোড়া দয়া ও প্রেমের প্রতীক হইবেন এবং তাঁহার সর্বপ্রভাব নিয়োজিত করিয়া মানব হৃদয়কে সেই প্রেরণায় উদ্বুদ্ধ করিয়া তুলিবেন! বস্তুত হযরত ঈসা (আ)-এর ব্যক্তিত্বে তাহাই ধরা দিয়াছে। তিনি দেহের স্থলে আত্মার, জিহবার, জিহ্বার স্থলে হৃদয়ের এবং বাহ্যিক ছাড়িয়া আভ্যন্তরীণ ব্যাপারের দিকে মানব জাতির দৃষ্টি আকর্ষণ করিয়াছেন। এইভাবে উন্নত মানবতার যে শিক্ষা মানুষ ভুলিয়া গিয়াছিল, তাহাই তিনি আবার জাগাইয়া তুলিলেন।

হযরত ঈসা (আ)-এর ওয়াজ ও শরী'আত এক নহে

সাধারণ হইতে সাধারণতর একটি কথা যদি কিছুটা আলঙ্কারিকভাবে বলা হয়, উহারও একটি বাহ্যিক ও একটি মর্মার্থ থাকে। স্বভাবতই অত্যন্ত আলঙ্কারিক ভাষায় বর্ণিত ওহীরও একটি বাহ্যিক অর্থ থাকিবে। উহাই হইল বাক্যটির প্রভাব বিস্তারের অলঙ্কার ও অন্তরে ঠাঁই নিবার আকর্ষণীয় দিক। কিন্তু আক্ষেপ এই, যে যুগের পৃথিবী ত্রিত্ববাদ ও কুফরীর মত বাতিল চিন্তাধারার জন্ম দিয়াছে, তাহা হযরত ঈসা (আ)-এর ওয়াজের তাৎপর্য উপলব্ধি করিতে ব্যর্থ হইয়াছে এবং বাহ্যিক অর্থকে মর্মার্থ মনে করিয়া ভুল ধারণার শিকারে পরিণত হইয়াছে !

তিনি যখনই বলিয়াছেন, 'শত্রুকে ভালবাস,' তখন নিশ্চয়ই তিনি এই অর্থে তাহা বলেন নাই যে, শত্রুর প্রেমে প্রত্যেকের পাগলপারা হওয়া চাই। বরং তিনি সরল-সহজভাবে ইহাই বুঝাইতে চাহিয়াছেন যে, তোমাদের ভিতরে ক্রোধ-উত্তেজনা, হিংসা-বিদ্বেষ ও প্রতিশোধ-স্পৃহার স্থলে দয়া ও ভালবাসার পূর্ণ প্রেরণা জাগ্রত হওয়া উচিত। এরূপ হওয়া চাই যে, বন্ধু তো বন্ধু, শত্রুর বেলায়ও ক্ষমা-দয়ার আশ্রয় নেওয়া উচিত। দয়া কর, ক্ষমা কর, প্রতিশোধ লইও না—এই মর্মগুলি সার্থকভাবে এই এক কথায় সুস্পষ্ট করিয়া তোলা হইয়াছে যে—'দুশমনকেও ভালবাস'। ইহা সেখানেই প্রচার করা হইয়াছে, যেখানে বন্ধুর সঙ্গেও অনুগ্রহ ও প্রীতির সম্পর্ক ছিল না। সেক্ষেত্রে 'শত্রুকেও ভালবাস' কথাটি দয়া ও প্রেমের একটি পূর্ণাঙ্গ ধারা ও উন্নত ধারণা সৃষ্টি করিয়াছে।

شنیدم که مردان راه خدا
دل دشمنان هم نه کردند تنگ !
ترا کے میسر شود این مقام
که باد وستانت خلافست و جنگ !

শুনেছি এ কথা আল্লাহ্‌র পথের প্রেমিক দরবেশ
বন্ধু তো দূরে, শত্রুর প্রাণে দিত না কখনো ক্লেশ।
তোমাদের মাঝে সেই উদারতা লাভ হয় যদি কারো
রণাঙ্গনের শত্রু যে তারে বন্ধু ভাবিতে পার।

কিংবা তিনি বলিয়াছেন, 'যদি কেহ তোমাদের গালে এক চপেটাঘাত করে, তাহাকে আরেক গাল আগাইয়া দাও।' নিশ্চয়ই এ কথার অর্থ এই নয় যে, সত্য সত্যই তুমি আরেক গাল বাড়াইয়া দিবে। বরং উহার মর্ম এই যে, এরূপ ক্ষেত্রে ক্ষমা ও মার্জনার পথ অনুসরণ কর। ভাষালঙ্কারের এই মারপ্যাঁচ সব ভাষাতেই রহিয়াছে এবং এই সব ক্ষেত্রে ভাবার্থ উদ্ধার না করিয়া শব্দার্থ গ্রহণ করাকে সবাই মূর্খতার শামিল মনে করিয়া আসিতেছে। যদি আমরা এই ভাবের ব্যঞ্জনাপূর্ণ বাক্যের সর্বদা

বাহ্যিক অর্থ গ্রহণ করি, তাহা হইলে শুধু ঐশী বাণীগুলির শিক্ষা হইতেই বঞ্চিত হইব না, বরং মানুষের যেসব ভাবপূর্ণ সাহিত্য পদবাচ্য গ্রন্থাবলি এ পর্যন্ত যত ভাষায় রচিত হইয়াছে, সবই নিরর্থক হইবে।

এখন শুধু এই কথাটি বুঝিবার বাকি রহিয়াছে যে, হযরত ঈসা (আ) শাস্তির স্থলে কেবল ক্ষমা ও দয়ার উপরই জোর দিয়াছেন কেন ? আদপে তাঁহার উপদেশগুলির মূলসূত্র উপলব্ধি করার পরে এই কথাটিও পরিষ্কার হইয়া গিয়াছে। সন্দেহ নাই, শরীআতে অবশ্যই শাস্তি ও প্রতিকার ব্যবস্থা বিদ্যমান ছিল। কিন্তু তাহা এইজন্য নহে যে, এই ব্যবস্থা প্রশংসনীয়। বরং মানুষের এমন অবস্থাও দেখা দেয়, যখন ইহা অপরিহার্য হইয়া উঠে। আরেক কথায় বলা চলে, বড় রকমের খারাপ কাজ বন্ধ করার জন্য অপেক্ষাকৃত এই ছোট রকমের খারাপ কাজের ব্যবস্থা করা হইয়াছে। কিন্তু পৃথিবীর মানুষ মানুষের অন্যায় রুখিবার এই ধন্বন্তরি ব্যবস্থাকে বিলোপ করিয়া নিজেদের মনগড়া ব্যবস্থা প্রবর্তন করিল ! ধীরে ধীরে এই পরিবর্তন মানব সভ্যতা ধবংসের এক মারাত্মক হাতিয়ারে পরিণত হইল।

বস্তুত আমরা দেখিতেছি, মানুষের হত্যা ও ধ্বংসলীলার ভয়াবহতা এরূপ আর কোন কিছুই সৃষ্টি করিতে পারে নাই, যাহা শরী'আত ও আইনের নামে সম্ভবপর হইয়াছে। মূলত উহা শরী'আতে ও আইনের শাস্তির বিধানের নামে বাড়াবাড়ি ছাড়া আর কিছুই ছিল না। ইতিহাসের পাতা উলটাইলে দেখিব, যুদ্ধের ময়দানের মত এত মারাত্মক ও ব্যাপক নরহত্যার স্থান আর কোথাও নাই। নিশ্চয়ই তাহা সেই শরী'আতে কিংবা আদালতের নাম নিয়াই সংঘটিত হয়। ধর্ম ও আদালত সর্বদা মানুষের ধ্বংসলীলার ব্যাপকতা অব্যাহত রাখার জন্য যত সব বর্বর ও ভয়াবহ ব্যবস্থা জারি রাখিয়াছে।

সুতরাং হযরত ঈসা (আ) যদি শাস্তি ও কঠোরতার স্থলে আগাগোড়া দয়া ও ক্ষমার উপর জোর দিয়া থাকেন, তাহা এইজন্য নহে যে, তিনি শাস্তি ও প্রতিকার রীতির বদলে কোন নূতন শরী'আত জারি করিতে চাহিয়াছিলেন। বরং তাঁহার উদ্দেশ্য এই ছিল যে, ধর্ম ও আদালতের নামে মানুষ যে মারাত্মক বিভ্রান্তির অতল তলে নিমজ্জিত হইয়া চলিয়াছে, তাহা হইতে মানুষকে মুক্তি দান। শাস্তি ও কঠোরতার চরম বাড়াবাড়িতে পরিপূর্ণ পৃথিবীর মানুষকে তিনি এই শিক্ষাই দিতে চাহিয়াছেন যে, মানুষের আসল ধর্ম হইল দয়া ও ক্ষমা। সমাজ ও রাষ্ট্রীয় আইনে যদিও শাস্তি ও কঠোরতা রাখা হইয়াছে, তাহা শুধু অপরিহার্য পরিস্থিতির মুকাবিলা করার জন্যই। কিন্তু তাহা কিছুতেই তোমাদের অন্তর হইতে দয়া ও ক্ষমা গুণের মূলোৎপাটন ঘটাইয়া সেখানে আগাগোড়া ঘৃণা ও প্রতিশোধ স্পৃহা জন্মাইবার জন্য নহে।

হযরত মূসা (আ)-এর শরী'আতের অনুসারীরা শরী'আতকে শুধু সাজাদানের যন্ত্র হিসাবে ব্যবহার করিত। হযরত ঈসা (আ) শিক্ষা দিলেন, শরী'আত সাজা দিবার

জন্য আসে নাই, আসিয়াছে মানুষের শান্তি ও মুক্তির পয়গাম শুনাইতে। সেই পথ ষোল আনাই হইল দয়া ও ভালবাসার পথ।

কর্ম ও কর্মীর প্রভেদ

মূলত এই ব্যাপার মানুষের মৌলিক ত্রুটি হইল এই, তাহারা কর্ম ও কর্মীর ভিতরে তফাৎ কোথায়, তাহা বুঝে নাই। বস্তুত ধর্মীয় শিক্ষার যতখানি সম্পর্ক রহিয়াছে, তাহাতে কর্ম কি জিনিস এবং কর্মী কে, তাহার ভিতরে যথেষ্ট পার্থক্য দেখা যায়। এই উভয়কে ধর্ম কখনো একাকার মনে করে না। এ কথায় সন্দেহ নাই যে, পৃথিবীর সকল ধর্মেরই সার্বজনীন উদ্দেশ্য হইল পাপ ও অন্যায় কাজের প্রতি মানুষের ঘৃণা সৃষ্টি করা। কিন্তু তাহা বলিয়া ধর্ম কখনো ইহা সহ্য করে নাই যে, এইজন্য স্বয়ং মানুষের প্রতি মানুষের ঘৃণা সৃষ্টি হউক। ধর্ম নিশ্চয়ই এই কথা বলিয়াছে যে, পাপকে ঘৃণা কর। কিন্তু কখনো এ কথা বলে নাই যে, পাপীকে ঘৃণা কর। তাহার উদাহরণ এই ভাবে দেওয়া যায় যে, একজন ডাক্তার সর্বদা মানুষকে রোগের জন্য ভয় করিতে বলে। অনেক সময়ে সে রোগের বিভীষিকা এরূপ ভীষণ ভাবে চিত্রিত করে যে, দর্শকরা তাহা দেখামাত্র হিমশিম খাইয়া যায়। কিন্তু সে তো কখনো রোগীকে ঘৃণা বা ভয় করিতে শিখায় না। পরন্তু, রোগের প্রতি তাহার দৃষ্টি ও কৃপা বেশি আকৃষ্ট হয়। যে যত বড় রোগী হয়, তাহার প্রতি তাহার দয়া ও কৃপাদৃষ্টি অধিক দেখা দেয়।

রোগ ও রোগী

সুতরাং যেভাবে দেহের ডাক্তাররা রোগের প্রতি ঘৃণা ও রোগীর জন্য দরদ শিক্ষা দেয়, ঠিক তেমনিভাবে অন্তরের ডাক্তাররা পাপের প্রতি ঘৃণা ও পাপীর জন্য দরদ শিক্ষা দেয়। নিশ্চয়ই তাঁহারা আমাদের অন্তরের রোগের জন্য সতর্ক করে, উহাকে ভয় করিতে শিখায়, ঘৃণা করিতে শিখায়। কিন্তু পাপীকে ঘৃণা করিতে শিখায় না। এই সূক্ষ্ম স্থানটিতেই ধর্মানুসারী দল আসিয়া হোঁচট খাইয়াছে। ধর্মগুলি চাহিয়াছিল, পাপের প্রতি মানুষের ঘৃণা সৃষ্টি হোক অথচ পাপকে ঘৃণা করার বদলে তাহারা তাহাদের খেয়ালে যাহাদের পাপী মনে হইত, তাহাদের সবাইকে ঘৃণা করিতে শুরু করিল।

পাপকে ঘৃণা কর—পাপীকে নহে

হযরত ঈসা (আ)-এর শিক্ষা দর্শনের মূলনীতি ইহাই ছিল যে, পাপকে ঘৃণা কর—পাপীকে নহে। যদি কেহ পাপ করে, তাহার অর্থ এই যে, সেই ব্যক্তির অন্তর রুগ্ন হইয়াছে। তাহার মনের সুস্থতা অবশিষ্ট নাই। দুর্ভাগ্যবশত যখন সে নিজের মানসিক সুস্থতা হারাইয়াছে, তখন কেন তোমরা তাহাকে ঘৃণা করিবে? সে তো নিজ স্বাস্থ্য হারাইয়া তোমাদের অধিক কৃপা ও ভালবাসার দাবি রাখে। তুমি তোমার রুগ্ন

ভাইর সেবা-শুশ্রূষা করিবে, না তাহাকে জল্লাদের হাতে সোপর্দ করিয়া দোর্‌রা মারিবার ব্যবস্থা করিবে ? সেন্ট লুকার সেই বর্ণনা স্মরণ কর। এক পাপীয়সী নারী যখন হযরত ঈসা (আ)-এর কাছে আসিল, তখন চুল দিয়া তিনি সেই নারীর পদযুগল মুছিয়া দিলেন। ইহা দেখিয়া রিয়াকার ফারিসিও অত্যন্ত অবাক হইয়া গেল (ফারিসিও'র নামেই শেষ পর্যন্ত রিয়াকারীর নাম হইয়াছে Pharisaism)। তিনি তাহা দেখিয়া বলিলেন—রোগীদের জন্যই ডাক্তার চাই ; সুস্থ মানুষের জন্য নহে। তারপর তিনি আল্লাহ্ ও তাঁহার পাপী বান্দার ভিতরকার দয়া-মায়ার সম্পর্কের নিতান্ত এক আবেদনপূর্ণ বর্ণনা দান করেন। ধর, এক মহাজন একজনকে পঞ্চাশ টাকা ও একজনকে এক হাজার টাকা ধার দিয়া উভয়কে অক্ষম দেখিয়া ঋণ মাফ করিয়া দিল। ইহার ফলে কে বেশি উপকৃত হইল এবং কে বেশি মহাজনেকে ভালবাসিবে ?

نصیب ما ست بهشت اے خدا شناس برو
که مستحق کرامت گناهگار انند !

—হে আল্লাহ্-প্রেমিকদল ! আমাদের ভাগ্যেই বেহেশত। কারণ, পাপীরাই দয়ার দাবি রাখে।

এই সত্যটিই একদল ইমাম এইভাবে ব্যক্ত করিয়াছেন ঃ

انکسار العایبین احب الی اللّٰه من صولة المطیعین -

—পাপীদের কাকুতি-মিনতি আল্লাহ্‌র কাছে ভক্তদের তপস্যা হইতে প্রিয়।

گدایان را ازین معنی خبر نیست
که سلطان جهان باماست امروز !

—দরবেশদের এ খবর জানা নাই, আজ খোদা আমাদের সঙ্গে আছেন।

এই তত্ত্বটিই আমরা কুরআনে দেখিতে পাই। যেখানেই খোদা পাপীদের উদ্দেশ্যে কিছু বলিয়াছেন কিংবা তাহাদের উল্লেখ করিয়াছেন, তখন সাধারণত সম্পর্ক সূচক (ইয়া) অক্ষর যুক্ত করিয়া সম্বোধন করিয়াছেন। 'ইয়া' অক্ষরটি সম্মান ও ভালবাসার পরিচয় বহন করে। যেমন ঃ

قُلْ يٰعِبَادِىَ الَّذِيْنَ اَسْرَفُوْا عَلٰى اَنْفُسِهِمْ - (٣٩ : ٥٣)

—হে আমার সেই পাপী বান্দাগণ যাহারা নিজেদের উপরে অত্যাচার করিয়াছ। (—সূরা যুমার ঃ আয়াত ৫৩)

কিংবা —

ءَاَنْتُمْ اَضْلَلْتُمْ عِبَادِىْ - (٢٥ : ١٧)

—হে আমার বান্দাগণ ! তোমরা কি বিভ্রান্ত হইয়াছ ? (—সূরা ফুরকান ঃ আয়াত ১৭)

ইহা যেন এক বাপ স্নেহবিগলিত কণ্ঠে নিজ সন্তানকে ডাকিতেছে এবং বিশেষভাবে নিজ পিতৃত্বের দাবির উপরে জোর দিয়া ডাকিতেছে ঃ হে আমার বৎস ! হে আমার সন্তান !

হযরত ইমাম জাফর সাদেক সূরা 'যুমারে'র রহ্‌মতের আয়াত ব্যাখ্যা করিতে গিয়া কি চমৎকার বলিয়াছেন, যখন আমরা নিজ নিজ সন্তানকে নিজের সহিত সম্পর্ক যুক্ত করিয়া ডাকি, তখন সে নির্ভয়ে নিশ্চিন্তে আমাদের দিকে দৌড়াইয়া আসে। কারণ সে তখন বুঝিতে পারে, বাপ তাহাকে সস্নেহে ডাকিতেছে, কোন ক্রোধ তাহার ভিতরে নাই।

কুরআনে আল্লাহ্ বিশটিরও অধিক স্থানে পাপীদের 'আমার বান্দা' বলিয়া আখ্যায়িত করিয়াছেন। আর মারাত্মক পাপীদের আখ্যা দিয়াছেন 'হে আমার বান্দা'। ইহা হইতে তাঁহার স্নেহ ও কৃপার সংবাদ আর কি হইতে পারে ?

সহীহ্ মুসলিম শরীফের একটি মশহুর হাদীস এই তত্ত্বটি কি চমৎকারভাবে ফুটাইয়া তুলিয়াছে ঃ

والذى نفسى بيده لو لم تذنبوا لذهب الله بكم ولجاء بقوم يذنبون فيستغفرون - (مسلم عن ابى هريرة)

যাঁহার মুঠায় আমার প্রাণ, তাঁহার শপথ ! যদি তোমরা এমন হও যে পাপ তোমাদের হইবেই না, তাহা হইলে আল্লাহ্ তোমাদের পৃথিবী হইতে সরাইয়া এমন এক জাতি পাঠাইবেন, যাহারা পাপ করিবে এবং আল্লাহ্‌র কাছে ক্ষমা ভিক্ষা করিতে থাকিবে।

فداے شیوه رحمت که در لباس بهار
بعذر خواهی رند ان بادنوش اسد !

পাপীরা যখন পাপ মার্জনার মিনতি জানায়,
তখন দয়ার দরিয়ায় বসন্তের দোলা দেখা দেয়।

ইঞ্জিল ও কুরআনের শিক্ষা মূলত এক

মূলত কুরআন ও ইঞ্জিলের শিক্ষার ভিতরে কোন মৌলিক পার্থক্য নাই। উভয়ের বিধানের বুনিয়াদ এক। শুধু বর্ণনার স্থান ও ভঙ্গীর ভিতরে পার্থক্য দেখা যায়। হযরত ঈসা (আ) শুধু চরিত্র ও আত্মশুদ্ধির উপরে জোর দিয়াছে । কারণ শরীয়ত (শাসন-বিধি) হিসাবে হযরত মূসা (আ)-এর গ্রন্থ বিদ্যমান ছিল এবং তিনি উহার একটি বিন্দুও পরিবর্তন করিতে চাহেন নাই। কিন্তু কুরআনকে নৈতিক উপদেশ ও শাসন-সংবিধান (শরী'আত) একই সঙ্গে দান করিতে হইয়াছে। সুতরাং স্বভাবতই ইহার বর্ণনার রীতি এরূপ হইয়া দাঁড়াইয়াছে যে, উপদেশের যুক্তজাল ও আকর্ষণীয় বাক-বিন্যাস না হইয়া

তাহা আইন-সংবিধানের স্পষ্ট ও মাপা কথা হইয়া গিয়াছে। তাই কুরআনে প্রথম দয়া ও ক্ষমাকে পূর্ণ ও মর্যাদার মূল হিসাবে বর্ণনা করিয়াই সঙ্গে সঙ্গে প্রতিকার ও শাস্তির দ্বার খোলা রাখিয়াছে। কারণ অগত্যা যেন এই পথ নেওয়া হয়। কিন্তু বারংবার সতর্ক করা হইয়াছে, সে ক্ষেত্রে কোথাও যেন বাড়াবাড়ি না হয়। এ কথা নিশ্চিত সত্য যে, পৃথিবীর সব নবীর শরী'আতের সার এই তিনটি মূলনীতি।

وَ جَزَاءُ سَيِّئَةٍ سَيِّئَةٌ مِّثْلُهَا - فَمَنْ عَفَا وَ اَصْلَحَ فَاَجْرُهُ عَلَى اللّٰهِ- اِنَّهُ لَايُحِبُّ الظّٰلِمِيْنَ - (٤٢ : ٤٠)

—আর (দেখ) অন্যায়ের প্রতিকারে ঠিক ততটুকুই অন্যায় চলিবে। কিন্তু যে ব্যক্তি ক্ষমা করিবে এবং গোলযোগের বদলে মিটমাটের পন্থা অনুসরণ করিবে, (বিশ্বাস কর) তাহার পুরস্কার স্বয়ং আল্লাহ্‌র নিকট রহিয়াছে। নিশ্চয়ই তিনি জালিমদের পছন্দ করেন না। (—সূরা শুরা ঃ আয়াত ৪০)

وَلَمَنِ انْتَصَرَ بَعْدَ ظُلْمِهٖ فَاُولٰئِكَ مَا عَلَيْهِمْ مِّنْ سَبِيْلٍ - اِنَّمَا السَّبِيْلُ عَلَى الَّذِيْنَ يَظْلِمُوْنَ النَّاسَ وَ يَبْغُوْنَ فِى الْاَرْضِ بِغَيْرِ الْحَقِّ - اُولٰئِكَ لَهُمْ عَذَابٌ اَلِيْمٌ - وَلَمَنْ صَبَرَ وَ غَفَرَ اِنَّ ذٰلِكَ لَمِنْ عَزْمِ الْاُمُوْرِ - (٤٢ : ٤١ - ٤٣)

—আর যদি কাহারো উপর জুলুম করা হয় ও সে তাহার প্রতিশোধ গ্রহণ করে, তাহা হইলে তাহাকে দোষারোপ করা চলে না। দোষারোপ তো জালিমদের আর অন্যায়ভাবে যাহারা পৃথিবীতে গোলযোগ সৃষ্টি করে, তাহাদেরই করা চলে। সুতরাং তাহারাই কঠিন শাস্তি ভোগ করিবে। আর যদি কেহ অপরাধের প্রতিশোধ গ্রহণ না করিয়া সহ্য করে ও ক্ষমা করে, তাহা নিশ্চয়ই বিরাট উন্নত মনের পরিচায়ক। (—সূরা শুরা ঃ আয়াত ৪১-৪৩)

বর্ণনা রীতির প্রতি লক্ষ করুন ! প্রথমে সাফ সাফ বলিয়া দেওয়া হইল, 'যে ব্যক্তি ক্ষমা করিল ও মিটমাট হইল, তাহার পুরস্কার স্বয়ং আল্লাহ্‌র হাতে রহিয়াছে।' বাহ্যত ক্ষমা ও দয়ার জন্য এতটুকু বলাই যথেষ্ট ছিল। কিন্তু তারপর আবার এই কথার উপর জোর দেওয়া হইয়াছে, 'আর অবশ্যই যে ব্যক্তি ধৈর্য ধারণ করিয়াছে ও ক্ষমা করিয়াছে, নিশ্চয়ই উহা তাহার উন্নত মনের পরিচয় দেয়।' এরূপ পুনঃ পুনঃ বলার উদ্দেশ্য হইল দয়া ও ক্ষমার গুরুত্বটি উজ্জ্বল করিয়া তুলিয়া ধরা ! এই কথাটি যেন সুস্পষ্ট হইয়া উঠে যে, যদিও প্রতিশোধ ও শাস্তিদানের দ্বার উন্মুক্ত রাখা হইয়াছে, তথাপি পুণ্য ও সম্মান দয়া ও ক্ষমার ভিতরেই নিহিত রহিয়াছে।

তারপর এই দিকটার দিকেও নজর দেওয়া দরকার যে, অন্যায়ের সাজাকেও কুরআন অন্যায় বলিয়া আখ্যায়িত করিয়া বলিয়াছে, 'অন্যায়ের প্রতিশোধে ততটুকু অন্যায়ই করা চলিবে।' অর্থাৎ ইহা ভাল কাজ নহে। কিন্তু ইহার দ্বার এইজন্য খোলা

রাখা হইয়াছে যে, তাহা না হইলে ইহা হইতেও গুরুতর অন্যায় আত্মপ্রকাশের সুযোগ লাভ করিবে। পক্ষান্তরে, যে ব্যক্তি ক্ষমা করিবে তাহার জন্য اصلح (গড়িয়া তোলা) শব্দ ব্যবহার করা হইয়াছে। ইহাতে পরিষ্কার বুঝা যাইতেছে যে, ক্ষমা ও দয়া ন্যায় কাজ। কারণ গড়িয়া তোলা ন্যায় কাজ ও ভাঙিয়া ফেলা অন্যায় কাজ। সুতরাং দয়া ও ক্ষমাকারী ভাঙাকে গড়িয়া তোলার পথ অনুসরণ করিল।

কুরআনে শাস্তি ও হুমকি

আমাদের কোন কোন স্বভাবের লোক এখানে এক প্রশ্ন তুলিতে পারে যে, মূলত কুরআনের আগাগোড়া শিক্ষার মূল রহ্‌মত হইলেও বিরুদ্ধবাদীদের ব্যাপারে শাস্তির কঠোর হুমকি কেন দেওয়া হইল ?

ইহার বিস্তারিত জবাব যথাস্থানে মিলিবে। তবে বর্তমান আলোচনাটি পূর্ণতায় পৌছানোর জন্য এখানে সে সম্পর্কে কিছুটা আভাস দেওয়া প্রয়োজন। নিশ্চয়ই কুরআনে এমন সব স্থান রহিয়াছে যেখানে সে নিজের বিরুদ্ধবাদীদের জন্য কঠোরতা প্রকাশ করিয়াছে। কিন্তু প্রশ্ন হইল, তাহা কোন্ ধরনের বিরুদ্ধবাদীদের জন্য ? তাহা কি শুধু মতবিরোধ রাখিত যাহারা তাহাদের জন্য, না যাহাদের মতবিরোধ বিরোধিতা ও উৎপীড়ন আকারে দেখা দিয়াছিল তাহাদের জন্য ? আমরা পূর্ণ দৃঢ়তার সহিত বলিতে পারি যে, তাহা নিশ্চয় প্রথমোক্ত দলের জন্য না হইয়া শেষোক্ত দলের জন্যই দেখা গিয়াছে। কারণ এরূপ অহেতুক বিরুদ্ধাচরণকারীদের সকল অত্যাচার যদি মুখ বুঁজিয়া সহ্য করা হয, তাহা হইলে দয়ার কাজ হয় বটে কিন্তু সেই দয়া মানবতার স্বার্থে না হইয়া অত্যাচার ও অনাচারের স্বার্থে চলিয়া যাইবে। এ কথা সুনিশ্চিত যে, সত্যিকারের দয়া কখনো অত্যাচার ও উৎপীড়নের পরিপোষক হইতে পারে না।

কয়েক পৃষ্ঠা আগাইয়া গিয়া আপনারা দেখিতে পাইবেন যে, আল্লাহ্ দয়ার সঙ্গে ইনসাফকেও স্থান দান করিয়াছেন। সূরা 'ফাতিহায়' রবুবিয়াত ও রহ্‌মতের আলোচনার পরেই আদালত বা ইন্‌সাফের আলোচনা দেখা যাইবে। সেখানে দেখা যাইবে, আল্লাহ্ রহ্‌মতকে ইন্‌সাফ হইতে পৃথক করিয়া দেখেন নাই বরং ইন্‌সাফকে প্রকৃত রহ্‌মতের লক্ষ্য ও দাবি বলিয়া উল্লেখ করিয়াছেন। কুরআন বলে, তুমি মানবতার প্রতি দয়া ও প্রীতি দেখাইতেই পার না যদি তোমার ভিতরে অত্যাচার ও অনাচারের প্রতি কঠোর ভাব না থাকে ! ইঞ্জিলে দেখিতে পাই, হযরত মসীহ্ (আ) ও তাঁহার যুগে অত্যাচারী ও অনাচারীদের সাপের বাচ্চা ও ডাকাতদল আখ্যা দিতে বাধ্য হইয়াছেন।

সাধারণ কাফির ও অত্যাচারী কাফির

কুরআন 'কুফর' শব্দটি 'অস্বীকার ' অর্থে ব্যবহার করিয়াছেন। অস্বীকার দুই ধরনের হইতে পারে। একটি নিষ্ক্রিয় অস্বীকার, আরেকটি সক্রিয় অস্বীকার।

নিষ্ক্রিয় কুফরী অর্থ হইল না বুঝিতে পারিয়া কিংবা উহা পছন্দনীয় নহে বলিয়া অথবা যে পথে আছে, তাহাতেই তৃপ্ত থাকায়, সে সত্য ধর্মকে স্বীকার করিয়া লইতে পারিতেছে না মাত্র। ইহা লইয়া মাথা ঘামাইবার ইচ্ছাও তাহার নাই।

পক্ষান্তরে সক্রিয় কুফরী অর্থ হইল শুধু অস্বীকার করিয়াই ক্ষান্ত হয় না, পরন্তু ক্ষেপিয়া গিয়া হিংসা, বিদ্বেষ ও শত্রুতা সৃষ্টি করে। যাহার পরিণতিতে জুলুম ও ষড়যন্ত্রের মারাত্মক দিকগুলি আত্মপ্রকাশ করে। সক্রিয় কুফরীতে কাফির শুধু সত্যধর্মাবলম্বীদের সহিত মতানৈক্যই রাখে না, বিরোধিতা শুরু করিয়া দেয়। তাহার প্রাণে হিংসা ও বিদ্বেষের আগুন তীব্রতর হইয়া জ্বলিতে থাকে। সে তাহার জীবনের সর্বশক্তি নিয়োগ করিয়া সত্যানুসারীদের ধ্বংস কামনা করে। যত ভাল কথাই বলা হউক, সে মিথ্যা বলিয়া উড়াইয়া দিবে। যত ভাল ব্যবহারই করা হউক, সে তার বিনিময়ে দুর্ব্যবহার চালাইবে। তুমি বলিবে, অন্ধকার হইতে আলো ভাল। সে বলিবে, অন্ধকারই আমার কাছে ভাল। তুমি বলিবে, তিক্ত বস্তুর চাইতে মিষ্ট বস্তু খাইতে মজা। সে বলিবে, তিক্ততায়ই আস্বাদ।

এই অবস্থাটিকেই কুরআন মানবীয় বুদ্ধির বিপর্যয় বলিয়া আখ্যা দেয়। আর মানবতার এই বিপর্যয়ের গতিরোধ করার জন্যই কুরআনের সব কঠোরতা ও হুমকি প্রকাশ পাইয়াছে ঃ

لَهُمْ قُلُوْبٌ لَّايَفْقَهُوْنَ بِهَا - وَ لَهُمْ اَعْيُنٌ لَّايُبْصِرُوْنَ بِهَا وَ لَهُمْ اٰذَانٌ لَّا يَسْمَعُوْنَ بِهَا - اُولٰئِكَ كَالْاَنْعَامِ بَلْ هُمْ اَضَلُّ - اُولٰئِكَ هُمُ الْغَافِلُوْنَ - (٧ : ١٧٩)

তাহাদের অন্তর আছে কিন্তু উপলব্ধি করে না। তাহাদের চক্ষু আছে অথচ দেখে না। তাহাদের কান আছে অথচ শুনে না। তাহারা চতুষ্পদ পশুর মত হইয়াছে বরং তাহা হইতেও নির্বোধ সাজিয়াছে। নিশ্চয় তাহারা উদাসীনতার চরমে পৌঁছিয়াছে। (—সূরা আ'রাফ ঃ আয়াত ১৭৯)

আমাদের তফসীরকাররা শেষোক্ত ধরনের কাফিরকে 'ঝগড়াটে কাফির' আখ্যা দিয়াছেন।

পৃথিবীতে যখনই সত্যের ডাক আসিয়াছে, কিছু লোক কবুল করিয়াছে, কিছু লোক অস্বীকার করিয়াছে আর কিছু লোক উহার বিরুদ্ধে কোমর বাঁধিয়া নামিয়াছে। কুরআন আসিয়াও এই তিনদল মানুষের সম্মুখীন হইয়াছে। পহেলা দলকে সে ছায়াতলে আশ্রয় দিয়া পালিয়াছে। দ্বিতীয় দলকে বুঝাইতে রহিয়াছে। তৃতীয় দলকে প্রয়োজনীয় ক্ষেত্রে ধমক দিয়াছে ও ভয় দেখাইয়াছে। এই কঠোরতা যদি 'রহমত' বিরোধী হয়, তাহা হইলে কুরআন তাহা করিয়াছে। মূলত এই পাল্লায় কুরআন 'রহ্‌মত'কে মাপে না!

তুমি বারংবার শুনিয়াছ, কুরআন সত্যধর্মের প্রকৃতি ও সৃষ্টি জগতের প্রকৃতির ভিতরে তফাৎ সৃষ্টি করে নাই। পরন্তু উহারই অংশ বলিয়াছে। সৃষ্টি জগতের প্রতিটি অংশের বিকাশ ও কার্যাবলি কিরূপ ? তাহা এই, সর্বত্র রহ্‌মত ও ইন্‌সাফ এবং পুরস্কার ও শাস্তি পাশাপাশি বিরাজ করিতেছে। কুরআন বলে, তোমাদের প্রকৃতির বাহিরে কিছু দিব না। যে কপোল কল্পিত 'রহ্‌মত' এমন কি তোমাদের প্রকৃতির ভাণ্ডারেও মিলে না, তাহা আমার পকেটে খুঁজিয়া পাইবে না।

فِطْرَتَ اللّٰهِ الَّتِىْ فَطَرَ النَّاسَ عَلَيْهَا - لَا تَبْدِيْلَ لِخَلْقِ اللّٰهِ - ذٰلِكَ الدِّيْنُ الْقَيِّمُ - وَلٰكِنَّ اَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَعْلَمُوْنَ - (٣٠ : ٣٠)

আল্লাহ্ যেই প্রকৃতিতে মানুষ সৃষ্টি করিয়াছেন, (সত্য ধর্মও) আল্লাহ্‌র সেই প্রকৃতি মাত্র। আল্লাহ্‌র সৃষ্টির ভিতরে তারতম্য ও পরিবর্তন নাই। এই-ই হইতেছে (আল্লাহ্‌র প্রকৃতির) স্থির জীবন দর্শন। কিন্তু অধিকাংশ লোক তাহার খবর রাখে না। (—সূরা রুম ঃ আয়াত ৩০)

কুরআনের যে যে স্থানে অস্বীকারকারীদের প্রতি কঠোরতা প্রকাশ করা হইয়াছে সবগুলির উপরে একত্রে নজর কর, দেখিবে সেখানে এই সত্যটিই সুস্পষ্ট হইয়া উঠিবে।

পাঁচ

মালিকি ইয়াওমিদ্-দীন

আল্লাহ্‌র রবুবিয়াত ও রহ্‌মতের পরে 'আদালত' (ইন্‌সাফ)-এর উল্লেখ করা হইয়াছে। সেইজন্য বলা হইয়াছে, 'তিনি প্রতিদান দিবসের অধিপতি।'

আদ-দীন (একমাত্র জীবন ব্যবস্থা)

সিরীয় ভাষায় প্রাচীনরূপে 'দান' ও 'দীন' শব্দের ব্যবহার দেখা যায়। উহার অর্থ প্রতিদান ও প্রতিকার। পরবর্তীকালে উহা আইন-কানূন অর্থে ব্যবহৃত হইতে লাগিল। বস্তুত ইব্রানী ও আরামী ভাষায় উহা হইতে আদ-দীন শব্দ সৃষ্টি হইয়াছে ! আরামী ভাষা হইতেই প্রাচীন ইরানী ভাষায় হয়তো এই শব্দ প্রবেশ করিয়াছে ! পাহ্‌লভী ভাষায় 'দীনিয়াহ্' বলিতে ধর্মীয় আইন-কানূন বুঝাইত। 'খোর্দাদিস্তাঁ' গ্রন্থে একাধিকবার এই শব্দের ব্যবহার দেখা যায়। যরদশতীদের প্রাচীন সাহিত্যে রচনা ও পত্রাদি লেখার রীতি ও আইনকে 'দীন' নামে আখ্যায়িত করা হইয়াছে। তাহা ছাড়া যরদশতীদের এক ধর্মীয় গ্রন্থের নাম দেওয়া হইয়াছে 'দীন-ই-কারেত'। সম্ভবত ইহা খ্রীস্টীয় নবম শতকে ইরাকের এক সংকলয়িতা সংকলন করিয়াছেন।

সে যাহাই হউক, আরবীতে 'দীন' শব্দের অর্থ প্রতিদান। হউক তাহা ভাল কিংবা মন্দ কাজের। যেমন ঃ

ستعلمی لیلی ای دین تداینت
وای غریم فی التقاضی غریمها !

লায়লা শীঘ্রই জানিতে পাইবে, কিরূপ প্রতিদান তাহাকে দেওয়া হইবে। উহা কত কষ্টদায়ক অবস্থা তাহাও সে শীঘ্র জানিবে।

সুতরাং 'মালিকি 'য়াওমিদ্-দীন' অর্থ হইল, 'তিনি প্রতিদান দিবসের অধিপতি' অর্থাৎ কিয়ামতের দিনের মহাবিচারক। এই ব্যাপারে কয়েকটি কথা ভাবিবার মত।

প্রথম কুরআন শুধু এখানেই নহে, প্রতিদানের জন্য সর্বত্রই 'দীন' শব্দ ব্যবহার করিয়াছে। এই কারণেই কিয়ামতকে সে সাধারণত 'ইয়াওমিদ্-দীন' আখ্যা দিয়াছে। এই আখ্যা এইজন্য দেওয়া হইয়াছে যে, প্রতিদান সম্পর্কে যে ধারণা সৃষ্টি করা কাম্য, তাহা এই শব্দটিই সর্বোত্তম ভাবে প্রকাশ করে। কর্মফল স্বাভাবিকভাবেই আত্মপ্রকাশ করে।

কুরআন অবতরণের সময়ে ধর্মানুসারীদের সার্বজনীন ধারণা ছিল এই, পুরস্কার ও শাস্তি আল্লাহ্‌র খামখেয়ালির উপরে নির্ভরশীল। কর্মফলের উহাতে ঠাঁই নাই। আল্লাহ্‌র প্রভুত্ব ও মানুষের বাদশাহী একাকার করিয়া ভাবিবার বিভ্রান্তি তখন সব ধর্মীয় চিন্তাধারায়ই ঠাঁই নিয়াছিল। মানুষ দেখিতে পাইত, স্বেচ্ছাচারী বাদশারা যখন যাকে খুশি পুরস্কার দিত, হঠাৎ বিগড়াইয়া গিয়া কাহাকে আবার প্রাণ-দণ্ডাদেশ দিত। তাই তাহাদের ধারণা জন্মিল আল্লাহ্‌ও তাহাই করিবেন। যাহাকে খুশি পুরস্কৃত করিবেন এবং যাহাকে খুশি শাস্তি দিবেন। মানুষ তাই দেবতাদের ঠাণ্ডা রাখিবার জন্য হাজার ধরনের পূজা-অর্চনা শুরু করিল। নানারূপ অর্ঘ্য-উপঢৌকন দিয়া তাহাদের খুশি রাখিবার জন্য সদা যত্নবান থাকিত।

ইহুদী ঈসায়ীদের সাধারণ ধর্মীয় চিন্তাধারা পৌত্তলিক সংস্কৃত-ভাষীদের চিন্তাধারা হইতে কিছুটা উন্নত ছিল। ইহুদীরা অসংখ্য দেবতার স্থলে ইসরাইল গোত্রের বংশানুক্রমে প্রাপ্ত এক খোদা মানিত। কিন্তু আগেকার খোদাদের মত এ খোদাও স্বেচ্ছাচারী ছিল। সে কখনও তাহাদের ভাল জানিত, কখনও রাগ হইয়া ধ্বংসের মুখে ঠেলিয়া দিত ! ঈসায়ীদের ধারণা ছিল যে, হযরত আদমের পাপের জন্য গোটা মানবজাতি অভিশপ্ত জীবন কাটাইতেছে। যতক্ষণ পর্যন্ত খোদা স্বীয় সন্তান দানের গুণটি মসীহ্‌রূপে রূপদান করিয়া কুরবান না করিয়াছেন, ততক্ষণ তাহার ক্রোধ প্রশমিত হয় নাই ও সেই পাপের প্রায়শ্চিত্ত হয় নাই।

কর্মফল ও প্রকৃতির রীতি

কিন্তু কুরআন আল্লাহ্‌র প্রতিদান দানের রীতিকে সম্পূর্ণ নূতন রূপ দান করিয়াছে। সে আল্লাহ্‌র এই কাজটিকে বিশ্বপ্রকৃতির স্বাভাবিক রীতি বহির্ভূত কোন কাজ বলে না বরং ইহার অন্তর্ভুক্ত বলিয়াই কাজটির প্রতিক্রিয়াও রহিয়াছে। প্রত্যেক বস্তুর একটি বৈশিষ্ট্য রহিয়াছে। এখানে কোন কিছুর অস্তিত্ব থাকিবে অথচ উহার কোন প্রভাব ও ফলাফল থাকিবে না, তাহা হইতে পারে না। সুতরাং আল্লাহ্ প্রত্যেকটি বস্তুর বৈশিষ্ট্য ও পরিণতি রাখিয়াছেন। মানবদেহের যেরূপ স্বাভাবিক কার্যকলাপ রহিয়াছে, তেমনি রহিয়াছে মানবাত্মার। দৈহিক প্রক্রিয়ার প্রভাব দেহের ও মানসিক প্রক্রিয়ার প্রভাব মনের উপরে দেখা দেয়। মানুষের কার্যাবলির ঠিক তেমনি বৈশিষ্ট্য ও পরিণতি রহিয়াছে। তাহাকে প্রতিফল বা প্রতিদান বলিয়া আখ্যায়িত করা হইয়াছে। ভাল কাজের ভাল ফলকে সওয়াব ও মন্দ কাজের মন্দ ফলকে আযাব বলা হয়। সেই পুরস্কার ও শাস্তির রূপ কি হইবে ? কুরআন মানুষের সীমিত জ্ঞানের পরিমাণ রক্ষা করিয়া মানুষের জন্য সহজবোধ্যভাবে বেহেশ্‌ত ও দোযখের চিত্র আঁকিয়া তাহা দেখাইয়াছে। বেহেশ্‌তের অজস্র নিয়ামত পুণ্যবানদের জন্য ও দোযখের অনন্ত আযাব পাপীদের জন্য রাখা হইয়াছে।

لَا يَسْتَوِىْ اَصْحٰبُ النَّارِ وَ اَصْحٰبُ الْجَنَّةِ - اَصْحٰبُ الْجَنَّةِ هُمُ الْفَائِزُوْنَ - (٥٩ : ٢٥)

—বেহেশ্‌তী আর দোযখীরা (কর্ম ও কর্মফলে) কখনও এক হইবে না। বেহেশ্‌তীরাই সফল মানুষ। (—সূরা হাশর ঃ আয়াত ২০)

কুরআন বলে, তোমরা দেখিতেছ যে, প্রকৃতি সর্বক্ষেত্রে ব্যবস্থা রাখে। তাহাতে পরিবর্তন ও রদবদল স্বীকার করে না। আগুনে ঝাপ দিয়া তুমি তাহার প্রতিফল লাভ না করিয়া পার না। নদীতে ঝাপ দিয়া পানিতে ডুবার পরিণাম হইতে তুমি রক্ষা পাইবে না। এইভাবে পৃথিবীর সর্বত্র আমরা প্রকৃতির যে প্রতিফল বা পরিণাম দানের ব্যবস্থা দেখিতে পাই, তাহা হইতে আমরা কি ভাবে কল্পনা করি যে, মানুষের কার্যাবলী কোনরূপ প্রতিফল বা প্রতিদান পাইবে না ? তাহাই হইল আল্লাহ্‌র পুরস্কার ও শাস্তিদান ব্যবস্থা।

আগুন জ্বালায়, পানি ঠাণ্ডা করে, দুধ পানে শক্তি বাড়ে, বিষ পানে মৃত্যু ঘটে ও কুইনাইন জ্বর তাড়ায়। এরূপ প্রত্যেকটি বস্তুর একটি পরিণাম ফল দেখিয়া তোমরা বিস্মিত হও না ; কারণ এগুলি তোমরা দৈনন্দিন জীবনে প্রত্যক্ষ কর। অথচ এই রীতি অনুসারেই যখন প্রতিটি কর্মের অনিবার্য পরিণতি লাভ সম্পর্কে বলা হয়, তখন কেন অবাক হও ? আক্ষেপ! তোমাদের সিদ্ধান্তের ভিতরে কত যে অসামঞ্জস্য রহিয়াছে, তাহা বুঝও না।

ধান বুনিয়া এ সন্দেহ জন্মে না যে, ধান গাছ হইবে না। কেহ যদি বলে, ধান হইতে পাট গাছ উৎপন্ন হইতে পারে, তুমি তাহাকে মাতাল বল। কেন ? কারণ প্রকৃতির যথাযথ ফল দানের স্বভাবে তোমার প্রতীতি জন্মিয়াছে। ঘুণাক্ষরে ভাবিতে পার না, প্রকৃতি ধান নিয়া ধানের বদলে পাট জন্মাইবে। তুমি এতটুকুও বিশ্বাস কর না যে, চিকন ধান নিয়া প্রকৃতি মোটা ধান দিবে। কারণ যথাযথ প্রতিদানই প্রকৃতি দিবে, এ বিশ্বাস তোমার সন্দেহাতীত ! তাহা হইলে সেই প্রকৃতি কি করিয়া ভাল কাজ নিয়া মন্দ ফল ও মন্দ কাজ নিয়া ভাল ফল দিবে ?

اَمْ حَسِبَ الَّذِيْنَ اجْتَرَحُوْا السَّيِّاٰتِ اَنْ نَّجْعَلَهُمْ كَالَّذِيْنَ اٰمَنُوْا وَعَمِلُوْا الصّٰلِحٰتِ سَوَاءً مَّحْيَا هُمْ وَ مَمَاتُهُمْ - سَاءَ مَا يَحْكُمُوْنَ - وَخَلَقَ اللّٰهُ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضَ بِالْحَقِّ وَلِتُجْزٰى كُلُّ نَفْسٍ بِمَا كَسَبَتْ وَهُمْ لَايُظْلَمُوْنَ -

পাপীরা কি মনে করে যে, পুণ্যাশ্রয়ী ঈমানদারদের মর্যাদা তাহারা পাইবে ? জীবনে ও মরণে উভয় দল সমান অবস্থায় কাটাইবে ? তাহাদের এই সিদ্ধান্ত

কতই অন্যায় ! অথচ আল্লাহ্ তা'আলা আসমান ও জমিন অশেষ বিজ্ঞতাসহ সম্পূর্ণ সার্থক করিয়া গড়িয়াছেন। তাহা এইজন্য যেন প্রত্যেকেই নিজ প্রয়াস অনুসারে ফল লাভ করে এবং বিন্দু-বিসর্গ যেন না ঠকে।

বস্তুত এই কারণেই কুরআন পুরস্কার ও শাস্তিদানের দিবসটিকে 'ইয়াওমিদ্-দীন' নাম দিয়াছে। স্বাভাবিক কর্মফল লাভের ব্যাপারটি 'দীন' শব্দ ছাড়া আর কিছুতে এত সুস্পষ্ট হয় না।

কুরআনের পরিভাষায় উপার্জন

আর এই কারণেই আমরা দেখিতে পাই, কুরআন ভাল-মন্দ কাজের জন্য এখানে সেখানে 'কাস্‌ব' (উপার্জন) শব্দ ব্যবহার করিয়াছে। কাস্‌ব অর্থ উপার্জন। অর্থাৎ এরূপ কাজ যাহা হইতে কোন উপকার কামনা করা হয়। এই উপকার পাইতে গিয়া হয়তো অনেকে ক্ষতিগ্রস্তই হয়। মূল কথা এই--মানুষ যে পুরস্কার ও শাস্তি ভোগ করিবে, তাহা নিজেদেরই উপার্জিত ফল। যে যেরূপ উপার্জন করিবে, সে তদ্রূপ ফল পাইবে। যদি কোন মানুষ ভাল কাজ করিয়া থাকে, ভাল ফল পাইবে। পক্ষান্তরে যে মন্দ কাজ করিবে সে মন্দ ফল পাইবে।

كُلُّ امْرِئٍ بِمَا كَسَبَ رَهِيْنٌ - (٥٢ : ٢١)

—প্রত্যেক মানুষ তাহার উপার্জনের ফলাফলের সহিত আবদ্ধ রহিয়াছে। (—সূরা তূর ঃ আয়াত ২১)

সূরা 'বকর' প্রতিফল লাভের মূলনীতি ঘোষণা করিতেছে ঃ

لَهَا مَا كَسَبَتْ وَعَلَيْهَا مَا اكْتَسَبَتْ - (٢ : ٢٨٦)

—প্রত্যেক মানুষই স্বীয় উপার্জন অনুসারে ফল পাইবে ! যাহা সে পাইবে, তাহা নিজের উপার্জিত ছাড়া অন্য কিছুই নহে এবং সে জন্য যে সে জবাবদিহি হইবে, তাহাও তাহার উপার্জন। (—সূরা বাকারা ঃ আয়াত ২৮৬)

এভাবে দল ও জাতি সম্পর্কে সাধারণ নীতি ঘোষণা করা হইয়াছে ঃ

تِلْكَ اُمَّةٌ قَدْ خَلَتْ - لَهَا مَا كَسَبَتْ وَلَكُمْ مَّا كَسَبْتُمْ - وَ لاَ تُسْئَلُوْنَ عَمَّا كَانُوْا يَعْمَلُوْنَ - (٢ : ١٣٤)

—এই একটি দল জীবন কাটাইয়া গেল। তাহারা যাহা উপার্জন করিয়া গেল, সেই ফলই তাহাদের জন্য নির্ধারিত হইয়াছে আর তোমরাও যে রূপ উপার্জন করিবে, সেই ফল পাইবে। (—সূরা বাকারা ঃ আয়াত ১৩৪)

যেমন কর্ম তেমন ফল

তাহা ছাড়া নানা জায়গায় পরিষ্কার ভাষায় কুরআন এ তত্ত্বটি তুলিয়া ধরিয়াছে, যদি খোদায়ী মতবাদ ভাল কাজের প্রেরণা যোগায় ও মন্দ কাজ হইতে ফিরায় তাহা

এইজন্য যে, মানুষ ধ্বংসের ও ক্ষতির হাত হইতে বাঁচুক, কল্যাণ ও পরিত্রাণ লাভ করুক। তাহা এইজন্য নহে যে, আল্লাহ্ নিজ ক্রোধ ও উত্তেজনা প্রশমিত করার জন্য শাস্তি দিতে চাহেন এবং তাহা হইতে বাঁচিবার জন্যই আমাদের সদা সর্বদা ধর্মের তপস্যা চালানো প্রয়োজন।

مَنْ عَمِلَ صَالِحًا فَلِنَفْسِهٖ وَ مَنْ اَسَاءَ فَعَلَيْهَا - وَمَا رَبُّكَ بِظَلَّامٍ لِّلْعَبِيْدِ - (٤١ : ٤٦)

—যে ব্যক্তি পুণ্য কাজ করিল, সে নিজের স্বার্থেই করিল এবং যে খারাপ কাজ করিল, উহার দুর্ভোগ সে নিজেই পোহাইবে এবং তোমার প্রভু নিজ বান্দাদের উপরে জুলুম করিবার নহেন। (—সূরা হা-মীম ঃ আয়াত ৪৬)

একটি মশহুর হাদীসে (কুদসী) এই সত্যটির দিকেই ইঙ্গিত দান করা হইয়াছে ঃ

يا عبادى ان اولكم واخر كم و نسكم و جنكم كانوا على اتقى قلب رجل واحد منكم ما زار فى ملكى شيئا - يا عبادى لو ان اولكم واخركم وانسكم وجنكم كانو على افجر قلب رجل واحد منكم ما نقص ذالك من ملكى شيئا يا عبادى لو ان اولكم واخركم وانسكم وجنكم قاموفى صعيد واحد فاسالونى فاعطيت كل انسان مسئلته ما نقص ذالك مما عندى الا كما ينقص المخيط اذا دخل البحر - يا عبادى ! انما هى اعمالكم احصيها لكم ثم او فيكم ايا ها - فمن وجد خيرا فليحمد اللّه ومن وجد غير ذالك فلا يلو من الا نفسه - (مسلم عن ابى ذر رض)

হে আমার বান্দাগণ ! যদি তোমাদের অতীত, বর্তমান ও ভবিষ্যতের সকল মানুষ ও জীন মিলিয়া তোমাদের সর্বশ্রেষ্ঠ পুণ্যবান ব্যক্তির মত হইয়া যাইতে, তাহা হইলেও আমার প্রভুত্বের কিছু মাত্র বৃদ্ধি পাইত না। হে আমার বান্দাগণ ! যদি তোমাদের অতীত, বর্তমান ও ভবিষ্যতের সকল জীন ও ইন্সান মিলিয়া তোমাদের সর্ব নিকৃষ্ট পাপীর মত হইয়া যাইতে, তাহাতেও আমার প্রভুত্বের কোনই ক্ষতি হইত না। হে আমার বান্দাগণ ! যদি তোমাদের অতীত, বর্তমান ও ভবিষ্যতের সকল জীন ও ইন্সান মিলিয়া আমার কাছে যাহার যাহা যত খুশি প্রার্থনা করিতে এবং আমি প্রত্যেককে তাহার সম্পূর্ণ চাহিদা মিটাইয়া দিতাম, তাহাতে আমার ভাণ্ডারের তেমন ক্ষতি হইত না ! একটা সুইয়ের ছিদ্র গলাইয়া যতটুকু পানি পার করা যায়, ততটুকুতে একটা সমুদ্রের যদি কোন ক্ষতি হয, আমার হয় তো ততটুকুই হইত। হে আমার বান্দাগণ ! (স্মরণ রাখিও) তোমাদের সব কাজই

আমার কাছে সুরক্ষিত থাকে এবং আমি উহার যথাযথ ফলাফল তোমাদের ফিরাইয়া দিই। সুতরাং তোমাদের যাহারা সুফল লাভ কর, তাহারা যেন আল্লাহ্‌র প্রশংসা করিতে থাক এবং যাহারা কুফল পাও, তাহারা যেন নিজকে ছাড়া আর কাহাকেও দায়ী না কর।

এখানে আবার কাহারো মনে এই সন্দেহটি না জাগে যে, কুরআন নিজেই তো বিভিন্ন স্থানে আল্লাহ্‌র খুশি ও সন্তুষ্টির কথা উল্লেখ করিয়াছে ? অবশ্যই তাহা করিয়াছে। পরন্তু সে আল্লাহ্‌র সন্তুষ্টি অর্জনকে পুণ্যবানদের সর্বোচ্চ স্তর বলিয়া ঘোষণা করিয়াছে। কিন্তু কথা হইল যে, আল্লাহ্‌র খুশি অখুশি বান্দার ফলাফল লাভের কারণ নহে। বরং বান্দার কার্যকলাপ আল্লাহ্‌র খুশি-অখুশির কারণ হইয়া থাকে। কুরআন সাফ সাফ বলে, মানুষের কৃতকর্মই ফলাফল দান করে। আল্লাহ্ ভাল কাজ পাইলেই খুশি হন এবং খারাপ কাজ দেখিলে অখুশি হন। ইহা সুস্পষ্ট যে, কুরআনের এই শিক্ষা আগেকার ধর্মবিশ্বাস হইতে শুধু সংক্ষিপ্তই নহে বরং বিরোধীও।

যাহা হউক, কর্মফল লাভের ব্যাপারটি বুঝাইবার জন্য 'দীন' শব্দটি যথোপযোগী হইয়াছে। ইহা আগেকার সব ভুল বিশ্বাস বিলোপ করে। সূরা ফাতিহার এই শব্দটি ব্যবহৃত হওয়ায় প্রতিফল লাভের তত্ত্বটি স্পষ্ট হইয়া ধরা দিয়াছে।

দীন অর্থ আইন ও ধর্ম

দ্বিতীয়ত, এই কারণেই আইন ও ধর্ম বুঝাইতেও 'দীন' শব্দ ব্যবহার করা হইয়াছে। কারণ ধর্মের মূল ধারণাটি হইল কর্মফল লাভ। আইনও কর্মফল দানের ব্যবস্থা করে। সূরা 'ইউসুফে' যেখানে হযরত ইউসুফ (আ)-এর ছোট ভাইকে আটক রাখার ঘটনা বলা হইয়াছে, সেখানে বলা হইয়াছে ঃ

مَا كَانَ لِيَأْخُذَ اَخَاهُ فِىْ دِيْنِ الْمَلِكِ اِلاَّ اَنْ يَّشَاءَ اللّٰهُ - (١٢ : ٧٦)

—তাহার ভাইকে আটক করাটা সেখানকার বাদশার আইন মুতাবিক ছিল না বরং আল্লাহ্‌র এরূপ মর্জি ছিল। (—সূরা ইউসুফ ঃ আয়াত ৭৬)

এখানে 'দীন' বলিতে আইন বুঝাইয়াছে।

'দীন' শব্দের ভিতরে খোদায়ী ইন্‌সাফের ঘোষণা

তৃতীয়ত, রবুবিয়াত ও রহমতের আলোচনার পরে ক্রোধ কিংবা উত্তেজনামূলক কোন গুণের উল্লেখ করা হয় নাই। বরং 'মালিকি ইয়াওমিদ দীন' গুণটির উল্লেখ করা হইয়াছে। উহার ভিতরে আল্লাহ্‌র ইনসাফের ধারণা নিহিত রহিয়াছে। ইহার ফলে জানা যায়, কুরআন খোদার গুণাবলির যে ধারণা দিয়াছে, তাহাতে ক্রোধ ও উত্তেজনার স্থান নাই। যতটুকু ক্রোধ গুণ দেখানো হইয়াছে, তাহা মূলত ইন্‌সাফ গুণেরই বহির্বিকাশ।

আল্লাহ্‌র গুণাবলির ধারণার এই ক্ষেত্রটিতেই মানুষ সর্বদা হোঁচট খাইয়াছে। ইহা সুস্পষ্ট যে, বিশ্ব প্রকৃতি প্রতিপালন এ দয়াগুণের সহিত প্রতিফল দানের গুণটিও রাখে। মানুষের চিন্তায় এই প্রশ্নটিই জাগার ছিল যে, প্রকৃতির যে প্রতিশোধ নিবার রীতিটি তাহা কি ক্রোধ ও উত্তেজনামূলক, না ইনসাফমূলক ? মানুষ ইনসাফের কথা না ভাবিয়া প্রতিশোধের কথাই ভাবিতে পারিয়াছিল। তাহারা প্রতিফল দানকে গজব ও ক্রোধ অর্থে গ্রহণ করিয়াছিল। এখান হইতেই আল্লাহ্‌কে ভয়াবহরূপে কল্পনা করিতে শিখিল। কিন্তু যদি তাহারা প্রকৃতির রীতি লক্ষ করিত, তাহা হইলে দেখিত উহা ক্রোধ ও উত্তেজনার কাজ নহে বরং ইন্‌সাফেরই কাজ। আর তাহাও রহমত ছাড়া অন্য কিছুই নহে। যদি বিশ্ব প্রকৃতির প্রতিফল দানের ব্যবস্থাও না হইত কিংবা সুন্দর রূপে গড়িয়া তোলার জন্য ভাঙার ব্যবস্থা না থাকিত, তাহা হইলে ইন্‌সাফের পাল্লা অবশিষ্ট থাকিত না এবং গোটা সৃষ্টি লণ্ডভণ্ড হইয়া যাইত।

সৃষ্টির কারখানার তিনটি ভিত্তি

চতুর্থত, সৃষ্টির কারখানাটি অস্তিত্ব লাভের ও টিকিয়া থাকার জন্য যেরূপ রবুবিয়াত ও রহমতের মুখাপেক্ষী, তেমনি আদালতেরও মুখাপেক্ষী। এই তিনটি হইল সৃষ্টি জগতের অন্তর্লীন মৌলিক ভিত্তি। রবুবিয়াত প্রতিপালন করে, রহমত কল্যাণ প্রাপ্তির মূল উৎসরূপে বিরাজ করে আর আদালতের সাহায্যে সৃজন ও সৌন্দর্য প্রকাশ পায় এবং খারাপ ও ক্ষতিকর ব্যাপার লোপ পায়।

আদালতের সৃজন ও সৌন্দর্য

রবুবিয়াত ও রহমতের কার্যক্রম আপনারা দেখিয়া আসিয়াছেন। কিছুদূর অগ্রসর হইয়া আপনারা আদালতের কার্যক্রমও দেখিবেন। আপনারা দেখিবেন সৃষ্টি জগতের সব ভাঙা-গড়া ও সৌন্দর্যের মূল হইল সঠিক ও সামঞ্জস্যপূর্ণ হওয়া। উহাই আদালতের প্রকাশ। আপনারা অনেক সুন্দর সুন্দর সৃষ্ট বস্তুই দেখিতেছেন এবং সেইগুলির বিভিন্ন নাম দিয়াছেন। কিন্তু সবগুলির মূল খুঁজিয়া দেখিলে আদালতের কার্যক্রমই দেখিবেন।

'আদল' অর্থ হইল যথাযথ হওয়া, বিন্দুমাত্র কম ও বেশি না হওয়া। এইজন্য কোন মামলা-মোকদ্দমায় মীমাংসা করিয়া দেওয়ার ব্যবস্থাকে আদালত বলে। বিচারক উভয় পক্ষে যে বাড়াবাড়িটুকু হইয়াছে, তাহা দূর করিয়া দেন। উভয়ের পাল্লা সমান করিয়া দেন। পাল্লার পরিমাপকেও আদালত বলে। কারণ উহা উভয় দিকে সমান করিয়া দেয়। এই আদালতই যখন বস্তুর ভিতর দেখা দেয়, তখন বস্তুর যাহা কিছু বেশকম থাকে, তাহা সমান ও সঠিক করিয়া দেয়। বস্তুর সকল অংশের সঠিক ও পারস্পরিক সামঞ্জস্য রক্ষার নাম আদালত।

এখন চিন্তা করুন, সৃষ্টি জগতে সুন্দর সুন্দর সৃজন কার্যের যে বিকাশ ঘটে, কতখানি এই তত্ত্বটির সহিত সম্পৃক্ত রহিয়াছে। বস্তু কি ? বৈজ্ঞানিক বলেন, বিভিন্ন উপাদানের যথাযথ সংযোগ। যদি এই সংযোগে বিন্দুমাত্র অসামঞ্জস্য দেখা দিত, তাহা

হইলে কোন বস্তুই রূপলাভ করিত না। দেহ কি ? দেহের উপাদানের যথাযথ সংযোগ। উহার একটি অংশও যদি ব্যতিক্রম হইত, দেহের রূপ বিগড়াইয়া যাইত। স্বাস্থ্য কি ? মিশ্রণের সামঞ্জস্য। যেখানে ব্যতিক্রম ঘটে, সেখানে স্বাস্থ্য উধাও হয়। সৌন্দর্য কি ? সামঞ্জস্যপূর্ণ সংযোগ অবস্থা। সুন্দর মানুষ, সুন্দর ফুল, সুন্দর সৌধ তাজমহল ও সুন্দর সুর—ইহা সবই সামঞ্জস্যপূর্ণ সংযোগ রূপ। বিন্দুমাত্র ব্যতিক্রম ঘটিলে সৌন্দর্য লোপ পাইত, সব সুর বেসুরো হইয়া বাজিত।

শুধু এরূপ কয়েকটি বস্তু বা দেহ নহে; সৃষ্টির পুরা কারখানাটাই আদল ও ওজনের (যথাযথ পরিমাপের) উপর প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে। মুহূর্তের জন্য উহা অনুপস্থিত থাকিলে গোটা সৃষ্টি জগৎ লণ্ডভণ্ড হইবে। সৌরজগতের সব গ্রহ-উপগ্রহ নিজ নিজ কক্ষপথে ঝুলন্ত অবস্থায় কিরূপে যথানিয়মে আবর্তিত হইতেছে ! অথচ সামান্য এদিক ওদিক সরিয়া গিয়া কোনদিন কোন দুর্ঘটনা ঘটাইতেছে না ! ইহাই আদালতের আইন ও সংবিধান ! ইহাই সব কিছুকে নিয়ম-শৃঙ্খলে বাঁধিয়া সুনিয়ন্ত্রিতভাবে চালাইতেছে। প্রত্যেকটি গ্রহ-উপগ্রহ আকর্ষণ-বিকর্ষণ-শক্তি রাখে আর তাহা এরূপ সঠিক পরিমাপে রাখে যাহার ফলে প্রত্যেকটি গ্রহ-উপগ্রহ যথাস্থানে বিরাজ করিয়া ঘূর্ণায়মান থাকিতে বাধ্য। যদি কোন গ্রহ কিংবা উপগ্রহ আদালতের এই বিধান বিন্দুমাত্র অমান্য করে, অমনি তাহা কক্ষচ্যুত হইয়া গোটা সৌরজগতে প্রলয়কাণ্ড সৃষ্টি করে।

সংখ্যা-তত্ত্বের বিরাট সত্যটি এই আদল ও ওজনের বহির্বিকাশ ছাড়া অন্য কিছুই নহে। যেদিন হইতে মানুষ এই সত্যটি উপলব্ধি করিয়াছে, জ্ঞান-গবেষণার সকল দ্বার তাহার জন্য উন্মুক্ত হইয়াছে।

মীযান (পরিমাপ যন্ত্র) প্রবর্তন

কুরআন এই সত্যটির প্রতি বিভিন্ন স্থানে ইঙ্গিত দান করিয়াছে ঃ

وَالسَّمَاءَ رَفَعَهَا وَ وَضَعَ الْمِيْزَانَ - اَلاَّ تَطْغَوْا فِى الْمِيْزَانِ - (٥٥ : ٧ - ٨)

—আর তিনি আকাশকে সমুন্নত করিয়াছেন আর নভোমণ্ডলের সব কিছু সুনিয়ন্ত্রিত রাখার জন্য আদালতের বিধান মুতাবিক সঠিক পরিমাপ যন্ত্র (মীযান) বহাল করিয়াছেন। (—সূরা রহমান ঃ আয়াত ৭-৮)

এই 'আল্-মীযান' বা পরিমাপ যন্ত্রটি কি ? সঠিক ও যথাযথ পরিমাপ তথা আদল বা ইন্সাফের বিধান। উহার ফলে নভোমণ্ডলের প্রত্যেকটি বস্তু 'দাঁড়ি-পাল্লার উভয় দিকে এরূপ সমতা রক্ষা করিয়া চলিয়াছে যে, কোন দিক ঝুঁকিয়া গিয়া কোন দুর্ঘটনা সৃষ্টি করিতেছে না। নভোমণ্ডলের এই অদৃশ্য খাম্বাগুলি সম্পর্কে সূরা 'রা'আদে বলা হইয়াছে ঃ

اَللّٰهُ الَّذِىْ رَفَعَ السَّمَاوَاتِ بِغَيْرِ عَمَدٍ تَرَوْنَهَا - (١٣ : ٢)

—তিনিই আল্লাহ্ যিনি আকাশকে সমুন্নতভাবে গড়িয়া নভোমণ্ডলকে খাম্বা ছাড়াই সুস্থির রাখিয়াছেন এবং তোমরাও এই শিল্প নৈপুণ্য নিরীক্ষণ করিতেছ। (—সূরা রা'দ ঃ আয়াত ২)

সূরা 'লুকমানে'ও এই সত্যটির দিকে ইঙ্গিত দেওয়া হইয়াছে ঃ

خَلَقَ السَّمَاوَاتِ بِغَيْرِ عَمَدٍ تَرَوْنَهَا - (٣١ : ١٠)

—তিনি আকাশকে বিনা খাম্বায় তৈরি করিয়াছেন, তোমরা তাহা পর্যবেক্ষণ করিতেছ। (—সূরা লুকমান ঃ আয়াত ১০)

এ কথা বলাই বাহুল্য যে, মাত্রার কাঁটা স্থির রাখার কথা বুঝাইবার জন্য দাঁড়িপাল্লার চাইতে সহজবোধ্য ও চিত্তাকর্ষী উপমা আর কিছুই হইতে পারে না।

এভাবে সূরা 'আল-ইমরানে'র বিখ্যাত আয়াতটিও উপরিউক্ত সত্যটির দিকে ইঙ্গিত করে ঃ قَائِمًا بِالْقِسْطِ 'সৃষ্টি জগতে খোদার ইন্‌সাফের সহিত প্রতিষ্ঠিত রহিয়াছে' এবং সৃষ্টির প্রতিষ্ঠার জন্য তিনি এই ইন্‌সাফের বিধানই নির্ধারিত করিয়াছেন।

ইনসাফের কাজই পুণ্য কাজ

কুরআন বলে, যখন এই ইনসাফবিধি সৃষ্টি জগতের প্রতিটি ক্ষেত্রে জারি রহিয়াছে, মানুষ কি করিয়া নিজের কর্ম ও চিন্তায় উহার প্রভাব অস্বীকার করে ? মানুষের এই প্রকৃতিসম্মত ইনসাফের কাজকে কুরআন 'পুণ্যকাজ' বলিয়া অভিহিত করে। মানুষ যদি সুন্দর সুন্দর অসংখ্য সৃষ্টির ভিতরে দৃষ্টিশক্তিকে আবদ্ধ হইতে না দিয়া উহার অন্তর্নিহিত ইন্‌সাফ বিধিটি লক্ষ করিতে পারিত, তাহা হইলে নিজের প্রতিটি চিন্তা ও কর্মে তাহা মানিয়া লইতে অসম্মত হইত কি ? সবাই তখন বাড়াবাড়ি ও কমবেশি করার বদলে ইনসাফের ভিতরেই পরম সৌন্দর্য ও সার্থকতার সন্ধান পাইত।

اَفَغَيْرَ دِيْنِ اللّٰهِ يَبْغُوْنَ وَلَهٗ اَسْلَمَ مَنْ فِى السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ طَوْعًا وَّ كَرْهًا وَّ اِلَيْهِ يُرْجَعُوْنَ - (٣ : ٨٣)

—ইহারা কি আল্লাহ্‌র নির্ধারিত বিধান ছাড়িয়া অন্য বিধান খুঁজিতেছে ? অথচ আকাশ ও পৃথিবীর সব কিছুই স্বেচ্ছায় হউক কিংবা অনিচ্ছায় হউক তাঁহারই বিধান মানিয়া চলিতেছে এবং অবশেষে তাঁহারই কাছে সবাই ফিরিয়া যাইবে। (—সূরা আলে 'ইমরান ঃ আয়াত ৮৩)

পাপ কাজের জন্য কুরআনের বিশেষ পরিভাষা

এই কারণেই কুরআন পাপ ও অন্যায় কাজের জন্য যতগুলি পরিভাষা ব্যবহার করিয়াছে, তাহার মর্ম উদ্ধার করিলে ইনসাফ ও মীযানের বিপরীত অর্থ বুঝায়। কুরআন অন্যায় বলিতে যেন ইন্‌সাফ বর্জনকেই বুঝিতেছে। তাই অন্যায়ের জন্য সে জুলুম, এনাদ, তুগ্‌য়্যান, ইস্‌রাফ, তাব্‌জীর, ইতেদা, উদওয়ান ইত্যাদি পরিভাষা সৃষ্টি করিয়াছে।

জুলুম ঃ ইহার অর্থ হইল 'কোন কিছু অপাত্রে রাখা' অর্থাৎ একের যথাযথ স্থানে অন্যকে বসানোর অবস্থাকে অভিধানে জুলুম বলা হয়। এইজন্য কুরআন শিরককে শ্রেষ্ঠতম জুলুম বলিয়াছে। কারণ ইহা হইতে অসঙ্গত কাজ আর কিছুই হইতে পারে না। এ কথা সুস্পষ্ট যে, প্রত্যেকটি বস্তু যথাযথ স্থানে না থাকার অবস্থাটি আদল বা ইন্‌সাফ বিরোধী ব্যাপার ছাড়া অন্য কিছুই নহে।

তুগ্‌য়্যান ঃ কোন কিছুর নিজ সীমারেখা লংঘনকে তুগ্‌য়্যান বলা হয়। এ কথা সুস্পষ্ট যে, সীমালংঘন কার্যটি আদালত বা ইনসাফ বিরোধী।

ইস্‌রাফ ঃ 'সরফ' শব্দমূল হইতে এই শব্দটি সৃষ্টি হইয়াছে। সর্‌ফ অর্থ হইল 'যাহা যেখানে যতটুকু খরচ করা উচিত, তাহা হইতে বেশি খরচ করা।' ইহাও ইন্‌সাফ বিরোধী কাজ।

তাবজীর ঃ ইহার অর্থ হইল 'কোন কিছু বেজা'গায় খরচ করা।' ইস্‌রাফ ও তাব্‌জীরের ভিতরে পার্থক্য শুধু পরিমাপ ও স্থানের। খাওন খরচ, খরচের সঠিক স্থান। কিন্তু প্রয়োজনের বেশি খরচ করিলে 'ইসরাফ' হইবে। নদীতে টাকা ফেলিয়া দেওয়া বেজা'গায় টাকা ফেলা হয় এবং ইহাকে 'তাব্‌জীব' বলে। উভয় অবস্থাই ইন্‌সাফ বিরোধী। কারণ ইন্‌সাফ যথাযথ পরিমাপ ও স্থান চায়।

ফাসাদ ঃ যথাযথ ও সঠিক অবস্থা অতিক্রম করার নাম ফাসাদ।

ই'তেদা ও উদ্‌ওয়ান ঃ একই শব্দ মূল হইতে সৃষ্টি। উভয়ের অর্থ হইল সীমালংঘন। ইহাও ইনসাফ বিরোধী।

আল্লাহ্‌র গুণাবলি সম্পর্কে কুরআন মজীদ

কুরআন আল্লাহ্‌র গুণাবলি সম্পর্কে যে ধারণা সৃষ্টি করিয়াছে, সূরা ফাতিহার শুরুতেই তাহা পরিদৃষ্ট হইয়াছে। মানুষের সামনে কুরআন এ ক্ষেত্রে যে চিত্র অংকন করিয়াছে, তাহা হইল রবুবিয়াত, রহ্‌মত ও আদালতের চিত্র। এই তিনটির ধ্যান-ধারণা হইতেই আমরা আল্লাহ্‌ সম্পর্কে সম্যক পরিচিতি লাভ করিতে পারি।

আল্লাহ্‌র ধারণা সর্বদাই মানুষের আত্মিক ও নৈতিক জীবন নিয়ন্ত্রিত করিতেছে। কোন ধর্মের রূপ ও স্বরূপ কি এবং অনুসারীদের উপর উহার প্রভাব কতটুকু ; তাহা শুধু সেই ধর্মের আল্লাহ্‌ সম্পর্কিত ধ্যান-ধারণা হইতেই বুঝা যাইতে পারে।

মানুষের প্রাথমিক ধারণা

যখন আমরা মানুষের বিভিন্ন যুগের আল্লাহ্‌ সম্পর্কিত ধ্যান-ধারণা অধ্যয়ন করি, আমাদের কাছে তাহা বেশ কিছুটা আশ্চর্য ধরনের মনে হয়। আমাদের জ্ঞান-গবেষণার রীতি-নীতি সেখানে অচল হইয়া যায়। সৃষ্ট বস্তুর সর্বত্র ঐতিহাসিক বিবর্তনবাদের নীতি সক্রিয় রহিয়াছে। মানব বুদ্ধি ও দেহ কোনটিই উহার বহির্ভূত নহে। মানুষের দেহ যেভাবে নিম্ন স্তর হইতে ক্রমোন্নতির ধারা বাহিয়া বর্তমান উঁচু পর্যায়ে আসিয়া পৌঁছিয়াছে, তেমিন পৌঁছিয়াছে মানুষের বুদ্ধি ও চিন্তাধারা। অথচ আল্লাহ্‌র ধ্যান-ধারণার

ব্যাপারে যেন তাহার বিপরীত অবস্থা দেখা দিয়াছে। তাহা যেন উঁচু স্তর হইতে ক্রমাবনতির ধারা বাহিয়া নীচুতে নামিয়া আসিয়াছে।

মানুষের মস্তিষ্কে সব চাইতে পুরানো যে ধারণা প্রাচীনতার অন্ধকার ভেদ করিয়া দ্যুতি ছড়াইতেছিল, তাহা এক আল্লাহ্‌র ধারণা বা তাওহীদ। এক অদেখা সর্বোন্নত শক্তি মানুষ ও তাহার চতুর্দিকে ছড়ানো সকল বস্তুর সৃষ্টিকর্তা বলিয়া তাহারা মনে করিত। ইহার পরের ইতিহাস দেখিলে মনে হয় যেন ক্রমে এই চিন্তাধারা পিছু হটিয়া চলিল এবং ধীরে ধীরে একেশ্বরবাদের স্থলে বহু ঈশ্বর ও ঈশ্বর সহকারী দল জন্ম নিতে লাগিল। অসংখ্য উপাস্য প্রভুর চরণে মানুষ মাথা ঠুকিতে শুরু করিল।

যদি তওহীদ আল্লাহ্ সম্পর্কিত মানবীয় ধারণার উন্নত পর্যায় হয় এবং অংশীবাদ ও বহু ঈশ্বরবাদ নিম্ন স্তরের ধারণা বিবেচিত হয়, তাহা হইলে আমাদের এই সিদ্ধান্তে পৌঁছিতে হয় যে, প্রাথমিক ধারণা মানুষের অবশ্যই উঁচু স্তরের ছিল। ইহার পর হইতে সেই চিন্তাস্রোত উঁচু হইতে নিম্নমুখী হইয়া চলিতে থাকে। ক্রমোন্নতির নীতি-নিয়ম এখানে যেন বানচাল হইয়াছে। তাই এ ক্ষেত্রে উন্নতির বদলে মানুষ দিন দিন অবনতির পথে দ্রুত পিছাইয়া চলিল।

উনবিংশ শতাব্দীর ধর্মীয় চিন্তাধারা

উনবিংশ শতাব্দীর সমাজ বিজ্ঞানীদের সাধারণ ধারণা ছিল যে, মানুষের ধর্ম বিশ্বাসের ধারণার সূত্রপাত ঘটে তাহাদের প্রাথমিক স্তরের জীবিকা পদ্ধতির স্বাভাবিক চাহিদা হইতে এবং স্থান ও পরিবেশের স্বাভাবিক প্রভাব দ্বারা উহা প্রতিফলিত হয় ও পুষ্টি লাভ করে। এই চিন্তাই ক্রমে বিবর্তনের খাতে প্রবাহিত হইয়া স্তরে স্তরে বিভিন্ন রূপ পরিগ্রহ করে। অবশেষে আসিয়া এক শ্রেষ্ঠতম শক্তি ও সর্ব বস্তুর স্রষ্টা রূপে উন্নত স্তরের মানুষের কাছে ধরা দেয়। এই ক্রমোন্নতির ধারার যেন প্রথম সূত্রটি সম্পূর্ণ কল্পনাপ্রসূত ছিল এবং উহা হইতে নানা ধরনের খোদায়ী শক্তির ধারণা সৃষ্টি হইল। তারপর তাহা বর্তমান পর্যায়ে আসিয়া একত্ববাদের ধারণায় উন্নীত হইয়াছে।

যদি এখানে উপরোক্ত চিন্তাধারার উপরে সংক্ষিপ্ত আলোচনা করা হয়, তাহা হয়তো অসঙ্গত হইবে না। আল্লাহ্ সম্পর্কিত অনুরূপ ধারণা একের পর এক করিয়া যাহা সৃষ্টি হইয়া আসিয়াছে এবং সমসাময়িক যুগের জ্ঞানী-গুণীদের প্রভাবান্বিত করিয়াছে, এখানে সেইগুলির উপরে মোটামুটি আলোচনা প্রয়োজন মনে করি।

ধর্মীয় বিশ্বাস ও ধ্যান-ধারণার ইতিহাস শিক্ষা ও জ্ঞানের অন্যতম শাখা হিসাবে উনবিংশ শতাব্দীর সৃষ্টি হয়। অষ্টাদশ শতাব্দীর শেষভাগে যখন ইন্দোজার্মান গোত্র অর্থাৎ মধ্য এশিয়ার আর্যগোত্র ও তাহাদের ভাষায় ইতিহাস প্রকাশ পাইল, তখন তাহাদের ধর্মীয় ধ্যান-ধারণাগুলিও জানা গেল। ফলে বিতর্ক ও সমালোচনার একটি নূতন ক্ষেত্র সৃষ্টি হইল। ইহার ফলেই উনবিংশ শতকের প্রথম দিকে পর্যালোচনা ও গবেষণার একটি স্বতন্ত্র শাখা জন্ম নিল। তখন হইতেই ধর্মীয় বিশ্বাসসমূহের জন্ম ও

সেইগুলির পালন-পুষ্টি ইতিহাস সংকলিত হইয়া চলিল। এই যুগে সাধারণ ধারণা এই দেখা দিল যে, খোদা-অর্চনার প্রারম্ভ প্রকৃতি-পূজা (Nature myths) হইতে শুরু হয়। অর্থাৎ প্রকৃতি সম্পর্কে যেসব উদ্ভট ও বাজে কিস্‌সা-কাহিনী শুরু হইয়াছিল, তাহাকে ভিত্তি করিয়াই আদি ধর্মের সূত্রপাত হয়। যেমন আলোর একটি স্বতন্ত্র অস্তিত্ব কল্পনা করা হইল। বারিপাতের শক্তি স্বতন্ত্র এক দেবতা সাজিল প্রাচীন আর্যরা যে প্রকৃতির নিদর্শনের অর্চনা করিত, তাহা হইতেই ধর্ম সম্পর্কিত এই প্রাথমিক ধারণা সংগ্রহ করা হইয়াছে।

কিন্তু উনিশ শতকের প্রথমার্ধে যখন আফ্রিকা ও আমেরিকার অসভ্য গোত্রগুলির অবস্থা জানা গেল, তখন ধর্মবিশ্বাস সম্পর্কিত ধারণাবলি লইয়া গবেষণার ব্যাপারে নূতন একটি চিন্তাধারার সংযোগ ঘটিল। ১৭৬০ খ্রীস্টাব্দে ডি ব্রোসেস (De Brosses) সেই অসভ্য জাতিগুলির ধ্যান-ধারণা হইতে Fetish-worship তত্ত্ব আবিষ্কার করেন। অর্থাৎ তাহারা এমন সব বস্তুর পূজা করিত যেগুলির ভিতরে জীনের আত্মার সংযোগ রহিয়াছে বলিয়া তাহারা মনে করিত। তারপর ১৮৫১ খ্রীস্টাব্দে এই জীন-পূজা (Comete) হইতে খোদা-অর্চনা জন্মলাভের মতবাদ প্রচার করিলেন। তারপর স্যার জন লুবাক ইহাকে অধিক আলোচনা ও গবেষণার বিষয়বস্তু করিয়া তুলিলেন। সেই যুগে এই মতবাদটি সর্বত্র অভিনন্দিত হইল এবং সমসাময়িক কালের জ্ঞানী-গুণীদের সমর্থন লাভ করিল।

প্রায় এই যুগেই পূর্বপুরুষ পূজার মতবাদ (Manism) মাথাচাড়া দিয়া উঠিল। এই মতবাদের মূলে এই অনুমানটি দেখা দিল যে, মানুষের মনে বাপ-দাদার শ্রেষ্ঠত্ব বোধই প্রথমে তাহাদিগকে পূজা-অর্চনার পথ দেখাইল। এই অর্চনাই ক্রমোন্নতির ধারা বাহিয়া খোদা-অর্চনার রূপ ধারণ করিয়াছে। তাঁবুবাসী ও তৃণভূমি সন্ধানীদের গোত্রসমূহের ভিতরে বাপ-দাদা পূজার কাল্পনিক উপকরণ মওজুদ ছিল না। তবে চীনের প্রাচীন ইতিহাসে এই পূজার সন্ধান বহুদূর পর্যন্ত মিলে। সুতরাং এই মতবাদের জন্য প্রয়োজনীয় উপকরণ এখানে পাওয়া গেল। পরে ১৮৭০ খ্রীস্টাব্দে যখন হার্বার্ট স্পেন্সার উক্ত ধারণার উপরে তাঁহার প্রেতাত্মা-মতবাদ (Ghost theory) প্রচার করিলেন, সমসাময়িক দার্শনিক ও সমাজবিজ্ঞানী দল তক্ষুণি তাহা মানিয়া লইলেন।

এই যুগেই আরেকটি মতবাদ দেখা দিল। এমনকি তাহা অস্বাভাবিকভাবে স্বীকৃতি লাভ করিয়া চলিল। তাহা হইল ই. বি. টেইলরের 'এনিমিজম' (Animism) মতবাদ। ১৮৭২ খ্রীস্টাব্দে তিনি তাঁহার বিখ্যাত গ্রন্থ 'প্রিমিটিভ্ কালচার' প্রকাশ করেন। তিনি তাহাতে ধর্মবিশ্বাসের সর্বাধিক সংক্ষিপ্ত সংজ্ঞা দান করেন 'এনিমিজম'-এর মাধ্যমে। 'এনিমিজম' বলিতে তিনি বুঝাইয়াছেন যে, মানুষের চিন্তাধারায় তাহার দৈহিক জীবন ছাড়াও স্বতন্ত্র এক আত্মিক জীবনের কল্পনা স্থান নেয়। এই স্বতন্ত্র আত্মিক জীবনের ধারণা টেইলরের কাছে আল্লাহ্ বিশ্বাস ও ধর্ম-উপাসনার

ভিত্তিমূল ছিল। এই ভিত্তিমূলই লালিত ও পুষ্ট হইয়া আল্লাহ্‌র অস্তিত্ব আবিষ্কার করিয়াছে।

সম্ভবত ধর্মবিশ্বাস সম্পর্কিত মতবাদের ভিতরে এইটিই প্রথম সম্পূর্ণ জ্ঞান-গবেষণার ভিত্তিতে প্রতিষ্ঠিত ছিল। এই মতবাদে বিতর্ক ও সমালোচনার সকল দিক সুন্দরভাবে সাজাইয়া দেখানো হইয়াছে। ফলে, সমসাময়িক সকল জ্ঞানী-গুণীর উপরে ইহার অপরিসীম প্রভাব দেখা দিল। আর ইহাকে স্থিরীকৃত সিদ্ধান্ত হিসাবে সর্বত্র চালাইতে লাগিল। উনবিংশ শতাব্দীর শেষ পর্যন্ত এই মতবাদের অপ্রতিহত প্রভাব বহাল রহিল।

ইত্যবসরে মিসর, ব্যাবিলন ও আশুরীয়দের প্রাচীন নিদর্শন ও লিপি মানুষের আয়ত্তাধীনে আসায় প্রাচীন ইতিহাসের এক নূতন ক্ষেত্র আবিষ্কার হইল। এই নিদর্শনগুলির উপরে সৃষ্ট আলোচনা ও সামালোচনা এক স্বতন্ত্র জ্ঞান ও শিক্ষার বিষয়বস্তুতে পরিণত হইল। এই নূতন উপকরণ প্রাকৃতিক বস্তু অর্চনার সূত্রকে নূতনভাবে গুরুত্ব দিয়া আবার জাগাইয়া তুলিল। কারণ নীল-উপত্যকা ও দজলা-ফোরাত উপত্যকার উভয় প্রাচীন সভ্যতা ধর্মবিশ্বাসের এই নিদর্শন রাখিয়া গিয়াছে। ফলে আবার ধর্ম সম্পর্কিত মতবাদের এক নূতন স্কুল গড়িয়া উঠিল। আল্লাহ্ অর্চনার মূলসূত্র হিসাবে তাহাতে আবার প্রকৃতি-পূজার দর্শন আবিষ্কৃত হইল। বিশেষ করিয়া নভোমণ্ডলের গ্রহ-উপগ্রহ পূজাকেই উহার মূলভিত্তি হিসাবে ঘোষণা করা হয়। এই মতবাদের সমর্থকরা 'এনিমিজম'-এর বিরোধিতা শুরু করিল এবং তাহারা 'অ্যাস্ট্রল অ্যাণ্ড ন্যাচার মাইথোলোজিস্টস্' (Astral and Nature Mythologists) নামে খ্যাতিলাভ করিল।

একদিকে উনিশ শতকের শেষভাগে যখন এই সব মতবাদ মাথা তুলিতেছিল, অন্যদিকে বিশেষ একদল মনীষী তখন ধর্মবিশ্বাস সম্পর্কে বিশেষ এক মতবাদ গড়িয়া তুলিলেন। এই মতবাদের উপকরণ প্রাচীনতম সভ্যতার যুগের শিকারজীবী গোত্রের ধর্মীয় ধ্যান-ধারণা হইতে সংগ্রহ করা হয়। এই মতবাদ 'টোটেমিজম' (Totemism) নামে পরিচিত হয়। অতি দ্রুত ইহা জ্ঞানী-গুণীদের আকৃষ্ট করিয়া ফেলে। 'টোটেমিজম' বলিতে তাঁহারা বুঝাইয়াছেন যে, প্রাথমিক যুগের মানুষ বিভিন্ন বস্তু ও জন্তুর সহিত সম্পর্ক স্থাপন করিত। এই সম্পর্ক পরে অশেষ মর্যাদার সম্পর্কে পরিণত হইল। ফলে সেইগুলি মানুষের পূজা-অর্চনা পাইতে লাগিল। ভারতে গো-মাতা, মিসরে পিতলের ঘণ্টা ও বলদ, উত্তরাঞ্চলে ভল্লুক, যাযাবর গোত্রের সাদা বাছুর ইত্যাদি 'টোটমিজম'-এর মূল ধারণার ভিত্তি ছিল। সর্বাগ্রে ১৮৮৫ খ্রীস্টাব্দে রবার্টসন স্মিথ এই মতবাদ প্রচার করেন। তারপর সমসাময়িক অন্যান্য চিন্তাশীল এই দিকে দৃষ্টি দেন।

কিন্তু কিছুকাল পরেই এই মতবাদ পংগু হইয়া চলিল। অধ্যাপক জে. জি. ফ্রেজারের সংগৃহীত উপকরণ যখন সকলের দৃষ্টিতে ধরা দিল তখন জানা গেল যে,

টোটেমিজম'-এর ধারণা আদৌ ধর্মীয় নহে। এমন কি ধর্মীয় ধ্যান-ধারণার উহা ভিত্তিও হইতে পারে না। উহাকে খুব বেশি হইলে সমাজ-নীতি পর্যন্ত বলা যাইতে পারে। ইহার চাইতে এই ব্যাপারে ইহাকে বেশি গুরুত্ব দেওয়া চলে না।

অবশ্য এই ব্যাপারের আরেকটি দিক আবিষ্কৃত হইল। ফ্রেজারের টোটেমিজম'-এর ধারণায় এরূপ বিশেষ এক দিক পাওয়া গেল, যাহাকে ধর্মীয় ধারণার মূলভিত্তি বলার যথেষ্ট কারণ দেখা দিল। তাহা হইল যাদু-বিশ্বাস। এই সূত্রটি লইয়া চিন্তাশীলদের বিরাট দলটি আলোচনা-সমালোচনায় প্রবৃত্ত হইল। সুধী সমাজেও যাদু-বিশ্বাসের এই মতবাদটি পরিচিত হইয়া গেল। ১৮৯২ খ্রীস্টাব্দে আমেরিকার অন্যতম মনীষী জি. এইচ. কিং এই দিকটিতে সকলের দৃষ্টি আকর্ষণ করিতে সক্ষম হইলেন। তারপর বিংশ শতকের প্রথম দিকে একই সময়ে জার্মানী, ইংলণ্ড, ফ্রান্স ও আমেরিকার সুধী সমাজে ইহা অভিনন্দিত হইয়া চলিল এবং 'এনিমিজম'-এর বিরুদ্ধে মত সৃষ্টি হইতে লাগিল। এখন এই চিন্তার ব্যাপকতা লাভ করিল যে, 'এনিমিজম ধারণার আগেও মানুষের ধর্মীয় ধারণার একটি স্তর ছিল। উহাকে 'প্রাক-এনিমিজম' (Pre-animism) যুগ বলা যায়। এই যাদু-বিশ্বাস পরবর্তী স্তরে আত্মিক ধারণার জন্ম দিয়াছে এবং আল্লাহ্ অর্চনার ও ধর্ম-বিশ্বাসের ভিত্তিমূলের পত্তন করিয়াছে।

এক্ষণে যাদু-বিশ্বাসের মতবাদ সার্বজনীন হইয়া উঠিল। ফলে আগেকার সব মতবাদ লোপ পাইয়া চলিল। ১৮৯৫ খ্রীস্টাব্দে আর. আর্মিরাট, ১৯০২ খ্রীস্টাব্দে হিউট, ১৯০৪ খ্রীস্টাব্দে প্রেউ, ১৯০৭ খ্রীস্টাব্দে এ, ভয়ের্কান্টেড এবং ১৯০৮ খ্রীস্টাব্দে ই. এক্স হার্টলেণ্ড এই মতবাদের ভিত্তিতেই নিজ নিজ আলোচনা এ চিন্তাধারা গড়িয়া তুলিলেন এবং ইহাকে দূর-দূরান্তরে প্রসারিত করিয়া চলিলেন। এই ব্যাপারে সব চাইতে বেশি অংশ নিলেন ফ্রান্সের সমাজবিজ্ঞানীদের সেই দলটি, যাহারা (Durkheim) 'দূরকীম'-এর চিন্তাস্রোতের সহিত সংশ্লিষ্ট ছিলেন। এই দলের প্রথম পরিকল্পনাদাতা এইচ. হিউবার্ট ও এম. মাস্ ছিলেন। তারপর ১৯১২ খ্রীস্টাব্দে দূরকীম আরও কিছু অগ্রসর হইলেন এবং এই মতবাদের শ্রেষ্ঠতম ধ্বজাধারী হইলেন। এই দলের মতে টোটেমিজম ও যাদু-বিশ্বাসের মিলিত যে রূপ অস্ট্রেলিয়ায় দেখা গিয়াছে, তাহাই মানব জাতির ধর্মীয় ধারণার ভিত্তি ছিল। ক্রমোন্নতির বিধান মুতাবিক উহাই পালিত ও পুষ্ট হইয়া কালে আল্লাহ্-অর্চনার ধারণা জন্ম দিয়াছে।

এই যুগের কয়েক বছর পরে একদল প্রোটেস্ট্যান্ট আলিম ধর্ম-বিশ্বাসকে লৌকিক রূপ দিবার জন্য এই মতবাদের সমর্থক সাজিলেন। তাঁহারা বলিলেন, 'ধর্ম-বিশ্বাসের ভিত্তিমূল খুঁজিতে গিয়া আমাদের ধর্মমত ও যাদু-বিশ্বাস উভয়ের মিলিত ধারণা অধ্যয়ন করা চাই।' এই দলের নেতা আর্ক বিশপ সোডার ব্লোম (Sodarblom) ছিলেন। ১৯১৬ খ্রীস্টাব্দে তাঁহার মতবাদ প্রকাশিত হয়। ইহার পরেই প্রথম মহাযুদ্ধ দেখা দেয়। ইহা বিংশ শতকের এক অধ্যায় শেষ করিয়া দ্বিতীয় অধ্যায়ের সূত্রপাত

ঘটাইল। এই নূতন যুগ আসিয়া জ্ঞান শিক্ষার অনেক দিককেই বৈপ্লবিক পরিবর্তন দান করিল। শিক্ষার এই শাখাটিও তাহার ফলে নূতন মোড় নিল।

পেছনের এইসব মতবাদ 'জড়বাদী বিবর্তনবাদের' নীতিকে ভিত্তি করিয়া গড়িয়া উঠিয়াছিল। এই Materialistic Evolutionism অনুসারীদের ধারণা ছিল এই, জড়দেহ ও উপকরণাদির মত মানুষের ধর্ম-বিশ্বাসও নিম্নতম সিঁড়ি হইতে ধাপে ধাপে উচ্চতর সিঁড়িতে আসিয়া পৌছিয়াছে। আর আল্লাহ্-অর্চনার ক্ষেত্রে একত্ববাদ সৃষ্টি সুদীর্ঘ কালের ক্রমোন্নতির ফল। উনিশ শতকের শেষাংশ ডারউইনবাদের প্রসারতার যুগ ছিল। ওয়েলস ও স্পেন্সার উহাকে নিজ নিজ দার্শনিক আলোচনার মাধ্যমে মানবীয় চিন্তা ও কর্মের সর্বক্ষেত্রে ছড়াইযা দিলেন। তাই স্বভাবতই আল্লাহ্‌বিশ্বাসের জন্য প্রশ্নটিও উহা দ্বারা প্রভাবিত হইল। ফলে, ইহা লইয়া চিন্তা ও আলোচনার যত প্রয়াস চলিল, সবই সেই আলোকে চলিতে লাগিল।

বিবর্তনবাদের মৃত্যু ও আধুনিক গবেষণা

কিন্তু বিংশ শতকের বিপ্লবাত্মক অগ্রগতি তখনও সবেমাত্র হাঁটি হাঁটি পা পা করিতেছিল। ইত্যবসরে বিবর্তনবাদ ভিত্তিক এই সব মতবাদের পায়ের তলার মাটি সরিতে শুরু করিল। তারপর প্রথম মহাযুদ্ধের পরবর্তী অধ্যায় তো উহাদের একেবারে বিলোপ করিয়া ছাড়িল। এক্ষণে সব চিন্তাশীল একমত হইয়া ভাবিতে লাগিল, এই পথে যত পদক্ষেপ ঘটিয়াছে, তাহার গোড়ায় গলদ থাকায় আগা-গোড়াই মিথ্যার সৌধ হইয়া উঠিয়াছে। কারণ এই সব মতবাদের ভিত্তি বিবর্তনবাদের ক্রমোন্নতির বিধানের উপর স্থাপিত ছিল। এই ক্রমোন্নতির ধারায় ফেলিয়া এইগুলি বিচার করার ফলে সফলতার বদলে বিভ্রান্তিই দেখা দিয়াছে। এক্ষণে সুস্পষ্ট অনস্বীকার্য ঐতিহাসিক প্রমাণাদির আলোকে তাঁহাদের সামনে এ ব্যাপারটি পরিষ্কার হইয়া ধরা দিল যে, ধর্মীয় ধ্যান-ধারণার যেই স্তরকে পূর্ববর্তীরা উন্নততম বলিয়া অভিহিত করিয়াছে, তাহা পরবর্তীকালে জন্ম নেয় নাই বরং মানব গোষ্ঠীর সর্বপ্রাচীন ধারণা ইহাই ছিল। প্রকৃতির নিদর্শনের অর্চনা, পশু-পূজা, বাপ্প-দাদার অর্চনা ও যাদু-বিশ্বাসের ধ্যান-ধারণাও বহু আগে যে ধারণা মূর্খ মানুষের মস্তিষ্ক দিগন্তে উঁকি মারিয়াছিল, তাহা এক উচ্চতম অস্তিত্বের নিরংকুশ ধারণা ছাড়া অন্য কিছুই ছিল না। অর্থাৎ তাহা ছিল আল্লাহ্‌র একত্বে অখণ্ড বিশ্বাস।

বস্তুত এক্ষণে আলোচনা-সমালোচনার এই দিকটিতে ক্রমোন্নতিবাদের মৃত্যু ঘটিল। ভিয়েনা বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রফেসর ডব্লিউ স্মিট (Schmidt) এ বিষয়ে বর্তমান যুগের সব চাইতে নির্ভরযোগ্য গ্রন্থ রচনা করিয়াছিলেন। তিনি লিখিতেছেন ঃ

'মানব গোত্র ও উহার শাখা-প্রশাখা সম্পর্কিত বিদ্যার সর্বক্ষেত্রে আজ ক্রমোন্নতিবাদ একদম দেউলিয়ায় পরিণত হইয়াছে। লালন-পুষ্টির ক্রমবিকাশের চোখ ধাঁধানো যে নীতি এই মতবাদ বিরাট উৎসাহ-উদ্দীপনার সহিত গড়িয়া তুলিয়াছিল, আজ তাহা

খণ্ড-বিখণ্ড হইয়া গিয়াছে। নয়া ঐতিহাসিক দৃষ্টিভঙ্গি আসিয়া উহা দূরে নিক্ষেপ করিয়াছে।"[৮]

দ্বিতীয় এক স্থানে তিনি লিখিতেছেন ঃ

'এক্ষণে এ কথা স্পষ্ট হইয়া উঠিয়াছে যে, প্রাথমিক মানুষের জীবন ও চিন্তাধারার উন্নততর অস্তিত্বটি মূলত একত্ববাদী বিশ্বাসের একক আল্লাহ্ ছাড়া অন্য কিছুই নহে। তাই উহার ভিত্তিতে তখন যে ধর্ম প্রচলিত ছিল, তাহা একত্ববাদের ধর্ম ছিল। এই তত্ত্বটি এখন এরূপ সুস্পষ্ট হইয়া ধরা দিয়াছে যে, উহার উপরে একটি-বার চোখ বুলাইয়া গেলেই যথেষ্ট মানব জাতির প্রাচীনতম ক্ষুদ্র গোত্রগুলির অধিকাংশ সম্পর্কে এই কথাটি দৃঢ়তার সহিত বলা যায়। এভাবে প্রাথমিক যুগের জঙ্গলবাসী গোত্রগুলি সম্পর্কে যে সব ব্যাপার জানা গিয়াছে, বিশেষ করিয়া কের্ণায়ী ক্লেন ও দক্ষিণ-পূর্ব অস্ট্রেলিয়ার য়্যাএন গোত্র সম্পর্কে যতখানি ঐতিহাসিক তথ্য সংগৃহীত হইয়াছে, সেই সবের অনুসন্ধান কার্যের ফলে আমরা আজ এরূপ সিদ্ধান্তে পৌঁছিতে সমর্থ হইয়াছি। আর্কেনিক সভ্যতা অধ্যুষিত গোত্রগুলির বর্ণনালিপি ও উত্তর আমেরিকার প্রাচীন গোত্রগুলির ধ্যান-ধারণা লইয়া গবেষণা চালাইয়াও এই সিদ্ধান্তেই পৌঁছা গিয়াছে।"[৯]

বর্তমান যুগের চিন্তাবিদগণ এই প্রশ্নটিকে ভিত্তি করিয়া (Pantheology). ধর্ম সম্পর্কিত বিদ্যা অধ্যয়ন করিয়াছেন এবং প্রাচীন জ্ঞান ও আলোচনার সব শাখা একত্র করিয়া একটি সামগ্রিক ফল বাহির করিয়াছেন। এই ব্যাপারে বিভিন্ন নয়া গবেষণার উপরে একবার দৃষ্টি বুলাইয়া যাওয়া প্রয়োজন। কারণ এখনও সেগুলি এত বিস্তারিতভাবে প্রচারিত হয় নাই যাহা লইয়া ব্যাপক আলোচনা করা যাইতে পারে।

অস্ট্রেলিয়া ও ভূমধ্যসাগরীয় দ্বীপপুঞ্জের অসভ্য গোত্রসমূহ এবং মিসরের প্রাচীনতম নিদর্শনের আধুনিক গবেষণা

অস্ট্রেলিয়া ও ভূমধ্যসাগরীয় দ্বীপগুলির অসভ্য গোত্রগুলি এক অজানা প্রাগৈতিহাসিক কাল হইতে তাহাদের প্রাথমিক অপরিণত বুদ্ধিভিত্তিক জীবন যাপন করিতেছিল। জীবন ও জীবিকার যেসব উন্নত ব্যবস্থা সাধারণত মানুষের বুদ্ধির উন্নয়নের সঙ্গে জন্ম নেয়, তাহা এসব ক্ষেত্রে সম্পূর্ণ অবর্তমান ছিল। প্রাথমিক যুগের মানব গোত্রের সব দৈহিক ও মানসিক বৈশিষ্ট্য তাহাদের পারিবারিক জীবনে দেখা যাইতে পারে। তাহাদের চিন্তাধারা এতই সীমাবদ্ধ ছিল যে, চিন্তা বা সংস্কার কোন কিছুর ভিতরেই তাহাদের ধারাবাহিক উন্নতির কোন পরিচয় পওয়া যায় না। তবুও তাহাদের ধর্মবিশ্বাসের একটি ধারণা সুস্পষ্ট দেখা যায়। তাহা হইল এক অদৃশ্য শক্তির অর্চনা। সেই শক্তিই তাহাদের পৃথিবী ও আকাশের স্রষ্টা। তাহাদের জনম ও মরণ তাঁহার মুঠায় রহিয়াছে। আট হাজার বছর আগেকার মিসরবাসীদের আওয়াজ আজ আমাদের কানে ভাসিয়া

---

৮. দি অরিজিন এণ্ড গ্রোথ অব রিলিজিয়ন (The Origin and Growth of Religion), পৃষ্ঠা ৮।

৯. ঐ. পৃষ্ঠা ২৬২।

আসিতেছে। প্রাচীন মিসরীয় ধ্যান-ধারণা একের পর এক করিয়া স্তরে স্তরে আমাদের সামনে আসিয়াছে। আমরা সেখানে দেখি, এক আল্লাহ্‌র চিন্তা সেখানে শেষ স্তরে দেখা দেয় নাই, বরং একেবারে গোড়ার স্তরে দেখা দিয়াছে। মিসরের যেসব উপাস্য প্রভুর চিত্র অংকিত করিয়া বিশ্ববিখ্যাত 'হায়কল' উপাসনালয় ও উহার মিনারগুলি সাজাইয়া দেওয়া হইয়াছে, তাহারাও সেই প্রাচীনতম যুগে ছিল না। তখন 'উসায়রিয' নামক অদৃশ্য এক শ্রেষ্ঠতম অস্তিত্ব নীলনদ উপত্যকার সকল বাসিন্দার একক প্রভু ছিলেন।

দজলা ফোরাত আদিবাসীদের একত্ববাদী ধারণা

প্রথম মহাযুদ্ধের পরে ইরাকের বিভিন্ন স্থানে মাটি খুঁড়িবার যে নূতন অভিযান শুরু হইয়াছিল এবং দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের কারণে যাহা স্থগিত হইল ও অসম্পূর্ণ রহিল, সেই অসম্পূর্ণ আবিষ্কৃত জিনিস লইয়া গবেষণা চালাইয়া আমরা এক নূতন আলোর সন্ধান পাইয়াছি। এখন আর এ ব্যাপারে কোনই সন্দেহ অবশিষ্ট নাই যে, নীল দরিয়ার মত দজলা-ফোরাতের উপকূলবর্তী আদিবাসীরা যখন সর্বপ্রথম আল্লাহ্‌কে ডাকিয়াছিল, তখন তাঁহার সহিত কাহাকেও অংশীদার ভাবে নাই। একই অদেখা শক্তি হিসাবে তিনি তাহাদের কাছে ধরা দিয়াছিলেন। কালদিয়া, সুমেরী ও আক্কাদী গোত্র সেই মানব গোষ্ঠীর উত্তম পুরুষ হইয়াছিল। তাহারা চন্দ্র-সূর্যের পূজা করিত না। বরং সেই একই চিরন্তন শক্তি অর্চনা করিত যিনি চন্দ্র, সূর্য ও উজ্জ্বল তারকারাজি সৃষ্টি করিয়াছেন।

মহেঞ্জোদারো সভ্যতায় এক আল্লাহ্‌র অস্তিত্ব

পাক-ভারত উপমহাদেশের মহেঞ্জোদারো সভ্যতার নিদর্শন আমাদিগকে এদেশে আর্যদের আগমনেরও অনেক আগের এক যুগে নিয়া যায়। যদিও উহার অধ্যয়ন পর্ব এখনও সম্পূর্ণ হয় নাই, তথাপি এই সত্যটি সম্পূর্ণ স্পষ্ট হইয়া উঠিয়াছে যে, এই আদিতম বাসিন্দাদের ধর্মবিশ্বাসের ভিত্তি তাওহীদ বা এক আল্লাহ্‌র অস্তিত্ব ছাড়া অন্য কিছুই ছিল না। মূর্তিপূজা তাহাদের পেশা ছিল না। তাহারা সেই একক স্রষ্টার নাম দিয়াছিল 'আদম'। সংস্কৃত 'আন্দোয়ান' শব্দের সহিত ইহার মিল দেখা যায়। উক্ত আল্লাহ্‌র প্রভুত্ব সব কিছুর উপরেই ছড়াইয়া ছিল। শক্তির যত নিদর্শন দেখা যায়, সবই তাঁহার অধীনে কাজ করিত। তাঁহার অন্যতম গুণবাচক নাম হইল 'দীদাদকুন' অর্থাৎ চির জাগ্রত সত্তা—'লাতা' খুজুহু সিনাতুঁওয়ালা নাউম' অর্থাৎ তাঁহার তন্দ্রা বা নিদ্রা কিছুই নাই।

অদৃশ্য এক আল্লাহ্ সম্পর্কিত প্রাচীন সিরীয় ধারণা

সিরীয় আদি গোত্রগুলির মূল উৎসভূমি আরব মরুর বিভিন্ন আবাদ এলাকা ছিল। যখন সেই উৎসভূমিতে মানব সন্তানের সংখ্যা অনেক বৃদ্ধি পাইত, তখনই আশেপাশে ছড়াইয়া পড়িত। কয়েক শতাব্দী পরে সেই সব এলাকার প্রভাবে তাহারা নূতন রূপ ও রঙে গড়িয়া উঠিত, নূতন নাম গ্রহণ করিত।

সম্ভবত মানব সন্তানের স্রোতধারা পৃথিবীর বুকে একই সময়ে দুই অঞ্চলে প্রবাহিত হইতেছিল। এভাবে পরবর্তীকালের বিভিন্ন জাতি ও সভ্যতার তাহারা ভিত্তিভূমি রচনা করিয়াছিল। গোবী মরুভূমির উৎস ধারা হইতে যে মানব স্রোত প্রবাহিত হয়, তাহারা হিন্দী, ইউরোপী, ইন্দো ইউরোপিয়ান ও আর্য নামে অভিহিত হইয়াছে। আরব মরুর উৎসধারা হইতে যে মানব স্রোত প্রবাহিত হয়, তাহারা প্রথম নাম পাইল শামী। তারপর বিভিন্ন এলাকায় গিয়া তাহারা অসংখ্য নাম ধারণ করিল। আমাদের জানা ইতিহাস ইহার চাইতে বেশি কোন খবর দিতেছে না।

আরব গোত্রের এই শাখাটি ধীরে ধীরে পশ্চিম এশিয়া ও নিকটবর্তী আফ্রিফা মহাদেশের দূর-দূরান্তের সকল অংশে ছড়াইয়া পড়িল। ফিলিস্তিন, সিরিয়া, মিসর, লিবিয়া, ইরাক ও পারস্য উপসাগর উপকূলবর্তী এলাকাসমূহে তাহারা বসতি স্থাপন করিল। আদ, সামুদ, আমালেকা, হেকসুস, মাওয়াবী, আশুরী, আক্কাদী, সুমেরী, ঈলামী, আরামী ও ইব্রানী ইত্যাদি গোত্র বিভিন্ন যুগে বিভিন্ন এলাকায় বসবাস করিয়া গিয়াছে। কিন্তু তাহারা একই আরব গোত্রের শাখা-প্রশাখা ছিল মাত্র।

নূতন এক সিরীয় নিদর্শন অধ্যয়ন করার পরে একটি সত্য নূতন করিয়া ধরা দিয়াছে। তাহা হইল এই, সেই সব গোত্র অদৃশ্য এক আল্লাহ্য় বিশ্বাস করিত। আর সেই আল্লাহ্র নাম দিয়াছিল তাহারা আল-ইলাহ্ বা আল্লাহ্। এই ইলাহ্ই কোথাও 'ঈল' কোথাও 'উলুহ্' এবং কোথাও বা 'এলাহিয়া' রূপে দেখা দিল।

গত মহাযুদ্ধের পরে হিজাজ সীমান্তের আকাবা প্রান্তর ও সিরিয়ার রা'ছে' শুমার এলাকায় যেসব নিদর্শন পাওয়া গিয়াছে, তাহাতে উক্ত সত্যটি অত্যন্ত পরিষ্কার হইয়া ধরা দিয়াছে। তবে তাহা বিস্তারিতভাবে আলোচনা করার স্থান ইহা নহে।

যাহা হউক বিংশ শতকের জ্ঞান-অনুসন্ধানের কার্য আমাদিগকে মানুষের যে আদিমতম ধর্মবিশ্বাসের ধারণা দিতেছে তাহা মূর্তিপূজার নহে বরং এক আল্লাহ্র অর্চনার। এই ক্ষেত্রে ইহা হইতে প্রাচীন কোন ধারণা আজ মিলিতেছে না। আদিমতম আদম সন্তানেরা মানব জীবনের সেই শৈশবকালে যখনই জ্ঞানের চক্ষু খুলিল তখনই তাহারা সেখানে এক আল্লাহ্র অস্তিত্ব দেখিতে পাইল। তারপর ধীরে ধীরে পেছনে হাঁটিতে লাগিল। বাইরের প্রকৃতি তাহাদের নূতন নূতন পরিবেশ ও পরিকল্পনা দিতে লাগিল। ফলে একাধিক অপ্রাকৃত শক্তির চিন্তা তাহাদের ভিতরে ঠাঁই নিয়া চলিল। প্রকৃতির অসংখ্য নিদর্শন তাহাদের দৃষ্টি আকর্ষণ করিতে লাগিল। এমনকি উহাতে পূজা-অর্চনার এরূপ সব আসন সৃষ্টি হইতে লাগিল যেখানে তাহারা প্রণতি জানাইবার জন্য মাথা ঠুকিয়া চলিত। পরন্তু এরূপ সব কল্পনার শিকার হইতে লাগিল যে, উহার বাহ্যিক সৌন্দর্যের কাছে তাহারা মাথা নত করিয়া চলিল। মোটকথা, এমন ভাবে প্রকৃতি তাহাদের পথ ঘিরিয়া রহিল যে, এরূপ না করিয়া বাঁচাও তাহাদের পক্ষে দুঃসাধ্য ছিল।

کمند کوتة وباز وے ست وبام بامند
بمن حوالیه ونومیدیم گنم گیرند !

ক্ষুদ্র তীর, দুর্বল বাহু অথচ লক্ষ্য সুদূরে ! হতাশায় হাত-পা ছাড়িয়া ভ্রান্ত পথে পা বাড়ানোই তাই সার হলো।

তাই জানা গেল যে, এ পথে হোঁচট পরে আসিয়াছে, গোড়াতে নহে। আদিতে সোজা পথেরই পথিক ছিল মানুষ।

من ملك بودم وفردوس برین جایم بود
آدم آورد درین خانه خراب ابادم !

আমি তো বাদশাহ ছিলাম। নিবাস আমার জান্নাত ছিল। আদমের ভুলেই আমাকে এই দুঃখনিবাসে ঠাঁই দিল।

যদি বর্তমান অবস্থাকে বিভ্রান্তি বলা হয়, তাহা হইলে মানিতে হইবে মানুষ গোড়ায় বিভ্রান্ত ছিল না। তাহারা আলোকে চোখ খুলিয়াছিল। ধীরে ধীরে তাহাদের চোখে আঁধারের কালো ছায়া নামিয়া আসিয়াছে।

কুরআনের ঘোষণা

বর্তমান যুগের জ্ঞান-অনুসন্ধান কার্যের এই অগ্রগতি ধর্ম জগতের পবিত্র গ্রন্থাবলির অনুকূল হইয়া দেখা দিয়াছে। মিসর, গ্রীক, কালদিয়া, ভারত, চীন, ইরান, সব দেশের ধর্মীয় বর্ণনাগুলি আদি মানুষের যে পরিচয় দান করে, তাহাতেও দেখা যায় সেই মানুষগুলি বিভ্রান্তির সহিত তখনও পরিচিত হইয়াছিল না এবং তাহারা প্রকৃতিগত সোজা পথ অনুসরণ করিয়া চলিত। প্লেটো 'ক্রিতিয়াস' (Critias) গ্রন্থে বিশ্বের আদি আবাদীর যে কাহিনী বর্ণনা করিয়াছেন তাহাতেও এই ধারণার পূর্ণ সমর্থন। তিমাউস (Timaows) নামক এক মিসরীয় উপাসকের বর্ণনায় প্রাচীন মিসরের ঠিক এই অবস্থারই চিত্র পাওয়া যায়। তাওরাতের জন্মখণ্ডে আদম-হাওয়ার কিস্‌সা এই সত্যই প্রকাশ করে যে, মানুষের প্রথম জীবন সত্যানুসারী ছিল, পরে ভ্রান্তি আসিয়া তাহাদিগকে স্বর্গীয় সুখ হইতে বঞ্চিত করিয়াছে। কুরআন তো সাফ সাফ ঘোষণা করিতেছে ঃ

وَمَا كَانَ النَّاسُ الاَّ اُمَّةً وَاحِدَةً فَاخْتَلَفُوْا –

শুরুতে সব মানুষের একই দল ছিল। পরে তাহারা দলীয় কোন্দলে শতধা বিভক্ত হইয়াছে।

كَانَ النَّاسُ اُمَّةً وَّاحِدَةً فَبَعَثَ اللّٰهُ النَّبِيِّنَ مُبَشِّرِيْنَ وَمُنْذِرِيْنَ وَاَنْزَلَ مَعَهُمُ الْكِتَابَ بِالْحَقِّ لِيَحْكُمَ بَيْنَ النَّاسِ فِيْمَا اخْتَلَفُوْا فِيْهِ– (٢ : ١٢٣)

—শুরুতে সব মানুষ ছিল একই গোষ্ঠীর অন্তর্ভুক্ত (স্বাভাবিক ধর্মের অনুসারী। তারপর বিভেদ সৃষ্টি হইয়াছে)। সুতরাং আল্লাহ্‌তা'আলা একের পর এক নবী পাঠাইতে লাগিলেন। তাঁহারা মঙ্গলের পথের সন্ধান দিতেন এবং বিপথে গমনের অনিষ্টকারিতা সম্পর্কে সতর্ক করিতেন। তাঁহাদের সহিত গ্রন্থও অবতীর্ণ করিতেন যেন উহার সাহায্যে মানুষ বিভেদের বিষয়গুলি মীমাংসা করিয়া লয়। (—সূরা বাকারা ঃ আয়াত ২১৩)

ক্রমোন্নতিবাদ আল্লাহ্‌র গুণাবলী সম্পর্কিত ধারণার বেলায় প্রযোজ্য

সুতরাং আল্লাহ্‌র অস্তিত্বের প্রশ্নে উনিশ শতকের ক্রমোন্নতিবাদের মতবাদগুলি বাতিল প্রমাণিত হইয়াছে। এ ক্ষেত্রে উহার শিক্ষা গুরুত্বহীন হইয়াছে, অবশ্য আল্লাহ্‌র গুণাবলি সম্পর্কিত মানবীয় ধারণার বেলায় ক্রমোন্নতিবাদ প্রযোজ্য হইতে পারে। কারণ ইহা সন্দেহাতীত সত্য যে, মানুষের চিন্তা শক্তির লালন ও পুষ্টির একটি ধারাবাহিক পদ্ধতি এখানে রহিয়াছে। ইহাতে ক্রমোন্নতির পূর্ব স্তর হইতে পরবর্তী স্তরে যথেষ্ট পার্থক্য দেখা দেয়। এ ক্ষেত্রে নিম্ন স্তর হইতে আমরা ক্রমে লালিত-পুষ্ট হইয়া উঁচু স্তরে পৌঁছিতে পারি।

তবে খোদার অস্তিত্বে বিশ্বাস মানুষের বুদ্ধিসৃষ্ট ব্যাপার নহে যে, বুদ্ধির পরিবর্তনের সঙ্গে সঙ্গে উহার অন্তর্নিহিত অনুভূতি পরিবর্তিত। এই আত্মিক অনুভূতি না মস্তিষ্ক দ্বারা প্রভাবিত হয়, না বাহিরের কোন প্রভাব স্বীকার করে।

পক্ষান্তরে মানব-বুদ্ধি আল্লাহ্‌র অস্তিত্ব সম্পর্কিত ধারণার ক্ষেত্রে অক্ষম হইয়া দাঁড়ায়। সুতরাং তাহাদের চিন্তাশক্তি বেশি হইলে আল্লাহ্‌র গুণ সম্পর্কেই কার্যকরী হইতে সক্ষম। আদপে গুণাবলি দ্বারাই কোন অস্তিত্বকে ভূষিত ও বৈশিষ্ট্যপূর্ণ করা হয়। সুতরাং প্রকৃতির যখন অন্তর্লীন প্রেরণা রহিয়াছে অপ্রাকৃত এক শক্তির স্বীকৃতি দানের, তখন বুদ্ধি চাহিল উহাকে সুসজ্জিত করিয়া লইতে। ফলে যখন মানুষ এই সম্পর্কে চিন্তা করিল তখন তাহা মূল সত্তা সম্পর্কে না হইয়া উহার গুণাবলি সম্পর্কে হইল। গুণাবলির ভিতরেও সেইগুলিই মানুষ করিল যাহা তাহাদের চিন্তাশক্তি করিতে সমর্থ হইল। এখান হইতেই আল্লাহ্‌র অর্চনার প্রকৃতিগত প্রেরণার সহিত মানুষের বুদ্ধির বাড়াবাড়ি শুরু হইল।

মানব বুদ্ধির গতিবিধি ইন্দ্রিয়ানুভূতির প্রাচীরে সীমিত রহিয়াছে। তাই মানুষের চিন্তা কখনো সীমালংঘন করিতে সমর্থ হয় না। যখনই কোন অদেখা ও অননুভূত বস্তু সম্পর্কে মানুষ ভাবিতে বসে তখন তাহার কল্পনায় দেখা ও অনুভূত গুণাবলিই ধরা দিতে বাধ্য। ইহা ছাড়া মানুষের বুদ্ধি ও চিন্তার যতখানি দৌড় তাহা একই সময়ে শেষ সীমা পর্যন্ত দেখা দেয় না। বরং সুদীর্ঘ দিনে ধারাবাহিক অগ্রগতির মাধ্যমেই তাহা পূর্ণত্বে পৌঁছে। আদি মানুষের বুদ্ধি শৈশবের স্তরে বিরাজ করিতেছিল। তাই তাহাদের কল্পনাগুলিও সেই ধরনের হইত। তারপর তাহাদের ও তাহাদের পরিবেশের উন্নয়ন

ঘটিয়া চলিল। তাহাদের বুদ্ধিও উন্নত হইয়া চলিল। বুদ্ধির এই সংশোধন ও উন্নয়নের সঙ্গে সঙ্গে তাহাদের চিন্তাজগতেও পারিপাট্য ও সমুন্নতি দেখা দিল।

মানুষের এই চৈন্তিক সীমাবদ্ধতার ফল এই দাঁড়াইল, যখনই তাহারা আল্লাহ্‌র সম্পর্কে নূতন করিয়া কোন ধারণা সৃষ্টি করিতে গিয়াছে, তখনই তাহারা অলক্ষ্যে তাঁহার সেই রূপ দান করিয়াছে, যাহা তাহাদের জানার সীমারেখার পূর্ব হইতেই বিধৃত ছিল। তাই যতই তাহাদের জানার দৌড় বাড়িতে লাগিল ততই আল্লাহ্‌র রূপ পরিবর্তন ঘটিয়া চলিল। তাহাদের চিন্তার আয়নায় একটি রূপ ধরা দিয়াছিল। সেটা আল্লাহ্‌র নামে হইলেও মূলত আল্লাহ্‌র রূপ ছিল তাহাদের কল্পনার একটি চিত্র মাত্র। মানবীয় চিন্তাধারার সব চাইতে প্রথম দুর্বলতা ও বিচ্যুতি ইহাই ছিল।

حرم جویان درے رامی پرستند
فقیهان دفترے رامی پرستند !
برا فگن پرده تامحوم گردد
که یاران دیگرے رامی پرستند !

বায়তুল হারামের পূজারীরা আল্লাহ্‌র বিছানা পূজা করিতেছে।
শাস্ত্রবিদরা গ্রন্থ পূজা করিতেছে।
সকলের জ্ঞানের উপরে পরদা পড়িয়া রহিয়াছে।
তাই বন্ধুরা আল্লাহ্‌র নামে অন্য আল্লাহ্‌র পূজা করিতেছে।

মানুষের এই অক্ষমতার জন্যই যুগে যুগে ওহী অবতীর্ণ হইয়া চলিল। নবীদের আহবানের একটি মূলনীতি এই রহিল যে, তাহারা সর্বদা আল্লাহ্‌র অর্চনার সেরূপ সবকই দিতেন যাহা সর্বসাধারণের জ্ঞান ও তিতিক্ষা গ্রহণ করার যোগ্যতা রাখে। তাহারা সাধারণ মানুষের শিক্ষক ও অভিভাবক ছিলেন। শিক্ষকের অবশ্য কর্তব্য হইল ছাত্রদের মেধা ও যোগ্যতা অনুসারে যথোপযোগী শিক্ষা তিনি দান করিবেন। সুতরাং মহান নবীরাও একের পর এক আল্লাহ্‌র গুণাবলির যে বর্ণনা দান করিয়া গিয়াছেন, তাহাও ক্রমোন্নতির ধারা অনুসরণ করিয়াই করিয়াছেন, বাহিরে গিয়া নহে।

ক্রমোন্নতিবাদের তিন ভিত্তি

এই ধারার প্রত্যেকটি স্তরের উপরে যখন আমরা দৃষ্টিপাত করি এবং এই চিন্তা-ধারার মূল উপাদানগুলি বিশ্লেষণ করি, তখন আমরা জানিতে পাই যে, যদিও ইহার অসংখ্য ধরন নির্ধারণ করা যায়, তথাপি ক্রমোন্নতির মূল ভিত্তি সর্বদাই তিনটি ছিল।

সেইগুলির আলোকেই এই মতবাদের উৎপত্তি ও সমাপ্তি বুঝা যাইতে পারে।

১. প্রাকৃত হইতে অপ্রাকৃত ধারণা।
২. বহুত্ব হইতে একত্ব ধারণা।
৩. নিষ্ঠুর হইতে দয়ালু ধারণা।

আল্লাহ্‌কে দেহী বা প্রাকৃত ধারণা ও নিষ্ঠুর রূপ কল্পনা প্রাথমিক স্তরেই দেখা দিয়াছে। তারপর উহা ক্রমোন্নতির ধারা বাহিয়া অপ্রাকৃত ও দয়ালু রূপ লাভ করিয়াছে। আল্লাহ্‌র গুণাবলি সম্পর্কিত ধারণার যতই গোড়ার দিকে যাওয়া হয়, ততই তাঁহাকে প্রাকৃত ও নিষ্ঠুর কল্পনা করার প্রবণতা অধিক দেখা যায়। পক্ষান্তরে সেই ধারণাকে যতখানি উন্নতির পর্যায়ে আনা যায়, ততই অপ্রাকৃত ও দয়ালু আল্লাহ্‌র পরিচয় স্পষ্টতর হইতে থাকে।

মানুষের চিন্তাধারায় আল্লাহ্‌র রুদ্র গুণটি কেন প্রথমে দেখা দিল ? ইহার কারণ সুস্পষ্ট। প্রকৃতির সৃজন উহার ধ্বংসলীলার যবনিকায় ঢাকা পড়ে। মানুষের বুদ্ধির শৈশবকালে তাই সৃজনের সেই সূক্ষ্ম সৌন্দর্যটি মানুষের দৃষ্টিতে আসেনি। ধ্বংসলীলার ভয়াবহতায় তাহাদের সৃষ্টি আচ্ছন্ন ছিল। উহার অন্তর্নিহিত সৃজনী শক্তি দেখার জন্য যে সূক্ষ্ম ও দূরদৃষ্টির প্রয়োজন ছিল, মানুষ তখনও তাহা অর্জন করে নাই।

পৃথিবীতে প্রত্যেক বস্তুর মত প্রত্যেকটি কাজেরও একটি বৈশিষ্ট্য আছে। সৃজন কার্যটি এমন এক ব্যাপার, যাহা আগাগোড়া নীরবতা ও প্রশান্তি ছাড়া অন্য কিছুই নহে। পক্ষান্তরে ধ্বংস এমন একটি ব্যাপার, যাহার আগাগোড়া গণ্ডগোল ও ভয়াবহতা বিরাজমান। সৃজনে বাধ্যবাধকতা আছে, শৃঙ্খলা আছে, সমাবেশ ও সাজানো আছে। পক্ষান্তরে ধ্বংসে আছে লণ্ডভণ্ডতা, বিচ্ছিন্নতা ও বিশৃঙ্খলা। দেয়াল যখন সৃষ্টি হয়, তখন কোন শোরগোল দেখা দেয় না, দেখা দেয় ভাঙার সময়ে ! আপনারা তাহা শুনিয়া চমকাইয়া উঠেন। উহার ফলে দেখা যায়, পশু প্রকৃতি ভাঙার কাজে বেশি প্রভাবিত হয়, উৎসাহ বোধ করে ! কারণ উহার সৃষ্টি মূলে রহিয়াছে ভয়াবহতা ও বিশৃঙ্খলা। সুতরাং গড়ার কার্যে উহার উৎসাহ বিলম্বে আসে। কারণ উহা হঠাৎ তাহাদের চমকাইয়া দেয় না এবং উহাতে শোরগোলের বদলে নীরবতা আছে।

এই জন্যই মানববুদ্ধি যখন খোদার গুণাবলি রূপদানের প্রয়াস পাইল, তখন প্রকৃতির লীলাখেলার ভিতরে ধ্বংসলীলার ভয়াবহতাই তাহাদের বেশি আকৃষ্ট করিল। কারণ উহা বেশি স্পষ্ট ও শোরগোলপূর্ণ ছিল। পক্ষান্তরে সৃজনলীলা দ্বারা তাহারা প্রভাবিত হইতে অনেক বিলম্ব ঘটাইল। মেঘের গর্জন, বিদ্যুতের চমক, পাহাড়ে আগ্নেয়গিরির অগ্ন্যুৎপাত, ভূমিকম্প, আকাশের রুদ্র মূর্তি, নদীর প্লাবন ও সমুদ্রের উত্তাল তরঙ্গ ইত্যাকার ধ্বংসাত্মক লীলার ভিতরে তাহাদের জন্য ভয়-ভীতির প্রকট প্রভাব বিদ্যমান ছিল। আর এই সব ভয়াবহ লীলার ভিতরেই তাহারা আল্লাহ্‌র এক ভয়ানক রূপ কল্পনা করিত। বিজলীর চমকে তাহারা কোন সৌন্দর্য দেখিতে পাইত না। মেঘের গর্জনের অন্তরালে তাহারা আল্লাহ্‌র প্রীতির কোন নমুনা দেখিতে পাইত না। আগ্নেয়গিরির অগ্ন্যুৎপাতকে তাহারা প্রীতির নজরে দেখিতে পারিত না। অথচ তাহাদের উপলব্ধি শক্তি তখন আল্লাহ্‌র এই সব লীলা প্রত্যক্ষ করারই ক্ষমতা লাভ করিয়াছিল।

তাহাদের প্রাথমিক যুগের জীবন পদ্ধতির ধরনও এরূপ ছিল যে, দয়া ও প্রীতির স্থলে নির্দয়তা ও পাশবিকতাই তাহাদের সামনে মাথাচাড়া দিয়া উঠিত। তাহারা দুর্বল ও অসহায় ছিল। দুনিয়ার প্রত্যেক বস্তুই যেন তাহাদের শত্রুতা ও ধ্বংসের জন্য লালায়িত ছিল। বিষধর সাপ-বিচ্ছু, হিংস্র জানোয়ার , প্রখর সূর্য, ভয়াবহ মৌসুম—এক কথায় জীবনের আগাগোড়াই তাহাদের অসংখ্য দুশমনের মুকাবিলা করিয়া চলিতে হইত। ইহার স্বাভাবিক পরিণতি এই দাঁড়াইল যে, আল্লাহ্‌র গুণাবলি সম্পর্কে ভাবিতে গেলেই আল্লাহ্‌র রুদ্র ও ভয়াবহ দিকটিই তাহাদের দৃষ্টিতে ভাসিয়া উঠিত। তাঁহার দয়া ও অনুগ্রহের দিকটি তাহারা বুঝিতে পাইত না। কিন্তু যতই তাহাদের নিজেদের পরিবেশের পরিবর্তন দেখা দিতে লাগিল, তাহাদের কল্পনায়ও হতাশা ও ভীতির স্থলে আশা ও দয়ার উপকরণ সংযোজিত হইয়া চলিল। সঙ্গে সঙ্গে খোদা সম্পর্কিত ধারণায়ও দয়া ও সৌন্দর্যের সংমিশ্রণ ঘটিয়া চলিল। আদি মানুষদের ভিতরে মূর্তিপূজার যে প্রচলন দেখা যায়, তাহা অনুসন্ধান করিলে আমরা দেখিব, উহার ভিতরে আল্লাহ্‌র রুদ্র রূপটির পরিচয়ই মিলে। তারপর ধীরে ধীরে তাঁহার দয়া ও সৌন্দর্য রূপ তাহাদের কাছে ধরা দিতে লাগিল। অবশেষে দেখা যাইবে যে, আল্লাহ্‌র রুদ্র রূপের ভিতরে দয়া ও প্রীতি সমানভাবেই বিরাজ করে। গোড়ার দিকে গজব ও ধ্বংসের দেবতা, ধন-দৌলতের দেবী, শিক্ষার দেবী, সৌন্দর্যের দেবী ইত্যাদি বহু দেবদেবীর পূজা করা হইত। যে গ্রীসের প্রতিমা-পূজার রুচিকর কল্পনা সকল দেশের কল্পনাকে অতিক্রম করিয়াছে, তাহাদের প্রথমদিকের কল্পনায়ও আল্লাহ্‌র রুদ্র দিকটির প্রতিফলন দেখা যায়। ভারতেও তখন জীবন দেবতা ও অনুগ্রহ দেবতার স্থলে রুদ্র দেবতাদের পূজা-অর্চনা বেশি চলিত। যে যাহাই হউক আমাদের দেখা দরকার যে, কুরআন অবতীর্ণ হবার প্রাক্কালে আল্লাহ্‌র গুণাবলির সাধারণ কল্পনা ও ধারণার ধরন কি ছিল এবং কুরআন আসিয়া আমাদিগকে কিরূপ ধারণা দান করিল।

কুরআন মজীদ আত্মপ্রকাশের মুহূর্তে পাঁচটি ধর্মীয় চিন্তাধারা মানুষের উপর প্রভাব বিস্তার করিয়াছিল ঃ চৈনিক, ভারতীয়, মজুসী, ইয়াহূদী ও মসিহী।

বিশ্বের প্রাচীনতম জাতিগুলির ভিতরে চীনাদের এই বৈশিষ্ট্য সবাইকে মানিতে হয় যে, তাহাদের খোদার কল্পনা শুরুতে যেরূপ সরল ও অস্পষ্ট রূপ ধারণ করিয়াছিল, তাহার অনেকখানিই সব সময়ে বহাল থাকিয়া আসিতেছিল। পরবর্তীকালের ব্যাপক পরিবর্তনও উহার তেমন রদবদল করিতে সমর্থ হয় নাই। তথাপি কল্পনার কোন রূপই কিছুটা রঙ্ স্বীকার না করিয়া পারে না। তাই ধীরে ধীরে এই সরল ধারণায়ও বিভিন্ন রঙ লাগিতে শুরু হইল। অবশেষে উহাও নূতন রঙে ও রূপে আত্মপ্রকাশ করিল।

চীনে প্রাচীনকাল হইতেই স্থানীয় খোদাদের সঙ্গে এক আসমানী খোদার বিশ্বাসও চলিয়া আসিতেছিল। তাহারা এমন এক বিরাট ও মহান খোদার কল্পনা করিত, যাঁহাকে ভাবিতে হইলে আকাশের দিকে অঙ্গুলি সংকেত করা ছাড়া উপায় ছিল না।

আকাশ সৌন্দর্য ও অবদানের প্রকাশস্থলও বটে। আবার রুদ্রতা ও গজবের প্রকাশও তাহাতে ছিল। উহার সূর্য একাধারে আলো ও উত্তাপ দান করিত। উহার তারকাগুলি অন্ধকার রাত্রিতে প্রদীপের কাজ দিত। উহার বারিপাত যমীনকে সুফলা করিত। আবার উহার বিদ্যুৎ ধ্বংস ডাকিয়া আনিত। উহার মেঘের গর্জন অন্তরে ত্রাস সৃষ্টি করিত। এই কারণে আসমানী খোদাকেও তাহারা দুই রূপ কল্পনা করিয়াছিল। একরূপ তাঁহার রুদ্রতার, অন্যরূপ হইল দয়ার। প্রাচীন চীনা কাব্যে আমরা চীনাদের প্রাচীনতম ধর্মীয় ধ্যান-ধারণার ঝলক দেখিতে পাই। তাহাতে স্থানে স্থানে আসমানী খোদার এই পরস্পর বিরোধী গুণের জন্য বিস্ময় ও বিহবলতা প্রকাশ পাইতে দেখি। কেন তোমার কাজে সামঞ্জস্য ও ঐক্য দেখিতে পাই না ? তুমি জীবন দাও, আবার জীবন সংহারিণী বিদ্যুৎও পাঠাও।'

এই 'আসমান' চীনাদের চিন্তাধারায় এরূপ এক মৌলিক উপকরণ হইয়া দাঁড়াইল যে, চীনা সংঘগুলি আসমানী সংঘ ও চীন রাষ্ট্রটি আসমানী রাষ্ট্র আখ্যা পাইল। রোমকরা যখন সর্বপ্রথম চীনের সহিত পরিচিত হইল, তখন তাহারা একটি আসমানী রাষ্ট্রের সন্ধান পাইল বলিয়া জানিল। সেই সময় হইতে Exlum শব্দের বিভিন্ন রূপই চীনের জন্য ব্যবহৃত হইত। উহার অর্থ 'আকাশবাসী' কিংবা 'আকাশী'। এখনও ইংরেজিতে চীনাদের জন্য Celestial শব্দটির ব্যবহার দেখা যায়, যাহার অর্থ আসমানী রাষ্ট্রের বাসিন্দা।

এই আসমানী শক্তি ছাড়াও তাহারা মৃত আত্মার শক্তিতে বিশ্বাস করিত। তাহারা ভাবিত, মৃতের আত্মা পরবর্তী জগতে পৌঁছিয়া খোদার কাছে তদ্‌বীর-তালাফীর অনেক কিছু শক্তিলাভ করে। তাই সেই আত্মাগুলিও পূজা পাবার যোগ্য। প্রত্যেক পরিবারের নিজ নিজ উপাস্য আত্মা ছিল এবং প্রত্যেক এলাকার ভিন্ন ভিন্ন খোদা ছিল।

লাও-ত্‌যু ও কিংফুজীর শিক্ষা

খৃষ্টপূর্ব পাঁচ শতকে লাও-ত্‌যু (Lao-Tzu) ও কিংফুজীর (Kingfutse) আবির্ভাব ঘটে। কিংফুজী রাষ্ট্রকে বাস্তব জীবনের কল্যাণকর পথপ্রদর্শন করেন এবং জীবিকা-পদ্ধতির অধিকার ও কর্তব্য যথাযথভাবে আদায়ের বিধান জারি করেন। কিন্তু আল্লাহ্‌র অস্তিত্বের ব্যাপারে তিনি 'আসমানী' খোদার প্রাচীনতম ধারণা বা দস্তুর বহাল রাখিলেন। তৎসঙ্গে বাপ-দাদা পূজার বিশ্বাসটি সংযোজিত হইয়া এরূপ এক ধারণা দান করিল যে, আসমানী খোদার কাছে পৌঁছিবার মাধ্যম হইল যত বাপ-দাদার আত্মা। আত্মিক চিন্তার ক্ষেত্রে মাধ্যমের ধারণা সর্বদা বাহকদের উপাসনার ধরন সৃষ্টি করে। এই মাধ্যম ধরার ব্যাপারটিও কার্যত ইবাদত ছিল এবং সব ধরনের ধর্মীয় কার্যাদি ও রীতি-নীতির মূলনীতি হইয়া দাঁড়াইল।

ভারত ও গ্রীসে যে যে দেবতার কল্পনা লালিত ও পুষ্ট হইয়াছিল, তাহারা অপ্রাকৃত শ্রেষ্ঠ খোদার বিভিন্ন কার্যে সহযোগিতা করিত। চীনে এই দেবতাদের স্থান দখল করিল বাপ-দাদার আত্মা। এইভাবে সেখানেও অংশীবাদ ও বহুত্ববাদের সূত্রপাত ঘটিল।

কিংফুজীর আবির্ভাবের পূর্বে কুরবানীর প্রচলন ব্যাপক ও সার্বজনীন ছিল। কিংফুজী যদিও তাহার উপরে জোর দেন নাই, তথাপি উহা নিষেধও করেন নাই। বরঞ্চ চীনা উপাসনালয়ের চাহিদা তিনি সর্বদা পূর্ণ করিয়া আসিয়াছেন। কুরবানী কার্যের পিছনে অনুগ্রহ ও নিরাপত্তা কামনার ধারণা সক্রিয় ছিল। কুরবানীর সাহায্যে তাহারা নিজেদের উদ্দেশ্য সফল করিতে পারিত, আবার খোদার ক্রোধ উপশম করিতে পারিত। প্রথম ক্ষেত্রে তাহা মানত ও দ্বিতীয় ক্ষেত্রে উৎসর্গ ছিল।

লাও-ত্যু 'তাউ' অর্থাৎ অধ্যাত্মবাদের সবক দিলেন। তাঁহাকে চীনের মা'রিফত ও বেদান্তের মশালবাহী বলা চলে। অধ্যাত্মবাদ (তাউ) চীনের জীবনধারাকে আত্মিক নিমগ্নতা এবং বাহ্যিক ধ্যানের পথ দেখাইল। ধর্মীয় ও চারিত্রিক ধ্যান-ধারণায় একদিকে উহা গভীরতা ও কৃচ্ছ্রতা সৃষ্টি করিল ও অপরদিকে চিন্তাধারার সূক্ষ্মতা ও মানসিক নম্রতার দ্বার খুলিয়া দিল। কিন্তু অধ্যাত্মবাদ কখনও গোটা দেশের সার্বজনীন ধ্যান-ধারণা হইতে পারে না। ইহার সীমাবদ্ধতা চীনেও অপরিবর্তনীয় রহিল।

চীনের শাম্‌নী ধারণা [১০]

ইহার পরে ভারতের শাম্‌নী মতবাদের (বুদ্ধ ধর্ম) প্রভাব চীনদেশে ছড়াইয়া পড়িল।

---

১০. সংস্কৃতে 'শামন' বলিতে সাধক ও সংসারত্যাগী বৈরাগীকে বুঝায়। বৌদ্ধ ধর্মে সংসারত্যাগীকে 'ভিক্‌শুওয়াস' (ভিক্ষু) আখ্যা দিত। ধীরে ধীরে সকল বুদ্ধানুসারীকে শাম্‌নী বলা আরম্ভ হইল। এই শাম্‌নীকে আরবীতে 'সুম্‌নি' করা হইয়াছে। মধ্য এশিয়ার বাসিন্দারা করিল 'শামানী'। বস্তুত যাকারিয়া, আল্‌-বিরূনী, ইব্‌নে নদীম প্রমুখ বৌদ্ধ ধর্মকে 'সুমনিয়া' ধর্ম বলিয়া উল্লেখ করিয়াছেন। আল্‌-বিরূনী বৌদ্ধ ধর্মের আন্তর্জাতিক প্রসারতার খবর রাখিতেন। তিনি 'কিতাবুল হিন্দের' প্রথম অধ্যায়ে সেইদিকে ইঙ্গিত করিয়াছেন।

চেংগীয খান সম্পর্কে এক বর্ণনা পাওয়া যায় যে, তিনি শামনী ধর্মের অনুসারী ছিলেন। অর্থাৎ বৌদ্ধ ধর্মাবলম্বী ছিলেন। যেহেতু তখনও শামনী ও বৌদ্ধ ধর্মের ঐক্য সুস্পষ্ট হইয়া ধরা দেয় নাই, তাই ঐতিহাসিকদের ভিতরে ভুল ধারণার সৃষ্টি হইয়াছিল।

এই ভুল ধারণা ইউরোপের লেখকদের ভিতরে আজও বিদ্যমান। উত্তর সাইবেরিয়া ও চীনা তুর্কিস্তানের আশেপাশের এলাকার তুরানী গোত্রগুলি তাহাদের ধর্মীয় নেতাদের (তিব্বতের লামাদের মত তাঁহারা রাষ্ট্রনায়কও হইতেন) 'শামান' বলিয়া থাকে। সোভিয়েট সরকার আজকাল তাহাদের শিক্ষা-দীক্ষার ভার গ্রহণ করিয়াছে। তাহারাও নিঃসন্দেহে ধর্মানুসারী। কিন্তু তাহাদের অনুসৃত বৌদ্ধধর্ম মঙ্গোলিয়ানদের বিকৃত ধর্ম বৌদ্ধ ধর্মেরই বিকৃত রূপ ছাড়া অন্য কিছুই নহে। তাই তাহাতে আসল ধর্মের রূপ খুব কমই অবশিষ্ট রহিয়াছে। এই কারণেই তাহাদের সঠিক ধর্ম সম্পর্কে আজকালকার লেখকগণ বিস্ময় প্রকাশ করিতেছেন।

ইংরেজিতে তুরানী গোত্রের ধর্ম সম্পর্কে 'শামানিজম' (Shamanism) শব্দ প্রচলিত হইয়াছে। পক্ষান্তরে, যাদুকরদের কার্য ও উহার প্রভাবকে (Shamanie ও Shamanistic) বলা হয়। উহা এই 'শামন' ও 'শামানী' বা 'শামনী' শব্দের পরিবর্তিত রূপ ছাড়া অন্য কিছুই নহে। যেহেতু এই গোত্রগুলির ভিতরে যাদুকরীর উপর আস্থা প্রবল ও ব্যাপক এবং তাহারা নিজেদের শামানের কাছে রোগব্যাধির জন্য যাদুকরী ব্যবস্থা প্রার্থনা করে, তাই যাদুকরীর জন্যই 'শামান' শব্দটির ব্যবহার দেখা দিল।

তাহা ছিল মহাযান বৌদ্ধ ধর্ম। ইহা মূল ধর্ম হইতে অনেক দূরে চলিয়া গিয়াছিল। ইহা এত বেশি পরিবর্তন ও পরিবর্ধন স্বীকার করিয়াছে যে, যেই পাত্রে যখন ধারণ করা হইত, সেই পাত্রেরই রূপ পরিগ্রহ করিত। কোরিয়া ও জাপানে যখন উহা পৌঁছিল, তখন ভারত ও সিংহলের রূপ বদল করিয়া সহসা স্থানীয় রূপ গ্রহণ করিল।

বৌদ্ধ ধর্ম সম্পর্কে বিশ্বাস করা হয় যে, উহা আল্লাহ্‌র অস্তিত্ব বিস্তার করে না। অথচ বুদ্ধের অনুসারীরা স্বয়ং বুদ্ধকেই আল্লাহ্‌র স্থান দিয়াছে। ফলে বুদ্ধকে পূজার এরূপ বিশ্বব্যাপী প্রচলন দেখা দিয়াছে যে, কোন প্রতিমা পূজার ইতিহাসে উহার নজীর নাই। চীন, কোরিয়া ও জাপানের প্যাগোডাগুলি সেই নূতন আল্লাহ্‌র মূর্তিতে ভরপুর !

২. ভারতীয় চিন্তাধারা

ভারতের আল্লাহ্ সম্পর্কিত ধারণার ইতিহাস পরস্পর বিরোধী কল্পনার এক বিস্ময়কর দৃশ্যের অবতারণা করে। একদিকে ইহার একত্ববাদী দর্শন অপরদিকে ইহার অনুসৃত ধর্ম। একত্ববাদী দর্শন চিন্তা ও কার্যে অত্যন্ত গভীর ও সূক্ষ্ম স্তর অতিক্রম করিয়াছে। ব্যাপারটিকে চিন্তার ক্ষেত্রে এতখানি উচ্চস্তরে তুলিয়া ধরিয়াছে যে, প্রাচীন জাতিগুলির ধর্মীয় চিন্তাধারায় তাহার তুলনা মিলে না। পক্ষান্তরে, ইহার অনুসৃত ধর্ম অংশীবাদ ও বহুত্ববাদের এরূপ লাগাম ছাড়া পথ অবলম্বন করিয়াছে এবং প্রতিমা পূজার কল্পনাকে এত ব্যাপক করিয়া দিয়াছে যে, প্রতিটি প্রস্তরই আল্লাহ্ সাজিয়াছে। প্রতিটি গাছ খোদার হইয়া বসিয়াছে। প্রতিটি আসন প্রণতির স্থল হইয়াছে । তাহারা এই সময়ে একদিকে উন্নতির চরম শীর্ষে পৌঁছিয়াছে আবার অন্যদিকে সর্বনিম্ন স্তরে নামিয়া গিয়াছে। ইহার বিশেষ ব্যক্তিগণ একত্ববাদ পছন্দ করিলেন এবং সর্বসাধারণের জন্য অংশীবাদ ও প্রতিমা পূজার পথ উপযোগী ভাবিলেন।

উপনিষদের একত্ববাদী ধারণা

ঋকবেদে আমরা একদিকে প্রকৃতি পূজার প্রাথমিক ধারণার ক্রমবিকাশ ও দেহ ধারণ দেখিতে পাই, অপরদিকে এক অপ্রাকৃত ও সর্বোন্নত সৃষ্টিকর্তার কল্পনাও ধীরে ধীরে আত্মপ্রকাশ করিতে দেখি। বিশেষত দশম খণ্ডের মন্ত্রগুলির ভিতরে তাঁহার অস্তিত্ব সুস্পষ্ট দেখা যায়। এই একত্ববাদী ধারণা হয়তো কোন অতি প্রাচীন যুগের মূল ধারণার জের ছিল। অথবা প্রাকৃতিক শক্তির নিদর্শনাবলির সংখ্যাধিক্য তাহাদের অবশেষে একত্ববাদের দিকে ফিরাইয়া নিয়াছিল। এ ব্যাপারটি সম্পর্কে কোন স্থির সিদ্ধান্তে পৌঁছা সুকঠিন। যাহা হউক, এরূপ এক প্রাচীন কালেও যখন ঋকবেদের কল্পনা রূপ পাইল, তাহাতে তাওহীদের ধারণা সুস্পষ্ট হইয়া দেখা দিল। যেখানে তিন শত তেত্রিশ কোটি কিংবা ততোধিক খোদার ভিড়, সেখানে অবশেষে তাহারা আসমান জমিন সর্বত্র ছড়াইয়া এক বিরাট প্রভুর সন্ধান পাইল। পরে সেই সকল প্রভুর সেরা প্রভু আরও উন্নতি লাভ করিয়া সর্বব্যাপী এক বিরাট শক্তিরূপে আত্মপ্রকাশ করিলেন। তিনি কখনও অর্জুন, কখনও ইন্দ্র, কখনও অগ্নির ভিতরে ধরা দেন। অবশেষে নিখিল

সৃষ্টির স্রষ্টারূপে, প্রজাপতি (প্রতিপালক) রূপে ও বিশ্বকর্মারূপে পরিচিত হইলেন এবং গোটা সৃষ্টির মূল হইয়া দাঁড়াইলেন। তিনি এক বটে। তবে বিশ্ববাসী তাঁহাকে বিভিন্ন নামে ডাকে। তিনি এক বটে তবে তিনি আকাশ নহেন, পৃথিবী নহেন, সূর্যের আলো নহেন এবং বায়ুর প্লাবনও নহেন ! তিনি নিখিল সৃষ্টির প্রাণ সর্বশক্তির উৎস, চিরন্তন ও অক্ষয় ! তাহা কি ? তিনি হয় তো প্রকৃতরূপে, আত্মার বেশে, শ্বাস-প্রশ্বাস ছাড়াই বাঁচিয়া থাকার এক শক্তি। আমরা তাহাকে দেখিতে পাই না। আমরা তাহার পুরাপুরি পরিচয়ও দিতে পারি না ! তিনি একক, অদ্বিতীয় এই 'একক তত্ত্বই' তাওহীদ। উহা বেশুমার সৃষ্টির ভিতরে দেখা যাইতে পারে।

এই মূল কথাগুলিই উপনিষদে একত্ববাদী (Pantheism) ধারণার নীতি প্রবর্তন করিয়াছে। তারপর বেদান্তের পরবর্তী সংস্করণে (Metaphysics) সেই সব মূলনীতির উপরে গভীর চিন্তা ও দর্শনের বিরাট সৌধ গড়িয়া তুলিয়াছে।

একক অস্তিত্বের বিশ্বাস মূল সত্তার আত্মিক উপলব্ধির উপর নির্ভরশীল ছিল। জ্ঞানগত বিশ্বাসের উহাতে দখল ছিল না। সুতরাং আদপেই এখানে গুণ আরোপের সুযোগ ছিল না। যদিও কিছু ছিল, তাহাও না-বাচক গুণ (Negative attributes), হ্যাঁ বাচক (Positive) গুণ নহে। অর্থাৎ তিনি এরূপ নহেন, সেরূপ নহেন তো বলা যাইত। কিন্তু কিরূপ তাহা বলা যাইত না। কারণ আমরা যখন তাহার কোন গুণ আরোপ করিতে যাইব, তাহা আমাদের মস্তিষ্ক ও চিন্তাপ্রসূত চিত্র হইবে। আর আমাদের চিন্তাশক্তি ইন্দ্রিয়ানুভূতি লব্ধ জ্ঞানের চার দেয়ালে আবদ্ধ থাকিতে বাধ্য। সুতরাং আমরা কিছুতেই কোন অসীম ও সর্বব্যাপী সত্তার রূপ কল্পনা করিতে অক্ষম। যখন আমরা সে সম্পর্কে চিন্তা করিব, তখন সর্বব্যাপী সত্তাকে ব্যক্তিরূপ দান করিব। তখন আর তাহার সর্বব্যাপী অস্তিত্ব থাকিবে না !

বাবা ফাগানী দুইটি চরণের ভিতর এই সম্পর্কিত পূর্ণ চিত্রটি তুলিয়া ধরিয়াছেন ঃ

مشکل حکاییست که هر ذره عین اوست

اسا نمی توان که اشارت به اوکنند !

মুশ্‌কিল এই যে, প্রতিটি অণু-পরমাণুতেই তিনি ছড়াইয়া আছেন অথচ বর্ণনাতীত। কোনটির প্রতি অংগুলি সংকেত করা যায় না যে, এই তিনি।

এই কারণেই উপনিষদ প্রথমে মৌল সত্তাকে (ব্রাহ্ম) ব্যক্তিরূপে (ঈশ্বর) নামাইয়া দিয়াছে।[১১] আর যখনই মৌল সত্তা ব্যক্তিত্বের পর্দা ধারণ করিল, তখন সেই ব্যক্তিসত্তার

১১. আমাদের সূফীবাদিগণ এই অবস্থাটিকে এভাবে ব্যক্ত করিয়াছেন যে, আহদিয়াত ও ওয়াহ্‌দিয়াতের মর্যাদায় অবতীর্ণ হইলেন। আহ্‌দিয়াত' অর্থ একক হওয়া ও ওয়াহ্‌দিয়াত অর্থ প্রথম হওয়া। একক সত্তাকে আমরা প্রথম সত্তা বলিয়া বুঝাইতে পারি না। কারণ যখনই প্রথম বলা হইবে তখন দ্বিতীয়, তৃতীয়, চতুর্থ ইত্যাদি দেখা দিবে। পক্ষান্তরে, এককের প্রশ্নে দ্বিতীয় বা তৃতীয় ইত্যাদির স্থান নাই। কিন্তু যখন 'আহ্‌দিয়াতের' মর্যাদা 'ওয়াহ্‌দিয়াতে' নামাইয়া আনিল, তখনই সেখানে দ্বিতীয়, তৃতীয়, ইত্যাদি

গুণাবলিও আরোপ শুরু হইল। এইভাবে একক সত্তার বিশ্বাস ব্যক্তিরূপে ব্যক্তিগুণের ধারণায় রূপান্তরিত হইল।

যখন এই গুণের আমরা গবেষণা করি, তখন নিঃসন্দেহে এক অত্যন্ত উচ্চ ধারণা আমাদের সামনে আসিয়া যায়। আর তাহার ভিতরে হ্যাঁ-বাচক, না-বাচক উভয় ধরনের গুণাবলির সমাবেশ ঘটে। তাঁহার মূল সত্তা এক, অদ্বিতীয়। তিনি অসম, অতুলনীয়, স্থান-কাল-পাত্রের বন্ধনমুক্ত, অবিনশ্বর, দুর্বোধ্য, অপরিহার্য, সৃষ্টিকর্তা, রক্ষাকর্তা, মৃত্যুদাতা, সর্বকারণের মূল কারণ, সব সৃষ্টির মূল, সব কিছুর স্থাপয়িতা, সকলের চরম আশ্রয় স্থল ও প্রতাবর্তনের ক্ষেত্র। তিনি আলো, স্বয়ং সম্পূর্ণ, সুন্দর, পবিত্র, সর্বশক্তিমান, সর্বশ্রেষ্ঠ, দয়ালু ও দাতা এবং সমস্ত উপাসনার মূল লক্ষ্য।

কিন্তু সঙ্গে সঙ্গে অপরদিকে এ সত্যটিও আমাদের সামনে উজ্জ্বল হইয়া উঠে যে, একত্ববাদী চিন্তার এই উচ্চতাও অংশীবাদ ও বহুত্ববাদ হইতে মুক্ত ও পবিত্র নহে। একক মূল সত্তার সহিত গুণবাচক একত্ববাদের সামঞ্জস্যহীন সংযোগ সার্থক হয় নাই। আধুনিক যুগের এক সুযোগ্য হিন্দু লেখকের ভাষায় মূলত অংশীবাদী ও বহুত্ববাদী (Polytheistic) ধারণা ভারতবাসীর মন ও মগজে এরূপভাবে শিকড় গাড়িয়া বসিয়াছিল যে, তাহাকে একেবারে তুলিয়া দূরে নিক্ষেপ করা সহজ ছিল না। তাই এক একক সত্তার আসন গ্রহণের পরেও অপর খোদারা লোপ পাইল না। অবশ্য সেই একক ও নিরংকুশ আল্লাহ্‌র শক্তি সকলের উপরে পরিব্যাপ্ত হইল এবং সবাই তাঁহার অধীনে আসিয়া গেল।[১২]

তাই এই ধরনের বর্ণনা আমাদের মিলিতে লাগিল যে, সেই উচ্চতম সত্তা (ব্রাহ্ম) ছাড়া 'অগ্নিদেবী' কিছুই করিতে পারে না। তাঁহারই (ব্রহ্মের) ভয়ে সকল দেবতা নিজ নিজ দায়িত্ব পালন করিতেছেন (তৃতীয় উপনিষদ)। রাজা অশ্বপতি যখন পঞ্চঘরবাসীদের জিজ্ঞাসা করিলেন ঃ তোমরা তোমাদের ধ্যানে কাহার অর্চনা কর ? তখন তাহাদের সবাই উত্তর করিল একই দেবতার নাম নিই। তাহাতে অশ্বপতি বলিলেন ঃ তোমরা সবাই সত্যের একটি অংশমাত্র পূজা করিতেছে। অথচ সবার মিলনে তাহার রূপলাভ ঘটে। চন্দ্র তাঁহার শিব, সূর্য তাঁহার চক্ষু, বায়ু তাঁহার শ্বাস, আকাশ তাহার দেহ এবং ধরিত্রী তাহার চরণ।[১৩]

মাথাচাড়া দিয়া উঠিল।

কবি বলেন ঃ

دریائے کہن چوبرزند موجه نو

موجس خوانند وفی الحقیقت دریاست !

একই নদীর অসংখ্য তরঙ্গ, অথচ সব তরঙ্গের মূলে একই নদী প্রবাহিত !

১২. প্রফেসর এস্ রাধাকৃষ্ণন—ইণ্ডিয়ান ফিলোসফি, প্রথম খণ্ড (দ্বিতীয় সংস্করণ), পৃষ্ঠা ১৪৪।

১৩. যদি উপনিষদের অন্যত্র অংশীবাদের সুস্পষ্ট বর্ণনা না থাকিত, তাহা হইলে অন্যরূপ ব্যাখ্যা করার সুযোগ থাকিত। দারাশিকো অবশ্য ইহাকে ইঙ্গিতবাচক বাক্য বলিয়াছেন।

কিন্তু সঙ্গে সঙ্গে ইহাও দেখা যায় যে, যখন চিরন্তন সত্যের নিত্যতা ও ব্যাপকতার উপর জোর দেওয়া হয়, তখন নিখিল সৃষ্টির সকল দেবতাও উধাও হইয়া যায়। কারণ সব অস্তিত্বই সেই একক অস্তিত্বের উপরে নির্ভরশীল অথচ তিনি কোন কিছুর উপরে নির্ভরশীল নহেন। যেরূপ রথের সব কিছু একই চাকার উপরে বিদ্যমান, তেমনি সব বস্তু, সব দেবতা সকল জগত ও সকল উপকরণই সেই একই অস্তিত্বের ভিতরে বিদ্যমান। (উপনিষদ-৫ ঃ ২)। এখানে যে গাছ দেখি, উহার মূল উর্ধ্বলোকে এবং শাখাগুলি নিম্নমুখী। ইহা ব্রহ্ম—নিখিল সৃষ্টি তিনিই ধারণ করিয়া আছেন। তাহার বাহিরে কিছুই নাই।

এখানে আমরা পূর্বোল্লিখিত লেখকের বক্তব্যের আবার সাহায্য নিতেছি। ইহা মূলত একটি আপোস ছিল। ফলে কয়েকজন বিশেষ চিন্তাশীলের দার্শনিক ধ্যান-ধারণা সর্বসাধারণের কাল্পনিক আবেগের সহিত একাকার হইয়াছে। ইহার ফলে বিশেষ ও অবিশেষদের চিন্তায় একটা ঐক্যের পরিবেশ সৃষ্টি হইল এবং ইহা সর্বদা চলিতে লাগিল।[১৪]

পরবর্তীকালে বেদান্তের দর্শন খুবই গভীরতা ও ব্যাপকতা অর্জন করিয়াছে। কিন্তু বিশেষ লোকদের একত্ববাদী ধারণার সহিত সর্বসাধারণের অংশীবাদী ধারণার যে একটা আপোস সৃষ্টি হইয়াছিল, তাহা অনড় রহিল। পরন্তু তাহা দৃঢ় ও ব্যাপক হইয়া চলিল। এ কথা সবাই স্বীকার করিয়া নিল যে, সাধক যখন চিরন্তন সত্য লাভের স্তর অর্জন করে, তখন তিনি ছাড়া আর সব অস্তিত্ব বিলুপ্ত হয়। অন্য সব অস্তিত্বের ভিতরে দেবতাদের অস্তিত্বও ধরা হইয়াছে। দেবতাদের অস্তিত্ব যেন মূল সত্তার বহিঃপ্রকাশরূপে বিরাজ করিতেছে। কিন্তু সঙ্গে সঙ্গে ইহাও সর্বদা স্বীকৃত সত্যরূপে প্রচলিত রহিল যে, মূল সত্তার স্তরে না পৌঁছা পর্যন্ত এই দেবতাদের অর্চনা অপরিহার্য বিবেচিত হইবে। সুতরাং দেবদেবীর অর্চনার যে প্রচলন রহিয়াছে তাহা অব্যাহত থাকিবে। এইভাবে অংশীবাদী একত্ববাদের (Monotheistic polytheism) এক জগাখিচুড়ি মতবাদ প্রবর্তিত হইল। ইহা একই সঙ্গে একত্ববাদী ও অংশীবাদী উভয় ধারণারই পরিপোষক সাজিল। বেদান্তের কোন কোন ধর্মমতে এই মিশ্রিত ধরনটি মূল ধারণা হইয়া দাঁড়াইল। তাই নিম্বারক ও তাহার শিষ্য শ্রী নিবাস ব্রহ্মসূত্রের ব্যাখ্যা প্রসঙ্গে আমাদিগকে জানাইতেছেন ঃ 'যদিও ব্রহ্ম কিংবা কৃষ্ণের মত কেহ নাই' তথাপি তাহার অস্তিত্ব হইতে তাহাদের প্রকাশ হয় ও তাঁহারই মত সৃষ্টির কাজে অংশগ্রহণ করে। বস্তত,

---

একথা স্মরণ রাখা উচিত যে, একশত ষাটখানা উপনিষদ বিদ্যমান। বিভিন্ন যুগে এইগুলি সংকলিত হইয়াছে। প্রত্যেক উপনিষদে সমসাময়িক কালের ধ্যান-ধারণার ক্রমবিকাশ ও ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণ বিধৃত হইয়াছে। এখানে যাহা কিছু বলা হইয়াছে, তাহা সবগুলির শেষ পরিণতি ও সিদ্ধান্তকে ভিত্তি করিয়া সামগ্রিকভাবে গ্রহণ করা হইয়াছে।

১৪. বেদান্ত পারিজাত সৌরভ ঃ তৃতীয় খণ্ড, পৃষ্ঠা ২০। ইহার ইংরেজি অনুবাদ করেন ডঃ রুমা বোস। 'রয়েল এশিয়াটিক সোসাইটি—'বেঙ্গল কর্তৃক ইদানীং প্রকাশিত হইয়াছে।

কৃষ্ণের বামে রাধা বিরাজমান। সে দান ও অনুগ্রহ দেবী। সব সুফল ও অবদান তাহারই দান। ব্রহ্মের সহিত তাহারও পূজা করা আমাদের কর্তব্য।

এখানে এই সত্যটিও সামনে রাখা চাই যে, বিশ্ব প্রকৃতির যে বিজ্ঞ শক্তিগুলিকে সিরীয় ধ্যান-ধারণা 'মালাক' ও 'মালায়েকা' নামে আখ্যায়িত করিয়াছে, তাহাদেরই আর্যরা 'দেব' বলিয়া অভিহিত করিয়াছে। গ্রীকদের 'কেটোস' (Qetos) রোমকদের 'ডেউস' (Deus), পার্সিয়ানদের 'য়েস্তা' (য়্যাযদান) ইত্যাদি শব্দের ভিতরে সেই একই শব্দমূল ও কল্পমূল কাজ করিতেছে। সংস্কৃতে দেব একটি ব্যাপক অর্থপূর্ণ শব্দ। বহু অর্থে ইহার ব্যবহার। কিন্তু যখন অলৌকিক কোন সত্তার ক্ষেত্রে ব্যবহৃত হয়, তখন তাহার অর্থ এরূপ এক অপ্রাকৃত ও আত্মিক সত্তা বুঝায় যাহা নিজেই প্রকাশমান ও সমুজ্জ্বল। সিরীয় ধর্মগুলিতে এই আত্মিক সত্তাগুলির মর্যাদা স্রষ্টার সৃষ্ট বস্তুর চাইতে বেশি নহে। কিন্তু আর্য ধর্মে তাহাদের স্বতন্ত্র ও স্বাধীন ক্ষমতার অধিকারী মনে করা হয়। যখন আবার তাহাদের ভিতরে একত্ববাদী ধারণা প্রতিষ্ঠিত হইল, তখন তাহারা সেইগুলিকে মাধ্যম হিসাবে গ্রহণ করিল। অর্থাৎ যদিও তাহারা স্বয়ং খোদা নহেন, খোদা পর্যন্ত পৌছার জন্য তাহাদের অর্চনা প্রয়োজন। যেহেতু আমরা সর্বসাধারণ সোজাসুজি খোদার কাছে পৌছাতে অক্ষম, তাই এই মাধ্যমের অর্চনা করিয়া তাহাদের সাহায্যে খোদা পাইতে হইবে। বস্তুত একত্ববাদী ধারণায় সর্বত্র এই মাধ্যম পদ্ধতি বিচ্যুতি ডাকিয়া আনে। নতুবা আল্লাহ্‌র একত্ব ও শ্রেষ্ঠত্বে কাহারো কখনো দ্বিমত ছিল না। জাহিলী যুগে আরবদের প্রতিমা পূজার ধারণা সম্পর্কে কুরআন এই যুক্তিই নকল করিয়াছে ঃ

مَا نَعْبُدُ اِلاَّ لِيُقَرِّبُوْنَ اِلَى اللّٰهِ زُلْفًا -

আমরা এইগুলিকে এইজন্য পূজা করি যে, ইহারা আমাদিগকে খোদার কাছে পৌছাইয়া দিবে।

যাহা হউক, আল্লাহ্‌র গুণের কিংবা উপাসনার অংশীদারদের সৃষ্টির মূলে এই যে উপকরণ, ইহাই ভারতের প্রচলিত ধর্মকে আগাগোড়া শিরক ও প্রতিমা পূজার আড্ডায় পরিণত করিয়াছে। ফলে কেহ যদি অত্যন্ত ধৈর্যের সহিত খুব গভীর ও ব্যাপকভাবে এই ধর্ম অধ্যয়ন না করে, তাহা হইলে ইহাদের একত্ববাদী বিশ্বাসের কোন সন্ধানই পাইবে না। সুতরাং এই ধর্মে কেবল মুষ্টিমেয় সাধকই তাওহীদের দ্বারদেশে পৌঁছিতে পারে। খ্রীস্টীয় একাদশ শতকে যখন আবূ-রায়হান বিরূনী ভারতের শিক্ষা দর্শন ও ধর্ম বিশ্বাসের সন্ধান লইতে প্রয়াস পাইলেন, তখন এই পরস্পর বিরোধী অবস্থান দেখিয়া হয়রান হইয়াছিলেন। ষোড়শ শতকে আবুল ফজলেরও সেই সংকট দেখা দিয়াছিল। তারপর অষ্টাদশ শতকে স্যার উইলিয়াম জোন্স সেই বিপদেই পড়িলেন।

ইহার উত্তম ব্যাখ্যা গীতার বিখ্যাত শ্লোক হইতে আমরা গ্রহণ করিতে পারি। আল্-বিরূনীও তাহাই করিয়াছিলেন। তাহা হইল এই, এখানে শুরু হইতেই ধর্ম-বিশ্বাস

ও ধর্ম-কর্মের দুইটি দিকই খোলা রাখা ভাল মনে করা হইয়াছিল। জনসাধারণ ও সুধী দুই মহলই যেন নিজ যোগ্যতা অনুসারে তাহা পালন করিতে পারে। স্বল্পবুদ্ধি সম্পন্ন জনসাধারণের পক্ষে তাওহীদের সূক্ষ্ম ও উন্নততম ধারণা অর্জন সহজসাধ্য ব্যাপার হইবে না বলিয়া তাহাদের জন্য মাধ্যম ধরা বা প্রতিমা পূজার ব্যবস্থা রাখা হইয়াছে। পক্ষান্তরে, সুধী সমাজের জন্য সোজা একক আল্লাহ্‌র আরাধনার পদ্ধতি প্রবর্তিত হইয়াছে। তারপর যেহেতু সুধীরাও সামাজিক জীব এবং সমাজ ছাড়িয়া সম্পূর্ণ আলাদা পথ অনুসরণের সুযোগ তাহাদের ছিল না, তাই সুধী ও সাধারণ সবাই শেষ পর্যন্ত অংশীবাদ ও প্রতিমা পূজার অনুসারী সাজিল।

আল্-বিরূনী গ্রীক মনীষীদের বাণী উদ্ধৃত করিয়া দেখাইয়াছেন, এ ব্যাপারে ভারত ও গ্রীক সমান। তারপর গীতার উদ্ধৃতি দিয়াছেন—'অনেক লোক আমার (খোদার) কাছে অপরের উপাসনা করিয়া পৌঁছিতে চাহে ! আমি তাহাদেরও বাসনা পূর্ণ করি। কারণ আমি তাহাদের কিংবা তাহাদের উপাসনার মুখাপেক্ষী নহি।'

এখানে যদি আমি বর্তমান যুগের একজন বিখ্যাত হিন্দু দার্শনিকের সিদ্ধান্ত উল্লেখ করি, তাহা অপ্রাসঙ্গিক হইবে না। গৌতম বুদ্ধের আবির্ভাবের আগে হিন্দু ধর্মের আল্লাহ্ সম্পর্কিত ধারণার যে সাধারণ রূপ সৃষ্টি হইয়াছিল, তাহা আলোচনা প্রসঙ্গে সুযোগ্য লেখক বলেন ঃ

গৌতম বুদ্ধের যুগে যেই ধর্ম দেশে প্রচলিত ছিল, তাহার মোটামুটি রূপ এই, আল্লাহ্ ও মানুষের ভিতরে তখন এক ব্যবসা চলিতেছিল। একদিকে উপনিষদের একক ব্রহ্ম একত্ববাদের উচ্চ ও মার্জিত ধারণা দেয়। অপরদিকে অগুনতি খোদার ভিড় চরম অংশীবাদের পরিচয় দেয়। আকাশের তারকারাজি, জড় উপাদান, গাছপালা, জঙ্গলের পশু-পাখি, পাহাড়ের শৃঙ্গরাজি, নদীর তরঙ্গরাজি, এক কথায় সৃষ্টি জগতের কোন শ্রেণী ছিল না যাহা আল্লাহ্‌র প্রভুত্বে ভাগ না বসাইয়াছে। এক লাগামছাড়া মনগড়া লাইসেন্স জুটিল দুনিয়ার সব বস্তুকেই আল্লাহ্‌র আসন দিবার। তাই অবাধে তাহারা তাহা করিয়া চলিল। খোদার এই বেশুমার ভিড়ও তাহাদের খোদা অর্চনার ক্ষুধা মিটাইতে পারিল না। মনগড়া আকৃতি দিয়া তাহারা নূতন নূতন খোদা তৈয়ার করিতে লাগিল। সন্দেহ নাই, উপনিষদ এই সব খোদার প্রভুত্ব লোপ করিয়াছে। কিন্তু বাস্তব ক্ষেত্রে তাহাদের তাড়াইতে পারে নাই। তাহাদের প্রভুত্ব সর্বদা বাদস্তুর বহাল রহিল।[১৫]

শামনী ধর্ম ও উহার ধ্যান-ধারণা

প্রাচীন ব্রাহ্মণ্য ধর্মের পরে শামনী ধর্মের (বৌদ্ধ ধর্ম) আবির্ভাব ঘটে। ইসলামের আবির্ভাবের আগে ভারতের সাধারণ ধর্ম ইহাই ছিল। শাম্‌নী ধর্মের মূল বিশ্বাসগুলির বিভিন্ন ব্যাখ্যা হইয়াছে। উনিশ শতকের প্রাচ্য বিশ্বেষজ্ঞর একটি দল উহাকে উপনিষদের শিক্ষারই একটি কার্যকরী রূপ বলিয়া অভিহিত করিয়াছিল এবং ধারণা করিয়াছিল,

---

১৫. অধ্যাপক এস. রাধাকৃষ্ণন (Indian Philosohy, Vol. I, Page 453 (Second Edition).

'নির্বাণ'-এ আকর্ষণ-বিকর্ষণের আধ্যাত্মিক লীলা নিহিত রহিয়াছে। অর্থাৎ যেই উৎস হইতে মানুষ নির্গত হইয়াছে, আবার সেখানে মিলিত হওয়াই 'নির্বাণ' ও পূর্ণ মুক্তির মোক্ষম উপায়। কিন্তু বর্তমানে সাধারণভাবে সবাই মানিয়া লইয়াছে যে, শামনী ধর্ম আল্লাহ্ ও মানবাত্মার অস্তিত্বের কোন ধারণা রাখে না। ইহার বিশ্বাসের পরিধি হইল শুধু পার্থিব জীবনের কল্যাণ ও মুক্তির ব্যবস্থা। ইহা শুধু প্রকৃতি অর্থাৎ যেই অবিনশ্বর মৌলিক উপাদান সৃষ্টি জগতের রূপদান করিয়াছে, তাহারই ইঙ্গিত দান করে। 'নির্বাণ'-এর উদ্দেশ্য হইল এই, বস্তুর রূপ ও ব্যক্তিত্ব লোপ পাইবে এবং সে পার্থিব জীবনের বেড়াজাল হইতে মুক্তিলাভ করিবে। সন্দেহ নাই, জীবনোত্তর কাল সম্পর্কে শাম্‌নী ধর্মবেত্তাগণ যেসব ব্যাখ্যা দান করেন, তাহার ভিতরে এই ব্যাখ্যাটি বিশুদ্ধ মনে হয়। যদিও তাহাদের একটি দল জীবনের অজ্ঞাত অধ্যায়ে (Agnosticism) আসিয়া নির্বাক হইয়া গিয়াছেন, তথাপি অন্যদল আরও অগ্রসর হইয়াছেন এবং তাহারা প্রশ্নসূচক না-বাচক মন্তব্যের পথ অনুসরণ করিয়াছেন। মোক্ষ আসিয়া গোপ্তানে (তুর্কী ভাষা)[১৬] সেই সব দলীল রদ করিয়াছেন, যাহা ভৈষিক তর্কশাস্ত্রের পদ্ধতি মুতাবিক আল্লাহ্‌র অস্তিত্ব সম্পর্কে পেশ করা হইয়াছিল। তথাপি এ কথা নিশ্চিতভাবে বলা চলে না যে, গৌতম বুদ্ধের আল্লাহ্‌র ক্ষেত্রে নীরবতা আল্লাহকে অস্বীকার বুঝাইতেছে ; তাঁহার সতর্ক নীরবতা কয়েকটি বিশেষ ক্ষেত্রে দেখা গিয়াছে। তাঁহার নামে যত কথা চালানো হয়, সবগুলি যদি সোজা ভাবে ভাবিয়া দেখা হয়, তাহা হইলে বুঝা যাইবে, তাহার এই নীরবতার নীতিমূলের অস্বীকারসূচক ছিল না বরং গুণের অস্বীকার ছিল তাহা। গুণের অস্বীকার বলিতে মনুষ্য আরোপিত আল্লাহ্‌র সব গুণ অস্বীকার করাকেই বুঝায়। তাহার ফলে মানুষের আল্লাহ্ সম্পর্কিত সব চিন্তা ও ভাষা অচল হইয়া দাঁড়ায়। সেখানে নির্বাক থাকা ছাড়া মানুষের গত্যন্তর থাকে না।

তাহা ছাড়া, এ কথাও ভুলিলে চলিবে না যে তাঁহার আবির্ভাবের সময়ে প্রতিমা পূজার ব্যাপারটি খুবই গভীরভাবে শিকড় গাড়িয়াছিল। প্রতিমা পূজা সত্যের পথে বিরাট এক অন্তরায় হইয়াছিল। তিনি এই প্রতিবন্ধক হটাইতে চাহিয়াছিলেন এবং মানুষের দৃষ্টি সর্বতোভাবে কল্যাণকর কর্মজীবনের দিকে আকৃষ্ট করিয়াছেন। ইহার অপরিহার্য পরিণতি দাঁড়াইল ব্রাহ্মণ্য খোদাকে অস্বীকার করা এবং ঘোষণা করা যে, ঐ সব খোদাকে অর্চনা করায় নহে বরং দিব্যজ্ঞান লাভ ও সত্যের সাধন করার ভিতরেই মুক্তি নিহিত রহিয়াছে। স্টাংমার্গে[১৭] দেখা যায়, ব্রাহ্মণদের বিরোধিতার ক্ষেত্রে

---

১৬. এই প্রাচীন গ্রন্থের শুধু একটি তিব্বতী সংস্করণ দুনিয়াবাসীর হস্তগত হইয়াছিল। বর্তমানে মূল সংস্কৃত সংস্করণ পাওয়া গিয়াছে। 'গায়কোয়ায় ওরিয়েন্টাল সিরীজ' নামক প্রতিষ্ঠান হইতে বর্তমানে উহা প্রকাশিত হইয়াছে। মহীশূরের প্রাচ্য গ্রন্থালয় উহার আরেকটি সংস্করণ প্রকাশের জন্য তৎপর রহিয়াছে।

১৭. গৌতম বুদ্ধের শিক্ষায় স্টাংমার্গ আটটি মূলনীতির একটি বিশেষ সাধনা পদ্ধতি। আটটি মূল কথায় শিক্ষা ও কাজের পরিশুদ্ধি ঘটে। তাহা হইল, খাঁটি শিক্ষা দয়া ও প্রীতি, আত্মত্যাগ, ইন্দ্রিয় মুক্তি, আমিত্ব লোপ ইত্যাদি।

বাড়াবাড়ি শেষ পর্যন্ত এই আপেক্ষিক অস্বীকারকে সাধারণ অস্বীকারে রূপান্তর করিয়াছে।[১৮]

যাহা হউক, গৌতম বুদ্ধ ও তাহার শিক্ষার ব্যাখ্যাদাতাগণের এই ব্যাপারে যাহাই মতামত হউক না কেন, একথা সত্য যে, তাঁহার শিষ্যরা খোদার শূন্য আসন খুব তাড়াতাড়ি পূর্ণ করিয়া লইয়াছে। যখনই তাহারা এই আসন শূন্য দেখিল, স্বয়ং বুদ্ধকেই সেখানে বসাইয়া নিল। তারপর এই নূতন খোদার অর্চনা এরূপ জোরেশোরে আরম্ভ হইল যে, অর্ধেক দুনিয়া বুদ্ধের বুতখানায় পরিণত হইল।

গৌতম বুদ্ধের মৃত্যুর পর কিছু সময় যাইতে না যাইতেই শিষ্যরা তাহাকে সাধারণ মানুষের ঊর্ধ্বে আসন দেওয়া শুরু করিল। তাঁহার নিদর্শনগুলি অর্চনার প্রবণতা বাড়িতে লাগিল। তাঁহার মৃত্যুর অল্প কিছু পরে যখন রাজগিরিতে বুদ্ধানুসারীদের প্রথম সম্মেলন বসিল এবং তাহার বিশেষ শিষ্য আনন্দ যখন সেখানে তাঁহার শেষ উপদেশগুলি বর্ণনা করিল, তখন নাকি শ্রোতারা তাহার বর্ণনা অবিশ্বাস করিল এবং তাহার বিরোধী হইল। কারণ তাহার সে বর্ণনায় বুদ্ধের যে অতিমানবীয় মর্যাদা তাহারা খুঁজিতেছিল, তাহা অবর্তমান ছিল। তারপর প্রায় একশত বছর পরে যখন বৈশালীতে (মুজাফ্ফরপুর) তাহাদের দ্বিতীয় সম্মেলন বসিল, তখন ধর্মের মৌলিক সারল্য লোপ পাইয়াছিল এবং তদস্থলে নূতন নূতন ধারণা ও মিশ্র কল্পনার পরিচয় পাওয়া গেল। তখন পাঁচ শতাব্দীর পরের ঈসায়ী ধর্মের ত্রিত্ববাদের মত বৌদ্ধধর্মে বুদ্ধের ব্যক্তিত্বকে ত্রিগুণে ভূষিত করার ব্যবস্থা হইল। তাঁহাকে সাধারণ মানুষের ঊর্ধ্বে আসন দানের সিদ্ধান্ত গৃহীত হইল। তাঁহার তিনটি রূপ এই—শিক্ষক বুদ্ধ, ব্যক্তি বুদ্ধ ও স্বর্গীয় বুদ্ধ। পৃথিবীতে যে বুদ্ধের প্রকাশ, তাহা স্বর্গীয় বুদ্ধের প্রতিবিম্ব মাত্র। পরিত্রাণ লাভের অর্থ হইল সত্যিকারের বুদ্ধের সঙ্গে স্বর্গে মিলিত হওয়া। খ্রীস্টীয় প্রথম শতকে কুশান বংশের শাসনকালে তাহাদের চতুর্থ সম্মেলন পেশোয়ারে অনুষ্ঠিত হয়। তখন মূল ধর্ম প্যাগোডার আনুষ্ঠানিক ধর্মে পরিণত হইয়াছিল এবং তাহার অষ্টশীলার মূল প্রাণ বিভিন্ন রূপ বাহ্যিক আচার-অনুষ্ঠান ও রীতি-নীতির আবর্তে তলাইয়া গিয়াছিল।

অবশেষে বুদ্ধের শিষ্যেরা দুইটি বড় দলে বিভক্ত হইল—হীনযান ও মহাযান। প্রথম দল বুদ্ধকে একজন পথপ্রদর্শক ও শিক্ষকমাত্র মনে করিতে চাহে। কিন্তু দ্বিতীয় দল তাহাকে লোকাতীত এক ঐশী মর্যাদার আসনে অধিষ্ঠিত করিল। অবশেষে বুদ্ধানুসারীদের সাধারণ পন্থা এইটিই হইয়া দাঁড়াইল। আফগানিস্তান, বার্মা, মধ্য

১৮. আমি স্বীকার করি যে, ইহা আমার ব্যক্তিগত গবেষণার ফল। সুতরাং যাহারা এই বিষয়ে জীবনভর গবেষণা চালাইয়া গিয়াছেন, তাঁহাদের মুকাবিলায় আমার ব্যক্তিগত সিদ্ধান্তকে জোরের সহিত পেশ করিতে পারি না। তথাপি আমার সীমাবদ্ধ জানা-শোনার ফলে যে মত সৃষ্টি হইল, তাহা প্রকাশ করিতে আমি বাধ্য হইলাম। ইউরোপের সুধীবৃন্দ বৌদ্ধধর্ম সম্পর্কে জানার জন্য যথেষ্ট ত্যাগ স্বীকার করিয়াছেন। পালি ভাষার সব গুরুত্বপূর্ণ গ্রন্থই তাঁহারা ফরাসী ও ইংরেজি ভাষায় অনুবাদ করিয়াছেন। সেইগুলি অধ্যয়ন করিয়াই আমি এই সিদ্ধান্তে পৌঁছিয়াছি।

এশিয়া, চীন, কোরিয়া, জাপান, তিব্বত সর্বত্র মহাযান ধর্মমত প্রচারিত ও প্রসারিত হইল। চীন পরিব্রাজক ফাহিয়ান যখন চতুর্থ শতকে ভারতে আসিলেন, তখন তিনি ইউরোপের হীনযান বৌদ্ধদের সহিত তর্ক করিয়াছিলেন। বর্তমানে সিংহলে শুধু হীনযান ধর্মমতের বিকৃত রূপ 'থিরাদাদ' মতবাদ ছাড়া দুনিয়ার সর্বত্রই মহাযান ধর্মমত চালু রহিয়াছে।

বর্তমান যুগের বৌদ্ধ ধর্ম বিশেষজ্ঞরা ধারণা করেন যে, অশোকের যুগ পর্যন্ত বৌদ্ধ ধর্মে প্রতিমা পূজার ব্যাপার প্রচলিত ছিল না। কারণ সেই যুগ পর্যন্ত বৌদ্ধ ধর্মের যেসব নিদর্শন পাওয়া যায়, তাহাতে বুদ্ধের অস্তিত্ব প্রতিমার মাধ্যমে না দেখাইয়া নীলোফার ফুল কিংবা শূন্য আসন দিয়া দেখানো হইত। তারপর নীলোফার ফুল ও শূন্য আসনের স্থলে দুইটি চরণ দেখানো হইল। তারপর ধীরে ধীরে বুদ্ধের গোটা দেহই আসন জুড়িয়া বসিল। এ গবেষণাকে সঠিক ধরা হইলে মানিতে হয় যে, অশোকের যুগের পর হইতেই বৌদ্ধ-মূর্তির ব্যাপক পূজা শুরু হইল। খ্রীস্টপূর্ব ২৫০ অব্দ পর্যন্ত অশোকের যুগ বিদ্যমান ছিল।

৩. ইরানের মজুসী ধর্মবিশ্বাস

যর্‌দশ্‌তের আবির্ভাবের আগে মাদা (মেডিয়া) ও পারেছে (পারস্য) এক প্রাচীন ইরিয়ানী (আর্য) অর্চনা পদ্ধতি প্রচলিত ছিল। ভারতের বেদগুলির ভিতরে দেবতাদের অর্চনা ও উৎসর্গের কার্যাদির যেসব আচার-অনুষ্ঠান দেখা যায়, প্রায় সেই ধর্ম-বিশ্বাস ও আচার-অনুষ্ঠান পারস্য ও মেডিয়ায় প্রচলিত ছিল। দৈবশক্তিকে তাহারা দুইটি অস্তিত্বে বিভক্ত করিয়া লইয়াছিল। একটি অস্তিত্ব আলোর। তাহা সবাইকে সুখ ও আনন্দ দান করে। আরেকটি শক্তি অন্ধকারের। তাহা মানুষকে দুঃখ ও ধ্বংস দান করে। আগুনের অর্চনার জন্য উৎসর্গস্থল সৃষ্টি করা হইত এবং উহার পূজারীদিগকে 'মোগোশ' বলা হইত। আবেস্তার শ্লোকে তাহাদিগকে 'কিরপান' ও 'কাবী' নাম দেওয়া হইয়াছে। পরবর্তীকালে 'মোগোশ' বলিতে অগ্নি উপাসকদেরই বুঝাইত এবং অন্যান্য সম্প্রদায়ের কাছে ইরানীরা 'মোগ' ও 'মোগোশ' নামে অভিহিত হইল। আরবী এই 'মোগোশ'ই 'মজুস' নাম ধারণ করিল।

মুয্‌দীনা

যর্‌দশ্‌ত আবির্ভূত হইলে ইরানীদের তিনি প্রাচীন ধর্ম বিশ্বাস হইতে মুক্তি দিয়া 'মুযদীনা' শিক্ষায় দীক্ষিত করিলেন। তিনি দেবতার স্থলে একক আহুরামুয্‌দের অর্চনা প্রবর্তন করিলেন। এই আহুরামুয্‌দ একক, অতুলনীয়, অদ্বিতীয়, পবিত্র, আলোকময়, অশেষ বিজ্ঞ ও কল্যাণদায়ক। তিনি নিখিল সৃষ্টির স্রষ্টা। মানুষের জন্য তিনি দুইটি জীবন সৃষ্টি করিয়াছেন। একটি পার্থিব জীবন। অপরটি পারলৌকিক জীবন, যাহা মৃত্যুর পর হইতে শুরু হয়। মৃত্যুর সঙ্গে সঙ্গে দেহ বিলীন হয় কিন্তু আত্মা বাঁচিয়া থাকে এবং কর্মফল লাভ করে।

দেবতাদের স্থলে তিনি 'আমসূস্পন্দ' ও 'য়েযতা' সম্পর্কিত ধারণা দান করিলেন। অর্থাৎ ফেরেশতার ধারণা জন্মাইলেন। এই ফেরেশতারা আহুরামুয্দের নির্দেশ কার্যকরী করিয়া থাকেন। অন্ধকার ও অন্যায়ের দেবতার স্থলে 'ইংগ্রামেনিউশন'-কে বসাইলেন। অর্থাৎ শয়তানের ধারণা দিলেন। এই 'ইংগ্রামেনিউশন'-ই পাযেন্দের পরিভাষায় 'আহরমন' হইয়াছে।

যর্দশ্তের শিক্ষায় ভারতীয় বেদের প্রবর্তিত ধর্ম-বিশ্বাসের পরিষ্কার বিরোধিতা দেখা যায়। একই নাম ইরান ও ভারতে দুই অর্থ প্রকাশ করে। আবেস্তার 'আহুরা' সিরিয়া ও ভারতে 'আসূরা' নাম দিয়াছে। ঋকবেদে অবশ্য ইহা ভাল অর্থে গ্রহণ করা হইয়াছে। এখন উহা শয়তানের পাপাত্মায় পরিণত হইয়াছে। বেদের ইন্দ্র আবেস্তায় আবার 'ইংগ্রা' হইয়াছে। বেদে সে আকাশের খোদা ছিল। আবেস্তায় হইয়াছে পৃথিবীর শয়তান। ভারতে ও ইউরোপে দেব, ডেইউস ও থিউস বলিতে খোদা বুঝায়। পক্ষান্তরে ইরানে দেব অর্থ ভূত, প্রেত ও শয়তান। দুইটি ধর্ম-বিশ্বাসের যেন লড়াই চলিয়াছিল। একের খোদা অপরের কাছে শয়তান হইত। ভারতে যম মৃত্যুদূত আর ইরানের আবেস্তায় জীবন ও মনুষ্যত্বের শ্রেষ্ঠতম বিকাশ। এই যমই ইরানের 'যমশিদ' (ধর্মরাজ) হইয়াছে।

কিন্তু মনে হয়, কয়েক শতাব্দী পরে ইরানের প্রাচীন ধ্যান-ধারণা ও বাহিরের প্রভাব আবার জয়ী হইল। আর সাসানী শাসনকালে যখন 'মুয্দিনা' শিক্ষার আগাগোড়া সংস্কার হইল, তখন মজুসী, গ্রীক ও যরদশ্তী শিক্ষার এক জগাখিচুড়ি জন্ম নিল। ইহার বাহিরের রঙ-রূপ সবই মজুসী ধর্মের দান। ইসলামের আবির্ভাবকালে দেখা যায়, ইরানে এই জগাখিচুড়ি ধর্মই প্রচলিত ছিল। পশ্চিম ইরানের পার্সিক মুহাজির দল ভারতে এই ধর্ম লইয়াই আসিয়াছিল। তারপর এখানের স্থানীয় প্রভাব উহার উপরে আরও রং চড়াইল।

মজুসী ধর্মের ভিত্তি ছিল দ্বিত্ববাদের (Dualism) উপরে। অর্থাৎ ভাল ও মন্দের দুইটি আলাদা উৎস-শক্তি রহিয়াছে। আহুরামুয্দ যাহা কিছু করেন, তাহা আলো দেয়, আর দেয় কল্যাণ। পক্ষান্তরে 'আহরমান' যাহা কিছু দান করে, অমঙ্গল ও অন্ধকার হইয়া দেখা দেয়। তাহাদের উপাসনার ভিত্তি স্থাপিত হইল সূর্য ও অগ্নিপূজার উপরে। ঐশ্বরিক গুণের শ্রেষ্ঠতম প্রকাশ রূপ হইল আলো। মনে হয়, মজুসী ধর্ম ভাল-মন্দ এই দুইটি শক্তির নিয়ন্ত্রণাধীনে যে গোটা সৃষ্টির কারখানাটি চলিতেছে, মানুষকে সেই বিশ্বাসই জন্মাইতে চাহিল।

৪. ইহুদী ধর্মবিশ্বাস

সীমাবদ্ধ একটি গোত্রীয় ধর্ম হিসাবেই ইহুদী ধর্ম-বিশ্বাসের যাত্রা শুরু হইল। ইহুদী ধর্মের খোদা ইসরাঈল-গোত্রের জন্য নির্দিষ্ট ছিল। কিন্তু এই ধারণা ধীরে ধীরে সম্প্রসারিত হইয়া এমন কি হযরত দ্বিতীয় ইয়াশিয়ার গ্রন্থে তিনি সর্বজাতির খোদা

হইলেন এবং সর্বজাতির জন্য উপাসনা মন্দির নির্মিত হইল। তথাপি ইসরাঈলী খোদা কোন না কোন উপায়ে ইসরাঈলীদের জন্যই রহিয়া গেলেন। ইসলামের আবির্ভাবকালে ইহুদী ধর্মের যে রূপ দেখা গেল, তাহা গোত্রীয় ও ভৌগোলিক সীমারেখা ধরিয়াই চলিয়াছিল।

দেহী খোদা ও বিদেহী খোদার ঝগড়ায় তাহারা মধ্যপন্থা অবলম্বন করিয়াছে। আর তাহাদের খোদার ভিতরে রাগ ও প্রতিশোধ স্পৃহার মাত্রাটা কিছু বেশি দেখা যায়। খোদার বারংবার দেহ ধারণ পূর্বক মানুষের সামনে হাযির হওয়া ও মানুষের মতই উদ্দিষ্ট ব্যক্তির সহিত কথাবার্তা বলা, কথায় কথায় বান্দাকে পাকড়াও করা ইত্যাদি ধারণা দ্বারা তাওরাতের পৃষ্ঠাগুলি ভরপুর রাখা হইয়াছে।

তাওরাতে মানুষের সহিত খোদার যেন স্বামী-স্ত্রী সম্পর্ক ছিল। স্বামী যেরূপ দাম্ভিক হয়, স্বামী স্ত্রীর সব দোষ মাফ করিতে পারে, কেবল স্বামীত্বের ক্ষেত্রে স্ত্রী অন্য কাউকে অংশীদার করিলে কিছুতেই ক্ষমা করিতে পারে না, তেমনি ইসরাঈলী খোদাও খুব দাম্ভিক ছিল, ছিল ঈর্ষাপরায়ণ। ইসরাঈল গোত্রকে সে নিজ স্বামীত্বের স্বেচ্ছাচার চরিতার্থের জন্য স্ত্রী হিসাবে গ্রহণ করিয়াছিল। তাই ইসরাঈলীরা বিশ্বাসঘাতকতা করিলে বা অন্য জাতির সহিত খাতির মুহব্বত করিলে খোদা খুবই নাখোশ হন এবং ইহার জন্য ভীষণ শাস্তি দান করেন। বস্তুত দশ বিধানের অন্যতম ইহাও ছিল, 'তোমরা অন্য কাহারো প্রতিমা গড়িয়া পূজা করিও না। কারণ আমি তোমাদের সেই খোদা যাহার মত ঈর্ষাপরায়ণ ও দাম্ভিক আর কেহই নহে।'

স্বামীত্বের এই উপমা মিসর হইতে বাহিরে ছড়াইবার পর বাস্তব রূপ ধারণ শুরু করিল। আর তাহা শেষ পর্যন্ত অব্যাহত রহিল। ইহুদীদের প্রত্যেকটি স্খলন-পতনের জন্য খোদার যখন-তখন ক্রোধ প্রকাশ এক স্বেচ্ছাচারী স্বামীর নিজ স্ত্রীর প্রত্যেকটি অপরাধের জন্য সাজা দানের কথা স্মরণ করাইয়া দেয়। উপমার এই ধরনটি যতই প্রেরণাদায়ক ও কাব্যময় হউক না কেন, নিঃসন্দেহে বলা চলে যে, আল্লাহ সম্পর্কিত এরূপ ধারণা প্রাথমিক স্তরের অনুন্নত কল্পনারই পরিচয় বহন করে।

৫. ঈসায়ী ধ্যান-ধারণা

কিন্তু দ্বিতীয় ইয়াশিয়ার যুগ হইতে এই অবস্থার পরিবর্তন সূচিত হয়। সেই হইতে ইহুদীদের ধ্যান-ধারণায়ও প্রশস্ততা ও সূক্ষ্মতার উপাদান দেখা দিতে লাগিল। মনে হইল যেন একটা নূতন ধ্যান-ধারণার জন্য ময়দান প্রস্তুত হইতেছিল। বস্তুত ঈসায়ী ধর্ম দয়া ও ভালবাসা, ক্ষমা ও দান-দাক্ষিণ্যের এক নূতন ধারণা লইয়া আসিল। এক্ষণে খোদার ধারণা অত্যাচারী বাদশাহ্ কিংবা হিংসুক ও দাম্ভিক স্বামীর কঠোরতা নিয়া ধরা দিল না। পরন্তু; তিনি স্নেহশীল পিতা হইয়া দেখা দিলেন। ইহা সন্দেহাতীত সত্য যে, ইহুদীদের ধারণায় যে কঠোরতা পরিলক্ষিত হইয়াছিল, এই নূতন ধারণা উহার সামনে এক বিপ্লব হইয়া দেখা দিল। মানব জীবনের সকল

সম্পর্কের ভিতরে মা-বাপের সম্পর্কই সবচাইতে গভীর ও উত্তম সম্পর্ক। কারণ উহাতে স্বামীর জৈবিক উত্তেজনাপূর্ণ সম্পর্কের স্থান নাই। ইহা আগাগোড়া স্নেহ ও দয়া-দাক্ষিণ্যের এবং লালন-পালন ও আদর-যত্নের শান্ত ও স্থির সম্পর্ক। সন্তান বারংবার অন্যায় করিবে, তথাপি মায়ের স্নেহ অটল থাকিবে এবং বাপের করুণা তাহা ক্ষমা করিতে দ্বিধা করিবে না। সুতরাং আল্লাহ্‌র সহিত বান্দার সম্পর্ক নির্ণয়ের জন্য যদি মানুষ নিজের সম্পর্ক হইতে উপমা গ্রহণ করা ছাড়া গত্যন্তর না দেখে, নিঃসন্দেহে তখন স্বামী-স্ত্রীর সম্পর্কের চাইতে মা-বাপের সম্পর্ককে উপমা হিসাবে গ্রহণ অধিকতর মার্জিত রুচি ও উন্নত মানের পরিচায়ক হইতে পারে।

সাকার ও নিরাকার প্রশ্নে ঈসায়ী চিন্তাধারা মূলত ইহুদী চিন্তাধারার প্রায় সমানই ছিল। তবে ঈসায়ী ভাবধারা যখন রোমকদের মূর্তিপূজার ভাবনার সহিত মিলিত হইল, তখন ত্রিত্ববাদ ও ঈসা-পূজার চিন্তাধারা প্রসারিত হইল। তাহার উপর আলেকজান্দ্রিয়ার দর্শনভিত্তিক প্রতিমা পূজার সেরাপীজ (Serapis) চিন্তাধারা ঈসায়ী প্রতিমা পূজার রূপ ধারণ করিল। এক্ষণে ঈসায়ীরা প্রতিমা পূজকদের প্রতিমা পূজাকে তো অস্বীকার করিতে লাগিল কিন্তু নিজেদের প্রকারান্তরে প্রতিমা পূজার উপরে কোন আপত্তি ছিল না। মেডোনার প্রাচীন প্রতিমার স্থলে এখন নূতন ঈসায়ী মেডোনার প্রতিমা সৃষ্টি হইল। এই প্রতিমা খোদার পুত্রকে কোলে ধরিয়া থাকিত এবং প্রত্যেক দৃঢ় বিশ্বাসী ঈসায়ীর কাছে সশ্রদ্ধ সিজদা দাবি করিত।

স্থূল কথা কুরআন যখন অবতীর্ণ হইল, ঈসায়ী ধ্যান-ধারণা তখন দয়া ও স্নেহপূর্ণ পিতৃত্বের উপমা নিয়া ত্রিত্ববাদ ও সাকার ধারণার সহিত মিশ্রিত এক আজব তাওহিদী ধারণা প্রচার করিতেছিল।

গ্রীক ও আলেকজান্দ্রিয়ার দার্শনিকদের ধ্যান-ধারণা

এই সব ধর্মীয় ধ্যান-ধারণা ছাড়াও গ্রীক দার্শনিকদের আলাদা এক ধরনের ধ্যান-ধারণা ছিল। যদিও তাহা ধর্মীয় চিন্তাধারার মত সার্বজনীন স্বীকৃতি লাভ করে নাই, তথাপি মানুষের চিন্তাধারার উত্থান-পতনের ইতিহাসে উহার প্রভাব কম ছিল না। তাই উহাকে উপেক্ষা করা চলে না।

প্রায় খ্রীস্টপূর্ব পাঁচ শতকে গ্রীসে একত্ববাদী ধ্যান-ধারণা পালিত ও বর্ধিত হইতেছিল। বিখ্যাত দার্শনিক সক্রেটিস এই চিন্তাধারার জন্মদান করেন। তারপর প্লেটো তাঁহার প্রচারিত দর্শনকে সুবিন্যস্ত ও সুসংকলিত রূপদান করেন।

ভারতের ঋকবেদের দেববাণী চিন্তাধারা যেভাবে সর্ব প্রভুর সেরা প্রভুর চিন্তাধারার জন্ম দিল, আর সেই সর্ব প্রভু যেমন তাহাদিগকে একত্ববাদের দিকে আগাইয়া নিয়া গেল, ঠিক সেইভাবে গ্রীসে অলিম্পাস দেবতাদেরও শেষ পর্যন্ত এক শ্রেষ্ঠতম প্রভুর কাছে মাথা নত করিতে হইল। তারপর এই সর্ব দেবতার প্রভু ধীরে ধীরে বহুত্ববাদ ও একত্ববাদের চড়াই-উতরাই পার হইয়া চলিল। গ্রীসের প্রাচীন কালের ধ্যান-ধারণা

জানার একমাত্র উপকরণ হইল প্রাচীন কাব্য কাহিনীগুলি। আমরা সেইগুলি অধ্যয়ন করিলে দুইটি ধারণাকে তাহাদের সব কিছুর পিছনে সক্রিয় দেখিতে পাই। তাহা হইল পরকালের জীবন এবং এক শ্রেষ্ঠতম ও সর্বব্যাপী প্রভুর অস্তিত্ব স্বীকার।

আইউনী (Ionie) দর্শন গ্রীক ধর্ম-দর্শনের প্রাচীনতম ছিল। তাহাতে নভোমণ্ডলের অদৃশ্য আত্মায় বিশ্বাস রাখা হইত। তারপর উহা সেই আত্মাগুলির উর্ধ্বে এমন এক শক্তিশালী ও বিরাট আত্মার সন্ধান করিয়াছে, যিনি নিখিল সৃষ্টির মূল রূপে বিবেচিত হইতে পারেন। খ্রীস্টপূর্ব পাঁচ শতকে পিথাগোরাসের আবির্ভাব ঘটিল। তিনি নূতন নূতন চিন্তার উপকরণের সহিত দর্শনকে পরিচিত করাইলেন। পিথাগোরাসের ভারত ভ্রমণ সঠিক খবর হউক কি না হউক, তাঁহার দর্শনের ভিতরে যে ভারতীয় চিন্তাধারার ছাপ প্রতিভাত হইয়াছিল তাহাতে সন্দেহ নাই। তাঁহার প্রচারিত মতবাদে পুনর্জন্মবাদের নিরংকুশ ধারণা, নভোমণ্ডলের পঞ্চ উপাদানের (Quintaessentia) স্বীকৃতি ব্যক্তি মানুষের একাকিত্ব ও আধাত্মিক উপলব্ধির ঝলক এবং বিশেষত জীবনধারার বিধি-বিধানগুলি উপনিষদের ধ্যান-ধারণার সহিত অনেকখানি সামঞ্জস্য রাখে।

পিথাগোরাসের পরে অ্যানেক্সগোরাস সেই মূলনীতিগুলিকে সামগ্রিক (Abstracts) রূপ দান করিলেন, ইহার উপরেই গ্রীক দর্শনের ভিত্তি রচিত। পরবর্তীকালে সক্রেটিস ও প্লেটো তাহার উপরে সামগ্রিক সত্তার সৌধ গড়িয়া তুলিলেন। সক্রেটিসের ব্যক্তিত্বই গ্রীসে নিরাকার ও একক প্রভুর বিশ্বাসের ভিত্তিমূল স্থাপন করে। তাঁহার আগে যে সব দার্শনিক ছিলেন, তাঁহারা জাতীয় উপাসনালয়ের দেবতাদের বিরুদ্ধাচরণ করেন নাই। কারণ তাঁহাদের মন-মগজও সেই দেবতাদের প্রভাব হইতে মুক্ত ছিল না। সেখানে আসমানি বস্তুর ধারণার মূল অনুসন্ধান করিলে ইহাই জানা যায় যে, গ্রীসের নক্ষত্র দেবতারাই জ্ঞান ও গবেষণার ক্ষেত্রে আসন লাভের জন্য নূতন এক দার্শনিক আবরণ গ্রহণ করিয়াছিল। ফলে তাহাদের অস্তিত্ব শুধু নিরক্ষর জনসাধারণকেই নহে, পরন্তু সুধী সমাজকেও আশ্বস্ত করিতে সমর্থ হইল। কিছুক্ষণ আগে আমরা প্রাচীন ভারতের ধর্মীয় ধারণায় যে বিবর্তনের ধারা দেখিয়া আসিয়াছি, ইহাও প্রায় সেইরূপ অবস্থা। তবে এই ধর্মীয় চিন্তার গবেষণাপ্রসূত ব্যাপারগুলি সাধারণত একই সঙ্গে জনসাধারণের অন্ধ বিশ্বাস ও জ্ঞানীদের দার্শনিক চাহিদার ভিতরে একটি সামঞ্জস্য বিধানের প্রয়াস পাইয়াছে। ভারতের মত গ্রীসেও সুধী ও সর্বসাধারণের চিন্তা ও কার্যে একটা সমঝোতা স্থাপন করা হইয়াছিল। অর্থাৎ তাওহীদ ও শিরকের ধারণা পাশাপাশি চলিতেছিল।

কিন্তু সক্রেটিসের মানসিক গঠন ও চিন্তাধারা এই সব সাধারণ পর্যায়ের অনেক উর্ধ্বে ছিল। তিনি সমসাময়িক প্রতিমা পূজার সহিত কোনরূপ আপোস করিতে পারিলেন না। তাহার একত্ববাদী ধারণা শিরক ও উপমামুক্ত নিষ্কলুষ রূপ নিয়া আত্মপ্রকাশ করিল। তাঁহার নিখুঁত খোদা অর্চনার ধারণা এত উন্নত স্তরের ছিল যে, সমসাময়িক ধর্মীয় ধ্যান-ধারণাগুলি সেদিকে মাথা তুলিয়া তাকাইবারও সাহস পাইত

না। তাঁহার সত্য দৃষ্টিতে গ্রীক প্রতিমা পূজকদের খোদা-অর্চনার ব্যাপারটি স্বয়ং সৃষ্ট প্রভুর সহিত বেচাকেনার কারবার চালানোর চাইতে কোন অংশে অধিক গুরুত্বের হইয়া দেখা দিল না। প্লেটো ও ইউসিকার ভাষা সাফ সাফ জানাইয়া দেয়, গ্রীসের ধর্মীয় চিন্তাধারা ও কার্যাবলি সম্পর্কে সক্রেটিসের সুস্পষ্ট সিদ্ধান্তের কারণেই সক্রেটিসের বিরুদ্ধে ধর্মদ্রোহিতার অভিযোগ আনা হইয়াছিল। তিনি জিজ্ঞাসা করিয়াছিলেন—ধর্মীয় মতবাদের মূল তত্ত্বটি কি ? তাঁহার এই প্রশ্নের জবাবে শুধু ইহাই মিলিল 'ধর্মীয় মতবাদ ভিখ চাওয়া ও দেওয়ার একটি পেশা মাত্র। দেবতাদের অর্চনার মাধ্যমে আমাদের খেয়াল-খুশিমত আবদার জানাইতে থাকিব আর দেবতারা অর্চনার বিনিময়ে তাহাই পূরণ করিতে থাকিবে। এই তেজারতী কারবারের বিশেষ ঢঙটির নাম ধর্ম।'

বস্তুত সক্রেটিসের এই ধরনের বেপরোয়া শিক্ষা কখনো সমসাময়িক কালের বাধাবিপত্তির হাত হইতে নিস্তার পাইতে পারে না। তাই তিনি পাকড়াও হইলেন ! কিন্তু তাঁহার সৎসাহস সমসাময়িক কালের সংকীর্ণতার কাছে মাথা নত করিল না। তিনি নবী ও বীর শহীদানের মত অশেষ ধৈর্য ও সহ্য লইয়া সত্যের জন্য বিষের পাত্র মুখে তুলিয়া লইলেন ! মৃত্যুর প্রাক্কালে তিনি এই শেষ বাণী রাখিয়া গেলেন, "আমি এক দুর্বল পৃথিবী ছাড়িয়া উত্তম পৃথিবীর পথে যাত্রা করিলাম।"

প্লেটো সক্রেটিসের সমালোচনামূলক (Dialectic) চিন্তাধারার পাণ্ডিত্যপূর্ণ বিশ্বাসকে পূর্ণ এক বিধিবদ্ধ রূপদান করিলেন। এমন কি তর্কশাস্ত্রের ভিত্তিতে সেইগুলিকে পূর্ণত্ব ও সামগ্রিকতা দান করিলেন ! তিনি নিজের সব দার্শনিক পর্যালোচনা ও গবেষণা এই জড়-জগতের উপরে ভিত্তি করিয়া শুরু করিলেন এবং আল্লাহ্ হইতে শুরু করিয়া রাষ্ট্র পর্যন্ত সব কিছুই (Idea) বা অধ্যাত্ম জগতের উপরে প্রতিষ্ঠিত করিলেন। যদি ইন্দ্রিয় জগৎ হইতে অধ্যাত্ম জগৎ আলাদা অস্তিত্ব রাখে, তাহা হইলে নাউস (Nause) অর্থাৎ বাকশক্তিও বস্তুজগতের বাহিরে অবস্থান করিতেছে। আর যদি এই বাকশক্তি জড়দেহ হইতে স্বাতন্ত্র্য বজায় রাখিয়া চলিতে পারে, তাহা হইলে খোদা কোন জড়জগৎ হইতে স্বাতন্ত্র্য রক্ষা করিয়া চলিতে পারিবেন না ? তিনি ইংকেসাগোরাসের মতবাদের বিরুদ্ধে গিয়া দুইট অস্তিত্বের ভিতরকার পার্থক্য দেখাইয়াছেন। একটিকে নশ্বর ও লয়শীল এবং দ্বিতীয়টিকে অবিনশ্বর ও চিরন্তন বলিয়াছেন। লয়শীল বস্তু আশা-আকাঙ্ক্ষা পোষণ করে এবং উহাই দেহধারী (Ego) হয়। কিন্তু অবিনশ্বর বিদেহী সত্তা হইল সৃষ্টিজগতের মূল বিজ্ঞশক্তি। তিনি শরীরী জীবনের সব রিপু হইতে পবিত্র। এই সামগ্রিক সত্তাই সেই প্রভু শক্তি যাঁহার বদৌলতে মানুষ অনুভূতি শক্তি লাভ করিয়া থাকে। এখানে পৌঁছিয়া সেই মূল সত্তার ধারণা এক ধরনের একক অস্তিত্ব সম্পর্কিত ধারণায় পর্যবসিত হয়। মূলত, হিন্দু দর্শনের 'আত্মা' ও গ্রীক দর্শনের 'বিদেহী সত্তা' একই বস্তু—দুই নাম মাত্র। এখানে আত্মার পরবর্তী ধাপে 'সামগ্রিক সত্তা' আত্মপ্রকাশ করিয়াছে।

সক্রেটিস আল্লাহ্‌র অস্তিত্ব হিসাবে আগাতুস অর্থাৎ উত্তম ধারণার জন্ম দিয়াছিলেন। তিনি সদা সর্বদা ভাল ও সুন্দর কামনা করেন। প্লেটো বস্তু জগৎ হইতে উর্ধ্বে উঠিয়া সেই উত্তমের মূল সূত্র খুঁজিতে প্রয়াসী হইয়াছিলেন। কিন্তু সক্রেটিসের গুণগত চিন্তাধারার সহিত তিনি নূতন কিছুর সংযোজন ঘটাইতে পারেন নাই।

অ্যারিস্টটল আধ্যাত্মিক ধারণা হইতে মুক্ত করিয়া দর্শনকে শুধু জড় বস্তু যা ইন্দ্রিয়ানুভূতির সীমারেখার মধ্যে দেখিতে চাহিয়াছেন। তিনি তাই সক্রেটিসের চিন্তাধারাকে পুরোপুরি মানিয়া লন নাই। তিনি 'আদি জ্ঞান' ও 'কর্মতৎপর জ্ঞান'-এর ধারণা দান করেন। সেই 'আদি জ্ঞান' এক চিরন্তন, অখণ্ড ও সর্বব্যাপী সত্তা। সক্রেটিস ও প্লেটো যেই সত্তাকে 'সর্বোত্তম' নাম দিয়াছিলেন, অ্যারিস্টটল তাঁহার নাম দিলেন 'আদি জ্ঞান' বা 'জ্ঞানের উৎস'। তিনি এখানে পৌঁছিয়াই নির্বাক হইয়াছেন। ইহার পরেও 'পেরিপ্যাটেটিক' দার্শনিকদের অর্থাৎ অ্যারিস্টটলের শিষ্যদের যতটুক অগ্রসর হইতে দেখি, তাহা স্বয়ং অ্যারিস্টটলের বর্ণনা নহে, বরং উহা তাঁহার দর্শনের গ্রীক ও আরব ব্যাখ্যাদাতাদের কাজ।

এই সব আলোচনায় আমরা এতটুকু জানিতে পারিলাম যে, 'সর্বত্তম' ও 'আদি জ্ঞান' গ্রীক দর্শনের খোদা সম্পর্কিত ধারণার নির্যাস। সক্রেটিসের গুণবাচক ধারণাটি বিস্তারিতভাবে বুঝিবার জন্য প্লেটোর Republic গ্রন্থটির এই বাদানুবাদটি সামনে রাখা চাই ঃ

এডমন্ট্‌স—কবিরা কিভাবে খোদার বর্ণনা দান করিবেন ?

সক্রেটিস—খোদার সত্তায় যে গুণ বিদ্যমান, তাহাই বর্ণনা করা উচিত। হউক তাহা মহাকাব্যে কিংবা গীতিকাব্যে! নিঃসন্দেহে বলা চলে খোদা মঙ্গলময়। সুতরাং তাঁহার গুণও সবকিছু মঙ্গলময় করার মাধ্যমে প্রকাশ পাইবে।

এডমন্ট্‌স—ঠিক আছে।

সক্রেটিস—ইহাও সুস্পষ্ট যে, মঙ্গলময় হইতে কোন অকল্যাণ প্রকাশ পাইতে পারে না। যেই সত্তা অনিষ্টকর নহেন, তিনি অনিষ্ট সৃষ্টিও করেন না। ইহাও সুস্পষ্ট যে, যেই সত্তা মঙ্গলময়, তিনিই কল্যাণদায়ক। সুতরাং খোদা শুধু মঙ্গলই করিতে পারেন, অমঙ্গলের কারণ তিনি হইতে পারেন না।

এডমন্ট্‌স—ঠিক আছে, সত্য বটে।

সক্রেটিস—ইহার ফলে এই কথাও স্পষ্ট হইল যে, সাধারণত খোদাকে যেসব ঘটনার জন্যই দায়ী করা হয়, তাহা ঠিক নহে। বরং তিনি মানুষের কৃতকর্মে খুব কমই হস্তক্ষেপ করেন। কারণ আমরা স্বভাবত ভাল কাজের চাইতে মন্দ কাজ বেশি করিয়া থাকি। তাই মন্দ কাজের জন্য মঙ্গলময় ও কল্যাণদায়ক খোদাকে দায়ী মনে করা ভুল। তাঁহাকে শুধু ভাল কাজেরই উৎস মনে করা উচিত এবং মন্দ কাজের জন্য অন্য কাহাকেও দায়ী করার জন্য অনুসন্ধান করা উচিত।

এডমন্ট্স—কথাটি আমার কাছে অত্যন্ত সুস্পষ্ট হইয়া ধরা দিতেছে।

সক্রেটিস—সুতরাং হোমার যে বলিয়াছেন, 'যিউসের (Zeus) অর্থাৎ সর্বপ্রভুর সামনে ভাল ও মন্দের দুইটি পাত্র রহিয়াছে এবং মানুষের সব ভাল-মন্দ সেই দুই পাত্র হইতেই আসে। তাই যেই মানুষের ভাগ্যে কল্যাণের পাত্র পড়িয়াছে, তাহার সর্বত্রই কল্যাণ দেখা দেয় এবং যাহার ভাগ্যে অকল্যাণের পাত্র রহিয়াছে, তাহার সব কিছুতেই অকল্যাণ দেখা দেয়। আর যাহার ভাগ্য উভয় পাত্র হইতে আসিয়াছে, তাহার কল্যাণ ও অকল্যাণ দুই-ই দেখা দিবে।' এই ধারণার সহিত একমত হওয়া যায় না।

তারপর তাঁহারা প্রভুর সাকার হওয়ার উপরে পর্যালোচনা করিয়াছেন এবং তিনি একথা অস্বীকার করিয়াছেন যে, 'খোদা বাজিকর ও বহুরূপীর মত কখনও এক বেশে আর কখনও আরেক বেশে দেখা দিয়া থাকেন।'

আলেকজান্দ্রিয়ার নিউ-প্লেটোনিক মতবাদ

খ্রীস্টপূর্ব তৃতীয় শতকে আলেকজান্দ্রিয়ায় 'আধ্যাত্মিক-দর্শন' নবীন প্লেটোনিক মতবাদ নামে আত্মপ্রকাশ করে। উহার প্রবর্তক ছিলেন আমুনিয়াস সাক্কাস (Ammonius Saccas) আমুনিয়াসের স্থলাভিষিক্ত হইলেন প্লেটিনাস (Platinus) এবং তাঁহার শিষ্য ছিলেন পোর্ফিরিউস (Porhpyrus)। ইস্কান্দার আফ্রোদীর পরে পোর্ফিরিউসকে অ্যারিস্টটলের বড় ব্যাখ্যাদাতা মনে করা হয়। তিনিই 'নিউ-প্লেটোনিক' মতবাদের মূল নীতিগুলিকে অ্যারিস্টটলের শিষ্যদের দর্শনের ভিতরে প্রসারিত করেন। প্লেটিনাস ও পোর্ফিরিউসের শিক্ষা আগাগোড়া ভারতীয় উপনিষদের শিক্ষার সহিত মিলিয়া যায়। অর্থাৎ সত্য জ্ঞানের মূল উপায় হইল দৈবজ্ঞান লাভ, দলীল-প্রমাণ কিংবা যুক্তিতর্ক নহে। আর অধ্যাত্মবাদের সর্বোচ্চ স্তর হইল চরম আকর্ষণের ভিতরে নিজেকে বিলীন করিয়া দেওয়া।

খোদার ব্যাপারেও প্লেটিনাস যে সিদ্ধান্তে পৌঁছিলেন, উপনিষদ রচয়িতা বহু আগেই সেই সিদ্ধান্তে পৌঁছিয়াছিলেন। অর্থাৎ তিনি গুণাবলি অস্বীকারের পথ অনুসরণ করিলেন। মূল সত্তা আমাদের সকল অনুভূতি ও ধ্যান-ধারণার ঊর্ধ্বে। তাই সেক্ষেত্রে আমরা কোনই সিদ্ধান্ত গ্রহণ করিতে পারি না। মূল সত্তা প্রকাশ পাইতে পারে, এমন কোন উপমেয় বস্তু নাই। আমরা তাঁহার ব্যাপারে কিছুই বলিতে পারি না। আমরা তাঁহাকে না রূপ দিতে পারি, না তাঁহার গুণ প্রকাশ করিতে পারি, না তাঁহাকে জীবনের সহিত সংশ্লিষ্ট করিতে পারি। এক্ষেত্রে সত্য হইল ধারণাতীত ও ব্যাখ্যা-নিরপেক্ষ।'

সক্রেটিস ও প্লেটো সত্যকে 'সর্বোত্তম' বা 'মঙ্গলময়' নাম দিয়াছিলেন। তাই প্লেটিনাস সেই পর্যন্ত অগ্রসর না হইয়া পারিলেন না। কিন্তু উহার পরের সব দ্বার রুদ্ধ করিয়া দিলেন। যখন তোমরা 'মঙ্গলময়' বলিয়াছ, ব্যস্ এখানেই থাম এবং ইহার উপরে আর কিছু যোগ করিও না। যদি তোমরা অন্য কোন ধারণার সংযোগ ঘটাও, প্রত্যেকটি সংযোগের সহিত নয়া একটি ত্রুটির সংযোগ ঘটাইয়া চলিবে। অ্যারিস্টটল

সত্যের সন্ধান পাইয়াছিলেন নিরংকুশ জ্ঞান রূপে। তিনি সর্ব কারণের মূল কারণকে 'আদি জ্ঞান' নাম দিয়াছিলেন। কিন্তু প্লেটিনাসের ব্যাপকতা সেই ব্যাখ্যার ছায়াও সহ্য করিতে পারিল না। তিনি বলেন, 'তুমি তাহাকে 'জ্ঞান' বলিয়াও আখ্যায়িত করও না। তাঁহাকে এভাবে তোমরা বিভক্ত করিও না।'

কিন্তু 'জ্ঞান'ও যদি তাঁহাকে না বলা যায়, কি করিয়া তাঁহাকে 'বর্তমান' এবং 'মঙ্গলময়' বলা যাইতে পারে ? যদি আমরা তাঁহার সম্পর্কে আমাদের কল্পিত কোন গুণই আরোপ করিতে না পারি, তাহা হইলে মঙ্গলময়তা ও অস্তিত্বশীলতার গুণই বা নিষিদ্ধ হইবে না কেন ? এই প্রশ্নের তিনি নিজেই জবাব দিতেছেন ঃ

'আমি যদি তাঁহাকে 'মঙ্গলময়' বলিয়া থাকি, তাহার অর্থ এই নহে যে, আমি এমন কোন বিশেষ গুণের স্বীকৃতি জানাইতেছি যাহা তাঁহার ভিতরে বিদ্যমান। আমি বরং তাহা বলিয়া এই কথাটি প্রকাশ করিতে চাই যে, তিনি এমন একটি লক্ষ্যস্থল ও চরমস্থল, যেখানে গিয়া সব কিছুর পরিসমাপ্তি ঘটে। ইহা যেন বিশেষ উদ্দেশ্য বুঝাইবার জন্য বিশেষ এক পরিভাষা। সেইরূপ যদি আমি তাহাকে অস্তিত্বশীল বলিয়া থাকি, তাহা তাঁহাকে অনস্তিত্বের হাত হইতে বাঁচাইবার জন্য। মূলত তিনি তো সব বস্তুরই উর্ধ্বে অবস্থিত। এমন কি অস্তিত্বশীলদের গুণাবলি ও বৈশিষ্ট্য হইতেও তিনি মুক্ত।'[১৯]

আলেকজান্দ্রিয়ার ক্লিমেন্ট (Clement) এই মতটিকে কয়েকটি শব্দে স্পষ্ট করিয়া তুলিয়াছেন—'তিনি কি ? এই প্রশ্নের মাধ্যমে তাঁহাকে জানার উপায় নাই। শুধু এই

---

১৯. E. T. Merenna, Part 11. Page 118.

নিউ প্লেটোনিক মতবাদ ঃ এই মতবাদকে প্লেটোর সহিত সংযুক্ত করার কারণ এই যে, ইহার ভিত্তি হিসাবে প্লেটোর কয়েকটি মূলনীতি গ্রহণ করা হইয়াছিল। কিন্তু ইহার চিন্তাধারা ও সিদ্ধান্তাবলির সহিত প্লেটোর মতবাদের কোন যোগ নাই। অথচ আরব দার্শনিকদের একটি বিরাট দল ভুল করিয়া ভাবিয়াছেন যে, মূলত ইহাও প্লেটোরই মতবাদ। এই মতবাদের জনৈক দার্শনিক অর্থাৎ পোর্ফিরিউস অ্যারিস্টটলের ব্যাখ্যা দিতে গিয়া তাঁহার মতবাদে যতটুকু সংযোজিত করিয়াছেন, আরব দার্শনিকরা সেইটুকুর পার্থক্যও ধরিতে পারে নাই। বস্তুত আবূ নছর ফারাবী 'মতবাদ সংকলন' নামক গ্রন্থে অ্যারিস্টটলের যে মতবাদ দেখাইয়াছেন তাহাতে এই ব্যাপারটি ধরা পড়িয়াছে। আরব দার্শনিকদের ভিতরে ইবনে রুশ্‌দই সর্বপ্রথমে এই ভ্রান্তি বুঝিতে সমর্থ হন। তিনি অ্যারিস্টটলের মতবাদকে ব্যাখ্যাকারদের সংযোজন হইতে মুক্ত করিয়া দেখিবার প্রয়াস পান।

৫২৯ খ্রীস্টাব্দে সম্রাট জাস্টিনিয়ানের সময়ে, যখন তাঁহার নির্দেশে আলেকজান্দ্রিয়ার দার্শনিকদের নির্বাসন দেওয়া হইল, তাহাদের কতিপয় তখন ইরানে আশ্রয় গ্রহণ করেন। বস্তুত সেমিস ও ডিমাসিস সম্রাট খসরুর দরবারে বেশ মর্যাদার আসন পাইয়াছিলেন। এই দার্শনিকদের প্রভাবে পাহলভী ভাষাও 'নিউ-প্লেটোনিক' মতবাদের সহিত পরিচিত হইল। ইরানী দার্শনিকরা উহাকে জাতীয় রূপ দেবার জন্য যরদশত ও জামাসেপের সহিত যুক্ত করিয়াছেন। আরবীতে যখন পাহলভী সাহিত্য অনূদিত হইল, তখন এই দার্শনিক রচনাবলিও অনূদিত হইল। ফলে সাধারণত এই ধারণার সৃষ্টি হইল যে, এই সব দার্শনিক তত্ত্ব যরদশ্‌ত ও জামাসেপের সৃষ্টি ছাড়া অন্য কিছুই নহে। বস্তুত, শেখ শিহাবুদ্দীন 'প্রাচ্য-দর্শন'-এ এবং শিরাজী উহার ব্যাখ্যায় দুইটি ভুলেরই পুনরাবৃত্তি ঘটাইয়াছেন। তাঁহারা 'নিউ-প্লেটোনিক' মতবাদকে প্লেটোর মতবাদ বলিয়া উহার মূল উদগাতা হিসাবে যরদশ্‌ত ও জামাসেপের নাম উল্লেখ করেন।

প্রশ্নই তাঁহার বেলায় চলে—তিনি কি নহেন ? অর্থাৎ তাঁহার বেলায় 'না' বাচক উত্তর চলে, কিন্তু 'হ্যা' বাচক উত্তর চলে না।

سر لسان النطق عنه اخرس !

—উহা এমনই রহস্য যেখানে ভাষা আসিয়া নির্বাক সাজে।

গুণ সম্পর্কিত এই অধ্যায়টি আমরা উপনিষদের 'নেতি নেতি' অধ্যায়ে শুনিতে পাই। শংকর যাহার উপরে স্বীয় মতবাদের ভিত্তি স্থাপন করিয়াছেন।

মধ্যযুগের ইহুদী দার্শনিকরাও এই পথ অনুসরণ করিয়াছিলেন। মূসা বিন মায়মূন (মৃঃ ৬০৫ খ্রীঃ) আল্লাহ্‌কে অস্তিত্বশীল বলিতেও অস্বীকার করিয়াছেন। তিনি বলেন, 'তাঁহাকে অস্তিত্বে কল্পনা করিতে গেলেই অন্যান্য অস্তিত্বশীল বস্তুর রূপ কল্পনা দেখা দেয়। অথচ আল্লাহ্ তাহা হইতে মুক্ত ও পবিত্র—তিনি নিরাকার। আল্লাহ্‌কে তিনি একক ও লা-শরীক বলিতেও অস্বীকার করিয়াছেন। কারণ ইহাতেও অস্তিত্ব কল্পনা দেখা দেয়।' ইবনে মায়মূনের এই মত মূলত গ্রীক দার্শনিকদের মতেরই প্রতিধ্বনি মাত্র।

কুরআনী মতবাদ

যাহা হউক, খ্রীস্টীয় ষষ্ঠ শতকে পৃথিবীর খোদা অর্চনার ধ্যান-ধারণা কুরআনের ধ্যান-ধারণার নাগাল পাইল।

এক্ষণে ভাবিয়া দেখুন, কুরআনের আল্লাহ্ সম্পর্কিত ধারণা কি ? আমরা যখন উপরে আলোচিত সব ধারণা অধ্যয়ন করিয়া কুরআনের ধারণার উপরে দৃষ্টিপাত করি, তখন পরিষ্কার দেখিতে পাই, আল্লাহ্ সম্পর্কিত যাবতীয় ধারণার ভিতরে কুরআনের ধারণা সবচাইতে ব্যাপক ও উন্নত। এই সূত্রে নিম্ন ব্যাপারগুলি অনুধাবনযোগ্য।

১. পূর্ণাঙ্গ অদ্বিতীয় ধারণা

প্রথমত, সাকার ও নিরাকার প্রশ্নে কুরআন যে নিরাকার ধারণা দান করিয়াছে, দুনিয়ার আর কোন মতবাদই তাহা পারে নাই। আল্লাহ্‌কে সব কিছু হইতে পবিত্র ও নিরাকার কল্পনার সব চাইতে বড় নিদর্শন পৃথিবীতে ইহাই ছিল যে, কিছু মানুষ এতটুকু পর্যন্ত ধারণা করিতে সমর্থ হইয়াছিল, সকল প্রতিমার উপরে এক অদৃশ্য খোদা রহিয়াছেন। কিন্তু তাঁহার গুণাবলি সম্পর্কিত ধারণার ক্ষেত্রে মানুষ নিজ অনুভূতি লব্ধ ধারণা ও পার্থিব বস্তুর উপর উপমা কল্পনা হইতে কখনও মুক্তি পায় নাই। ভারত ও গ্রীকের অবস্থা আমরা দেখিলাম। যেই ইহুদী ধারণা প্রতিমা পূজার কোন দিকই বৈধ মনে করে না, তাহাদের খোদার কল্পনায়ও মানবীয় উপমা-উদাহরণের হিড়িক দেখা যায়। হযরত ইবরাহীমের চলার পথে আল্লাহ্‌কে উঁচু স্থানে দেখিতে পাওয়া, হযরত ইয়াকুবের সহিত খোদার কুস্তি লড়া, কোহিতূরে আবির্ভূত খোদাকে হযরত মূসার পিছন হইতে দেখা, খোদার ক্রোধের বশবর্তী হইয়া কোন কাজ ফেলিয়া আবার পস্তানো, বনী ইসরাঈলকে খোদার খেয়াল-খুশি চরিতার্থের স্ত্রী হিসাবে গ্রহণ এবং

তাহাদের খারাপ চাল-চলনের জন্য আল্লাহ্‌র মাতম করা, হায়কল ধ্বংসের জন্য তাঁহার আহাজারী, তাঁহার আঁতে যন্ত্রণা দেখা দেওয়া ও কলিজা ছিদ্র হওয়া ইত্যাদি তাওরাতের সাধারণ বর্ণনায় পরিণত হইয়াছে।

মূল কথা এই, কুরআন অবতীর্ণ হইবার আগে মানুষের ধারণা এতখানি উন্নত ছিল না যে, আল্লাহ্‌কে মানবীয় কল্পনা হইতে পবিত্র রাখিয়া তাঁহার যথার্থ দ্যুতি অনুভব করিতে পারে। তাই সব ধারণার ভিত্তি মানবীয় উপমা-উদাহরণের উপরে প্রতিষ্ঠিত করিতে হইয়াছে। তাওরাতে আমরা দেখিতে পাই, যবুরের গীতাবলিতে ও ইয়াশিয়ার গ্রন্থে একদিকে খোদার জন্য মার্জিত ধারণা বিদ্যমান, অপরদিকে খোদার উদ্দেশ্যে এমন সব বক্তব্য মিলে যাহাতে মানবীয় গুণাবলি ও ইন্দ্রিয়ানুভূতির ছাপ নাই। হযরত ঈসা (আ) যখন খোদার রহ্‌মতে সার্বজনীন ও আন্তর্জাতিক ধারণা সৃষ্টি করিতে চাহিলেন, তিনিও অগত্যা আল্লাহ্‌কে বাপের সহিত উপমিত করিতে বাধ্য হইলেন। এই উপমাই বাহ্য-দৃষ্টিসম্পন্নদের ধোঁকায় ফেলিয়াছে এবং তাহারা ঈসাকে খোদার পুত্র বলিয়া ধারণা করিয়াছে।

কিন্তু এই সকল ধারণা আলোচনার পরে যখন আমরা কুরআনের ধারণার দিকে দৃষ্টি ফিরাই, তখন মনে হয়, সহসা যেন ধ্যান-ধারণার এক নূতন জগৎ উন্মুক্ত হইল। এখানে মানবীয় উপমা-উদাহরণের সকল পর্দা হঠাৎ উন্মোচিত হয়। মানবীয় অনুভূতির আরোপিত আল্লাহ্‌র সব তুলনীয় বস্তু উধাও হয়। প্রতিটি ক্ষেত্রে পরোক্ষ পরিচয় লোপ পাইয়া সত্য পরিচয় ফুটিয়া উঠে। অংশীবাদের আভাসমাত্র বিদ্যমান থাকে না। কুরআনে আল্লাহ্‌র নিরংকুশতা ষোল আনা পূর্ণতা লাভ করে। যেমন ঃ

لَيْسَ كَمِثْلِهٖ شَيْءٌ - (٤٢ : ١١)

—তাঁহার সহিত তুলনীয় হইতে পারে এমন কিছুই নাই। (—সূরা শুরা ঃ আয়াত ১১)

لَا تُدْرِكُهُ الْاَبْصَارُ - وَهُوَ يُدْرِكُ الْاَبْصَارَ - وَهُوَ اللَّطِيْفُ الْخَبِيْرُ - (٦ : ١٠٣)

—মানুষের দৃষ্টি তাঁহাকে দেখিতে পারে না। কিন্তু তিনি মানুষের দৃষ্টি দেখিতে পান। অনন্তর তিনি সূক্ষ্মদর্শী ও সর্বজ্ঞ। (—সূরা আন'আম ঃ আয়াত ১০৩)

قُلْ هُوَ اللّٰهُ اَحَدٌ - اَللّٰهُ الصَّمَدُ - لَمْ يَلِدْ - وَلَمْ يُوْلَدْ - وَلَمْ يَكُنْ لَّهٗ كُفُوًا اَحَدٌ - (١١٢ : ٤ - ١)

—আল্লাহ্‌র সত্তা নিরংকুশভাবে এক । তিনি অভাবমুক্ত স্বয়ংসম্পূর্ণ। তিনি না জন্ম দিয়াছেন, না নিয়াছেন। না কেহ তাঁহার সহিত তুলনীয় হইতে পারে।

(—সূরা ইখলাস ঃ আয়াত ১-৪)

তাওরাত ও কুরআনের যে সব বর্ণনায় মিল রহিয়াছে, গভীর সূক্ষ্মদৃষ্টি লইয়া তাহা অধ্যয়ন করিলে দেখিতে পাইবেন, তওরাতে যেখানে খোদার সরাসরি উপস্থিতির বর্ণনা দান করা হইয়াছে, কুরআন সেখানে শুধু খোদার জ্যোতি প্রকাশের কথা বলিয়াছে। তাওরাতের খোদা যেখানে রূপ ধরিয়া হাযির হইয়াছেন, কুরআন সেখানে ফেরেশতার রূপ ধরিয়া আসার কথা বলিয়াছে। উদাহরণ স্বরূপ একটি স্থানের কথা উল্লেখ করিতেছি। তাওরাতে আছে ঃ

"খোদাওন্দ বলিলেন—হে মূসা ! দেখ, এই স্থান আমার কাছাকাছি স্থান। তুমি ঐ মাঠে দাঁড়াও এবং ব্যাপার এইরূপ ঘটিবে, আমার যখন সেই পথে গমন হইবে, তুমি সেইখানে দাঁড়াইয়া থাকিবে। যখন আমি সেই পথ অতিক্রম করিব, তোমাকে হাতের আড়ালে ঢাকিয়া রাখিব। অতিক্রম করার পরে আমি হাত উঠাইয়া লইব এবং তুমি আমাকে পিছন দিক হইতে দেখিবে—কিন্তু আমার চেহারা দেখিতে পারিবে না।" —(নিষ্ক্রমণ ৩৩/৬)

"তখন খোদাওন্দ মেঘের উপর ভর করিয়া অবতরণ করিলেন এবং তাঁবুর দরজায় দণ্ডায়মায় হইলেন। তিনি বলিলেন—আমার ভৃত্য মূসা খোদার সুরাত দেখিবে।"

এই ব্যাপারটি কুরআন এইভাবে ব্যাখ্যা করিয়াছে ঃ

قَالَ رَبِّ اَرِنِىْ اَنْظُرْ اِلَيْكَ - قَالَ لَنْ تَرٰنِىْ وَلٰكِنِ انْظُرْ اِلَى الْجَبَلِ - (٧ : ١٤٣)

—মূসা বলিল—হে প্রতিপালক ! আমাকে আপনার রূপ প্রদর্শন করুন, যেন আপনাকে দেখিতে পারি। তিনি জবাব দিলেন—তুমি কখনও আমাকে দেখিতে পাইবে না। কিন্তু হ্যাঁ—ওই পাহাড়ের দিকে তাকাও। (—সূরা আ'রাফ ঃ আয়াত ১৪৩)

অবশ্য স্মরণ রাখা উচিত যে, আরবীতে 'তান্‌যীহ' ও 'তা'তীল' শব্দ দুইটির অর্থে বেশ তফাৎ রহিয়াছে। 'তান্‌যীহ্' অর্থ মানুষের জ্ঞান যতখানি পৌঁছিতে সমর্থ, আল্লাহ্‌র গুণাবলিকে ততখানি সৃষ্টি জগতের সর্ববিধ তুলনা হইতে পবিত্র ও উন্নত রাখিবে। আর 'তা'তীল' অর্থ হইল অতুলনীয়তাকে এত উর্ধ্বে তুলিয়া ধরা যে, মানুষের চিন্তার নাগালের যেন বাহিরে চলিয়া না যায়। কুরআন খোদার অতুলনীয়তাকে পূর্ণতায় পৌঁছাইয়াছে কিন্তু তাহা মানুষের চিন্তার নাগালের বাহিরে শূন্যতায় নিয়া ঠেকায় নাই।

ইহা নিশ্চিত সত্য যে, উপনিষদের 'নেতি নেতি'[২০] বহুদূর পর্যন্ত চলিয়া গিয়াছে। কিন্তু কার্যত ফল কি দাঁড়াইয়াছে ? ফল এই যে, নিরংকুশ ব্রহ্ম সত্তাকে ঈশ্বরের বিশেষ রূপে না নামাইয়া গত্যন্তর দেখিতে পায় নাই।

---

২০. 'নেতি নেতি' অর্থ না-বাচক পদ এরূপও নহে, ওরূপও নহে। উপনিষদে এই না-সূচক পদের ধারা অনেক দূর পর্যন্ত চলিয়া গিয়াছে। তিনি স্থূল। না। তিনি সূক্ষ্ম ? না। তিনি সরু ? না । তিনি লম্বা ? না । মোটকথা, যে-কোন উপমা উদাহরণ অস্বীকার করিতে থাকে। তিনি না এরূপ, না ওরূপ। তবে তিনি কিরূপ ? কোন রূপই নহেন অর্থাৎ তাহার ধারণার ক্ষেত্রে মহাশূন্যতা বিরাজ করে।

যেভাবে গুণের আরোপ বাড়াবাড়ির দিকে লইয়া যায়, তেমনি উহার অস্বীকারও অচলাবস্থার সৃষ্টি করে। দুইটি ক্ষেত্রেই মানুষের চিন্তাধারার স্খলন দেখা দেয়। বিশেষ গুণের আরোপ যদিও খোদার সত্যরূপ হইতে মানুষকে দূরে সরাইয়া নেয়, শূন্যতা মানুষকে বিশ্বাসের প্রাণ-শক্তি হইতেই বঞ্চিত করে। এখানে দুইদিকেই বাড়াবাড়ি মারাত্মক। সুতরাং মাঝামাঝি পন্থাই উত্তম। বস্তুত কুরআন যে পথ অনুসরণ করিয়াছে, তাহা উভয় মতের মধ্যবর্তী পথ। উভয় চরম পন্থার আকর্ষণ হইতে ইহা মুক্ত।

আল্লাহ্ সম্পর্কে ধারণার জন্য যদি তাঁহার কোন গুণ বা কাজ মানুষের চিন্তার নাগালে না থাকে, তাহার ফল কি দাঁড়ায় ? তাহার ফল দাঁড়াইবে এই, অতুলনীয়তার এই চরম রূপ অস্তিত্বহীনতা ডাকিয়া আনিবে। অর্থাৎ যদি বলা হয়, আল্লাহ্র জন্য আমরা কোন গুণই কল্পনা করিতে পারি না। কারণ যে গুণই কল্পনা করিব, তাহা মানবীয় চিন্তাপ্রসূত হওয়ায় সৃষ্টি জগতের কোন কিছুর সহিত তুলনীয় হইয়া দাঁড়াইবে। এইরূপ বক্তব্যের স্পষ্ট পরিণতি এই দাঁড়াইবে যে, মানুষের আল্লাহ্ সম্পর্কে ধারণা সৃষ্টির কোন পথই থাকিবে না। সুতরাং মানুষের চিন্তা হইতে আল্লাহ্র অস্তিত্বই লোপ পাইবে। কারণ ইহা নহে, উহা নহে, তাহা নহে এবং কোন কিছুই নহে—ইত্যাকার 'না'সূচক চিন্তার অবাধ স্রোত প্রতিপাদ্যকেও 'না'-এর পর্যায়ে ফেলিতে বাধ্য। কারণ মানুষের চিন্তা তখন খেই হারায় এবং এমন কোন সম্বল পায় না যাহাকে আঁকড়াইয়া বিশ্বাসটি জমাইয়া তুলিবে।

মানুষের অন্তর্নিহিত দাবির সম্পূরক হইল খোদা-বিশ্বাস। প্রাণী জগতে শ্রেষ্ঠত্ব অর্জন ও মানবিকতার পূর্ণ বিকাশ সাধনের জন্য মানুষকে উন্নত জীবনের কয়েকটি মূলনীতি অনুসরণ করিতে হয়। আর সেই মূলনীতির চাহিদাই মানুষের অন্তরে সৃষ্টি হয় না, যতক্ষণ না কোন ঊর্ধ্বতন শক্তি সর্বময় ক্ষমতার দণ্ড লইয়া মানুষের সামনে উপস্থিত হয়। কিন্তু মুশকিল এই, কোন লাগামছাড়া অবিশেষিত কিছুর ধারণা মানুষের সামনে ধরা দেয় না। যখনই মানুষ তাহা ধারণা করিতে যাইবে, তখন কোন কোন বিশেষ গুণ বা রূপের আবরণে তাহাকে গ্রহণ করিবে। বস্তুত সর্বদা এরূপ আবরণেই সত্যের সৌন্দর্য অবলোকন করিতে হইয়াছে। এই আবরণ কখনও পুরু আর কখনো পাতলা হইয়াছে, কখনও জমকালো ও ভয়াবহ এবং কখনও আবার অত্যন্ত আকর্ষণীয় হইয়াছে। কিন্তু এই আবরণ কখনও খুলিয়া পড়ে নাই।

اه ازان حوصله تنگ وازان حسن نلند

که دلم راگله از حسرت دیدار تو نیست

সত্যের সৌন্দর্য তো আবরণহীন কিন্তু আমাদের দৃষ্টিশক্তির অভাব। আমরা নিজেদের চোখে আবরণ দিয়া তাহাকে দেখিতে চাই আর মনে করি যে, তাঁহার চেহারাই আবরণে ঢাকা।

কোন গুণের ধারণা ছাড়া মানুষের চিন্তায় কোন অস্তিত্ব ঠাঁই পাইতে পারে না। তাহারা এমন কিছু চাহে, যাহা তাহাদের ধারণায় আসিতে পারে। মানুষ স্বভাবত এমন এক প্রিয় শক্তির কামনা করে, যাঁহার প্রেমে তাহার অন্তর সঁপিয়া দিতে পারে, যাঁহার সৌন্দর্য প্রভার পিছনে সে উন্মাদ হইয়া ছুটিতে পারে, যাঁহার শ্রেষ্ঠত্বের কাছে নিজের দুর্বল যুক্ত কর প্রার্থনারত করিতে পারে এবং তিনি যতই উর্ধ্বে থাকুন না কেন, সর্বদা বান্দার দিকে লক্ষ্য রাখেন। যেমন ঃ

اِنَّ رَبَّكَ لَبِالْمِرْصَادِ - (٨٩ : ١٤)

—নিশ্চয়ই তোমাদের প্রভু তোমাদের দিকে সদা জাগ্রত দৃষ্টিতে তাকাইয়া আছেন। (—সূরা ফজর ঃ আয়াত ১৪)

وَاِذَا سَاَلَكَ عِبَادِىْ عَنِّىْ فَاِنِّىْ قَرِيْبٌ - اُجِيْبُ دَعْوَةَ الدَّاعِ اِذَا دَعَانِ - (٢ : ١٨٦)

—যখন আমার বান্দা তোমার কাছে আমার কথা জিজ্ঞাসা করে তখন তাহাদের বলিও, আমি সর্বদা তাহাদের পাশেই আছি। কেহ ডাকা-মাত্রই আমি সাড়া দিয়া থাকি। (—সূরা বাকারা ঃ আয়াত ১৮৬)

در پرده وپرهمبه کس پرده می دری
باهرکسی و باتو کسے را وصال نیست !

তুমি সকলের কাছেই আছ অথচ মিলিতে পারে না কেহ তোমার সাথে। তুমি সকলকেই দেখ অথচ তোমাকে দেখে না কেহই।

গুণের ধারণাহীন কল্পনা শুধু শূন্যতার সৃষ্টি করে। তাহাতে মানুষের মনের দাবি মিটাইতে পারে না। এরূপ চিন্তা একটা দর্শন হইয়া দেখা দিতে পারে কিন্তু প্রাণকে সঞ্জীবিত ও সক্রিয় করিয়া তুলিতে পারে না। তাই উহাকে ভিত্তি করিয়া কখনো আল্লাহ্-বিশ্বাস গড়িয়া উঠিতে পারে না।

এই কারণেই কুরআনের অনুসৃত পথে একদিকে অতুলনীয়তাকে চরমে পৌছানো হইয়াছে। অপরদিকে শূন্যতা সৃষ্টির হাত হইতেও তাহাকে বাঁচাইয়া রাখা হইয়াছে। কুরআন এক এক করিয়া আল্লাহ্র সর্ববিধ গুণ ও কাজ প্রমাণ করিয়া যায় এবং সঙ্গে সঙ্গে উহার অতুলনীয়তাকে দৃঢ়ভাবে প্রতিষ্ঠা করিয়া চলে। কুরআন বলে, মানুষের কল্পনায় যতখানি ভাল ও সুন্দর দেখা দিতে পারে, আল্লাহ্র তাহা আছে। তিনি চিরজীবী, সর্বশক্তিমান, প্রতিপালক, দয়ালু, দ্রষ্টা, শ্রোতা ও সর্বজ্ঞ। শুধু তাহাই নহে, পরন্তু মানুষের ভাষায় শক্তির, অধিকারের, ইচ্ছার ও কাজের যতগুলি ভাল ব্যাখ্যা হইতে পারে, সবই বিনাদ্বিধায় তাঁহার ক্ষেত্রে ব্যবহার করিতে পারি। যেমন আল্লাহ্র হাত সংকীর্ণ নহে বরং তাঁহার হাত দুইটি অত্যন্ত উদার ও প্রশস্ত।' তাঁহার হাতের নাগালের বাহিরে কোন এলাকাই থাকিতে পারে না। 'নভোমণ্ডলী ও পৃথিবীর সবকিছু

জুড়িয়া আছে তাঁহার আসন।' সঙ্গে সঙ্গে বলা হইয়াছে, 'উহা বেনজীর ও অতুলনীয়।' কারণ, তাঁহার মত কেহই নাই। 'তোমাদের সংকীর্ণ দৃষ্টি তাঁহার নাগাল পাইতে পারে না।' তাই 'তোমার খেয়াল-খুশিমত তাঁহার উপমা-উদাহরণ জগৎ হইতে গ্রহণ করিও না।'

সুতরাং স্পষ্ট জানা গেল, তাঁহার জীবন অন্য কাহারো জীবনের মত নহে। তাঁহার প্রতিপালন আর আমাদের প্রতিপালন এক নহে। তাঁহার দেখা-শোনা-জানা আমাদের অনুরূপ নহে। তাঁহার ক্ষমতা ও দানের হস্ত এবং প্রভাব ও আসনের অস্তিত্ব আছে ঠিকই। কিন্তু সেইগুলি প্রকাশের জন্য ব্যবহৃত বাক্যের মাধ্যমে আমরা তাঁহার যথাযথ রূপ বুঝিতে পারি না।

কুরআনের আল্লাহ্ সম্পর্কিত ধারণার এই ধরনটি এই পথের সব অচলাবস্থার অবসান ঘটাইয়াছে। আজীবন সাধনা চালাইয়া এক্ষেত্রে যে মীমাংসায় পৌঁছা যায়, ইহা যেন তাহাই। মানুষের চিন্তার যতই চর্চা ও উৎকর্ষ দেখা দেউক না কেন, ইহা ব্যতীত অন্য কোন সিদ্ধান্তে পৌঁছিতে পারিবে না। এখানে একদিকে সত্যের চরম বিশালতা ও উচ্চতা, অন্যদিকে চিন্তার অত্যন্ত সংকীর্ণতা ও সীমাবদ্ধতা। আরেক দিকে আছে আমাদের স্বভাবের অনন্ত পিপাসা ! লক্ষ্যবস্তু এত উর্ধ্বে যে, আমাদের দৃষ্টি সেদিকে তাকাইতে গিয়া স্থির হইয়া যায়। অথচ দেখার বাসনা এত তীব্র যে, কোন কিছুর প্রভাব না দেখা পর্যন্ত স্থির হওয়া যায় না।

نه به اندازه باز وست کمندم هیهات
ورنه با گوشه بامیم سروکارے رهست !

একদিকে দুর্গম পথের অশেষ প্রতিবন্ধক, অপরদিকে ব্যাকুল কামনা।

ملنا ترا اگر نهین انسان توسهل هے
دشوار تو یهی هے که دشوار بهی نهین هے !

তোমার মিলন সহজ হইয়াও সহজসাধ্য নয়,
কঠিন তো এই কারণে যে উহা কঠিন নয়।

যদি অতুলনীয়তার দিকে ঝোঁক বেশি আসে, শূন্যতায় গড়াইয়া যায়। আবার যদি অতুলনীয় গুণের আরোপ শুরু করে, তাহা হইলে উভয়ের মাঝখানে পাও সামলাইয়া রাখা দায়। গুণারোপের আঁচলও ছাড়িবে না অথচ অতুলনীয়তায়ও শৈথিল্য দেখা দিবে না। মনের আকৃতি রঙ্-বেরঙের নামে ডাকিতে থাকিবে, অতুলনীয়তার সতর্ক দৃষ্টি তাহাকে প্রাকৃতিক উপমা-উদাহরণের কবল হইতে বাঁচাইয়া চলিবে। এক হাতে অনাবিল ও অনন্ত সৌন্দর্যকে বিভিন্ন রূপে দেখিবার প্রয়াস চালাইবে, অপর হাত উহা হইতে এত উর্ধ্বে রাখিয়া চলিবে যে, পার্থিব তুলনার কোন ধূলা-বালি তাহাকে কলুষিত না করে।

بر چهره حقیقت اگر ماند پرده
جرم نگاه دیده صورت پرست ما ست !

সত্য ও সুন্দরের উপরে যদি কোনরূপ পর্দা দেখা যায়, তাহা আমাদের দৃষ্টির ত্রুটি। কেননা আমাদের দৃষ্টি সৌন্দর্যকে বিশেষ রূপ দান করিয়া অর্চনা করে।

উপনিষদের লেখকদের গুণাবলী অস্বীকারের ভিতরে বাড়াবাড়ি পরিলক্ষিত হয়। কিন্তু মুসলমানদের ভিতরে যখন বিভিন্ন মতের ধর্মবিশ্বাস বিশ্লেষকদের আবির্ভাব ঘটিল, তখন তাঁহাদের গবেষণার কসরৎ উপনিষদকেও ছাড়াইয়া সামনে আগাইয়া গেল। তখন খোদার গুণাবলির প্রশ্নটি এক বিরাট ঝগড়া ও মতানৈক্যের কারণ হইয়া দাঁড়াইল। 'জুহ্‌মিয়া' ও 'বাতেনিয়া' দল গুণাবলি অস্বীকারের দিকে গিয়াছেন। মু'তাজিলারা পুরোপুরি অস্বীকার না করিলেও সেইদিকে তাহাদের লক্ষ্য দেখা যায়। আবুল হাসান আশ্'আরী নিজে অস্বীকার না করিলেও (কিতাবুল ইশারা দ্রষ্টব্য) তাঁহার শিষ্যরা গুণাবলির বর্ণনায় অনেক দূরে চলিয়া গিয়াছেন এবং গবেষণা ও বিতর্কের ভিতরে বাড়াবাড়ির পরিচয় দিয়াছেন। তাঁহাদের কেহই নিজ সৃষ্ট জটিলতার গ্রন্থি উন্মোচন করিতে পারেন নাই। কুরআনের বক্তব্যই অবশেষে তাঁহাদের অবলম্বন ছিল। ইমাম জুহমী এই সত্যটি স্বীকার করিয়া পৃথিবী হইতে বিদায় লইয়াছেন—আমার মাতা যে ধর্ম বিশ্বাসে আমাকে গড়িয়া তুলিয়াছেন, তাহা লইয়াই দুনিয়া ছাড়িয়া চলিলাম।'

আশ্'আরীদের ভিতরে ইমাম ফখরুদ্দীন রাযী এই ব্যাপারে সর্বাধিক মাথা ঘামাইয়াছিলেন। তিনিও জীবনের শেষভাগে রচিত গ্রন্থে স্বীকার করিয়া গিয়াছেন ঃ

'ধর্ম শাস্ত্র ও দর্শনের সব পদ্ধতিই খুব ভালভাবে অধ্যয়ন করিলাম। অবশেষে জানিতে পাইলাম, তাহাতে না কোন রোগের দাওয়াই আছে, না কোন তৃষ্ণার্তের তৃষ্ণা মিটাইবার ব্যবস্থা আছে। সর্বোত্তম ও সবচাইতে খাঁটি ও সরল পথ শুধু কুরআনেই দেখিতে পাই। বিশেষণ আরোপের ব্যাপারটি পাঠ কর—'শ্রেষ্ঠতম দয়ালু আরশের উপরে স্থিরভাবে বিরাজমান' আবার বিশেষণ লোপের ব্যাপারটি দেখ—'তাঁহার সহিত উপমিত হইতে পারে, এমন কিছুই নাই'। অর্থাৎ 'হ্যাঁ-না' দুইটিই দৃঢ়ভাবে আঁকড়াইয়া থাকে। আমার ধারণা, এই ব্যাপারে যাহার পাকাপাকি অভিজ্ঞতা লাভের সুযোগ ঘটিয়াছে, সে আমার মতই এই সত্যটি উপলব্ধি করিতে পারিয়াছে।'

এই কারণেই হাদীসশাস্ত্রের পূর্বসূরিগণ এই ব্যাপারটি যথাযথ অবস্থায় ছাড়িয়া দেওয়ার (তাফ্‌ভীজ)[২১] পন্থা অনুসরণ করিয়াছেন এবং ইহা লইয়া মাথা ঘামানো ও বিভিন্ন রূপ ব্যাখ্যা সৃষ্টির প্রয়াসকে অপসন্দ করিয়াছেন। এই কারণেই জুহ্‌মিয়াদের বিশেষণ অস্বীকারকে তাঁহারা তা'তীল বা অচলাবস্থা সৃষ্টির প্রয়াস বলিয়া অভিহিত

২১. তাফ্‌ভীজ নীতি হইল এই যে, যেই তত্ত্ব আমাদের কার্যক্ষেত্র ও উপলব্ধি পরিধির বাহিরে অবস্থিত, তাহা লইয়া অনর্থক মাথা না ঘামাইয়া স্বীয় অক্ষমতা ও বিনয় প্রকাশ করা।

করিয়াছেন। তাঁহারা মু'তাজিলা ও আশ'আরীদের ব্যাখ্যা আবিষ্কারের প্রয়াসের ভিতরেও অচলাবস্থার আভাস দেখিতে পাইয়াছেন। এই ধর্মবিশ্বাস বিশ্লেষক-গোষ্ঠী হাদীস শাস্ত্রবিদদের খোদা রূপ কল্পনা ও উপমা গ্রহণরূপ শিরকের দায়ে অভিযুক্ত করিয়াছেন। হাদীসশাস্ত্রবিদরা তাহার জবাবে বলেন, এই তথাকথিত শিরক তোমাদের শূন্যতা ও অচলাবস্থা সৃষ্টি হইতে অনেক ভাল। কারণ এখানে বিশ্বাস স্থাপনের অন্তত সূত্র মিলে। অথচ তোমাদের গবেষণার ধূম্রজালে রচিত শূন্যতায় তো বিশ্বাস স্থাপনের কোন সূত্রই খুঁজিয়া পাওয়া যায় না। পরবর্তীকালের হাদীস শাস্ত্রকারগণের মধ্যে ইমাম ইব্‌নে তাইমিয়া ও তাঁহার শিষ্য ইমাম ইব্‌নে কাইয়েম এই প্রশ্নের গভীরতাকে ভালভাবে উপলব্ধি করিয়াছেন। তাই তাঁহারা পূর্বসূরিদের অনুসৃত নীতির কিছুমাত্র এদিক-ওদিক করেন নাই।

আর্য ও সিরীয় দৃষ্টিভঙ্গির পার্থক্য

এই ব্যাপারে কুরআনের সহিত আর্যদের ও প্রাচীন সিরীয়দের দৃষ্টিভঙ্গির পার্থক্য লক্ষ করিতে পারি। আর্য দর্শন মানব-প্রকৃতির রূপ-অর্চনার যে চাহিদার জবাবে মূর্তিপূজার দ্বার উন্মুক্ত করিয়াছে, কুরআন সেজন্য শুধু গুণের বিন্যাসই যথেষ্ট মনে করিয়াছে। এই স্তরের নিম্নে অবতরণ পূর্ণভাবে নিষিদ্ধ করিয়াছে। ফল এই দাঁড়াইল, সর্ব অনাচার সৃষ্টির দ্বার রুদ্ধ হইল অর্থাৎ মূর্খতাপ্রসূত প্রতিমা পূজার যে অনাচার ভারতে সৃষ্টি হইয়াছে তাহার পথ বন্ধ হইল।

মুহ্‌কামাত ও মুতাশাবিহাত (সরল ও রূপক)

কুরআন নিজ বাণী প্রকাশের ক্ষেত্রে দুই মৌলিক রীতি অবলম্বন করিয়াছে। একটিকে বলা হয় 'মুহ্‌কামাত' অর্থাৎ যাহার অর্থ মানুষ সোজাসুজি বুঝিতে পারে এবং উহা মানুষের বাস্তব জীবনে অনুসরণযোগ্য বিধিনিষেধমূলক বাণী। তাই উহাতে একাধিক অর্থের স্থান নাই। আরেকটি 'মূতাশাবিহাত' অর্থাৎ যাহার মর্মোদ্ধার মানুষের সাধ্যাতীত রাখা হইয়াছে। সেক্ষেত্রে মানুষকে কিছু দূর অগ্রসর হইতে না হইতেই স্তব্ধ হইতে হয়। মর্মোদ্ধারের প্রয়াস সেখানে নিষ্ফল হইয়া দাঁড়ায়।

هُوَ الَّذِىْ اَنْزَلَ عَلَيْكَ الْكِتَابَ مِنْهُ اٰيٰتٌ مُّحْكَمَاتٌ هُنَّ اُمُّ الْكِتَابِ وَاُخَرُ مُتَشَابِهَاتٌ - فَاَمَّا الَّذِيْنَ فِىْ قُلُوْبِهِمْ زَيْغٌ فَيَتَّبِعُوْنَ مَا تَشَابَهَ مِنْهُ ابْتِغَاءَ الْفِتْنَةِ وَابْتِغَاءَ تَاوِيْلِهٖ - وَمَا يَعْلَمُ تَاوِيْلَهٗ اِلاَّ اللّٰهُ - وَالرَّاسِخُوْنَ فِى الْعِلْمِ يَقُوْلُوْنَ اٰمَنَّا بِهٖ كُلٌّ مِّنْ عِنْدِ رَبِّنَا - وَمَا يَذَّكَّرُ اِلاَّ اُوْلُوْا الْاَلْبَابِ - (٣ : ٧)

—সেই প্রভুই তোমার উপরে গ্রন্থ অবতীর্ণ করিয়াছেন। উহাতে সহজ বিধানাবলি রহিয়াছে। সেইগুলিই গ্রন্থের মূল বিষয়বস্তু। অবশিষ্টগুলি রূপক। যাহাদের অন্তর কুটিল তাহারা সেইগুলির ভিতরে বিরোধ সৃষ্টির উপাদান খুঁজে এবং নানাবিধ

ব্যাখ্যা আবিষ্কার করে। মূলত আল্লাহ্ ছাড়া সেইগুলির ব্যাখ্যা কাহারো জানা নাই। যাহারা সুস্থির জ্ঞানী, তাহারা সোজাসুজি বলিয়া দেয়, আমরা এইগুলিকে আল্লাহ্‌র বাণী বলিয়া বিশ্বাস করি। অনন্তর জ্ঞানী লোক ছাড়া কুরআনের এই সব উপদেশ কাহারও কল্যাণে আসে না। (—সূরা আল ইমরান ঃ আয়াত ৭)

আল্লাহ্‌র গুণাবলির তত্ত্ব এই রূপক বাণীগুলির অন্তর্ভুক্ত। তাই কুরআন বলে, এই ব্যাপারে কপোল-কল্পনা আদৌ ফলপ্রসূ হয় না। পরন্তু, নানাবিধ জটিলতার সৃষ্টি করে। এক্ষেত্রে 'তাফ্‌ভীজ' ছাড়া গত্যন্তর নাই। সুতরাং আমাদের ধর্মবিশ্বাস বিশ্লেষক গোষ্ঠী এই ব্যাপারে যত মাথা ঘামাইয়াছেন, তাহা আদৌ কুরআনের শিক্ষার অনুকূল নহে।

১. উপনিষদের বিশেষণমুক্ত ও বিশেষণমুক্ত স্তর

এখানে এই ব্যাপারটিও পরিষ্কার হওয়া দরকার যে, বেদান্ত সূত্র এবং উহার শ্রেষ্ঠতম ব্যাখ্যাদাতা 'শংকর আচার্য' খোদার ধারণাকে বিশেষণমুক্ত রাখার উপরে যেখানে জোর দিয়াছেন সেই স্তরকে তিনি 'ব্রহ্ম' স্তর বলিয়া আখ্যায়িত করিয়াছেন। কিন্তু তিনি ইহাও স্বীকার করিয়াছেন যে, এই নিরাকার ও অবিশেষিত ব্রহ্মের আরেকটি নিম্নতর স্তর রহিয়াছে। সেখানে সব গুণই আরোপিত হইতে পারিবে এবং উপাসকদের ধ্যান-ধারণার উপাস্য প্রভু সেই সর্বগুণান্বিত প্রভু।

উপনিষদে অবিশেষিত সত্তা 'নিরূপাধিকান্ত' ও 'নির্গুণ'। অর্থাৎ প্রাকৃতিক সব উপমা তুলনা বিমুক্ত এবং যে কোন প্রকার গুণের আরোপ হইতে মুক্ত। যদি কোন গুণ আছে বলিয়া ধারণা করা যায়ও, তাহা হইলে নির্গুণ গুণ বা অবিশেষত্বের বৈশিষ্ট্য। "আমরা তাঁহার সম্পর্কে কিছুই বলিতে পারি না। কারণ বলিতে গেলেই আমরা অপরিহার্যভাবে অসীমকে সসীম করিয়া ফেলিব। যদি সসীমেরও অসীম ধারণা করা সম্ভবপর হয়, তাহা হইলেও হয়তো সসীমকে অসীম এবং অসীমকে সসীম ধারণা করিয়া বসিব" (শঙ্করভাষ্য ব্রহ্মসূত্র—৩য় অধ্যায়)। 'আমরা কোন কিছুর দিকে ইশারা করিয়া যে কথা বলি, তাহা হয় সেই বস্তুর বিশেষ কোন ধরন সম্পর্কে বলি কিংবা উহার কোন বিশেষ কাজের উল্লেখ করি ইত্যাদি। কিন্তু ব্রহ্মকে কোন বিশেষ ধরন কিংবা কাজের ভিতরে আমরা সীমিত করিতে পারি না। আমরা বলিতে পারি না যে, তিনি এইরূপ নহেন। কারণ তিনি কোন কিছুর সহিতই তুলনীয় নহেন। সুতরাং তাঁহার সেই অতুলনীয়তা ও পার্থক্য মানুষের ধারণায় আসিতে পারে না। উপমা বা তুলনার মত অতুলনীয়তার ধারণাও আপেক্ষিক হইয়া দেখা দেয়' (উপনিষদ ১ম ও ২য় অধ্যায়)।

স্থূল কথা মূল সত্য সংজ্ঞার উর্ধ্বে এবং দর্শন ও তর্কশাস্ত্রের বস্তু নিরপেক্ষতার চাইতেও নিরপেক্ষ। তাই বেদান্তসূত্র মৌলিকভাবে উহার দুইটি স্তর স্থির করিয়াছে। একটি কল্পনাসাধ্য এবং অপরটি কল্পনাতীত। কল্পনাসাধ্যটি হইল প্রকৃতি। উহা মৌলিক

উপাদান, ধীশক্তি, জ্ঞান ও ব্যক্তিত্বের সমাবেশে সৃষ্ট। ধারণাতীত স্তরটি হইল ব্রহ্ম বা নিরাকার ও নির্গুণ সত্তা। এই মতই আলেকজান্দ্রিয়ার নিউপ্লেটোনিক মতবাদে দেখা যায়। ইসলামের মনীষী ও অধ্যাত্মবাদিগণও এই মত গ্রহণ করিয়াছেন। সূফীবাদিগণ মৌল ও নির্গুণ সত্তাকে 'আহাদিয়াত' নাম দিয়াছেন এবং বলিয়াছেন যে, এই স্তর মানুষের কল্পনাতীত ব্যাখ্যার ঊর্ধ্বে ও সর্বতোভাবে বস্তু নিরপেক্ষ।

بنام ان که ان نامے نه دارد

به هر نامے که خوانی ، سربر ارد !

তার নামে শুরু করিলাম যার কোন নামই নেই
যে নামেই ডাকি, তার ঠিকানায় পৌছে যায়।

কিন্তু এই অবিশেষিত নিরাকার স্তর আবার এরূপ এক স্তরে অবতীর্ণ হয়, যেখানে সর্বগুণের আরোপে এক পরিপূর্ণ রূপ-কল্পনা সম্ভব হয়। উপনিষদ উহাকে 'ঈশ্বর' নাম দিয়াছে। আর সূফীরা উহার নাম দিয়াছে 'ওয়াহ্‌দিয়াত'। বেদান্ত সূত্রের ব্যাখ্যাকারদের ভিতরে শংকরই সব চাইতে বেশি চাহিয়াছেন উপনিষদের 'নির্গুণ' রীতি বহাল রাখিতে এবং এই ব্যাপারে তিনি যথেষ্ট মাথা ঘামাইয়াছেন। কিন্তু তাঁহাকেও অবশেষে 'সগুণ ব্রাহ্মণ' অর্থাৎ ব্যক্তিত্ব ও বৈশিষ্ট্যময় খোদা মানিতে হইয়াছে। যদিও এই স্তরের উপনিষদের অনুসারীকে তিনি অপূর্ণ বা নিম্নমানের উপাসক আখ্যা দিয়াছেন। অবশ্য সঙ্গে সঙ্গে তিনি ইহাও স্বীকার করেন যে, একজন উপাস্যের অস্তিত্ব এই পথে ছাড়া কল্পনা করা যায় না এবং মানুষের জ্ঞান ও অনুভূতি খুব বেশি হইলে এই স্তর পর্যন্তই উঠিতে পারে। (শংকর ভাষ্য)

২. দয়া ও সৌন্দর্যগুণ

দ্বিতীয়ত, অতুলনীয়তা ও নিরাকার গুণের মত দয়া ও সৌন্দর্যগুণ সম্পর্কিত কুরআনী ধারণার উপরেও চক্ষু বুলাইয়া দেখা যাইতে পারে যে, সেখানেও পূর্ণতার শান পুরোমাত্রায় বিরাজমান। কুরআন অবতীর্ণ হইবার প্রাক্কালে ইহুদী ধারণায় গোসা ও গজবের উপাদান অধিক ছিল। মজুসী ধারণায় আলো ও আঁধার নামে দুইটি পৃথক সত্তা জন্ম নিয়াছিল। ঈসায়ী ধারণায় দয়া ও প্রেমের জোর বেশি ছিল। অথচ ইন্‌সাফের তত্ত্বটি পুরোপুরি অবলুপ্ত ছিল। এই ভাবে বুদ্ধের অনুসারীরাও দয়া ও প্রেমের উপর জোর দিতেছিল। প্রতিদানের উল্লেখ কোথাও ছিল না। মনে হইত যেন, দয়া ও সৌন্দর্যের যে ধারণা ছিল তাহাতে ক্রোধ ও প্রতিশোধ স্পৃহার উপাদান বেশি ছিল কিংবা সমান ছিল। পরে যখন দয়া ও প্রেম আসিল, তখন ইন্‌সাফও ভাসাইয়া নিল !

কিন্তু কুরআন দয়া ও সৌন্দর্যের এরূপ একটি পূর্ণাঙ্গ চিত্র দান করে যে, একদিকে তাহাতে যেমন ক্রোধ ও প্রতিশোধ স্পৃহার স্থান নাই ; অপরদিকে ইন্‌সাফ ও কর্মফলের বাগডোরও হাতছাড়া করে নাই। কারণ কর্মফলের ধারণা তো আর ক্রোধ

বা প্রতিশোধ স্পৃহার ভিত্তিতে জন্মে না ; বরং ইন্‌সাফের ভিত্তিতে জন্মে। বস্তুত আল্লাহ্‌র গুণ সম্পর্কে কুরআনের ঘোষণা এই ঃ

قُلِ ادْعُوا اللّٰهَ اَوِ ادْعُوا الرَّحْمٰنَ - اَيًّا مَّا تَدْعُوْا فَلَهُ الْاَسْمَاءُ الْحُسْنٰى - (٧ : ١١٠)

—হে রাসূল ! তাহাদিগকে জানাইয়া দাও; তোমরা আল্লাহ্ নামেই ডাক আর রহ্‌মান নামে ডাক, যেই গুণবাচক নামেই ডাক না কেন, সব উত্তম নামের তিনিই অধিকারী। (—সূরা বনী ইসরাঈল ঃ আয়াত ১১০)

অর্থাৎ কুরআন আল্লাহ্‌র সকল গুণবাচক নামকেই ভাল নাম আখ্যা দিয়াছে। ইহাতে জানা গেল যে, আল্লাহ্‌র এমন কোন নাম নাই যাহা ভাল নহে বা সুন্দর নহে। এই গুণগুলি কি কি ? কুরআন পূর্ণ ব্যাপ্তির সহিত সেইগুলি বিভিন্ন স্থানে উল্লেখ করিয়াছে। তন্মধ্যে এমন গুণও রহিয়াছে যাহাতে বাহ্যত ক্রোধ ও ক্রোপ প্রকাশ পায়। যেমন জব্বার ও কাহ্‌হার। কিন্তু কুরআন উহাকেও সুন্দর নাম বলিয়াছে। কারণ উহাতে ইনসাফ ও ক্ষমতার প্রকাশ ঘটিয়াছে। ইন্‌সাফ ও ক্ষমতা অবশ্যই ভাল ও সুন্দর গুণ। উহাতে ভয়াবহতা বা রক্তলোলুপতার আভাস মাত্র নাই। বস্তুত সূরা 'হাশরে' দয়া ও সৌন্দর্য গুণের সহিত ক্রোধ ও শক্তিমত্তার উল্লেখ রহিয়াছে। তারপর এইগুলিকে একত্রে ভাল নাম আখ্যা দেওয়া হইয়াছে।

هُوَ اللّٰهُ الَّذِىْ لَا اِلٰهَ اِلَّا هُوَ - اَلْمَلِكُ الْقُدُّوْسُ السَّلَامُ الْمُؤْمِنُ الْمُهَيْمِنُ الْعَزِيْزُ الْجَبَّارُ الْمُتَكَبِّرُ سُبْحَانَ اللّٰهِ عَمَّا يُشْرِكُوْنَ هُوَ اللّٰهُ الْخَالِقُ الْبَارِئُ الْمُصَوِّرُ لَهُ الْاَسْمَاءُ الْحُسْنٰى يُسَبِّحُ لَهُ مَا فِى السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ وَهُوَ الْعَزِيْزُ الْحَكِيْمُ . (٥٩ : ٢٣ - ٢٤)

—তিনিই আল্লাহ্ ! তিনি ছাড়া কেহই উপাস্য নাই। তিনি মালিক, তিনি কুদ্দুস, তিনি সালাম, তিনি মু'মিন, তিনি মুহাইমিন, তিনি আজিজ, জব্বার, মুতাকাব্বির এবং মানুষ তাঁহার সঙ্গে যাহাদের উপাসনায় শরীক করে, তিনি তাহাদের হইতে মুক্ত ও পবিত্র। তিনি খালিক, তিনি বারী, তিনি মুসাব্বির। এক কথায়, তাঁহারই জন্য যতসব সুন্দর ও ভাল নাম। আসমান ও যমীনে যত সৃষ্ট বস্তু রহিয়াছে, সবাই তাহার পবিত্র নাম জপনা করিতেছে, তাঁহার শ্রেষ্ঠত্বের সাক্ষ্যদান করিতেছে। নিঃসন্দেহে তিনিই বিজ্ঞ ও সর্বজয়ী।' (—সূরা হাশর ঃ আয়াত ২৩-২৪)

এইভাবে সূরা আ'রাফে বলা হইয়াছে ঃ

وَلِلّٰهِ الْاَسْمَاءُ الْحُسْنٰى فَادْعُوْهُ بِهَا - وَ ذَرُوا الَّذِيْنَ يُلْحِدُوْنَ فِىْ اَسْمَائِهٖ - (٧ - ١٨٠)

—আর আল্লাহ্ তা'আলার জন্য সুন্দর ও ভাল নাম রহিয়াছে। সুতরাং সেই সব গুণবাচক নামে তাঁহাকে ডাকা উচিত। আর যাহাদের স্বভাব সেইসব গুণের ভিতরে বাড়াবাড়ি করিতে চাহে, তাহাদের নিজ নিজ অবস্থায় থাকিতে দাও।[২২] (—সূরা আ'রাফ ঃ আয়াত ১৮০)

বস্তুত এইজন্যই সূরা 'ফাতিহায়' মাত্র তিনটি গুণ প্রকাশ পাইয়াছে। রবুবিয়াত. রহ্মত ও আদালত। সেখানে কহর ও গজবের কোন গুণ স্থান পায় নাই।

৩. শিরকের মূলোৎপাটন

তৃতীয়ত, একত্ববাদ ও অংশীবাদের ব্যাপারে কুরআনের ধারণা এতখানি দ্ব্যর্থহীন ও পরিপূর্ণ যে, পূর্ববর্তী কোন ধারণায়ই তাহার তুলনা মিলে না।

যদি আল্লাহ্ মৌল সত্তায় একক ও লা-শরীক হন, গুণের জগতেও তিনি একক ও অতুলনীয় হইবেন। তাঁহার একত্বের মর্যাদা রক্ষিত হইতে পারে না যদি না তাঁহার গুণের সহিত অন্য কোন সত্তা তুলনীয় হয় কিংবা অংশীদার হয়। কুরআনের আগে একত্ববাদের 'হ্যাঁ'-সূচক দিকটির উপরে তো সবাই জোর দিয়াছিল কিন্তু না-বাচক দিকটি দেখা দিয়াছিল না। 'হ্যাঁ-সূচক দিক' বলিতে 'আল্লাহ্ এক' কথাটি বুঝায় এবং 'না-বাচক দিক' বলিতে তাঁহার সমান কেহ নাই, কথাটি বুঝায়। যখন তাঁহার সমান কেহ নহে, তখন ইহাও অপরিহার্য যে তাঁহার গুণাবলিতেও কাহারো অংশ নাই। প্রথমটিকে 'সত্তায় এককত্ব' ও দ্বিতীয়টিকে 'গুণে এককত্ব' বলা হইয়াছে। কুরআনের পূর্বে পৃথিবীর মানুষের যোগ্যতা এতখানি উন্নতিলাভ করে নাই, যে গুণের জগতে আল্লাহ্র এককত্বের গুরুত্ব ও বাধ্যবাধকতা উপলব্ধি করিতে পারে। এই কারণেই তৎকালীন ধর্মগুলিতে সব জোরই সত্তায় এককত্বের উপরে দান করা হইয়াছে এবং গুণগত এককত্বের ক্ষেত্রে পূর্ব প্রচলিত ত্রুটিপূর্ণ ধারণাকে যথা অবস্থায় ছাড়িয়া দিয়াছে।

বস্তুত এই কারণেই আমরা দেখিতেছি যে, কুরআনের পূর্বেকার সকল ধর্মেই 'এক আল্লাহ্র' সবক দিলেও কোন-না-কোনভাবে শিরক অব্যাহত ছিল। ধর্ম প্রবর্তকগণ তাহা কিছুতেই বন্ধ করিতে পারেন নাই। ভারতে তো সম্ভবত পয়লা দিন হইতেই এই কথাটি মানিয়া লওয়া হইয়াছিল যে, জনসাধারণের মানসিক তৃপ্তিদানের জন্য দেবতা ও মহামানবদের পূজা-অর্চনা অপরিহার্য ব্যাপার। তাই একত্ববাদী ধারণা শুধু বিশেষ

২২. এই আয়াতে 'ইলহাদ ফিল আছমা এ' দ্বারা কি বুঝানো হইয়াছে ? ইলহাদ 'লহদ' হইতে সৃষ্টি। 'লহদ' অর্থ হইল মধ্যপথ হইতে বিচ্যুত হওয়া। এইজন্যই কবরের ভিতরে যেইদিকের মাটি সরাইয়া দেওয়া হয়, সেই অংশটিকে লহদ বলে। মানুষের কার্য সম্পর্কে এই শব্দ ব্যবহার করিলে বুঝাইবে সত্য হইতে সরিয়া যাওয়া। কারণ সত্য হইল মধ্যপথ, উহার এদিক ওদিক হইল ভ্রান্ত পথ। তাই الحد فلان বলিলে অর্থ হয়, অমুকে সত্যচ্যুত হইয়াছে। এখানে 'ইলহাদ ফিল আছমা এ' দ্বারা আল্লাহ্র গুণ সম্পর্কিত সঠিক ধারণা হইতে বিচ্যুত হওয়াকে বুঝানো হইয়াছে। ইমাম রাগিব ইস্পাহানী উহার ব্যাখ্যা এইভাবে করিয়াছেন—আল্লাহ্র জন্য এমন বিশেষণ প্রয়োগ করা যাহা তাঁহার জন্য উপযোগী নহে কিংবা তাঁহার গুণবাচক নামের এরূপ অর্থ বাহির করা যাহা তাঁহার মর্যাদার হানি ঘটায়।' (মুফরাদাত, পৃ. ৪৬৪)

লোকদের জন্য নির্দিষ্ট হওয়া চাই। গ্রীক দার্শনিকদেরও এইরূপ ধারণা ছিল। নিশ্চয়ই তাহাদের এ খবরটি অজানা ছিল না যে, অলিম্পাস পর্বতের দেবতাদের কোন মূল্য নাই। তথাপি সক্রেটিস ছাড়া কোন দার্শনিকই জনসাধারণের প্রতিমা পূজার বিশ্বাসে আঘাত দিতে রাযী হয় নাই। তাহারা বলিত, যদি দেবতা-অর্চনার ব্যবস্থা অব্যাহত না থাকে, মানুষের ধর্মীয় জীবনে বিপর্যয় দেখা দিবে। পিথাগোরাস সম্পর্কে বলা হইয়াছে যে, যখন তিনি তাঁহার বিখ্যাত অংকশাস্ত্র সম্পর্কে ধারণা লাভ করেন, তখন তিনি দেবতাদের উদ্দেশ্যে একশত বাছুর উৎসর্গ করিয়াছিলেন।

এই ব্যাপারে সর্বাধিক মারাত্মক ব্যাপার ছিল নবী ও মহাপুরুষদের অসাধারণ ব্যক্তিত্ব। ইহা সুস্পষ্ট যে, প্রবর্তক ও গুরুর শ্রেষ্ঠত্বই প্রবর্তিত শিক্ষার গুরুত্ব বাড়াইয়া দেয়। কিন্তু ব্যক্তিত্বের গুরুত্ব কতখানি দেওয়া চলে ? এখানে আসিয়াই সবার পা পিছলাইয়াছে। কেহই উহার যথাযথ সীমা নির্দিষ্ট করিতে পারে নাই। ফলে প্রেরিত ব্যক্তিকে কখনও আল্লাহ্‌র অবতার, কখনও আল্লাহ্‌র পুত্র ভাবিয়াছে, কখনও বা তাঁহাকে আল্লাহ্‌র অংশীদার ও সহায়ক মনে করিয়াছে। অন্তত তাঁহার শ্রেষ্ঠত্বের সামনে মাথা নত করিয়া অর্চনা দান করিয়াছে। ইহুদীরা তাহাদের প্রাথমিক যুগের বিভ্রান্তির পরে অবশ্য পাথরের প্রতিমা গড়িয়া পূজা করে না। তবে স্বীয় নবীর কবরের উপরে সমাধি গড়িয়া উহাকে উপাসনালয়ের মর্যাদা দান করিয়াছে। গৌতম বুদ্ধের শিক্ষায় প্রতিমা পূজার কোনই স্থান ছিল না। তাঁহার শেষ বাণী আমরা যা জানি তাহা এই, 'আমার মৃত্যুর পরে আমার লাশে ভস্ম রাখিয়া পূজা করা শুরু করিও না। যদি তাহা কর, নিশ্চিত জানিও, মুক্তির পথ রুদ্ধ হইবে।[২৩] অথচ তাঁহার এই অন্তিম উপদেশ শিষ্যরা কতখানি কার্যকরী করিয়াছে, দুনিয়ার সবাই তাহা জানে। তাহারা শুধু ভস্মস্তূপ ও স্মৃতিচিহ্নের উপরেই উপাসনালয় গড়িয়া ক্ষান্ত হয় নাই। পরন্তু তাঁহার মূর্তিতে দুনিয়ার প্রতিটি অংশ ভরপুর করিয়া দেওয়াকেই তাহারা ধর্ম প্রসারের বড় উপায় মনে করিয়াছে। ইহা সত্য যে, পৃথিবীর বুকে বুদ্ধের যত প্রতিমা আছে, খোদারও তত প্রতিমা নাই। ঈসায়ী ধর্মের শিক্ষা আগাগোড়া একত্ববাদের শিক্ষা। অথচ উহা প্রবর্তিত হওয়ার পরে এক শতাব্দী পার না হইতেই ঈসা (আ)-এর উপরে ঐশ্বরিক গুণের আরোপ শিকড় গাড়িতে শুরু করিল।

তওহীদ ফীল সিফাত (গুণে এককত্ব)

কিন্তু কুরআন গুণে এককত্বের এরূপ পূর্ণ চিত্র অংকিত করিল যে, এই ধরনের পদস্খলনের সকল দ্বার রুদ্ধ হইল। সে শুধু সত্তার এককত্বেই জোর দেয় নাই বরং শিরকের পথও বন্ধ করিয়া দিয়াছে। এই অধ্যায়ে কুরআনের বৈশিষ্ট্য ইহাই।

সে বলে, আল্লাহ্‌ই সব ধরনের অর্চনা ও বিনয় লাভের অধিকারী। তাই উপাসনাসুলভ বিনয় ও শ্রদ্ধা লইয়া যদি তোমরা অন্য কাহারও সামনে মাথা ঝুঁকাও সেখানে আল্লাহ্‌র

২৩. Early Buddhism.

এককত্বে বিশ্বাস বজায় থাকে না। সে বলে, মানুষের ডাকে সাড়া দেওয়া ও তাহাদের প্রার্থনা পূর্ণ করার মালিক একমাত্র তিনিই। তাই তোমরা যদি তাঁহাকে ডাকিতে গিয়া ও তাঁহার কাছে কিছু চাহিতে গিয়া তাঁহার সঙ্গে অন্য কাহাকেও জুড়িয়া লও, তোমরা যেন তাহাকে আল্লাহ্‌র সহিত শরীক করিলে। সে বলে, আহ্‌বান, সাহায্য কামনা, নতজানু হওয়া, ভূমিতে মাথা ঠেকানো, বিনয় ও অক্ষমতা প্রকাশ, ভরসা ও নির্ভরতা এবং এই ধরনের সব উপাসনাসুলভ ও বিণয়পূর্ণ ব্যাপার শুধু আল্লাহ্-বান্দার সম্পর্ক প্রমাণ করে। সুতরাং এইসব ব্যাপারে যদি তোমরা অন্য কাহাকেও মিলাইয়া লও, তখন আল্লাহ্‌র প্রভুত্বের সম্পর্কটির নিরংকুশতা অবশিষ্ট থাকে না। তেমনি শ্রেষ্ঠত্ব, অপ্রতিদ্বন্দ্বিতা, সৃষ্টির লীলাখেলা ও স্বয়ংসম্পূর্ণতার যেসব ধারণা তোমরা আল্লাহ্‌র ব্যাপারে রাখ, তাহা শুধু আল্লাহ্‌র জন্যই বিশেষভাবে রাখিও। যদি তোমরা অন্য কাহারো বেলায় এসব ধারণা ও বিশ্বাস পোষণ কর, তাহা হইলে তাওহীদের শিক্ষা সম্পূর্ণ লণ্ডভণ্ড হইয়া যাইবে।

এই কারণেই সূরা 'ফাতিহায়ও' ইয়্যাকা না'বুদু ওয়া ইয়্যাকা নাস্তা'ঈন'-এর শিক্ষা দান করা হইয়াছে। উহাতে একদিকে ইবাদতের সহিত 'ইস্তি' আনাত' (সাহায্য প্রার্থনা) জুড়িয়া দেওয়া হইয়াছে। তাহার উপরে উভয় স্থলেই 'কর্ম'কে আগে আনা হইয়াছে বিশেষিত করার উদ্দেশ্যে। অর্থ দাঁড়াইল, শুধু তোমারই অর্চনা করিতেছি এবং শুধু তোমার কাছেই সাহায্য প্রার্থনা করিতেছি। ইহা ছাড়া সমগ্র কুরআনে 'তাওহীদ-ফিল-সিফাত' (গুণগত এককত্ব) ও শির্‌ক রোধের উপর এত বেশি জোর দেওয়া হইয়াছে যে, কোন সূরা, এমন কি কোন পৃষ্ঠাই হয়তো তাহা হইতে বাদ যায় নাই।

নবীর মর্যাদার সীমা নির্ধারণ

সব চাইতে গুরুত্বপূর্ণ প্রশ্ন হইল নবীর মর্যাদার সীমা নির্ধারণ। অর্থাৎ আদর্শ প্রবর্তনের ব্যক্তিত্বকে যথাস্থানে বহাল রাখিয়া ব্যক্তি পূজার চিরতরে অবসান ঘটানো। এই ব্যাপারে কুরআন যতখানি স্পষ্ট ও দ্ব্যর্থহীন ভাষায় ইসলামের পয়গম্বরের মানুষ ও বান্দা হবার উপরে জোর দিয়াছে, তাহা বর্ণনার অপেক্ষা রাখে না। এখানে আমি শুধু সর্বজনবিদিত কালেমায়ে শাহাদতের দিকে দৃষ্টি আকর্ষণ করিতেছি। ইসলাম স্বীয় শিক্ষার মূলমন্ত্রে যাহা বলিয়াছে, তাহা এই ঃ

اَشْهَدُ اَنْ لاَّ اِلٰهَ اِلاَّ اللّٰهُ وَاَشْهَدُ اَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَ رَسُوْلُهُ -

—আমি স্বীকার করিতেছি যে, আল্লাহ্ ভিন্ন অন্য কোন প্রভু নাই এবং আমি আরও স্বীকার করিতেছি যে, নিশ্চয়ই মুহাম্মদ তাঁহার দাস ও প্রেরিত পুরুষ মাত্র।

এই স্বীকৃতিনামায় যেভাবে আল্লাহ্‌র এককত্বের সাক্ষ্য দান করা হইয়াছে, ঠিক তেমনিভাবেই ইসলামের নবীর দাসত্ব ও নবুয়তের সাক্ষ্য দান করা হইয়াছে। ভাবিয়া দেখা উচিত, এরূপ করা হইল কেন ? শুধু এইজন্য যে, ইসলামের নবীর আল্লাহ্‌র

দাস ও রসূল হবার বিশ্বাসটি ইসলাম শিক্ষার যেন ভিত্তিমূল হয়। ফলে দাসত্ব যেন প্রভুত্বে এবং নবুয়ত যেন অবতরবাদে পরিণত না হইতে পারে। ইহা হইতে এ ব্যাপারে আর কি সতর্কতা অবলম্বন করা যায় ? কোন ব্যক্তি ইসলামের গণ্ডিতে প্রবেশই করিতে পারিবে না যতক্ষণ না সে আল্লাহ্‌র একত্বে বিশ্বাসের সঙ্গে রসূলের দাস হবার বিশ্বাসটি জুড়িয়া লইবে।

এই কারণেই ইসলামের নবীর ইন্তিকালের পরে বহু ব্যাপারে মতভেদ সৃষ্টি হইলেও তাঁহার মানুষ হওয়া সম্পর্কে কোনই মতানৈক্য সৃষ্টি হয় নাই! তাঁহার ইন্তিকালের কয়েক ঘণ্টা পরেই হযরত আবূ বকর (রা) প্রকাশ্য জনসমাবেশে দৃঢ়কণ্ঠে ঘোষণা করিলেন ঃ

তোমরা যাহারা মুহাম্মদের উপাসক, তাহারা জানিয়া লও, মুহাম্মদের মৃত্যু ঘটিয়াছে। আর যাহারা আল্লাহ্‌র উপাসক, তাহারা জানিয়া রাখ, আল্লাহ্ চিরঞ্জীব, তাঁহার মৃত্যু নাই।

৪. বিশেষ-অবিশেষ নির্বিশেষের একই ধারণা

চতুর্থত, কুরআনের পূর্বে ধর্মশিক্ষার ক্ষেত্রে যেরূপ বিশেষ ও অবিশেষে পার্থক্য দেখা যাইত, তেমনি ধর্মবিশ্বাসের ক্ষেত্রেও অনুরূপ পার্থক্য সৃষ্টি করা হইত। তাহারা ধারণা করিত, আল্লাহ্‌র একটি সত্যিকার পরিচয় আছে যাহা সর্বসাধারণের জন্য শুধু। বস্তুত ভারতে খোদা পরিচিতির তিনটি স্তর নির্দিষ্ট করা হইয়াছে।

জনসাধারণের জন্য দেবতার অর্চনা, বিশেষ লোকদের জন্য সরাসরি খোদার অর্চনা আর সবিশেষ লোকদের জন্য নিরংকুশ মৌল সত্তার ধ্যানে বসা। ঠিক এ অবস্থাই ছিল গ্রীক দর্শনের। তাহাতেও ভাবিত যে, এক অদৃশ্য ও নিরাকার খোদার চিন্তা শুধু শিক্ষিত ও জ্ঞানী-গুণীদের জন্য। জনসাধারণের জন্য দেবতার অর্চনা করাই শ্রেয়।

কিন্তু কুরআনে বিশেষ-অবিশেষ আর প্রত্যক্ষ-পরোক্ষ বলিয়া কোন পার্থক্য সৃষ্টি করে নাই। সে সবাইকে আল্লাহ্-অর্চনার একই পথ দেখাইয়াছে। সবার জন্য আল্লাহ্‌র একই গুণাবলি প্রকাশ করিয়াছে। জ্ঞানী সাধক হইতে শুরু করিয়া মূর্খ সর্বসাধারণ সবাইকে একই সত্যের আলোর সন্ধান দিয়াছে। সবারই জন্য ঈমান ও ই'তিকাদের একই দ্বার উন্মুক্ত করিয়াছে। উহার প্রবর্তিত ধারণা একজন মহাজ্ঞানী তাপসের জন্য যেরূপ গভীর ধ্যান-গবেষণার সামগ্রী হইয়াছে, একজন রাখাল চাষীর জন্য তেমনি তৃপ্তিকর হইয়াছে।

এখানে এ ব্যাপারে আরেকটি দিক ভাবিবার আছে। ভারতে বিশেষ ও অবিশেষ খোদা-অর্চনার ধারণায় সেই পার্থক্য সৃষ্টি করা হইয়াছে, সে ব্যাপারটি এভাবেও লক্ষ করা যাইতে পারে যে, এখানে ধর্মীয় দৃষ্টিভঙ্গি শুরু হইতেই মানুষের চিন্তা ও কাজের অনুসরণে গড়িয়া ওঠার নীতি গ্রহণ করিয়াছে। অর্থাৎ চিন্তার গণ্ডি এত সংকীর্ণ ও

অনড় দেখানো যে তাহাতে অন্য কোন চিন্তা ঠাঁই পাইতে পারে না। এখানের জ্ঞানী-গুণীরা তাওহীদ অবলম্বন করিলেন। অথচ জনসাধারণের জন্য দেবদেবীর প্রতিমা পূজার দ্বার উন্মুক্ত রাখিলেন। ফলে বিপরীতমুখী বিশ্বাসের একত্র সমাবেশ ঘটিল।

প্রত্যেক কাজকেই বৈধ করার সুযোগ আছে। সব ধরনের উপাসনা পদ্ধতির এখানে অবাধ লালিত-পালিত হবার সুযোগ রহিয়াছে। যে ধর্মীয় বিতর্ক ও মতবিরোধ অন্য সম্প্রদায়ের ভিতরে পারস্পরিক বিবাদ-বিসম্বাদ সৃষ্টি করিত, এখানে তাহা সমঝোতার পথ অনুসরণ করিয়াছে। পারস্পরিক বিরোধী নীতি এখানে দ্বন্দ্বের স্থলে একে অপরের জন্য স্থান করিয়া দেয়। বিরোধের স্থলে আপোস ও ঝগড়ার স্থলে মীমাংসা যেন এখানকার ধর্মীয় চিন্তাধারার বৈশিষ্ট্য ছিল। এক বেদান্তানুসারী জানে যে, মূল সত্য অংশীবাদ ও প্রতিমা পূজার অনেক উর্ধ্বে অবস্থিত। ইহা জানিয়াও সে প্রতিমা পূজার বিরোধী হয় না। কারণ সে মনে করে, পশ্চাৎপদ মানুষের জন্য ইহা প্রাথমিক স্তরস্বরূপ। আরেক কথা, পথিক যে পথেই চলুক না কেন, লক্ষ্যস্থল এক।

خواه از طریق میکده خوه ازره حرم
از هر جهت که شاد شوی فتحیاب گیر !

শরাবখানার পথেই হউক কিংবা হরমখানার পথেই হউক, যে পথে খুশি লক্ষ্যের সাধনা কর, সফল হইবে।

বস্তুত কয়েক বছর আগে অধ্যাপক সি. ই. যুয়াদ (Joad) ভারতের ঐতিহাসিক বিশেষত্বের উপরে আলোচনা প্রসঙ্গে এই বিশেষত্বটির উপর অধিক গুরুত্ব আরোপ করিয়াছিলেন। তাঁহার আগেও কয়েকজন খ্যাতনামা লেখক ভারতীয় প্রকৃতির এই বিশেষ দিকটির উপরে বিশেষ জোর দিয়া গিয়াছেন।

এ ব্যাপারটিও আমাদের পর্যালোচনা করা দরকার।

সন্দেহ নাই, চিন্তা ও কাজের এরূপ সমঝোতাপূর্ণ সম্পর্ক ভারতের ইতিহাসে যে সব সময়ে দেখা দিয়াছে, তাহা অনস্বীকার্য। কিন্তু ব্যাপারটির এখানেই শেষ নহে। এখানে জীবন রহস্যের দাবিও একটু বিচিত্র ধরনের। আমরা এখানে বিশেষ একটি দিকে আবদ্ধ থাকিতে পারি না। অন্যান্য দিকের খবরও আমাদের রাখিতে হয়। চিন্তা ও কর্মের স্রোত এখানে এত দূর দরাজে চলিয়া গিয়াছে যে, কোথাও না কোথাও গিয়া আমাদের ছেদ টানিয়া দিতে হয়। যদি তাহা না করি, জ্ঞান ও চরিত্রের সব বিধানই উলট-পালট হইয়া যায় এবং চারিত্রিক পরিমাপের কোন স্বতন্ত্র মানদণ্ড অবশিষ্ট থাকে না। সমঝোতা অবশ্যই ভাল কথা। সঙ্গে সঙ্গে ধর্মবিশ্বাসের দৃঢ়তা, মতামতের স্থিরতা এবং চিন্তার নিশ্চয়তার সৌন্দর্যও অস্বীকার করা যায় না। সুতরাং এখানে কোন-না-কোনরূপ সীমারেখা থাকা দরকার যেন এ সব সৌন্দর্য নিজ নিজ স্থানে প্রকাশ পাইতে পারে। সকল চারিত্রিক বিধান এইরূপ সীমারেখা নির্দেশের মাধ্যমে সৃষ্টি হয় ও প্রকাশ পায়। যখনই এই বিধি-নিষেধের বেড়া হেলিয়া পড়ে, গোটা প্রাচীর কাত হইয়া যায়।

ক্ষমা ও মার্জনা খুবই ভাল ও সুন্দর কথা। কিন্তু এই ক্ষমা ও মার্জনা যখন নির্দিষ্ট সীমা লংঘন করিয়া চলে, তখন আর তাহা ক্ষমা ও মার্জনা থাকে না। উহাকে কাপুরুষতা ও দুর্বলতা আখ্যা দেওয়া হয়। বীরত্ব মানুষের চরিত্রের শ্রেষ্ঠ গুণ। কিন্তু এই গুণটি যখন নির্দিষ্ট সীমা অতিক্রম করে, তখন শুধু যে উহার নামই বদলায়, তাহা নহে। উহার রূপও পরিবর্তিত হইয়া যায়। তখন দেখিবেন, উহা নিষ্ঠুরতা, ক্রোধ ও অত্যাচার নামে অভিহিত হইবে।

দুই ধরনের অবস্থার প্রকৃতি এক হইতে পারে না। একটি অবস্থা এই, কোন বিশেষ বিশ্বাস ও কাজের আলো পাইয়া আমরা বিশেষ এক সিদ্ধান্তে উপনীত হইলাম, তাহা সম্পর্কে আমাদের কর্মপদ্ধতি কিরূপ হওয়া দরকার ? আমরা সেই সিদ্ধান্তে দৃঢ়ভাবে স্থির থাকিব, না দোদুল্যমান থাকিব ?

আরেকটি অবস্থা এই, যেভাবে আমরা বিশেষ এক সিদ্ধান্তে পৌঁছিয়াছি, তেমনি অপর একজনও আরেকটি সিদ্ধান্তে উপনীত হইয়াছে। কারণ এখানে চিন্তা ও কাজের একই পথ সবার জন্য উন্মুক্ত হয় না। এখন সেই ব্যক্তি সম্পর্কে আমাদের কার্যক্রম কি হইবে ? আমাদের মত তাহারও নিজ পথে চলার অধিকার আছে কি না ? সহনশীলতার সঠিক স্থান এই দ্বিতীয় ক্ষেত্রটি—প্রথমটি নহে। যদি প্রথম অবস্থায় মানসিক দশা অনুরূপ ঘটে, তাহা সমঝোতা না হইয়া বিশ্বাসের দুর্বলতা ও আস্থাশূন্যতার পরিচায়ক হইবে।

উদারতা অর্থ এই যে, নিজের বিশ্বাস ও কাজের সঙ্গে অপরের স্বতন্ত্র বিশ্বাস ও কাজের অধিকার মানিয়া লওয়া। যদি অন্যের পথ আপনার কাছে প্রকাশ্য ভ্রান্তিমূলক হয়, তবুও তাহার সে পথ অনুকরণের অধিকার আপনি অস্বীকার করিবেন না। কিন্তু উদারতার সীমা যদি এতখানি বাড়াইয়া দেওয়া হয় যে, আপনার স্থির বিশ্বাসও শিথিল করিয়া দেয়, এমন কি আপনার স্থির সিদ্ধান্তকে দুর্বল করিয়া ফেলে, তাহা উদারতা নহে বরং চিন্তার স্থিরতার বিলুপ্তিমাত্র।

সমঝোতা জীবনের একটি মৌলিক প্রয়োজন। আমাদের গোটা জীবনই সমঝোতার। কিন্তু অন্যসব পথের মত এ পথেরও একটা সীমা আছে। এই সীমারেখা যেখানেই অঙ্কিত হইবে, বিশ্বাস সঙ্গে সঙ্গে স্থির হইয়া দাঁড়াইবে। এখন যখন বিশ্বাস আপনার পথে অন্তরায় সাজিল, আপনার কাজ দূরে থাকা। উহাতে কাঁটাছাঁটার প্রয়োজন নাই। আপনি অপরের বিশ্বাসকেও সম্মান করুন এবং নিজের বিশ্বাসেও মজবুত হইয়া থাকুন।

এই পথে বিশ্বাস ও কর্মক্ষেত্রে যে কত শত বিপদ আসিয়া উপস্থিত হইয়াছে, তাহার ইয়ত্তা নাই। এই দুই অবস্থার পার্থক্য উপলব্ধি না করার ফলে অনেক অঘটনই ঘটিয়া থাকে। বিশ্বাস যখন চরম আকার ধারণ করে, সমঝোতা ও সহনশীলতার সব দাবি ভুলাইয়া দেয়। অপরের বিশ্বাস ও কর্মে জবরদস্তিমূলক হস্তক্ষেপ শুরু হয়। আবার উদারতা যখন আসে, চরম রূপ নিয়া আসে। তাহাতে বিশ্বাস ও সিদ্ধান্তের

সকল বাঁধ ভাসাইয়া লইয়া যায়। প্রথম দলের উদাহরণ আমরা সংকীর্ণ সাম্প্রদায়িকতার উগ্র উন্মত্ততার স্রোতে অসংখ্য প্রাণ বিনাশের ভিতরে দেখিতে পাই। দ্বিতীয় দলের নজীর আমরা ভারতের ধর্মবিশ্বাসের ইতিহাসে দেখিতে পাই। এখানে চিন্তা ও বিশ্বাসের কোন উন্নত স্তরই কুসংস্কার ও মূর্খতার খপ্পর হইতে মুক্ত ছিল বলিয়া দেখিতে পাই না। জ্ঞান ও শিক্ষা এবং কুসংস্কার ও মূর্খতা এখানে সর্বদা সমঝোতা করিয়া চলিয়াছে। এই সমঝোতাই মন-মগজ ও আকৃতির বিকৃতি ঘটাইয়াছে। তাহাদের উন্নত চিন্তাধারার সব সৌন্দর্যই প্রতিমা পূজা ও কুসংস্কারের পঙ্কিলে নিমজ্জিত হইয়াছে।

বর্তমান যুগের ইতিহাসকাররা এই অবস্থানটি স্বীকার করিয়া লইয়াছেন। আমাদের যুগের এক বিখ্যাত হিন্দু লেখক আর্যদের ধর্মবিশ্বাস যখন ভারতীয় প্রাচীন জাতিগুলির ধর্মবিশ্বাসের সহিত মিশ্রিত হইয়া চলিল, সেই সময়কার চিন্তাধারার উপরে আলোকপাত করিয়া স্বীকার করিতেছেন--'হিন্দু ধর্মের মিশ্র প্রকৃতির পরিচয় আমরা এই অবস্থানটি হইতেই পাইতে পারি, যখন কানন-প্রান্তরের বাসিন্দাদের জংলী ধ্যান-ধারণা আর উন্নততম নাগরিকদের ধ্যান-ধারণা পরস্পর মিলিয়া গেল। আর্য ধর্ম গোড়া হইতেই উদার, গতিশীল ও সহনশীল ছিল। যখনই ইহা কোন নূতন ধর্মের সংস্পর্শে আসিয়াছে, তাহা হইতে গ্রহণ করিয়াছে ও তাহার জন্য নিজের ভিতরে স্থান ছাড়িয়া দিয়াছে। ইহার মেযাজের এই অবস্থাটির ভিতরে আমরা বিনয় ও সহানুভূতির পরিচয় পাই। হিন্দু ভাবধারা নিম্নস্তরের ধর্মগুলিকে উপেক্ষা করা কিংবা লড়াই করিয়া সেইগুলিকে লোপ করা পসন্দ করিল না। ইহার ভিতরে ধর্মীয় এমন কোন মত্ততা মাথা তুলে নাই, যাহা নিজকে ছাড়া অন্যকে সত্য ভাবিবে না। যদি মানুষের কোন দল বিশেষ কোন পদ্ধতিতে আল্লাহ্‌র অর্চনা করিয়া তৃপ্তি পায়, তাহা হইলে উহাকেই সত্য পথ বলিয়া বিশ্বাস করা উচিত। পূর্ণ সত্যে কেহই সহসা পৌঁছিতে পারে না ! তাহা ধীরে ধীরে নানা পথে লাভ করা যাইতে পারে। এ ক্ষেত্রে নবীশদের জন্যও স্থান রাখিতে হইবে। হিন্দু ধর্ম সহনশীলতা ও সমঝোতার পথ এইজন্যই উন্মুক্ত রাখিয়াছে। কিন্তু সে ভুলিয়া বসিয়াছে যে, এমন অবস্থাও দেখা যায়, যেখানে উদারতার স্থলে সংকীর্ণতাই উত্তম। আর ধর্মীয় ব্যাপারে 'গ্রশামের'[২৪] আইনের ফলে ধর্ম একটি অপরটির সহিত মিলিত হইল, একটি মার্জিত আরেকটি অমার্জিত, একটি ভাল অপরটি অপদার্থ, তখন অমার্জিত ও অপদার্থ অংশটি মার্জিত ও ভাল অংশটিকে স্বভাবতই বিতাড়িত ও বিলুপ্ত করিল।[২৫]

যাহা হউক, কুরআনের খোদায়ী ধ্যান-ধারণার একটি মৌলিক বৈশিষ্ট্য হইল এই কুরআন ধর্মবিশ্বাসের ব্যাপারে কোনরূপ বুঝাপড়া বা সমঝোতার অবকাশ রাখে নাই।

---

২৪. বিখ্যাত অর্থনীতিবিদ গ্রেশাম একটি আইনকে মুদ্রার ব্যাপারে সক্রিয় বলিয়া দেখাইয়াছে। তাহা এই যে, একই সঙ্গে যদি বাজারে ভাল ও মন্দ দুই ধরনের মুদ্রা থাকে, তাহা হইলে মন্দ মুদ্রা ভাল মুদ্রাকে বাজার হইতে বিতাড়িত ও বিলুপ্ত করিবে।

২৫. অধ্যাপক রাধাকৃষ্ণন—ভারতীয় দর্শন, প্রথম অধ্যায় (২য় সংস্করণ) ১১৯ পৃঃ।

সে একত্ববাদী ও লা-শরীকী ধারণায় আগাগোড়া আপোসহীন ও অনমনীয় রহিয়াছে। উহার এই দৃঢ়তা কোনরূপেই আমাদের ধর্মবিশ্বাসের ক্ষেত্রে আপোস মনোভাব গ্রহণ করিতে দেয় নাই। অবশ্য অন্য সব ক্ষেত্রে উহা আমাদের আপোসের পথ অনুসরণের উৎসাহ যোগাইয়াছে।

৫. কুরআনের ধারণা সার্বজনীন

কুরআনের খোদায়ী ধারণা বিশ্বমানবের সার্বজনীন অনুভূতির উপরে প্রতিষ্ঠিত। এই ব্যাপারটি বিশেষ চিন্তাশীলদের গবেষণার সামগ্রী করিয়া রাখে নাই, বিশ্ব মানবের সার্বজনীন অনুভূতিটি কি ? তাই এই নিখিল সৃষ্টি হঠাৎ আপন হইতে গড়িয়া উঠে নাই। উহা সৃষ্টি করা হইয়াছে। সেজন্য একজন বিরাট শক্তিশালী ও সুনিপুণ স্রষ্টা বিরাজমান ! কুরআনও সাধারণত মানুষকে এই শিক্ষাই দিয়াছে। ইহা ছাড়া যাহা বলা হইয়াছে, তাহা ধর্ম-বিশ্বাসের জন্য প্রয়োজনীয় নহে। তাহা ব্যক্তিগত ও শ্রেণীগত অভিজ্ঞতা ও অবস্থার কথা বলা হইয়াছে। তাই সেই বোঝা সর্বসাধারণের উপরে না চাপাইয়া উঁচুদরের সাধকদের জন্য নির্দিষ্ট করা হইয়াছে।

وَالَّذِيْنَ جَاهَدُوْا فِيْنَا لَنَهْدِيَنَّهُمْ سُبُلَنَا - وَاِنَّ اللّٰهَ لَمَعَ الْمُحْسِنِيْنَ - (٢٩ : ٦٩)

—আর যাহারা আমাকে পাইবার জন্য প্রয়াস চালাইবে, আমি অবশ্যই তাহাদের পথ দেখাইব। আর আল্লাহ্‌তা'আলা পুণ্যবানদের সঙ্গেই থাকেন। (—সূরা আনকাবুত ঃ আয়াত ৬৯)

وَفِى الْاَرْضِ اٰيٰتٌ لِّلْمُؤْقِنِيْنَ - وَفِىْ اَنْفُسِكُمْ - اَفَلَا تُبْصِرُوْنَ - (٥١ : ٢٠ - ٢١)

—আর যাহারা দৃঢ় বিশ্বাসী, পৃথিবীতে তাঁহাদের জন্য বহু নিদর্শন রহিয়াছে। এমন কি তোমাদের নিজেদের ভিতরেও তো (সত্যের নিদর্শন) রহিয়াছে। তোমাদের কি দৃষ্টি আচ্ছন্ন ? (—সূরা যারিয়াত ঃ আয়াত ২০-২১)

৬. চাওয়া-পাওয়ার স্তরভেদ

এখান হইতেই আমরা ইসলাম সর্বসাধারণ ও বিশেষ মানুষের ভিতরে যতটুকু পার্থক্য রাখিয়াছে, তাহা বুঝিতে পারি। হিন্দু দার্শনিকরা সাধারণ ও অসাধারণ মানুষের মধ্যে ভিন্ন ভিন্ন ধর্মবিশ্বাস সৃষ্টি করিয়াছে। ইসলাম এই ক্ষেত্রে কোনই পার্থক্য সৃষ্টি করে নাই। আল্লাহ্ সম্পর্কে মানুষের মন ও মগজে সে একই বিশ্বাস ছড়াইয়া দিয়াছে। তবু ইহা সুস্পষ্ট যে, আল্লাহ্‌কে চাওয়া-পাওয়ার ব্যাপারে সবার অবস্থা সমান হয় না। এখানে একই ধরনের পিপাসা লইয়া সবাই আসে না। সাধারণ মানুষ সমষ্টিগতভাবে একরূপ বিশেষ ধারণা ও চাহিদা রাখে। আবার বিশেষ বিশেষ লোক ব্যক্তিগতভাবে চাওয়া ও পাওয়ার ব্যাপারে ভিন্ন ভিন্ন স্তরে উন্নীত হয়। সুতরাং সার্বজনীন যে ধারণা

সে দান করে, তাহাতে কোনই পার্থক্য স্বীকার করে নাই। কেবল বিশেষ বিশেষ মানুষ চাওয়া ও পাওয়ার ক্ষেত্রে যে পার্থক্য আপনা হইতে সৃষ্টি করে, সেইটুকুর স্বীকৃতি দান করিয়াছে এবং তাহাদের জন্যও পথ খোলা রাখিয়াছেন।

সহীহ্ বুখারী ও মুসলিম শরীফের এক ঐকমত্যের হাদীসে হযরত জিবরাঈল (আ)-এর সম্পর্কের উল্লেখ করিয়া এই ব্যাপারটি পরিষ্কার করিয়া তুলিয়া ধরিয়াছে। এই হাদীসে তিনটি স্তরের উল্লেখ রহিয়াছে। ইসলাম, ঈমান, ইহসান। ইসলাম হইল কুরআন নির্দেশিত ধর্মবিশ্বাসগুলির স্বীকৃতি দান ও কাজের চারটি ভিত্তি—নামায, রোযা, হজ্জ ও যাকাত সম্পন্ন করা। ঈমান হইল স্বীকৃতির স্তর হইতে অগ্রসর হইয়া ইসলামের মূল ধর্মবিশ্বাসগুলির দৃঢ় বিশ্বাস অর্জন। ইহ্সান হইল ঃ

اَنْ تَعْبُدَ اللّٰهَ كَاَنَّكَ تَرٰهُ وَاِنْ لَّمْ تَكُنْ تَرٰهُ فَاِنَّهٗ يَرٰكَ –
(صحيحين)

আল্লাহ্র এরূপ ইবাদত করিবে যেন তুমি তাঁহাকে সামনে দেখিতেছ। যদি তুমি তাঁহাকে দেখিতে না পাও, তাহা হইলে যেন (মনের এই অবস্থা থাকে) তিনি তোমাকে দেখিতেছেন।

সুতরাং আল্লাহ্কে জানা ও অর্জনের দিক হিসাবে এখানে তিনটি অবস্থা দেখানো হইল। ইসলাম গ্রহণের জন্য সাধারণ বিশ্বাস ও কার্যাবলি যথেষ্ট। কিন্তু ইসলামের আওতায় প্রবেশের অর্থ এই নহে যে, আল্লাহ্-সম্পর্কিত ধারণা ও বিশ্বাসের সকল স্তরই আয়ত্ত করিয়া ফেলিল। তাই ইসলাম গ্রহণের পরেই যে দ্বিতীয় স্তর শুরু হয় উহার নাম ঈমান। ইসলাম শুধু বাহ্যিক স্বীকৃতি ও কাজকর্মের ভিতরে সীমাবদ্ধ। ঈমান উহাকে অন্তরের সিংহাসনে সুপ্রতিষ্ঠিত করে। এই স্তরে যে ব্যক্তি পৌছিল, সে সর্বসাধারণ মুসলমানের আওতামুক্ত হইয়া বিশেষ মুসলমানদের দলভুক্ত হইল। কিন্তু ব্যাপারটি এখানে আসিয়াই ক্ষান্ত হইল না। সত্যের পূর্ণ পরিচিতি ও প্রত্যক্ষ বিশ্বাসের জন্য আরও একটি অধ্যায় রহিয়াছে, উহার নাম ইহ্সান। ইহা ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতালব্ধ প্রত্যক্ষ জ্ঞানের স্তর। শাস্ত্রের শিখানো বিধি-বিধানের এখানে দখল নাই। তর্ক-গবেষণার বাধা এখানে অবর্তমান। ইহা নিজের চাওয়া-পাওয়ার ব্যাপার। ইহা শিখানো আর বুঝানোর ব্যাপার নহে। এই স্তরে যদি কেহ পৌঁছায়, সে যদি কিছু শিখায় বা বুঝায়, তাহা এই যে, আমার মত হও, তারপর যাহা দেখিতে পাও, নিজে দেখ।

پر سیدیکے کہ عاشقی چیست ؟
گفتم کہ چو من شوی بدانی !

জানতে গেলাম একের কাছে, প্রেম কি ভাই ?
বলল, হলে আমার মতন জানবে তাই।

ইসলাম এভাবে চাওয়া-পাওয়ার সব ধরনের পিপাসুর জন্য স্তরে স্তরে তৃপ্তির আয়োজন রাখিয়াছে। সর্বসাধারণের জন্য প্রথম স্তরই যথেষ্ট। বিশেষ লোকদের জন্য দ্বিতীয় স্তর প্রয়োজন। আবার সবিশেষ লোকদের পিপাসা নিবৃত্তির জন্য তৃতীয় স্তর দরকার। কুরআনের বর্ণিত আল্লাহ্‌র ধারণা-বিশ্বাসের শরাবখানা একটি মাত্র। তবে শরাবের পেয়ালায় বিভিন্নতা আছে। প্রার্থীর চাহিদা মুতাবিক শরাবের ব্যবস্থা রাখা হইয়াছে। প্রত্যেক ধরনের পিপাসুকে পরিতৃপ্ত করার যথাযথ আয়োজন রহিয়াছে ঃ

ساقی به همه باده زیك خم دند اما

در مجلس اومستی هر کس زشر ابے ست !

একটি শরাব পাত্র থেকে সবকে শরাব দিচ্ছে সাকী
যার যতটুকু মত্ত হবার হচ্ছে তেমন কেউ না বাকি।

এখানে এ ব্যাপারটিও পরিষ্কার করিয়া দেওয়া অপ্রাসঙ্গিক হইবে না যে, কুরআনের কয়েকটি বর্ণনা এরূপ আছে যাহা আল্লাহ্‌র এককত্বের চরম প্রান্তে পৌছায়। যেমন ঃ 'তিনিই আদি তিনিই অন্ত, তিনিই বাহির, তিনিই ভিতর। কিংবা 'যেখানে যেদিকেই তাকাও আল্লাহ্‌র চেহারাই দেখিবে।' অথবা 'আমি তোমাদের শাহ্‌রগেরও কাছে আছি' বা 'প্রত্যেক দিনই তিনি এক নূতন মর্যাদায় সমাসীন থাকেন' ইত্যাদি। ইহা ছাড়া আর যে সব বর্ণনায় সবকিছুর শেষে 'তাঁহারই কাছে প্রত্যাবর্তনের' কথা বলা হইয়াছে, একক আল্লাহ্‌র অস্তিত্বের দিকে সেইসব আয়াতও ইঙ্গিত দান করে। শাহ্ ওয়ালীউল্লাহ্ তো এতখানি লিখিয়াছেন যে, যদি আমি একক আল্লাহ্‌র অস্তিত্ব প্রমাণ করিতে চাই, তাহা হইলে কুরআনের প্রত্যেকটি বাক্য দ্বারাই আমি তাহা করিয়া দেখাইতে পারি। কিন্তু এই ব্যাপারটি সাফ সাফ বুঝা যায় ওই সব আয়াতেই। ইহার চাইতে অগ্রসর হওয়া আমাদের উচিত নহে। কুরআনের আদি ব্যাখ্যাতার মুখ হইতে যতটুকু শোনা গিয়াছে, তাহাই যথেষ্ট। এখন রহিল সত্যের প্রত্যক্ষ পরিচয় লাভের ব্যাপারে সাধকদের যাহা কিছুর সম্মুখীন হইতে হইয়াছে, সেই সম্পর্কে বলা। সেখানে বক্তব্য হইল এই, তাঁহারা কোন প্রকারেই কুরআন নির্দেশিত খোদায়ী ধারণার বিরুদ্ধে যান নাই। তাঁহাদের ধারণাটি অত্যন্ত ব্যাপক ও তাৎপর্যপূর্ণ। প্রত্যেকটি একত্ববাদী ধারণাই তাহাতে ঠাঁই পায়। তাহারা সত্যকে পরিচিত পর্দায়ও দেখিতে পায়, আবার পরিচয়ের যে চূড়ান্ত পর্যায়ে মানুষের পক্ষে পৌছা সম্ভবপর, সেখানেও দেখিতে পায়।

تو نظر بازنه ورنه تغافل نگاه ست

تو زبان فهم نه ورنه خموشی سخن ست !

তোমার বাহ্য দৃষ্টিই অন্তরায়। নইলে চোখ মুঁদিলেই চরম দেখা দেখিতে তোমার বুদ্ধির বাকচাতুর্যই বিপদ। নইলে চুপ থাকায়ই চরম বলা বলিতে।

সূরা 'ফাতিহা'য় যেই ধারাবাহিকতার সহিত এই তিনটি গুণ বর্ণনা করা হইয়াছে, তাহা সব মানবীয় চিন্তার চাহিদা ও জ্ঞাতব্যের সাধারণ স্তর। সর্বপ্রথম 'রবুবিয়াত' (প্রতিপালন)-এর উল্লেখ করা হইয়াছে। কারণ নিখিল সৃষ্টির ভিতরে এই গুণটিরই প্রকাশ দেখি সর্বাধিক এবং সবকিছুই এই গুণটির মুখাপেক্ষী। রবুবিয়াতের পরে স্থান পাইল রহ্‌মত। কারণ এই সত্যটি রবুবিয়াতের মত সর্বাধিক সুস্পষ্ট নহে। ইহা বুঝিবার জন্য কিছুটা আয়াস প্রয়োজন। 'রবুবিয়াত' বুঝিতে পাইয়া যখন মানুষ আরেকটু অগ্রসর হয় তখন এই রহ্‌মতের আলো ধরা দেয়। রহ্‌মতের পরে আসে আদালতের স্থান। কারণ ইহা সফরের শেষ মন্‌যীল। রহ্‌মত প্রত্যক্ষ করিয়া যখন আরেক কদম আগে বাড়ে, তখন দেখিতে পায়, এখানে 'আদালত'ও সর্বত্র বিরাজমান। আর তাহা এইজন্য যে, রবুবিয়াত ও রহ্‌মত অবশেষে উহাই কামনা করে।

ছয়

ইহ্‌দিনাস্‌ সিরাতাল মুস্তাক্বীম

হিদায়ত

'হিদায়ত' অর্থ পথ দেখানো, পথে তুলে দেওয়া ও পথ দেখাইয়া চলা। এই সম্পর্কে মোটামুটি আলোচনা উপরে হইয়া গিয়াছে। এখানে আমি হিদায়তের বিভিন্ন স্তর ও শ্রেণীর উপরে আলোকপাত করিতে চাই। তন্মধ্যে অন্যতম হইবে ওহী ও নবুয়তের হিদায়ত।

সৃষ্টির চারিটি স্তর

আপনারা এইমাত্র পড়িয়া আসিয়াছেন যে, আল্লাহ্‌র রবুবিয়াত যেভাবে সৃষ্টিকে যথোপযোগী দেহ ও শক্তি দান করে, সেইভাবে তাহার স্বভাবজাত পথের দিশা (হিদায়ত) দান করে। এই সেই হিদায়ত যাহার মাধ্যমে প্রত্যেকটি সৃষ্টি জীবন ও জীবিকার পথ স্বভাবতই লাভ করিয়া থাকে এবং জীবনের প্রয়োজন মিটাইবার কাজে আগাইয়া যায়। প্রকৃতিগত এই হিদায়ত না থাকিলে সৃষ্ট জীবের বাঁচিয়া থাকা কঠিন হইত। বস্তুত কুরআনে বিভিন্ন স্থানে এই তথ্যটির দিকে দৃষ্টি আকর্ষণ করা হইয়াছে। সে বলে, প্রত্যেকটি সৃষ্টির শুরু হইতে শেষ পর্যন্ত চারটি অধ্যায় পার হইতে হয় আর তাহার মধ্যে সর্বশেষ স্তরটি হইল হিদায়ত। সূরা 'আ'রাফে' এই চারিটি স্তর ধারাবাহিকভাবে উল্লেখ করা হইয়াছে।

اَلَّذِىْ خَلَقَ فَسَوّٰى - وَالَّذِىْ قَدَّرَ فَهَدٰى - (٨٧ : ٢ - ٣)

—তিনিই সর্ব বস্তু সৃষ্টি করিয়া যথোপযোগী রূপ দান করিয়াছেন। তারপর পরিমাপ নির্দিষ্ট করিয়া কর্মপথ দেখাইয়াছেন। (—সূরা আ'লা ঃ আয়াত ২-৩)

অর্থাৎ কোন কিছুর অস্তিত্ব লাভের চারিটি স্তর হইতেছে—'সৃষ্টি, সামঞ্জস্য, পরিমাপ ও পথের নির্দেশ (তাখ্‌লীক, তাস্‌ভীয়া, তাক্‌দীর ও হিদায়ত)।

তাখ্‌লীক অর্থ সৃষ্টি করা। সৃষ্টি জগতের প্রত্যেকটি বস্তুর উপাদানগুলি শূন্যতার ভিতরে নূতন রূপ পরিগ্রহ করিল।

তাস্‌ভীয়া অর্থ এক বস্তুর যেভাবে হওয়া উচিত ঠিক সেইভাবেই সুষম ও সুবিন্যস্ত হওয়া।

তাক্‌দীর অর্থ পরিমাপ স্থির করা। ইহার বিশ্লেষণ উপরে করা হইয়াছে।

হিদায়তের উদ্দেশ্য হইল, প্রত্যেকটি জীবের সামনে তাহার জীবন ও জীবিকার পথ খুলিয়া দেওয়া। রবুবিয়াতের আচোলনা প্রসঙ্গেই তাহা আলোচিত হইয়াছে। এখন সৃষ্টি জগতের বিশেষ একটি পাখির দিকে লক্ষ্য করুন।

১. ইহার সৃষ্টির উপাদানগুলি রূপ লাভ করিলে হয় তাখ্‌লীক ।

২. ইহার ভিতর ও বাহির সম্পূর্ণ সামঞ্জস্যপূর্ণ ও যথাযথ হইলে হয় তাস্‌ভীয়া।

৩. ইহার বাহ্যিক ও আভ্যন্তরীণ অবয়বের কার্যাবলির রীতি ও পরিমাপ ঠিক করিয়া দেওয়াকে বলা হয় তাক্‌দীর। যেমন ইহাকে হ' য়ায় উড়িতে হইবে।

৪. ইহার ভিতরে যে অনুভূতি ও উপলব্ধির আলো দেখা দেওয়ায় সে জীবন-পথের সন্ধান পাইল, তাহাই হিদায়ত।

কুরআন বলে, আল্লাহ্‌র রবুবিয়াতের দাবি ইহাই ছিল, যেভাবে বস্তুকে সৃষ্টি করা হইয়াছে, সেভাবে উহার বাহির ও ভিতরের অবয়বগুলিকে সঠিক ও সামঞ্জস্যপূর্ণ করা এবং উহার কার্যাবলির জন্য যথাযথ পরিমাপ নির্দিষ্ট করা। সেইভাবে উহার জীবন-পথের সন্ধান লাভেরও ব্যবস্থা করা।

رَبُّنَا الَّذِىْ اَعْطٰى كُلَّ شَىْءٍ خَلَقَهٗ ثُمَّ هَدٰى - (٢٠ : ٥٠)

আমাদের প্রভুই সর্ব বস্তুকে রূপদান করিয়াছেন, তারপর তাহাদের কর্মপথ উন্মুক্ত করিয়াছেন।

কুরআনে হযরত ইবরাহীম (আ) এবং তাঁহার সম্প্রদায়ের ভিতরে কথোপকথনের যে বিবরণ বিভিন্ন স্থানে রহিয়াছে, তাহাতে হযরত ইব্‌রাহীম (আ) স্বীয় ধর্মবিশ্বাস এরূপ ঘোষণা করিয়াছেন ঃ

وَاِذْ قَالَ اِبْرٰهِيْمُ لِاَبِيْهِ وَ قَوْمِهٖ اِنَّنِىْ بَرَاءٌ مِّمَّا تَعْبُدُوْنَ - اِلاَّ الَّذِىْ فَطَرَنِىْ فَاِنَّهٗ سَيَهْدِيْنِ - (٤٣ : ١٦ - ٢٧)

—যখন ইব্‌রাহীম (আ) স্বীয় পিতা ও গোত্রের নিকট বলিল, তোমরা যেই দেবতাদের অর্চনা কর, তাহাদের সহিত আমার কোনই সম্পর্ক নাই। সম্পর্ক তো শুধু সেই সত্তার সহিত রহিয়াছে, যিনি আমাকে সৃষ্টি করিয়াছেন এবং তিনিই আবার আমাকে পথ প্রদর্শন করিবেন।' (—সূরা যুখরুফ ঃ আয়াত ২৬-২৭)

'আল্লাযী ফাতারানী ফাইন্নাহু 'সায়্যাহ্‌দীন' অর্থাৎ যিনি আমাকে দেহ ও অস্তিত্ব দান করিয়াছেন, তাঁহার জন্য ইহাও প্রয়োজন যে, আমার কর্মপন্থা নির্দেশ করিবেন। সূরা 'শূরায়' এই কথাটি বিশেষ স্পষ্টতার সহিত বলা হইয়াছে ঃ

اَلَّذِىْ خَلَقَنِىْ فَهُوَ يَهْدِيْنِ - وَالَّذِىْ هُوَ يُطْعِمُنِىْ وَ يَسْقِيْنِ - وَاِذَا مَرِضْتُ فَهُوَ يَشْفِيْنِ - (٢٦ : ٧٨ - ٨٠)

—যেই প্রভু আমাকে সৃষ্টি করিয়াছেন, তিনিই আমাকে পথ দেখাইবেন। তিনিই আমাকে পানাহার করাইয়া থাকেন। আমি যখন অসুস্থ হই, তিনিই আরোগ্য দান করেন। (—সূরা শু'আরা ঃ আয়াত ৭৮-৮০)

অর্থাৎ যে প্রতিপালকের প্রতিপালন নীতি আমার সর্ব প্রয়োজন মিটাইবার ব্যবস্থা রাখিয়াছে, যিনি আমার ক্ষুধার অন্ন ও তৃষ্ণার বারি দান করেন, রোগ হইলে ভাল

করেন, তিনি আমার জীবন-পথের সন্ধান না দিয়া পারেন কি ? যদি তিনিই আমাকে সৃষ্টি করিয়া থাকেন, তাহা হইলে অবশ্যই আমাকে তিনি আমার চলার পথ বলিয়া দিবেন। সূরা 'সাফ্‌ফাত'-এ এই মর্মটি এরূপে ব্যক্ত করা হইয়াছে ঃ

اِنِّىْ ذَاهِبٌ اِلٰى رَبِّىْ سَيَهْدِيْنِ - (٣٧ : ٩٩)

—আমি (সবদিক হইতে সম্পর্ক ছিন্ন করিয়া) নিজ প্রতিপালকের দিকে ফিরিলাম। তিনিই আমাকে পথ দেখাইবেন।' (—সূরা সাফ্‌ফাত ঃ আয়াত ৯৯)

'রব্বী' শব্দটি লইয়া চিন্তা করুন। 'আমার প্রভু' যিনি তিনি নিশ্চয়ই আমার পথের নির্দেশ দান করিবেন।

হিদায়তের প্রাথমিক তিন স্তর

হিদায়তেরও তিনটি ধাপ আছে। সব প্রাণীই ইহা অনুভব করে। সর্বপ্রথম ধাপ অন্তরের পথ-নির্দেশ। প্রাণী জগতের স্বভাবগত আভ্যন্তরীণ ওহী হইল এই অন্তর। আমরা দেখিতেছি, একটি শিশু জন্ম নিয়াই খাবার জন্য কান্না জুড়িয়া দেয় অথচ কেহ তাহাকে শিখায় নাই। তেমনি মায়ের দুধ মুখে পাইলেই চুষিতে থাকে। ইহা কে শিখাইল ?

অন্তরের পরে ইন্দ্রিয়ের পথনির্দেশ আসে। এ স্তর অপেক্ষাকৃত উন্নততর। দর্শন, শ্রবণ, স্পর্শ, স্বাদ, ঘ্রাণ—এই শক্তিগুলি ইন্দ্রিয় আমাদের দিয়া থাকে। এইগুলির সাহায্যে আমরা অন্যসব বস্তু সম্পর্কে জ্ঞান অর্জন করি।

প্রকৃতিগত পথনির্দেশের এই দুইটি স্তর সব প্রাণীর ভিতরে বিদ্যমান। কিন্তু মানুষের ভিতরে তৃতীয় এক স্তর দেখা যায়। তাহা হইল জ্ঞানের নির্দেশ। মানব প্রকৃতির এই হিদায়ত তাহাদের সামনে অন্তহীন সম্ভাবনার দ্বার খুলিয়া ধরিয়াছে। এইজন্যই তাহাদের নিখিল সৃষ্টির সেরা বলা হইয়াছে।

অন্তরের নির্দেশ তাহার ভিতরে চাহিদা সৃষ্টি করে ও প্রচেষ্টার জন্য প্রেরণা যোগায়। ইন্দ্রিয় শক্তি তাহার জানার ক্ষেত্র প্রশস্ত করে এবং জ্ঞান, সিদ্ধান্ত ও বিধি-বিধানের বিন্যাস ঘটায়। পশু-পাখিদের এই শেষ স্তরটির প্রয়োজন ছিল না বলিয়া তাহাদের প্রথম দুই স্তরের আগে বাড়িতে দেওয়া হয় নাই। শুধু মানুষের বেলায় এ তিনটি স্তরের একত্র সমাবেশ ঘটিয়াছে।

জ্ঞান-রত্নটি কি ? মূলত তাহা প্রথম দুই স্তরেরই উন্নত সংস্করণ মাত্র। মানুষের দেহ যেভাবে নিখিল সৃষ্টির ভিতরে উন্নততম পর্যায়, তেমনি তাহার আভ্যন্তরীণ শক্তিও অন্য সবকিছুর আভ্যন্তরীণ শক্তি হইতে শ্রেষ্ঠ। গাছপালার ভিতরে যে অনুভূতি শক্তি নিহিত, পশু-পাখির ভিতরে যাহার সুস্পষ্ট বিকাশ দেখা যায়, মানব স্তরে আসিয়া তাহা জ্ঞান-রত্ন হইয়াছে।

হিদায়ত নির্দিষ্ট সীমা লংঘন করে না

আমরা আবার দেখিতেছি, হিদায়তের তিনটি স্তরের প্রত্যেকটিতেই স্বীয় শক্তি ও কর্মধারার বিশেষ সীমারেখা রহিয়াছে। উহার বাহিরে তাহা যাইতে পারে না। যদি ক্রমোন্নতির ধারাবাহিক স্তরগুলি বিদ্যমান না থাকিত, তাহা হইলে আমাদের আভ্যন্তরীণ শক্তি কখনো প্রকৃতির পথনির্দেশের উন্নততর পর্যায় পর্যন্ত পৌঁছিতে পারিত না।

অন্তরের পথনির্দেশ আমাদের ভিতরে চাহিদা ও প্রয়াসের প্রেরণা সৃষ্টি করে এবং জীবনের প্রয়োজনগুলি মিটাইবার পথ বাতলাইয়া দেয়। কিন্তু আমাদের দেহের বাহিরে যাহা কিছু আছে, তাহার পরিচয় দান করিতে পারে না। সেখানে ইন্দ্রিয়শক্তির পথনির্দেশ কাজ দেয়। অন্তরের হিদায়ত যখন নিষ্ক্রিয় হইয়া যায়, তখনই ইন্দ্রিয় শক্তির হিদায়ত হাত ধরিয়া নিবার জন্য আত্মপ্রকাশ করে। চক্ষু দেখে, কান শুনে, জিহবা স্বাদ নেয়, হাত ছোঁয়, নাক ঘ্রাণ নেয় এবং এইভাবে আমাদের নিজেদের বাহিরে যাহা কিছু অনুভূতি শক্তির আওতায় আসে, তাহা সবই জানিতে পাই।

কিন্তু ইন্দ্রিয়শক্তির হিদায়তও বিশেষ এক সীমায় আসিয়া অচল হইয়া দাঁড়ায়। চক্ষু দেখে, যখন দেখার সকল শর্ত বিদ্যমান থাকে। একটি শর্তও অবর্তমান হইলে অর্থাৎ আলো না থাকিলে কিংবা দূরত্ব অধিক হইলে, চক্ষু থাকিতেও তখন আমরা দেখিতে পাই না। তাহা ছাড়া অনুভূতি শক্তিগুলি হিদায়ত বস্তুটিতে শুধু অনুভব করাইতে পারে। অথচ শুধু অনুভব করিলেই তো আর হয় না। আমাদের তাহা হইতে কোন সিদ্ধান্তে পৌঁছিতে হয়, নূতন কোন ধারণা সৃষ্টি করিতে হয়। সেইজন্য কিছু নীতি-নিয়ম ও কিছু মূলনীতি থাকা দরকার। এ কাজ জ্ঞানের হিদায়ত হইতেই পাইতে পারি। জ্ঞান অনুভূতিলব্ধ সব বস্তু যথাযথভাবে সাজাইয়া উহার নিয়ম-নীতি ও সামগ্রিক রূপ আবিষ্কার করে।

আবার প্রকৃতিলব্ধ হিদায়ত সংশোধন ও সঠিক নিয়ন্ত্রণের জন্য কোন উন্নততম হিদায়তের মুখাপেক্ষী। তাহা ছাড়া যেভাবে অন্তরের পৃষ্ঠপোষকতার জন্য ইন্দ্রিয়শক্তি প্রয়োজন, তেমনি ইন্দ্রিয়শক্তির পৃষ্ঠপোষকতার জন্য আবার জ্ঞা-শক্তি প্রয়োজন। ইন্দ্রিয়লব্ধ পরিচয় শুধু সীমাবদ্ধ নহে, অনেক সময়ে ভুল-ভ্রান্তি হইতেও মুক্তি পায় না। দূর হইতে আমরা যে বস্তুকে একটি বিন্দুর চাইতে বড় দেখি না, তাহা হয়তো বিরাট এক ব্রহ্মাণ্ড। অসুস্থ অবস্থায় মধুও আমরা তিক্ত ভাবি। সোজা লাঠির প্রতিবিম্ব পানিতে বাঁকা হইয়া দেখা দেয়। কানের বিশেষ কারণে এরূপ আওয়াজ শুনি, যাহার বাহিরে কোন অস্তিত্ব নাই। যদি ইন্দ্রিয়শক্তির উর্ধ্বে অন্য কোন স্তর আমাদের পথ না দেখাইত, তাহা হইলে সেগুলির নিষ্ক্রিয়তা ও ব্যর্থতায় সত্য আমাদের কাছে অনাবিষ্কৃত থাকিত। এই সময়ে জ্ঞান শক্তি আগাইয়া আসে। ইহা ইন্দ্রিয়শক্তির ব্যর্থতা অতিক্রম করিয়া আমাদিগকে বলিয়া দেয়, সূর্য বিশাল এক গ্রহ, মধু সুস্বাদু, শুষ্কতায় কানে যে আওয়াজ সৃষ্টি হয়, উহা বাহিরের নহে—আমাদের মস্তিষ্কের গুঞ্জন।

প্রকৃতির পথনির্দেশের চতুর্থ স্তর

যখন পথনির্দেশের একটি স্তর অচল হইলে উন্নততর অন্য স্তর প্রয়োজন হয়, তখন জ্ঞানের স্তরটিও স্বভাবতই একটি উন্নততম স্তরের কামনা করে। কারণ জ্ঞানশক্তি বিশেষ সীমায় গিয়া স্তব্ধ হইয়া দাঁড়ায়। ইহার কার্যসীমার উর্ধ্বেও ক্ষেত্র থাকিয়া যায়। জ্ঞানের কার্যক্রম ইন্দ্রিয়লব্ধ বস্তুর ভিতরেই সীমাবদ্ধ। কিন্তু ইন্দ্রিয়ের সীমান্তের পরপারে কি আছে ? এখানে জ্ঞান আসিয়া নির্বাক সাজে, কোন আলোই সে যোগাইতে পারে না।

তাহা ছাড়া মানুষের বাস্তব জীবনের সর্বক্ষেত্রে সর্ব অবস্থায়ই জ্ঞান সহায়ক হয় না, প্রভাব বিস্তার করে না। মানুষের মনের বাসনা-কামনার কোন কোনটি জ্ঞানের বিচারে সমর্থনযোগ্য না হইলেও মানসিক উত্তেজনার কাছে কখনও জ্ঞানকে হারিয়া যাইতে দেখা যায়। রাগে বেসামাল হইতে নাই, জ্ঞান এই সম্পর্কে যত বড় বড় দলীলই পেশ করুক না কেন, বেসামাল হওয়া বন্ধ করিতে পারে নাই। পারে নাই ক্ষুধার তাড়নায় কুখাদ্য হইতে বিরত রাখিতে। আচ্ছা, আল্লাহ্‌র রবুবিয়াতের প্রয়োজনে যদি অন্তরের হিদায়তের সহিত ইন্দ্রিয়ের হিদায়ত দেখিতে পাই, আর তাহার সাথে আবার জ্ঞানের হিদায়তও যোগ করা হয়, তখন জ্ঞান যেখানে অচল, সেখানের পথনির্দেশের জন্য কি কিছুই দেওয়া প্রয়োজন নহে ? অন্তরের ভুল ও অক্ষমতা দূর করার জন্য ইন্দ্রিয়শক্তি ও ইন্দ্রিয়শক্তির দুর্বলতা ও ত্রুটি-বিচ্যুতি সংশোধনের জন্য যদি জ্ঞানশক্তি দেওয়ার প্রয়োজন দেখা দিয়া থাকে, তাহা হইলে জ্ঞানের ত্রুটি-বিচ্যুতি ও অক্ষমতা দূর করার কোন ব্যবস্থারই কি প্রয়োজন দেখা দেয় নাই ?

কুরআন বলে, তাহাও দরকার হইয়াছিল এবং রবুবিয়তে মানুষের জন্য হিদায়াতের চতুর্থ স্তরেরও ব্যবস্থা রাখিয়াছে। তাহা হইল, ওহী বা নবুয়তর হিদায়ত।

বস্তুত আমরা দেখিতে পাই, কুরআন বিভিন্ন স্থানে হিদায়তের বিভিন্ন স্তরের উল্লেখ করিয়াছে। আর তাহাকে আল্লাহ্‌র বিরাট দান বলিয়া আখ্যায়িত করিয়াছে।

اِنَّ خَلَقْنَا الْاِنْسَانَ مِنْ نُّطْفَةٍ اَمْشَاجٍ نَّبْتَلِيْهِ فَجَعَلْنَاهُ سَمِيْعًا بَصِيْرًا - اِنَّا هَدَيْنٰهُ السَّبِيْلَ اِمَّا شَاكِرًا وَّ اِمَّا كَفُوْرًا - (٧٦ : ٢ - ٣)

—আমি মানুষের মিলিত শুক্র দ্বারা মানুষ সৃষ্টি করিয়াছি। উহা একে একে বিভিন্ন স্তর পার হইয়া আসিয়াছে। তারপর তাহাদের শ্রবণ ও দর্শন শক্তি দান করিয়াছি। তাহাদের কর্মপথ প্রদর্শন করিয়াছি। এখন এই সবের জন্য সকৃতজ্ঞ থাকা কিংবা অকৃতজ্ঞ সাজা তাহাদের উপরে নির্ভর করে। আল্লাহ্ প্রদত্ত শক্তির তাহারা সদ্ব্যবহার করিয়া কল্যাণের অনুসরণ করিতে পারে অথবা বিভ্রান্তির পথে গা ঢালিয়া দিতে পারে। (—সূরা দাহর ঃ আয়াত ২-৩)

اَلَمْ نَجْعَلْ لَّهٗ عَيْنَيْنِ - وَلِسَانًا وَّ شَفَتَيْنِ - وَهَدَيْنٰهُ النَّجْدَيْنِ - (٩٠ : ٨ - ١٠)

—আমি কি তাহাদের দুই চোখ, জিহবা ও দুই ঠোঁট দান করি নাই (যদ্দ্বারা তাহারা দেখে ও কথাবার্তা বলে) ? তারপর তাহাদিগকে কি ভাল-মন্দ উভয় পথ দেখাইয়া দেই নাই ? (—সূরা বালাদ ঃ আয়াত ৮-১০)

وَجَعَلَ لَكُمُ السَّمْعَ وَالْاَبْصَارَ وَالْاَفْئِدَةَ - لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُوْنَ - (١٦ : ٧٨)

—আর আল্লাহ্ তা'আলা তোমাদের শোনার, দেখার ও অনুভবের জন্য কান, চোখ ও মন (জ্ঞান) দান করিয়াছেন, যেন তোমরা কৃতজ্ঞ থাক (কিন্তু খুবই কম লোক তাহা থাকিতেছ)। (—সূরা নহল ঃ আয়াত ৭৮)

এই সব আয়াত ও সমার্থক অন্যান্য আয়াতে ইন্দ্রিয়শক্তি ও চিন্তা শক্তির পথনির্দেশের দিকে ইঙ্গিত দান করা হইয়াছে। কিন্তু যে সব স্থানে মানুষের আত্মিক কল্যাণ-অকল্যাণের উল্লেখ করা হইয়াছে, সেখানে ওহী ও নবুয়তের পথনির্দেশ সম্পর্কে বলা হইয়াছে ঃ

اِنَّ عَلَيْنَا لَلْهُدٰى - وَاِنَّ لَنَا لَلْاٰخِرَةَ وَالْاُوْلٰى - (٩٢ : ١٢ - ١٣)

—নিশ্চয়ই পথপ্রদর্শন করাটা আমার দায়িত্ব এবং অবশ্যই দুনিয়া ও আখিরাতে উভয়ই আমার জন্য অস্তিত্ব লাভ করিয়াছে। (—সূরা লায়ল ঃ আয়াত ১২-১৩)

وَاَمَّا ثَمُوْدُ فَهَدَيْنٰهُمْ فَاسْتَحَبُّوا الْعَمٰى عَلَى الْهُدٰى - (٤١ : ١٧)

—অনন্তর সামুদ জাতিকে আমি হিদায়ত পাঠাইয়াছি। তাহারা হিদায়তের পথ ছাড়িয়া অন্ধ সাজাই ভাল মনে করিয়াছে। (—সূরা হামীম ঃ আয়াত ১৭)

وَالَّذِيْنَ جَاهَدُوْا فِيْنَا لَنَهْدِيَنَّهُمْ سُبُلَنَا - وَاِنَّ اللّٰهَ لَمَعَ الْمُحْسِنِيْنَ - (٢٩ : ٦٩)

—যাহারা আমাকে পাবার জন্য সাধনা করিয়াছে, তাহাদের পথপ্রদর্শন করা আমার অবশ্য কর্তব্য হইয়া দাঁড়ায়। নিশ্চয়ই আল্লাহ্ ভাল বান্দাদের সঙ্গে থাকেন। (—সূরা আন্‌কাবুত ঃ আয়াত ৬৯)

আল্-হুদা

আল্লাহ্‌র হিদায়ত

বস্তুত এ ব্যাপারে কুরআন হিদায়তের উল্লেখ করিয়াছে। উহার নাম দিয়াছে আল-হুদা।

قُلْ اِنَّ هُدَى اللّٰهِ هُوَ الْهُدٰى - وَاُمِرْنَا لِنُسْلِمَ لِرَبِّ الْعَالَمِيْنَ - (٦ : ٧١)

—হে রাসূল ! জানাইয়া দাও, নিশ্চয়ই মূল হিদায়ত হইল 'আল্-হুদা' (আল্লাহ্‌র পথনির্দেশ)। আর আমাদের এই নির্দেশই দান করা হইয়াছে যে, নিখিল সৃষ্টির প্রতিপালকের কাছে আত্মসমর্পণ করিতে হইবে। (—সূরা আন'আম ঃ আয়াত ৭১)

وَلَنْ تَرْضٰى عَنْكَ الْيَهُوْدُ وَلاَ النَّصٰرٰى حَتّٰى تَتَّبِعَ مِلَّتَهُمْ - قُلْ اِنَّ هُدَى اللّٰهِ هُوَ الْهُدٰى - (٢ : ١٢)

—(স্মরণ রাখিও) ইহুদী ও নাসারারা কিছুতেই তোমার উপরে খুশি থাকিবে না, যতক্ষণ না তুমি তাহাদের ধর্ম মানিয়া লও। তুমি বলিয়া দাও, সত্যিকারের পথের নির্দেশ তো আল্লাহ্‌র পথনির্দেশ।

এই আল্-হুদা বা সত্যিকারের একক আন্তর্জাতিক পথনির্দেশটি কি ? কুরআন বলে, তাহা হইল আল্লাহ্‌র ওহীর বিশ্বজনীন পথনির্দেশ। উহা পৃথিবীতে প্রথম দিন হইতেই বিদ্যমান ছিল এবং বর্ণ, গোত্র, সম্প্রদায় ও জাতি নির্বিশেষে সকলের জন্যই তাহা আসিয়াছে। ইন্দ্রিয় ও জ্ঞান শক্তির হিদায়তের যেরূপ স্থান, কাল, পাত্র নির্বিশেষের জন্য দান করা হইয়াছে, ইহাও তেমনি। আর আল্লাহ্‌র নির্দেশিত পথ ভিন্ন অন্য যত পথ দেখা যায়, সবই মানুষের মনগড়া ও ভ্রান্তিপূর্ণ। সুতরাং উহাই একক সত্য পথ।

তাই কুরআন এই মূল হিদায়ত ভিন্ন সব ধরনের হিদায়তই বাতিল বলিয়া ঘোষণা করে। বিভিন্ন গোত্র, সম্প্রদায় ও জাতি যে নিজেদের খেয়াল-খুশির হিদায়ত মানিয়া কল্যাণ ও মুক্তির কুঞ্জী প্রত্যেকের পকেটে আছে বলিয়া প্রচার করে, কুরআন তাহার সত্যতা অস্বীকার করে। এইজন্য সে একমাত্র সত্য হিদায়তের নাম দিয়াছে 'আদ্ দীন' (একমাত্র জীবন ব্যবস্থা) বা আল্-ইসলাম (আল্লাহ্‌র আত্মসমর্পণ নীতি)।

ধর্মীয় ঐক্যের শ্রেষ্ঠতম সূত্র ও কুরআন

কুরআনের ডাকের সর্বপ্রথম ভিত্তি হইল ধর্মীয় ঐক্য। সে যাহা কিছু বলিতে চাহিয়াছে, সব কিছুই এই সূত্রকে ভিত্তি করিয়া বলিয়াছে। ইহা বাদ দিলে তাহার আহ্‌বানের গোটা কারখানাই লণ্ডভণ্ড হইয়া যায়। কিন্তু বিশ্বের ইতিহাসের আশ্চর্য গতিবিধি প্রমাণ করে যে, কুরআন এই সূত্রটির উপরে যতখানি জোর দিয়াছে, পৃথিবীর মানুষ ততখানিই জোরের সহিত ইহা উপেক্ষা করিয়াছে। এমন কি বলা চলে, এই সত্যটির মত কুরআনের আর কোন সত্যই বিশ্ববাসীর চোখের আড়ালে লুকায় নাই। যদি কেহ সর্বপ্রভাবমুক্ত হইয়া কুরআন অধ্যযন করে, আর বিভিন্ন স্থানে এই সেরা সূত্রটির সুস্পষ্ট ঘোষণা পাঠ করে, তারপর একবার দুনিয়ার উপরে দৃষ্টিপাত করে, তাহা হইলেই সে আমার বক্তব্যের সত্যতা বুঝিবে। কুরআনকে যদি সে দুনিয়ার বহু সম্প্রদায়ের একবার জন্মদাতা ছাড়া আর কিছু মনে নাও করে, নিশ্চয়ই সেও আকুল কণ্ঠে আওয়াজ তুলিবে, হয় দুনিয়ার দৃষ্টি দুনিয়াকে ধোঁকা দিয়াছে, নতুবা দুনিয়া সর্বদা চোখ না খুলিয়াই সিদ্ধান্ত গ্রহণ করিয়া থাকে।

ধর্মের মূলকথা ও কুরআন মজীদ

এ সত্যটির বিশ্লেষণের প্রাক্কালে ওহী ও নবুয়ত অর্থাৎ দীনের ব্যাপারে কুরআনের বক্তব্য কি এবং কোন্ পথে সে মানব জাতিকে নিয়া যাইতে চায়, তাহা সুস্পষ্টভাবে আলোচনা করা দরকার।

এই অধ্যায়ে কুরআন মজীদ যাহা কিছু বলিয়াছে, তাহার মর্ম নিম্নে উদ্ধৃত হইল।

কুরআন বলে, আদি মানুষেরা সহজাত সরল জীবন যাপন করিত। দলাদলি, ঝগড়াঝাটি কিছুই ছিল না। সবার জীবন একই ধরনের সাদাসিধা ছিল, নিজকে লইয়াই সবাই তৃপ্ত ছিল। তারপর মানব সন্তান বাড়িয়া চলিল। সঙ্গে সঙ্গে জীবন ও জীবিকার ব্যাপ্তি ও জটিলতা বাড়িয়া চলিল। তাহাতে বিভিন্নতা দেখা দিল। ফলে বিভেদ-বিচ্ছেদ ও হাঙ্গামা-অত্যাচার দেখা দিতে লাগিল। একদল আরেক দলকে ঘৃণার চোখে দেখিতে লাগিল। বড়রা ও সবলরা দুর্বলের অধিকার পয়মাল করিয়া চলিল। অবস্থাদৃষ্টে প্রয়োজন হইয়া দাঁড়াইল পথপ্রদর্শন আর জ্ঞান ও সততা প্রতিষ্ঠার জন্য আল্লাহ্‌র ওহী আত্মপ্রকাশ করা। বস্তুত এই আলো আসিল এবং আল্লাহ্‌র রাসূলদের আহ্‌বান ও প্রচারের ধারা প্রতিষ্ঠিত হইল। রাসূল অর্থ হইল (আল্লাহ্‌র) বাণীবাহক। তাই যাহাদের মাধ্যমে তিনি স্বীয় পথপ্রদর্শনের ধারা প্রবর্তন করিলেন, তাহাদের নাম দিলেন রাসূল।

وَمَا كَانَ النَّاسُ اِلاَّ اُمَّةً وَّاحِدَةً فَاخْتَلَفُوْا - وَ لَوْ لاَكَلِمَةٌ سَبَقَتْ مِنْ رَّبِّكَ لَقُضِىَ بَيْنَهُمْ فِيْمَا فِيْهِ يَخْتَلِفُوْنَ - (١٠ : ١٩)

—আর শুরুতে সব মানুষই এক দলভুক্ত ছিল। তারপর তাহারা পরস্পর বিচ্ছিন্ন হইল। যদি তোমার প্রভুর পূর্ব সিদ্ধান্ত না থাকিত, তাহা হইলে দুনিয়ায়ই তাহাদের বিরোধের মীমাংসা করা হইত। (—সূরা য়ুনুস ঃ আয়াত ১৯)

كَانَ النَّاسُ اُمَّةً وَّاحِدَةً - فَبَعَثَ اللّٰهُ النَّبِيّٖنَ مُبَشِّرِيْنَ وَمُنْذِرِيْنَ - وَ اَنْزَلَ مَعَهُمُ الْكِتَابَ بِالْحَقِّ لِيَحْكُمَ بَيْنَ النَّاسِ فِيْمَا اخْتَلَفُوْا فِيْهِ - (٢ : ٢١٣)

—শুরুতে সব ছিল একদল। তারপর বিরোধ ও মতানৈক্য দেখা দিল। আল্লাহ্ তখন একের পর এক নবী পাঠাইতে লাগিলেন। তাঁহারা (ভাল কাজের জন্য) সুসংবাদ দিতেন এবং (মন্দ কাজের বিরুদ্ধে) সতর্ক করিতেন। তাঁহাদের সঙ্গে 'আল-কিতাব' (ওহী-সংকলন) অবতীর্ণ করিয়াছি। মানুষ যেসব ব্যাপার লইয়া পরস্পর ঝগড়া করে, উহা তাহারই মীমাংসা-বিধান। (—সূরা বাকারা ঃ আয়াত ২১৩)

সার্বজনীন হিদায়ত

এই হিদায়ত কোন দেশ, কাল, পাত্রে সীমিত ছিল না বরং গোটা মানব জাতির জন্য ছিল। সর্বযুগে সব দেশে ইহা সমানভাবে আত্মপ্রকাশ করিয়াছে।

কুরআন বলে, পৃথিবীর কোন মনুষ্যপূর্ণ এলাকা নাই যেখানে আল্লাহ্ রাসূল পাঠান নাই।

وَاِنْ مِّنْ اُمَّةٍ اِلاَّ خَلاَ فِيْهَا نَذِيْرٌ - (٣٥ : ٢٤)

পৃথিবীতে এমন কোন জাতি নাই, যাহার কাছে (খারাপ কাজের বিরুদ্ধে) সতর্ককারী কোন আল্লাহ্র রাসূল প্রেরিত হন নাই। (—সূরা ফাতির ঃ আয়াত ২৪)

اِنَّمَا اَنْتَ مُنْذِرٌ وَّ لِكُلِّ قَوْمٍ هَادٍ - (١٣ : ٧)

—(হে রাসূল) তুমি সতর্ককারী ছাড়া অন্য কিছুই নহ। প্রত্যেক জাতির জন্য একজন পথপ্রদর্শক থাকে। (—সূরা রা'দ ঃ আয়াত ৭)

وَلِكُلِّ اُمَّةٍ رَّسُوْلٌ - فَاِذَا جَاءَ رَسُوْلُهُمْ قُضِيَ بَيْنَهُمْ بِالْقِسْطِ وَهُمْ لاَ يُظْلَمُوْنَ - (١٠ : ٤٧)

—আর প্রত্যেক জাতির জন্য একজন রাসূল থাকে। যখন সেই রাসূল আবির্ভূত হয়, তখন সব সমস্যা ও বিরোধের মীমাংসা করা হয়। (—সূরা য়ুনুস ঃ আয়াত ৪৭)

প্রাথমিক যুগের নবী

কুরআন বলে, প্রাথমিক যুগে একের পর এক বহু নবী প্রেরিত হইয়াছিলেন। তাঁহারা বিভিন্ন জাতিকে সত্য পথপ্রদর্শন করিয়াছেন।

وَ كَمْ اَرْسَلْنَا مِنْ نَّبِيٍّ فِى الْاَوَّلِيْنَ - (٤٣ : ٦)

—আর প্রাথমিক যুগে আমি অনেক নবীই প্রেরণ করিয়াছিলাম। (—সূরা যুখরুফ ঃ আয়াত ৬)

নবী প্রেরণ আল্লাহ্র ইনসাফের নিদর্শন

কুরআন বলে, কোন জাতি সতর্কবাণী না পাওয়া সত্ত্বেও অন্যায়ের জন্য আল্লাহ্র দরবারে জবাবদিহি হইবে, ইহা ন্যায়বিচারের নীতি-বিরোধী অর্থাৎ রাসূল না পাঠাইয়া কোন জাতিকে অন্যায়ের জন্য জবাবদিহি করা আল্লাহ্ তা'আলা ইন্সাফসম্মত মনে করেন নাই।

وَمَا كُنَّا مُعَذِّبِيْنَ حَتّٰى نَبْعَثَ رَسُوْلاً - (١٧ : ١٥)

—(আমার নীতি হইল এই) যতক্ষণ আমি নবী পাঠাইয়া পথপ্রদর্শন না করি, ততক্ষণ আমি শাস্তি দিতে রাযী নহি। (—সূরা বনী 'ইসলাইল ঃ আয়াত ১৫)

وَمَا كَانَ رَبُّكَ مُهْلِكَ الْقُرٰى حَتّٰى يَبْعَثَ فِىْ اُمِّهَا رَسُوْلاً يَّتْلُوْا عَلَيْهِمْ اٰيٰتِنَا- وَمَا كُنَّا مُهْلِكِى الْقُرٰى اِلاَّ وَ اَهْلُهَا ظَالِمُوْنَ - (٢٨ : ٥٩)

—(আর স্মরণ রাখিও) তোমার প্রভু পাপাচারের জন্য কোন বস্তিই ধ্বংস করিবেন না, যতক্ষণ তিনি (তাহাদের পথ দেখাইবার) নবী পাঠাইয়া সেখানে আল্লাহ্‌র বাণী প্রচার না করেন। আর আমি কখনও কোন বস্তি ধ্বংস করি না, যদি না উহার বাসিন্দারা অত্যাচারকে জাতীয় চরিত্র হিসাবে গ্রহণ করে। (—সূরা কাসাস ঃ আয়াত ৫৯)

আল্লাহ্‌র এই সব রাসূল ও সত্যের আহ্বায়কদের কতিপয়ের উল্লেখ কুরআনে রহিয়াছে এবং অনেকেরই নাম উল্লেখ করা হয় নাই।

وَلَقَدْ اَرْسَلْنَا رُسُلاً مِّنْ قَبْلِكَ مِنْهُمْ مَّنْ قَصَصْنَا عَلَيْكَ وَمِنْهُمْ مَّنْ لَّمْ نَقْصُصْ عَلَيْكَ – (٤٠ : ٧٨)

—আর (হে রাসূল) আমি তোমার আগেও অনেক রাসূল পাঠাইয়াছিলাম। তাহাদের কতিপয়ের কথা তো তোমাকে বলিয়াছি এবং অনেকের কথাই তোমাকে জানাই নাই। (—সূরা মু'মিন ঃ আয়াত ৭৮)

অসংখ্য জাতি ও অসংখ্য রাসূল

নূহের কওম এবং আদ ও সামূদ জাতির পরে কত জাতিই যে পৃথিবীতে আসিয়াছিল, আর কত নবীই যে প্রেরিত হইয়াছিল, তাহার সংখ্যা কেবল আল্লাহ্‌ই জানেন।

اَلَمْ يَاْتِكُمْ نَبَؤُا الَّذِيْنَ مِنْ قَبْلِكُمْ قَوْمِ نُوْحٍ وَّ عَادٍ وَّ ثَمُوْدَ – وَالَّذِيْنَ مِنْ بَعْدِهِمْ – لَايَعْلَمُهُمْ اِلاَّ اللّٰهُ – جَاءَتْهُمْ رُسُلُهُمْ بِالْبَيِّنٰتِ فَرَدُّوْا اَيْدِيَهُمْ فِىْ اَفْوَاهِهِمْ – (١٤ : ٩)

—তোমার আগের জাতিগুলির খবর জানিতে পাও নাই। নূহের কওম, আদ ও সামূদের কওম এবং তাহাদের পরবর্তী এরূপ অসংখ্য কওম, যাহাদের সঠিক সংখ্যা আল্লাহ্ ছাড়া কাহারো জানা নাই, তাহাদের সকল কওমের ভিতরেই সত্যের আলোবাহী রূপে নবী আবির্ভূত হইয়াছিল। অথচ তাহারা মূর্খতা ও অহংকারে ডুবিয়া নবীর শিক্ষা উপেক্ষা করিয়াছিল। (—সূরা ইব্‌রাহীম ঃ আয়াত ৯)

হিদায়ত সর্বদাই এক ধরনের ছিল

নিখিল সৃষ্টির প্রতিটি এলাকায় খোদায়ী প্রকৃতির বিধান সমান। উহা না একাধিক হইতে পারে, না পরস্পর বিরোধী হইতে পারে। সুতরাং আল্লাহ্‌র হিদায়তও শুরু হইতে একই রূপ হওয়া অপরিহার্য ছিল এবং সমগ্র মানব জাতির উদ্দেশ্যে আল্লাহ্‌র আহবান একই ধরনের হওয়া দরকার ছিল। বস্তুত কুরআন বলে, আল্লাহ্‌র যত নবী ছিলেন, আর যে যুগেই যাঁহারা আসিয়াছিলেন, সবার পথ একই ছিল। সবাই আল্লাহ্‌র একমাত্র সার্বজনীন কল্যাণের শিক্ষা দান করিতেন। এই বিশ্বজনীন কল্যাণের সংবিধানটি

কি ? আল্লাহ্‌র বিশ্বাস ও ভাল কাজের বিধান। অর্থাৎ একমাত্র বিশ্বপালকের অর্চনা করা আর পুণ্য জীবন-যাপন করা। ইহা ছাড়া এবং ইহার বিপরীত যত কিছু দেখা যায়, তাহা সত্য ধর্মের শিক্ষা হইতে পারে না।

وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِىْ كُلِّ اُمَّةٍ رَّسُوْلاً اَنِ اعْبُدُوْا اللّٰهَ وَاجْتَنِبُوْا الطَّاغُوْتَ - (١٦ : ٣٦)

—আর সন্দেহ নাই যে, আমি পৃথিবীর সকল জাতির কাছেই রসূল পাঠাইয়াছি (যাহাদের শিক্ষা ছিল এই) যেন মানুষ আল্লাহ্‌র অর্চনা করে এবং 'তাগূত' অর্থাৎ নাফরমানী ও পাপাচারের কবল হইতে পরিত্রাণ লাভ করে। (—সূরা নহল ঃ আয়াত ৩৬)

وَمَا اَرْسَلْنَا مِنْ قَبْلِكَ مِنْ رَّسُوْلٍ اِلاَّ نُوْحِىْ اِلَيْهِ اَنَّهٗ لاَ اِلٰهَ اِلاَّ اَنَا فَاعْبُدُوْنِ - (٢١ : ٢٥)

—হে রাসূল ! তোমার আগে এমন কোন নবী পাঠাই নাই, যাহাকে তোমার অনুরূপ শিক্ষামূলক ওহী পাঠানো হয় নাই। তাহা এই, আমি আল্লাহ্ ছাড়া আর কোন প্রভু নাই। তাই আমারই শুধু ইবাদত কর। (—সূরা আম্বিয়া ঃ আয়াত ২৫)

সবাই একই শিক্ষায় সংঘবদ্ধ করিতে চাহিয়াছেন

কুরআন বলে, পৃথিবীতে কোন ধর্ম প্রবর্তকই এরূপ ছিলেন না, যিনি একই ধর্মের পতাকাতলে বিশ্ব-মানবকে সংঘবদ্ধ হইতে এবং সকল বিরোধ মিটাইয়া ফেলিতে আহ্‌বান জানান নাই। সবারই শিক্ষা এই ছিল, 'দুনিয়ার বিক্ষিপ্ত মানুষগুলিকে সংঘবদ্ধ করার জন্যই আল্লাহ্‌র ধর্ম আসিয়াছে, বিভেদ সৃষ্টির জন্য নহে। সুতরাং একই প্রভুর অর্চনায় বিশ্বের সকল মানুষ ঐক্যবদ্ধ হও এবং বিভেদ-বিরোধ ভুলিয়া প্রীতি ও ঐক্যের পথ অনুসরণ কর।

وَاِنَّ هٰذِهٖ اُمَّتُكُمْ اُمَّةً وَّاحِدَةً وَّ اَنَا رَبُّكُمْ فَاتَّقُوْنِ - (٢٣ : ٥٢)

—আর (দেখ) তোমাদের এই জাতিগুলি মূলত একই জাতি এবং আমি তোমাদের সকলেরই প্রতিপালক প্রভু। সুতরাং (আমারই অর্চনার পথে তোমরা ঐক্যবদ্ধ হও এবং) নাফরমানী হইতে বাঁচ। (—সূরা মু'মিনুন ঃ আয়াত ৫২)

কুরআন বলে, আল্লাহ্ তোমাদের একই মানুষের বেশ দান করিয়াছিল। কিন্তু তোমরা ভিন্ন ভিন্ন বেশ ধারণ করিয়াছ। এভাবে একক মানবজাতিকে তোমরা শতধা ছিন্ন করিয়াছ। তোমাদের বিভিন্ন গোত্র ভিন্ন ভিন্ন নামে পৃথক হইয়া গিয়াছ। বহু দেশের আওতায় বিভক্ত হইয়াছ। তারপর একদল আরেক দলের সঙ্গে কলহে লিপ্ত হইয়াছ। তোমরা একই মানব এভাবে গোত্র, দল, দেশ, ভাষা, বর্ণ, ধনী, গরীব, প্রভু,

ভৃত্য, আশ্‌রাফ, আতরাফ ইত্যাকার অসংখ্য ভাগে বিভক্ত হইয়াছ। আর সেইগুলি এমন সম্পর্ক যাহা মানুষকে একত্র হইতে দেয় না। সুতরাং এমন কোন্ সম্পর্ক আছে যাহা পৃথিবীর সকল মানুষকে এক করিতে পারে ?

কুরআন বলে, সেজন্য শুধু একটি সম্পর্ক আছে তাহা হইল আল্লাহ্ অর্চনার পবিত্র সম্পর্ক। তোমরা যে গোত্রের, বর্ণের, দেশের, ভাষার অন্তর্ভুক্তই হও না কেন, একই প্রভুর দাস হিসাবে সবাই এক ও অবিচ্ছেদ্য হইতে পার। একই প্রভুর বিধান অনুসারে একই রূপ জীবনধারা অনুসরণ করিয়া চলিতে পার। কেবলমাত্র এই একক প্রভুর সহিত সম্পর্কের ভিত্তিতে তোমরা সব বিরোধ-বিচ্ছেদ ভুলিয়া একাকার হইতে পার। তখন তোমরা অনুভব করিতে পারিবে, দুনিয়া তোমাদের দেশ, গোটা মানবজাতি তোমাদের পরিবারভুক্ত এবং তোমাদের সবাই একই প্রতিপালক প্রভুর প্রজা।

কুরআন আরও বলে, আল্লাহ্‌র সব রাসূলের শিক্ষাই ছিল যে, আদ্‌দীন'কে ভিত্তি করিয়া দুনিয়ার সব মানুষ এক হইয়া যাও। এই পথ যেন কখনও বিভিন্ন না হয়।

شَرَعَ لَكُمْ مِّنَ الدِّيْنِ مَا وَصّٰى بِهٖ نُوْحًا وَّ الَّذِىْ اَوْحَيْنَا اِلَيْكَ وَمَا وَصَّيْنَا بِهٖ اِبْرَاهِيْمَ وَ مُوْسٰى وَعِيْسٰى اَنْ اَقِيْمُوْا الدِّيْنَ وَلاَ تَتَفَرَّقُوْا فِيْهِ - (٤٢ : ١٣)

—আর (দেখ) তিনি তোমাদের জন্য জীবন ব্যবস্থার সেই একক পথ নির্ধারিত করিয়াছেন, যাহার সম্পর্কে নূহকে ওসীয়াত করা হইয়াছিল। যাহার উপরে চলার জন্য ইব্‌রাহীম, মূসা ও ঈসাকে নির্দেশ দেওয়া হইয়াছিল। তাঁহাদের সবাইর শিক্ষা ইহাই ছিল যে, আল্লাহ্‌র সেই একই দীনে'র উপরে প্রতিষ্ঠিত থাকিবে এবং বিভিন্ন পথে বিচ্ছিন্ন হইয়া যাইবে না। (—সূরা শুরা ঃ আয়াত ১৩)

এই ভিত্তিতেই কুরআন দলীল পেশ করে যে, যদি তোমরা আমার শিক্ষার সত্যতা অস্বীকার কর, তাহা হইলে যে কোন ঐশী গ্রন্থ দ্বারা প্রমাণ কর যে, সত্য ধর্মের পথ ইহা ছাড়া অন্য কিছু হইতে পারে। তোমরা যে কোন ধর্মের মূল শিক্ষা লক্ষ করিলে দেখিবে, সকল ধর্মেরই মূল শিক্ষা এক।

قُلْ هَاتُوْا بُرْهَانَكُمْ - هٰذَا ذِكْرُ مَنْ مَّعِىَ وَ ذِكْرُ مَنْ قَبْلِىْ - بَلْ اَكْثَرُهُمْ لاَيَعْلَمُوْنَ الْحَقَّ فَهُمْ مُّعْرِضُوْنَ - وَمَا اَرْسَلْنَا مِنْ قَبْلِكَ مِنْ رَّسُوْلٍ اِلاَّ نُوْحِىْ اِلَيْهِ اَنَّهٗ لاَ اِلٰهَ اِلاَّ اَنَا فَاعْبُدُوْنِ - (٢١ : ٢٤ - ٢٥)

—হে রাসূল ! তাহাদের বলিয়া দাও, (যদি তোমরা আমার শিক্ষাকে অস্বীকার কর) তাহা হইলে, সেইজন্য দলীল পেশ কর। যে শিক্ষা আমি দিতেছি, আমার সঙ্গীদের কাছে তাহা বিদ্যমান আর সেই সব শিক্ষাও বিদ্যমান আছে, যাহা

আমার পূর্ববর্তীরা দিয়া গিয়াছেন। তোমরা তাহা হইতে প্রমাণ দাও যে, তাঁহাদের কেহ আমার বিপরীত শিক্ষা দান করিয়া গিয়াছেন। আসল কথা এই, সত্য অস্বীকারকারীদের অধিকাংশই এরূপ, যাহারা আসল ব্যাপারের সঙ্গে পরিচয়ই রাখে না। এইজন্যই তাহারা সত্য হইতে ঘাড় ফিরাইয়া রাখে। হে রাসূল ! বিশ্বাস কর, আমি তোমার আগে এমন কোন নবী পাঠাই নাই যাহাকে আমার প্রভুত্ব অর্চনার শিক্ষা ভিন্ন অন্য কোন শিক্ষা দান করা হইয়াছে। (—সূরা আম্বিয়া ঃ আয়াত ২৪-২৫)

শুধু তাহাই নহে, সে চ্যালেঞ্জ প্রচার করিতেছে, শিক্ষা ও জ্ঞানের কোন একটি বর্ণনা দ্বারা প্রমাণ করিয়া দেখাও যে, আমার প্রদত্ত শিক্ষাই অতীতের সব শিক্ষার মূল ছিল না।

ائْتُونِي بِكِتَابٍ مِّنْ قَبْلِ هَٰذَا أَوْ أَثَارَةٍ مِّنْ عِلْمٍ إِنْ كُنْتُمْ صَادِقِينَ – (٤٢ : ٤)

যদি তোমাদের অস্বীকার কার্যটি সত্যভিত্তিক হয়, তাহা হইলে অতীতে অবতীর্ণ যে কোন বাণী কিংবা জ্ঞান ও শিক্ষার যে কোন বর্ণনা দ্বারা তাহা প্রমাণ কর।

ঐশী গ্রন্থের পারস্পরিক স্বীকৃতি

এই ভিত্তিতেই কুরআন দুনিয়ার সকল ঐশী গ্রন্থের একটির অপরটিকে স্বীকৃতি দানের দলীল প্রমাণ করিতেছে। কুরআন বলিতেছে, সেইগুলির প্রত্যেকটির শিক্ষা অন্যগুলির শিক্ষাকে স্বীকৃতি জানায়। যখন একটি শিক্ষা অপরটিকে নীতিগতভাবে সমর্থন করে, তখন বুঝা যায় যে, এই সকল শিক্ষার ভিতরে একটি মৌলিক ঐক্যসূত্র রহিয়াছে। কারণ, বিভিন্ন এলাকায়, বিভিন্ন ভাষায়, বিভিন্ন নামে, বিভিন্ন ধরনে, বিভিন্ন ভাষায় যে কথা বলা হইয়াছে, এত ধরনের বিভিন্নতার ভিতর দিয়াও যখন উহার মূল সুর একই রহিয়াছে, একই কথার উপরে সব গুরুত্ব আরোপিত হইয়াছে, তখন স্বভাবতই তোমাদের মানিতে হইবে যে, এরূপ একটি কথা কিছুতেই সত্য না হইয়া পারে না।

نَزَّلَ عَلَيْكَ الْكِتَابَ بِالْحَقِّ مُصَدِّقًا لِّمَا بَيْنَ يَدَيْهِ وَأَنْزَلَ التَّوْرَاةَ وَالْإِنْجِيلَ – مِنْ قَبْلُ هُدًى لِّلنَّاسِ – (٣ : ٣)

হে রাসূল ! আল্লাহ্ তোমার উপরে এরূপ সত্যভিত্তিক গ্রন্থ অবতীর্ণ করিয়াছেন যাহা পূর্ববর্তী ঐশী গ্রন্থগুলির সত্যতা ঘোষণা করে। এই ভাবে তিনি মানুষকে পথ দেখাইবার জন্য তাওরাত ও ইঞ্জীল অবতীর্ণ করিয়াছেন। (—সূরা আল ইমরান : আয়াত ৩)

وَآتَيْنَاهُ الْإِنْجِيلَ فِيهِ هُدًى وَّ نُورٌ – وَّ مُصَدِّقًا لِّمَا بَيْنَ يَدَيْهِ مِنَ التَّوْرَاةِ – (٧ : ٤٦)

—আমি ঈসাকে ইঞ্জীল দান করিয়াছি। উহাতে মানুষের জন্য হিদায়ত ও আলো ছিল। আর উহার আগে যে তাওরাত অবতীর্ণ হইয়াছিল, সেই স্বীকৃতিও উহাতে আছে। (—সূরা মায়িদা ঃ আয়াত ৪৬)

এ কারণেই আমরা দেখিতে পাই, কুরআনের বর্ণনা ও উপদেশাবলির ভিতরে অতীতের হিদায়তগুলির উল্লেখ রহিয়াছে। সেইগুলির ভিতরকার ঐক্য, সঙ্গতি ও একক শিক্ষার দ্বারা কুরআন স্বীয় প্রচারিত মতবাদের সকল দিক প্রমাণ করিয়া থাকে।

একমাত্র মতবাদ-একক বিধান

প্রশ্ন জাগে, গোটা মানবজাতির জন্য মতবাদ যদি একটিই হয় আর সকল ধর্ম প্রবর্তক যদি একই ভিত্তি ও বিধান শিক্ষা দিয়া থাকেন, তাহা হইলে ধর্মে ধর্মে এত অনৈক্য কেন ? কেন সব ধর্মে একই ধরনের হুকুম-আহ্‌কাম, একই রূপ কার্যবিধি, একই প্রকারের রীতি-নীতি দেখিতেছি না ? কেন এক এক ধর্মের কেন্দ্রভূমি, উপাসনা, পদ্ধতি, বিধি-বিধান এক এক রকম দেখা যায় ?

পার্থক্য মূলে নহে—প্রশাখায়

কুরআন বলে, ধর্মের মতানৈক্য দুই ধরনের। এক তো ধর্মানুসারীরা মূল শিক্ষা ভুলিয়া গিয়া সৃষ্টি করে। দ্বিতীয়, আদপেই ধর্মের বিধানের ব্যাপারে একটি অপরটির সহিত বিভিন্নতা রাখে। যেমন উপাসনা পদ্ধতি সব ধর্মের এক নহে। বস্তুত এই ধরনের পার্থক্যের প্রথমটি তো ধর্মের নহে, ধর্মানুসারীর আর দ্বিতীয় পার্থক্যটি মূল ধর্মের নহে—শাখা-প্রশাখার, অন্তরের নহে—বাহিরের। এরূপ পার্থক্য থাকার প্রয়োজন ছিল।

কুরআন বলে, ধর্মের শিক্ষার দুইটি দিক। এক তো ধর্মের প্রাণশক্তি। দ্বিতীয় হইল ধর্মের বাহ্যিক রূপ। প্রথমটি হইল মূল দ্বিতীয়টি শাখা। প্রথমটিকেই 'দীন' বলা হয়, দ্বিতীয়টি 'শরা'। এইটিকে 'নুছুক' এবং 'মিনহাজ'ও বলা হয়। 'শরা' ও 'মিনহাজ' অর্থ পথ এবং নুছুক অর্থ উপাসনা পদ্ধতি। তারপর 'শরা' পরিভাষারূপে ধর্মীয় বিধি-বিধান অর্থে ব্যবহৃত হইল আর 'নুছুক' ইবাদত অর্থে ব্যবহৃত হইল। ধর্মের ভিতরে পার্থক্য যতটুকু দেখা যায় তাহা দীন বা মতবাদের নহে বরং পথ ও পদ্ধতির অর্থাৎ স্বরূপে নহে—রূপে, ইহার দরকার ছিল। কারণ ধর্মের উদ্দেশ্য মানবজাতির সঠিক কল্যাণ দান ও সংশোধন। সকল যুগের সব মানুষের অবস্থা ও প্রয়োজন একরূপ ছিল না। এক এক যুগের মানুষের জীবন ও জীবিকা, চিন্তা ও কর্ম এক এক রূপ দেখা দিত। সব দেশের মানুষের প্রকৃতিও এক এক ছিল না। সুতরাং যেই যুগে যেরূপ পরিবেশে সত্য ধর্ম আত্মপ্রকাশ করিল, পথ ও পদ্ধতি সেই অনুসারে প্রদত্ত হইল। ফলে প্রত্যেকটি ধর্ম উহার নির্দিষ্ট সীমারেখায় যথাযথই ছিল। তাহা ছাড়া মানুষের ধারাবাহিক অস্তিত্বের ধারায় স্থান ও কালের প্রভাবে যত বৈচিত্র্য ও পার্থক্য দেখা দিয়াছে, সেই তুলনায় ধর্মের এই বাহ্যিক পার্থক্য আদৌ গুরুত্ব রাখে না।

لِكُلِّ اُمَّةٍ جَعَلْنَا مَنْسَكًا هُمْ نَاسِكُوْهُ فَلاَ يُنَازِعُنَّكَ فِى الْاَمْرِ وَادْعُ اِلٰى رَبِّكَ - اِنَّكَ لَعَلٰى هُدًى مُّسْتَقِيْمٍ - (٢٢ : ٦٧)

—হে রাসূল ! আমি প্রত্যেক সম্প্রদায়ের জন্যই ইবাদতের এক বিশেষ পদ্ধতি রাখিয়াছি। তাহারা সেই সব পথে চলিতেছে। সুতরাং তোমার সহিত তাহাদের ঝগড়া করা উচিত নহে। তুমি তাহাদিগকে তাহাদের একক প্রভুর দিকে ডাক। নিশ্চয়ই তুমি সঠিক পথে রহিয়াছ। (—সূরা হজ্জ ঃ আয়াত ৬৭)

কিবলা বদল ও কুরআনের ঘোষণা

কিবলা বদলের প্রশ্নটি যখন দেখা দিল অর্থাৎ ইসলামের পয়গম্বর (সা) যখন বায়তুল মুকাদ্দাস্ ছাড়িয়া কা'বা ঘরের দিকে মুখ করিয়া নামায আদায় করিতে শুরু করিলেন, তখন ইহা ইহুদী ও নাসারাদের জন্য বড়ই কষ্টদায়ক হইল। তাহাদের মতে ধর্মের সব কিছু এইসব বাহ্যিক আচার-অনুষ্ঠানের উপরে নির্ভরশীল ছিল ; আর সত্য-অসত্যের মাপকাঠিও তাহারা সেইগুলিকে মনে করিত। কিন্তু আমরা দেখিতেছি, কুরআন এই ব্যাপারটি সম্পূর্ণ আলাদা দৃষ্টিতে বিচার করিল। সে বলিল, তোমরা এই ব্যাপারটিকে এত গুরুত্ব দিতেছ কেন ? ইহা তো আর সত্য-মিথ্যার মাপকাঠি নয়। ধর্মের মূল সত্যের সহিতও ইহার কোন যোগ নাই। প্রত্যেক ধর্ম নিজ নিজ অবস্থা ও চাহিদা অনুসারে উপাসনার বিশেষ একটি পদ্ধতি অনুসরণ করিয়াছিল। অনুসারীরা সেইটিকেই আঁকড়াইয়া রহিয়াছে। উদ্দেশ্য তো সবারই এক। তাহা হইল অর্চনা ও ভাল কাজ করা। সুতরাং যে ব্যক্তি সত্যকামী, মূল উদ্দেশ্যের দিকে দৃষ্টিদানই তাহার কর্তব্য। মূলের ভিত্তিতেই তাহারা সব কিছু বিচার করিবে, বাহ্যিক আচরণ নিয়া নহে।

وَلِكُلٍّ وِجْهَةٌ هُوَ مُوَلِّيْهَا فَاسْتَبِقُوْا الْخَيْرَاتِ - اَيْنَ مَا تَكُوْنُوْا يَاْتِ بِكُمُ اللّٰهُ جَمِيْعًا اِنَّ اللّٰهَ عَلٰى كُلِّ شَىْءٍ قَدِيْرٌ - (٢ : ١٤٨)

—আর (দেখ) সকল সম্প্রদায়ের জন্যই উপাসনার একটি কেন্দ্রভূমি (কিবলা) রহিয়াছে। সেইদিকে মুখ করিয়া তাহারা উপাসনা করে। সুতরাং (এই ব্যাপারটিকে এত গুরুত্ব না দিয়া) পুণ্যের পথে একদল অপর দলকে অতিক্রম করিতে চেষ্টা কর (ইহাই ধর্মের সারকথা)। তোমরা যেখানেই থাক, আল্লাহ্ তোমাদের সবাইকে তাঁহার সম্মুখে একত্রে সমবেত করিবেন। নিশ্চয়ই আল্লাহ্র শক্তির বাহিরে কিছুই নাই। (—সূরা বাকারা ঃ আয়াত ১৪৮)

কুরআনের দৃষ্টিতে ধর্মবিশ্বাস ও কার্যাবলির সারকথা

এভাবে আরও আগে গিয়া সে সাফ ভাষায় আসল ধর্ম কি আর কিসে একটা মানুষ ধর্মের সুফল লাভ করিতে পারে তাহা জানাইয়া দিয়াছে। কুরআন বলে, একজন পূর্ব দিকে কিংবা পশ্চিম দিকে ফিরিয়া উপাসনা করিল, ইহাই ধর্ম নহে। ধর্মের সারকথা হইল, আল্লাহ্র অর্চনা ও সৎ জীবন যাপনের ক্ষেত্রে সে কতটুকু সফলতা

অর্জন করিল, তাহা বিবেচনা করা। আল্লাহ্‌র অর্চনা কি ও ভাল কাজ কাহাকে বলে, তাহাও সে খোলাখুলিভাবে বলিয়া দিতেছে।

لَيْسَ الْبِرَّ اَنْ تُوَلُّوْا وُجُوْهَكُمْ قِبَلَ الْمَشْرِقِ وَالْمَغْرِبِ وَلٰكِنَّ الْبِرَّ مَنْ اٰمَنَ بِاللّٰهِ وَالْيَوْمِ الْاٰخِرِ وَالْمَلٰئِكَةِ وَالْكِتَابِ وَالنَّبِيِّنَ - وَاٰتَى الْمَالَ عَلٰى حُبِّهٖ ذَوِى الْقُرْبٰى وَالْيَتٰمٰى وَالْمَسٰكِيْنَ وَابْنَ السَّبِيْلِ وَالسَّائِلِيْنَ وَفِى الرِّقَابِ - وَ اَقَامَ الصَّلٰوةَ وَاٰتَى الزَّكٰوةَ - وَالْمُوْفُوْنَ بِعَهْدِهِمْ اِذَا عٰهَدُوْا - وَالصّٰبِرِيْنَ فِى الْبَاْسَاءِ وَالضَّرَّاءِ وَحِيْنَ الْبَاْسِ - اُولٰئِكَ الَّذِيْنَ صَدَقُوا - وَ اُولٰئِكَ هُمُ الْمُتَّقُوْنَ - (٢ : ١٧٧)

—আর (দেখ) পুণ্য ইহাকে বলে না যে, তুমি পূর্ব দিকে বা পশ্চিম দিকে মুখ করিয়া উপাসনা করিতেছ (কিংবা এই ধরনের কোন বাহ্যিক আচার-অনুষ্ঠান সম্পাদন করিতেছ) পুণ্যের পথ হইল আল্লাহ্, পরকাল, ফিরিশতা, ঐশী গ্রন্থাবলি ও সব নবীর উপরে দৃঢ় আস্থা স্থাপন। আর নিজের সম্পদ আল্লাহ্‌র পথে অর্থাৎ আত্মীয়-স্বজন, ইয়াতীম, মিসকীন, মুসাফির ও ভিক্ষুককে দান এবং দাস ও বন্দী মুক্তির জন্য খরচ করা আর নামায কায়েম ও যাকাত আদায় করা, ওয়াদা রক্ষা করা, দুঃখ-কষ্টে বা ভয়-ভাবনায় ধৈর্য ধারণ করিযা সুস্থির থাকা। সুতরাং (স্মরণ রাখিও) এই সকল কার্য সম্পাদনকারীই সত্যিকারের ধর্ম পালন করিতেছে এবং ইহারাই অন্যায়-অধর্ম হইতে মুক্ত থাকিতেছে। (—সূরা বাকারা ঃ আয়াত ১৭৭)

যে গ্রন্থে তের শতাধিক বৎসর পূর্ব হইতে এই কথা বিদ্যমান, দুনিয়াবাসী যদি সেই গ্রন্থের আহবানের মূল উদ্দেশ্য বুঝিতে ব্যর্থ হইয়া থাকে, তাহা হইলে দুনিয়াবাসী আর কোন্ কথা বুঝিতে সক্ষম হইবে ?

শরীআতের পার্থক্য আল্লাহ্‌র অভিপ্রেত

সূরা মায়িদায় আমরা দেখিতেছি, বিশেষ এক ধারাবাহিকতার সহিত বিভিন্ন আহ্বান কার্যের উল্লেখ রহিয়াছে। তারপর সমগ্র মানবজাতিকে উদ্দেশ্য করিয়া বলা হইয়াছে ঃ

لِكُلٍّ جَعَلْنَا مِنْكُمْ شِرْعَةً وَّ مِنْهَاجًا - وَلَوْ شَاءَ اللّٰهُ لَجَعَلَكُمْ اُمَّةً وَّاحِدَةً وَّلٰكِنْ لِّيَبْلُوَكُمْ فِىْ مَا اٰتٰكُمْ فَاسْتَبِقُوا الْخَيْرٰتِ - (٥ : ٤٨)

—আমি তোমাদের প্রত্যেক সম্প্রদায়ের জন্য বিশেষ এক ধরনের শরীআত দান করিয়াছি, এক বিশেষ ধরনের পথ নির্দিষ্ট করিয়া দিয়াছি। যদি আল্লাহ্‌র ইচ্ছা থাকিত, তাহা হইলে শরীআতগুলিও একরূপ হইত ও সবাই একই সম্প্রদায়ভুক্ত হইত। কিন্তু এইটুকু পার্থক্য এইজন্য সৃষ্টি করা হইয়াছে যে, বিভিন্ন যুগের বিভিন্ন

অবস্থার সহিত খাপ খাওয়াইয়া ভিন্ন ভিন্ন শরীআত প্রবর্তন করা হইয়াছিল। বস্তুত ইহা তোমাদের জন্য একটা পরীক্ষা যে, তোমরা কি ধর্মের এই সব বাহ্যিক পার্থক্যের ফাঁদে আটকা পড়, না আল্লাহ্‌র নির্দেশিত কল্যাণের পথে পরস্পর প্রতিযোগিতা করিয়া ছুটিয়া চল। (—সূরা মায়িদা ঃ আয়াত ৪৭)

ধর্মানুসারীরা ধর্মের মৌলিক ঐক্য ভুলিয়া গিয়া বিধি-বিধানের পার্থক্যকে পারস্পরিক ঝগড়ার ভিত্তি করিয়া লইল। উপরোক্ত আয়াতের উপরে ভাসাভাসা দৃষ্টি বুলাইলে চলে না। ইহার প্রতিটি শব্দ লক্ষ করিলে দেখা যায়, কুরআন অবতীর্ণ হইবার মুহূর্তে পৃথিবীর সব ধর্মানুসারী ধর্মকে শুধু বাহ্যিক আচার-অনুষ্ঠানের ভিত্তিতেই দেখিত। ধর্মের উৎসাহ উদ্দীপনা সেইগুলির ভিতরে নিহিত ছিল। সব দলই ভাবিত, অন্যান্য দল মুক্তি পাইবে না। কারণ সেইগুলির ধর্মীয় আচার-অনুষ্ঠান তাহাদের মত নহে। কুরআন আসিয়া ঘোষণা করিল, ইহা ভুল। এই বাহ্যিক দিকটা কখনই ধর্মের মূল সত্য নহে। তাই তাহা সত্য-অসত্যের মাপকাঠি হইতে পারে না। ধর্মের এই খোলস হইতে প্রাণ অনেক উর্ধ্বে। সত্যিকারের দীন কি ? এক আল্লাহ্‌র অর্চনা ও ভাল কাজ করা। ইহা কোন সম্প্রদায়ের পৈতৃক সম্পদ নহে যে, তাহাদের ছাড়া উহা আর কেহ পায় নাই। সব ধর্মেই এই ব্যাপারে দ্বিমত প্রকাশ করে নাই। আচার-অনুষ্ঠান ও কার্যবিধি শাখা মাত্র। তাই উহা প্রত্যেক যুগের, প্রত্যেক দেশের অবস্থা অনুসারে পরিবর্তিত হইয়া চলিয়াছে। ধর্মে ধর্মে পার্থক্য যতটুকু দেখা দিয়াছে, তাহা এই শাখা-প্রশাখায় মাত্র।

তাই কুরআন বলে, এই বাহ্যিক পার্থক্যের উপরে অহেতুক গুরুত্ব দিয়া এক সম্প্রদায় অন্য সম্প্রদায়ের পিছনে লাগিও না। বরং ধর্মের মূল লক্ষ্য 'খায়রাত' বা কল্যাণকর কাজে সবাই আত্মনিয়োগ কর। আচার-অনুষ্ঠান তো সেই পথের সংশ্লিষ্ট ব্যাপার মাত্র। উহা লইয়া ঝগড়া করা আর উহাকেই সত্য-অসত্যের মানদণ্ড স্থির করা ভুল।

'তোমাদের প্রত্যেক সম্প্রদায়ের জন্য এক একটি পথ ও পদ্ধতি দেওয়া হইয়াছে—এই কথাটি লক্ষ করুন। এখানে শরীআতের কথা বলা হইয়াছে, 'দীন' বলা হয় নাই। কারণ 'দীন' তো সকলের এক। মত এক, পথ ভিন্ন। কারণ সব যুগে সব দেশে সব মানুষের জন্য এক ধরনের পথ অনুসরণ সম্ভবপর ছিল না বলিয়াই উহাতে পার্থক্য সৃষ্টি দরকার ছিল। তাই একই মতের এই বিভিন্নতা দেখা দিয়াছে।

এখানে স্মরণ রাখা দরকার, যেখানেই আল্লাহ্ বলিয়াছেন, 'ইচ্ছা থাকিলে আমি সব সম্প্রদায়কে একটি মাত্র সম্প্রদায়ে পরিণত করিতাম'—সেখানে তিনি ধর্মের এই মূল সত্যটি প্রকাশ করিতে চাহিয়াছেন। মানুষ যেন এই কথাটি বুঝিতে চেষ্টা করে যে, এই চিন্তা ও কাজের পার্থক্যটি দেশ, কাল, পাত্রভেদে স্বাভাবিকভাবেই দেখা দিয়াছে। স্থান-কাল বিশেষে মানুষের কর্মপদ্ধতিতে পার্থক্য থাকা নিতান্তই স্বাভাবিক

ব্যাপার। বিভিন্ন পরিবেশে মানুষ ভিন্ন ভিন্ন ধারায় কাজ করিতে বাধ্য হয়। তাই কর্মপদ্ধতির এই পার্থক্যকে মূল সত্য স্থির করিয়া সত্যাসত্যের বিচার করা বোকামি ছাড়া আর কিছুই নহে। মূল লক্ষ্য যাহাদের এক, তাহাদের একদল অপর দলকে শুধুমাত্র কর্মপন্থার পার্থক্যের জন্য মিথ্যার পূজারী বলা অন্যায়। বরং সবাই মিলিয়া ধর্মের সত্যিকারের উদ্দেশ্য অর্জনের জন্য আত্মনিয়োগ করিলেই মঙ্গল। সত্যকে যেন কোন দল নিজেদের পৈতৃক সম্পত্তি মনে না করে।

কুরআনের এই উদার শিক্ষা শরীআতের ভিন্নতার ক্ষেত্রেই নহে, পরন্তু চিন্তা ও কাজের প্রত্যেকটি ক্ষেত্রেই লক্ষ করি। এমন কি, যাহারা কুরআনের পয়গামের বিরুদ্ধে জোর-জবরদস্তির পথ অনুসরণ করে, কুরআন তাহাদের ওযর-আপত্তির দিকটা তুলিয়া ধরিতে মোটেও দ্বিধা করে না। এক স্থানে স্বয়ং রসূলুল্লাহ্‌কে উদ্দেশ্য করিয়া বলিতেছে—তুমি তো সত্যের ডাকে অতি উৎসাহী হইয়া চাহিতেছ যে, প্রত্যেকটি মানুষকে পথে আনিবে। কিন্তু তোমাকে ভুলিলে চলিবে না যে, চিন্তা ও কাজের পার্থক্য মানব প্রকৃতির স্বাভাবিক বৈশিষ্ট্য। তুমি জোর করিয়া মানুষের মনে কোন কথা ঢুকাইয়া দিতে পারিবে না।

وَلَوْ شَاءَ رَبُّكَ لَاٰمَنَ مَنْ فِى الْاَرْضِ كُلُّهُمْ جَمِيْعًا - اَفَاَنْتَ تُكْرِهُ النَّاسَ حَتّٰى يَكُوْنُوْا مُؤْمِنِيْنَ - (١٠ : ٩٩)

—যদি তোমার প্রভু ইচ্ছা করিতেন, তাহা হইলে পৃথিবীর সকল মানুষই ঈমান আনিত। কিন্তু তুমি দেখিতেছ যে, তাঁহার ক্ষমতা লীলার সিদ্ধান্তই এই যে, সব মানুষই নিজ নিজ জ্ঞান অনুসারে পথ অনুসরণ করুক। তবু কি তুমি চাও যে, সবাইকে জোর করিয়া সত্যপথ অনুসরণ করাইতে হইবে ? (—সূরা য়ুনুস ঃ আয়াত ৯৯)

কুরআন বলে, মানুষের স্বভাবই এইরূপ রাখা হইয়াছে যে, প্রত্যেক দলই নিজেদের চাল-চলন ভাল দেখে। সে নিজের কথাকে প্রতিপক্ষের দৃষ্টিতে দেখিতে পারে না। তোমাদের কাছে যেরূপ তোমাদের পথটি সর্বোত্তম মনে হয়, অন্যরাও তেমনি মনে করে। সুতরাং এই ব্যাপারটি হজম করিয়া যাওয়া ছাড়া উপায় নাই।

وَلَا تَسُبُّوا الَّذِيْنَ يَدْعُوْنَ مِنْ دُوْنِ اللّٰهِ فَيَسُبُّوا اللّٰهَ عَدْوًا بِغَيْرِ عِلْمٍ - كَذٰلِكَ زَيَّنَّا لِكُلِّ اُمَّةٍ عَمَلَهُمْ - ثُمَّ اِلٰى رَبِّهِمْ مَّرْجِعُهُمْ فَيُنَبِّئُهُمْ بِمَا كَانُوْا يَعْمَلُوْنَ - (٦ : ١٠٨)

—আর (দেখ) যাহারা আল্লাহ্‌কে ছাড়িয়া অন্যকে ডাকে তাহাদের গালি দিও না। কারণ উহার ফলে মূর্খতা-বশত তাহারাও আল্লাহ্‌কেই গালি দিয়া বসিবে। স্মরণ রাখিও, মানুষের প্রকৃতিই আমি এইরূপ করিয়াছি যে, প্রত্যেকে নিজের কাজকে ভাল মনে করিবে। অবশেষে সবাইকেই আল্লাহ্‌র কাছে ফিরিয়া আসিতে হইবে।

সেখানে প্রত্যেকের কাজের তত্ত্ব উদ্‌ঘাটিত হইবে। (—সূরা আন'আম ঃ আয়াত ১০৮)

সাম্প্রদায়িক কোন্দল

যখন সব ধর্মের মূল লক্ষ্য এক, সবটির বুনিয়াদ সত্যের উপরে, তখন আর কুরআন অবতীর্ণ হবার দরকার ছিল কি ?

কুরআন বলে, যদিও সব ধর্ম সত্য কিন্তু সব ধর্মানুসারীই ধর্মচ্যুত হইয়াছে। তাই তাহাদের হৃত পথে ফিরাইয়া আনার আর মানবজাতিকে নূতনভাবে সত্যের উপরে সমবেত করার জন্যই এই নূতন বিধানের প্রয়োজন দেখা দিল।

এ ব্যাপারে সে ধর্মানুসারীদের বিভ্রান্তিগুলি এক এক করিয়া দেখাইয়া দিল। বিশ্বাস ও কাজ উভয় ক্ষেত্রেই এই বিভ্রান্তি দেখা দিয়াছিল। মোটকথা, উহার ভিতরে যে বিরাট ভুলটির উপরে বিভিন্ন স্থানে সে জোর দিয়াছে, তাহাকে (তাশায়্যু) দলীয় কোন্দল নাম দিয়াছে। ইহাকে সম্প্রদায় বা জাতি পূজাও বলা হয়।

اِنَّ الَّذِيْنَ فَرَّقُوْا دِيْنَهُمْ وَ كَانُوْا شِيَعًا لَّسْتَ مِنْهُمْ فِىْ شَىْءٍ اِنَّمَا اَمْرُهُمْ اِلَى اللّٰهِ ثُمَّ يُنَبِّئُهُمْ بِمَا كَانُوْا يَفْعَلُوْنَ - (٦ : ١٥٩)

—যাহারা ধর্মকে ছিন্ন-বিচ্ছিন্ন করিয়াছে এবং ভিন্ন দল বা জাতি গঠন করিয়াছে, তাহাদের সহিত তোমার সম্পর্ক নাই। তাহাদের ব্যাপার আল্লাহ্‌র হাতেই ছাড়িয়া দাও। তাহাদের কাজের যাহা পরিণাম, আল্লাহ্‌ই তাহাদের তাহা জানাইবেন। (—সূরা আন'আম ঃ আয়াত ১৫৯)

فَتَقَطَّعُوْا اَمْرَهُمْ بَيْنَهُمْ زُبُرًا - كُلُّ حِزْبٍ بِمَا لَدَيْهِمْ فَرِحُوْنَ - (٢٣ : ٥٣)

অতঃপর মানুষ পরস্পর বিচ্ছিন্ন হইয়া ভিন্ন ভিন্ন ধর্ম সৃষ্টি করিল। প্রত্যেক দলই নিজেদের যাহা কিছু আছে, তাহা লইয়া সুখী।

সাম্প্রদায়িক কোন্দলের তত্ত্বকথা

দলীয় কোন্দলের বিভ্রান্তি বলিতে কি বুঝায় ? স্পষ্টভাবে ব্যাপারটি বুঝা দরকার। কুরআন বলে, আল্লাহ্‌র নির্বাচিত ধর্মের মূল কথা তো এই ছিল যে, মানবজাতি আল্লাহ্‌র অর্চনা ও কল্যাণের কাজে নিমগ্ন থাকিবে। অর্থাৎ আল্লাহ্‌র এই কানুনটি ঘোষণা করা যে, সব কিছুর মতই মানুষের চিন্তা ও কাজের বিশেষ বিশেষ পরিণতি ও ফল দেখা দিতে বাধ্য। ভাল চিন্তা ও ভাল কাজের ফল ভাল হইবে এবং খারাপ চিন্তা ও খারাপ কাজের পরিণাম খারাপই হইবে। কিন্তু মানুষ ধর্মের এই মূল সত্যটি ভুলিয়া গোত্র, সম্প্রদায়, জাতি ইত্যাদি নানা নামে বিভিন্ন রীতিনীতির অনুসারী সাজিয়া বিভক্ত হইয়া গেল। ফলে মানুষের সত্যিকারের মুক্তির পথ চাপা পড়িল। কারণ কাহার কি বিশ্বাস ও কাজ তাহা বিচার্য না হইয়া কে কোন্ দল বা সম্প্রদায়ভুক্ত, তাহাই বিচার্য

হইয়া দাঁড়াইল। ফলে মুক্তির চাবিকাঠি আবদ্ধ হইল প্রত্যেক সম্প্রদায় ও গোষ্ঠীর হাতে। প্রত্যেক দলই ভাবিত, তাহাদের দলভুক্ত না হইলে আর মানুষের পরিত্রাণ নাই। তাহাদের সম্প্রদায়ভুক্ত হইলেই দুনিয়া আখিরাত পার হইবে, ইহাই হইল মানুষের ভাবনা। বিশ্বাস ও কাজের ভাল-মন্দের বিচার তাহারা সম্প্রদায়ের যুপকাষ্ঠে বলি দিল। এক সম্প্রদায় অন্য সম্প্রদায়ের বিরুদ্ধে লাগিল। একদল অপর দলের বিরুদ্ধে হিংসা-বিদ্বেষ শিক্ষা দিল। ফলে আল্লাহ্‌র অর্চনা ও ধর্ম-কর্ম আগা-গোড়া ঘৃণা, শত্রুতা, হিংস্রতা ও রক্তা-রক্তির পথ হইয়া দাঁড়াইল।

কুরআনের আহবানের তিন ভিত্তি

এই ব্যাপারে কুরআন যেসব গুরুত্বপূর্ণ দিকের উপরে জোর দিয়াছে তাহার ভিতরে তিনটিই সর্বাধিক গুরুত্বপূর্ণ।

১. মানুষের মুক্তি ও সৌভাগ্যের ভিত্তি হইল বিশ্বাস ও কাজ—সম্প্রদায়ের গণ্ডি নহে।

২. মানবজাতির ধর্ম একটি। সবাইকে সমানভাবে সেই শিক্ষাই দেওয়া হইয়াছে। সুতরাং ধর্মানুসারীরা যে বিশ্বজনীন ধর্মের সারকথা ভুলিয়া পরস্পর বিরোধী অনেক শিবির গড়িয়া ঝগড়াঝাটি আর কাটাকাটি শুরু করিয়াছে, এসব নির্জলা বিভ্রান্তি মাত্র।

৩. মূল ধর্ম হইল একত্ববাদ। একই আল্লাহ্‌র অর্চনা সরল প্রাণে করা—ইহা সকল ধর্ম প্রবর্তকের শিক্ষা ছিল। ইহার বিরুদ্ধে যত ধরনের বিশ্বাস ও কাজ দেখা যাইতেছে, তাহা বিচ্যুতি মাত্র।

ইহুদী ও নাসারাদের সাম্প্রদায়িকতার প্রতিবাদ

নিম্ন আয়াতেও এই ব্যাপারটি তুলিয়া ধরা হইয়াছে ঃ

وَقَالُوْا لَنْ يَّدْخُلَ الْجَنَّةَ اِلاَّ مَنْ كَانَ هُوْدًا اَوْ نَصٰرٰى - تِلْكَ اَمَانِيُّهُمْ - قُلْ هَاتُوْا بُرْهَانَكُمْ اِنْ كُنْتُمْ صٰدِقِيْنَ - بَلٰى - مَنْ اَسْلَمَ وَجْهَهٗ لِلّٰهِ وَهُوَ مُحْسِنٌ فَلَهٗ اَجْرُهٗ، عِنْدَ رَبِّهٖ - وَلاَ خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلاَهُمْ يَحْزَنُوْنَ - (٢ : ١١١ - ١١٢)

—ইহুদী ও নাসারারা বলে, দুনিয়ার কোন মানুষ ইহুদী বা নাসারা না হইলে বেহেশ্‌তে যাইতে পারিবে না। ইহা তাহাদের কপোল-কল্পনা ছাড়া অন্য কিছুই নহে। (হে রাসূল) বলিয়া দাও, যদি তোমাদের কথা সত্য হয়, তাহা হইলে দলীল পেশ কর। তবে হ্যাঁ—মুক্তির পথ সম্প্রদায়ভুক্ত হওয়ায় মিলে না বরং আল্লাহ্‌র কাছে আত্মসমর্পণ, সৎ কাজ ও সঠিক বিশ্বাসে মিলে। তাহারাই (ইহুদী বা নাসারা হউক বা না হউক) আল্লাহ্‌র কাছে পুরস্কৃত হইবে। তাহাদের জন্য কোন দ্বিধা বা দুর্ভাবনার কারণ নাই। (—সূরা বাকারা ঃ আয়াত ১১১-১১২)

অন্যত্র এই সত্যটিকেই আরও স্পষ্টভাবে বলা হইয়াছে ঃ

اِنَّ الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا وَالَّذِيْنَ هَادُوْا وَالنَّصٰرٰى وَالصَّابِئِيْنَ مَنْ اٰمَنَ بِاللّٰهِ وَالْيَوْمِ الْاٰخِرِ وَعَمِلَ صَالِحًا فَلَهُمْ اَجْرُهُمْ عِنْدَ رَبِّهِمْ - وَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَاهُمْ يَحْزَنُوْنَ - (٢ : ٦٢)

—যাহারা [মুহাম্মদ (সা)-এর উপর] ঈমান আনিয়াছে, তাহারাই হউক কিংবা যাহাদের ইহুদী বা নাসারা অথবা সাবেঈন বলা হয়, তাহারা হউক, এই সকলের ভিতরে কেবল যাহারা আল্লাহ্ ও পরকালের উপরে দৃঢ় আস্থা স্থাপন করিয়া সৎকাজ অবলম্বন করিয়াছে, তাহারাই স্বীয় প্রভুর কাছে পুরস্কৃত হইবে। তাহাদের কোনরূপ সংশয় বা দুর্ভাবনা নাই। (—সূরা বাকারা ঃ আয়াত ৬২)

ধর্মের উদ্দেশ্য তো কোন সম্প্রদায় সৃষ্টি করা ছিল না বরং আল্লাহ্র অর্চনা ও কল্যাণের কাজের প্রবর্তন ছিল। মানুষ যে-ই হউক, যে সম্প্রদায়ের বা গোত্রের হউক আর নাম তাহার যাহাই হউক, আল্লাহ্র উপরে যদি সে সত্যিকারের ঈমান আনে ও ভাল কাজ করে, সে-ই যথার্থ ধার্মিক। মুক্তি তাহারই জন্য। অথচ ইহুদী ও নাসারারা সাম্প্রদায়িক গণ্ডিকে মুক্তির মাপকাঠি মনে করিল। ফলে সত্যে বিশ্বাস ও কল্যাণকর কাজ তাহাদের কাছে মুক্তির চাবিকাঠি বলিয়া বিবেচিত হইল না। চরম পাপীও ইহুদী বা নাসারা সম্প্রদায় মানিয়া মুক্তির আশ্বাস পাইল। অথচ চরম আল্লাহ্র উপাসক ও সৎকর্মশীল হইয়াও ইহুদী বা নাসারা না হওয়ার জন্য মুক্তির আশ্বাস হইতে বঞ্চিত রহিল। কুরআন তাহাদের এই সাম্প্রদায়িক মনোভাবটিকে এইভাবে ব্যক্ত করিয়াছে, 'কুনু হুদান আও নাসারা। তাহ্তাদু'—'ইহুদী অথবা নাসারা হও, মুক্তির পথ পাইবে।' তাই সে এই ভ্রান্তির মূলোৎপাটনের জন্য ঘোষণা করিল—'বালা-মান্ আস্লামা ওয়াজহাহু লিল্লাহি ওয়াহুয়া মুহ্সিনুন'—'বরং সে যে-ই হউক যদি আল্লাহ্র হাতে নিজকে সঁপিয়া দেয় ও কল্যাণকর কাজ করে (মুক্তি তাহারই জন্য)।'

এখন ভাবিয়া দেখুন, ধর্মীয় সত্যের আন্তর্জাতিক প্রসারতা ইহার পরেও আর কোন্ ভাষায় ব্যক্ত করা যাইতে পারে।

وَقَالَتِ الْيَهُوْدُ لَيْسَتِ النَّصٰرٰى عَلٰى شَيْءٍ - وَقَالَتِ النَّصٰرٰى لَيْسَتِ الْيَهُوْدُ عَلٰى شَيْءٍ وَّهُمْ يَتْلُوْنَ الْكِتَابَ - كَذٰلِكَ قَالَ الَّذِيْنَ لَايَعْلَمُوْنَ مِثْلَ قَوْلِهِمْ - فَاللّٰهُ يَحْكُمُ بَيْنَهُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ فِيْمَا كَانُوْا فِيْهِ يَخْتَلِفُوْنَ - (٢ : ١١٣)

—আর ইহুদীরা বলে, ঈসায়ীদের ধর্ম কিছু না। তেমনি ঈসায়ীরা বলে, ইহুদীদের ধর্ম কিছুই না। অথচ উভয় দলই খোদায়ী গ্রন্থ পাঠ করিতেছে (উভয় দলের ধর্মের উৎস একই)। সেইরূপ কথাই আবার খোদায়ী গ্রন্থ সম্পর্কে যাহারা কিছুই জানে না, তাহারাও বলিতেছে (অর্থাৎ আরবের অংশীবাদীরাও নিজেদের

কেবল মুক্তিপ্রাপ্ত বলিয়া মনে করে)। ঠিক আছে, যে কথা লইয়া তাহারা পরস্পর ঝগড়া করিতেছে, শেষ বিচারের দিন আল্লাহ্ তা'আলা উহার মীমাংসা করিবেন। (—সূরা বাকারা ঃ আয়াত ১১৩)

একই ধর্ম হওয়া সত্ত্বেও আর খোদায়ী গ্রন্থ সামনে থাকা সত্ত্বেও সম্প্রদায় সৃষ্টির ফল দাঁড়াইল এই যে, উভয় দলই একে অপরের দুশমন সাজিল এবং একটিকে অপরটি মিথ্যা ও ভিত্তিহীন ঘোষণা করিল।

সত্য মূলত সবার কাছেই আছে, নাই শুধু কাজ

প্রশ্ন এই যে, ধর্মের পথ যখন একটির স্থলে অসংখ্য হইয়াছে এবং প্রতিটি পথের অনুসারীই নিজেদের মুক্তিদাতা ও অন্যদের মিথ্যা বলিয়া বেড়াইতেছে, তখন আদপেই কোন সত্য আছে কি ? তাহা কোথায় ? কুরআন বলে, সত্য মূলত সবার কাছেই আছে, নাই শুধু বাস্তবে। সবাই একই ধর্মের শিক্ষা পাইয়াছে এবং সবার জন্যই একক বিশ্বজনীন হিদায়ত ছিল। কিন্তু সবাই মূল ধর্ম নষ্ট করিয়া ফেলিল এবং 'আদ্-দীন' ছাড়িয়া দিয়া ভিন্ন ভিন্ন সম্প্রদায় গড়িয়া তুলিল। তারপর প্রতিটি দল অন্য দলের সঙ্গে লড়াই শুরু করিয়া দিল। ভাবিল, ধর্মের যাহা কিছু কল্যাণ তাহা তাহাদেরই জন্য, মুক্তিও কেবল তাহাদের ভাগ্যে পড়িয়াছে। তাহাদের এই পৈতৃক সূত্রে পাওয়া কল্যাণ ও মুক্তিতে আর কোন সম্প্রদায়ের দখল নাই।

উপাসনালয়ের পার্থক্য

সূরা 'বাকারা'য় উপরের আয়াতের পরেই এই আয়াত আসিয়াছে ঃ

وَمَنْ اَظْلَمُ مِمَّنْ مَّنَعَ مَسٰجِدَ اللّٰهِ اَنْ يُّذْكَرَ فِيْهَا اسْمُهٗ وَسَعٰى فِيْ خَرَابِهَا - اُولٰئِكَ مَا كَانَ لَهُمْ اَنْ يَّدْخُلُوْهَا اِلاَّ خَائِفِيْنَ - لَهُمْ فِى الدُّنْيَا خِزْىٌ وَّ لَهُمْ فِى الْاٰخِرَةِ عَذَابٌ عَظِيْمٌ - (٢ : ١١٤)

—আর ভাবিয়া দেখ, তাহার চাইতে বড় জালিম আর কে হইতে পারে, যে ব্যক্তি উপাসনালয়ে উপাসনার কার্যে বাধা সৃষ্টি করে এবং উহা ধ্বংস করার প্রচেষ্টা চালায়। যাহাদের জুলুম ও অনাচারের এই অবস্থা, নিশ্চয়ই তাহারা আল্লাহ্র উপাসনালয়ে কদম রাখার যোগ্যতা রাখে না। হ্যাঁ, ভীত ও সন্ত্রস্তভাবে গোপনে তাহা করিতে পারে। স্মরণ রাখিও, এরূপ মানুষের জন্য পৃথিবীতে যেরূপ অপমান দেখা যাইতেছে, আখিরাতে তেমনি কঠিন শাস্তি রহিয়াছে। (—সূরা বাকারা ঃ আয়াত ১১৪)

ধর্মীয় কোটারী সৃষ্টির পরিণতি এই দাঁড়াইল যে, একই আল্লাহ্র উপাসকরা ভিন্ন উপাসনালয় গড়িয়া একের জন্য অপরের উপাসনালয়ের দ্বার রুদ্ধ করিয়া দিল এবং একদল আরেক দলের উপাসনালয়কে আল্লাহ্র উপাসনার যোগ্য ভাবিল না। শুধু তাই নহে, ধর্মের নাম লইয়াই একদল অপর দলের উপাসনালয় ধ্বংস করিতে উদ্যত ও প্রয়াসী হইল। কুরআন বলে, আল্লাহ্র বান্দাকে আল্লাহ্র উপাসনা হইতে বিরত রাখার

প্রচেষ্টা হইতে বড় জুলুম আর কি হইতে পারে ? আর ইহার চাইতে অনাচার আর কি হইতে পারে যে, একদল আল্লাহ্‌র নাম লইয়াই অপর দলের গড়া আল্লাহ্‌র উপাসনালয়কে ধ্বংস করার জন্য কোমর বাঁধিয়া নামে! তোমাদের সাম্প্রদায়িক ভিন্নতার ফলে আল্লাহ্‌ও কি ভিন্ন ভিন্ন হইয়া গেলেন ? এক দলের উপাসনালয়ের আল্লাহ্ কি আরেক দলের উপাসনালয়ের আল্লাহ্ হইতে ভিন্ন ?

وَلَاتُؤْمِنُوْا اِلَّا لِمَنْ تَبِعَ دِيْنَكُمْ - قُلْ اِنَّ الْهُدٰى هُدَى اللّٰهِ - اَنْ يُّؤْتٰى اَحَدٌ مِّثْلَ مَا اُوْتِيْتُمْ اَوْ يُحَاجُّوْكُمْ عِنْدَ رَبِّكُمْ - قُلْ اِنَّ الْفَضْلَ بِيَدِ اللّٰهِ - يُؤْتِيْهِ مَنْ يَّشَاءُ - وَاللّٰهُ وَاسِعٌ عَلِيْمٌ - (٣ : ٧٣)

—আর এই মানুষগুলি পরস্পর বলে, একথা কখনই বিশ্বাস করি না যে, তোমাদের ধর্মের (ইহুদী ধর্মের) যে সৌভাগ্য দান করা হইয়াছে তাহা আর কেহ পাইতে পারে। অথবা আল্লাহ্‌র দরবারে তোমাদের বিরুদ্ধে আবার কাহারও কোন বক্তব্য থাকিতে পারে। (হে রাসূল) এই লোকগুলিকে বলিয়া দাও, হিদায়ত তো কেবল আল্লাহ্ প্রদত্ত হিদায়ত (এবং আল্লাহ্ প্রদর্শিত পথ সকলের জন্য বিমুক্ত) এবং মর্যাদা ও অনুগ্রহের ঠিকাদারী তোমাদের হাতে নহে। উহা আল্লাহ্ তা'আলারই হাতে রহিয়াছে। তিনি যখন যাহাকে ইচ্ছা দান করেন। দান-দাক্ষিণ্যে তাঁহার হাত খুবই প্রশস্ত এবং তিনি সব কিছুই জানেন। (—সূরা আল ইমরান ঃ আয়াত ৭৩)

অর্থাৎ ইহুদীদের বিশ্বাস ছিল যে, ওহী ও নবুয়তের হিদায়ত তাহাদেরই একচেটিয়া সম্পত্তি। আর কাহারও তাহা পাইবার উপায় নাই। সেই ধারণায়ই তাহারা বলিত অন্য কাহারো সত্যতা ও মর্যাদা স্বীকার করা চলিবে না। কাহারো এমন কোন কথা শুনিবে না, যাহা তোমাদের খেলাপ হইতে পারে। কুরআন এই ভ্রান্তি নিরসন করিয়া ঘোষণা করিল, 'হিদায়তের চাবিকাঠি আল্লাহ্‌র হাতে। তিনি যাহাকে ইচ্ছা তাহা অর্পণ করিতে পারেন।' সুতরাং সেই সার্বজনীন হিদায়ত যে ব্যক্তিই অনুসরণ করিবে, সে ইহুদী হউক কিংবা অন্য কিছু হউক, মুক্তি ও অনুগ্রহ লাভ করিবে।

ইহুদীদের সাম্প্রদায়িক সংকীর্ণতা এতখানি বাড়িয়া গিয়াছিল যে, তাহারা বলিয়া ফিরিত, আল্লাহ্ তাহাদের জন্য দোযখের আগুন হারাম করিয়াছে। তাই তাহাদের কেহ দোযখে গেলেও শাস্তিলাভের জন্য যাইবে না, যাইবে পাপ মোচনের জন্য সাময়িকভাবে। তারপর আবার বেহেশ্‌তে চলিয়া আসিবে। কুরআন বিভিন্ন স্থানে তাহাদের এই ভুল ধারণার উল্লেখ করিয়া জিজ্ঞাসা করিতেছে, 'তোমরা ইহা কোথায় পাইয়াছ ? তোমাদের আল্লাহ্ কি বিনা শর্তে মুক্তিলাভের জন্য কোন পাট্টা লিখিয়া দিয়াছেন ? যদি না দিয়া থাকেন তাহা হইলে তাঁহার উপরে এরূপ কথা আরোপ মিথ্যা নহে কি ?' তারপর সে স্পষ্ট ভাষায় আল্লাহ্‌র বিধান ঘোষণা করে, 'যে ব্যক্তি খারাপ কাজ করিবে, সে ভাল ফল পাইবে।' যেভাবে বিষপান করিলে হিন্দু, মুসলমান,

ইহুদী, খ্রীস্টান এক কথায় সবাই মরিবে এবং দুধ পান করিলে যে কোন ব্যক্তি সবল হইবে। এইভাবেই প্রত্যেক নিজ কর্মের অনিবার্য ফল লাভ করিবে। বিশেষ সম্প্রদায় বা গোত্রের অন্তর্ভুক্ত হইবার জন্য কেহ কর্মফলের ক্ষেত্রে ব্যতিক্রম দেখিবে না।

وَقَالُوْا لَنْ تَمَسَّنَا النَّارُ اِلاَّ اَيَّامًا مَّعْدُوْدَةً - قُلْ اَتَّخَذْتُمْ عِنْدَ اللّٰهِ عَهْدًا فَلَنْ يُّخْلِفَ اللّٰهُ عَهْدَهٗ اَمْ تَقُوْلُوْنَ عَلَى اللّٰهِ مَا لاَتَعْلَمُوْنَ- بَلٰى مَنْ كَسَبَ سَيِّئَةً وَّ اَحَاطَتْ بِهٖ خَطِيْئَتُهٗ فَاُوْلٰئِكَ اَصْحَابُ النَّارِ - هُمْ فِيْهَا خَالِدُوْنَ - وَالَّذِيْنَ اٰمَنُوْا وَعَمِلُوا الصّٰلِحٰتِ اُوْلٰئِكَ اَصْحَابُ الْجَنَّةِ - هُمْ فِيْهَا خَالِدُوْنَ - (٢ : ٨٠ - ٨٢)

—আর তাহারা (ইহুদীরা) বলে, আমাদের কখনও জাহান্নামের আগুন স্পর্শ করিবে না। যদি একান্ত করেও, তাহা মাত্র কয়েক দিনের জন্য। (হে রাসূল ! তাহাদের) বল, তোমরা যাহা বলিতেছ, সে জন্য আল্লাহ্‌র কাছ হইতে কোন ইকরারনামা লইয়াছ যে, তিনি কখনও তাঁহার খেলাপ কিছু করিতে পারিবেন না ? কিংবা তোমরাই আল্লাহ্‌র নামে এরূপ মিথ্যা কথা বলিতেছ, যাহা তোমাদের আদপে জানা নাই ? অন্যথায় আল্লাহ্‌র বিধান তো এই যে, গোত্র ও সম্প্রদায় নির্বিশেষে যাহারা অন্যায় করিবে এবং অন্যায় যাহাদের ঘিরিয়া রাখিবে, তাহারা জাহান্নামী দল হইবে, সর্বদা দোযখে থাকিবে। পক্ষান্তরে যাহারাই ঈমানের পথ অনুসরণ করিবে আর ভাল কাজ করিবে, তাহারা বেহেশ্‌তী সম্প্রদায় হইবে এবং চিরদিন সেখানে থাকিবে। (—সূরা বাকারা ঃ আয়াত ৮০-৮২)

সূরা 'নিসা'য় শুধু ইহুদী ও ঈসায়ী নহে, সবাইকে লক্ষ করিয়া কুরআন সাফ সাফ ঘোষণা করিতেছে ঃ

لَيْسَ بِاَمَانِيِّكُمْ وَلاَ اَمَانِيِّ اَهْلِ الْكِتَابِ - مَنْ يَّعْمَلْ سُوْءً يُّجْزَ بِهٖ - وَلاَ يَجِدْ لَهٗ مِنْ دُوْنِ اللّٰهِ وَلِيًّا وَّ لاَنَصِيْرًا - (٤ : ١٢٣)

—(হে মুসলিম) স্মরণ রাখিও, মুক্তি ও সৌভাগ্য না তোমাদের মর্জির উপর নির্ভর করে, না অন্যান্য ঐশী গ্রন্থ প্রাপ্তদের মর্জির উপর। আল্লাহ্‌র বিধান তো এই, যাহারাই অন্যায় করুক, পরিণাম তাহারাই ভোগ করিবে। তখন কোন বন্ধুর বন্ধুত্ব বা শক্তির সহায়তা কাজে আসিবে না। (—সূরা নিসা ঃ আয়াত ১২৩)

সাম্প্রদায়িক সংকীর্ণতার ফলে ইহুদীরা এই পর্যন্ত ভাবিত যে, সততা ও সচ্চরিত্রতা শুধু নিজেদের সম্প্রদায়ের ভিতরে দেখাইতে হইবে, বাহিরের মানুষের সঙ্গে নহে। একজন ইহুদী বলিত, ইহুদী ব্যতীত যে কোন মানুষের সম্পদ লুটিয়া খাওয়া কিংবা যথেচ্ছা ব্যবহার করা বৈধ। তাই লেন-দেনে সুদ না খাওয়ার মাস্‌'আলা শুধু নিজ সম্প্রদায়ের ভিতরে সীমিত রাখিয়া বাহিরের লোকের সহিত বৈধ করিয়া লইল।

তাহাদের এই নিয়ম আজও প্রচলিত আছে। কুরআন তাহাদের এই বিভ্রান্তির উল্লেখ করিয়া বলিতেছে ঃ

وَاَخْذِهِمُ الرِّبٰوا وَ قَدْ نُهُوْا عَنْهُ وَ اَكْلِهِمْ اَمْوَالَ النَّاسِ بِالْبَاطِلِ - (٤ : ١٦١)

—আর তাহাদের সুদ গ্রহণ—অথচ তাহাদের জন্য নিষিদ্ধ ছিল এবং তাহাদের অপরের অর্থ আত্মসাৎ করার অবৈধ ব্যাপারটি (সম্পূর্ণ ভ্রান্তিমূলক)। (—সূরা নিসা ঃ আয়াত ১৬১)

এইভাবে যেসব ইহুদী আরবে বসবাস করিত, তাহারা বলিত, আরবের মূর্খ লোকদের সঙ্গে সততা বা সচ্চরিত্রতা রক্ষা করার কোন প্রয়োজন নাই। ইহারা প্রতিমা পূজক। তাই তাহাদের ধন-সম্পদ যেভাবে ইচ্ছা লুট করা বৈধ।

ذٰلِكَ بِاَنَّهُمْ قَالُوْا لَيْسَ عَلَيْنَا فِى الْاُمِّيّٖنَ سَبِيْلٌ - وَ يَقُوْلُوْنَ عَلَى اللّٰهِ الْكَذِبَ وَهُمْ يَعْلَمُوْنَ - بَلٰى مَنْ اَوْفٰى بِعَهْدِهٖ وَاتَّقٰى فَاِنَّ اللّٰهَ يُحِبُّ الْمُتَّقِيْنَ - (٣ : ٧٥ - ٧٦)

(ইহুদীদের এই দুষ্কর্মগুলি) এইজন্য দেখা যায় যে, তাহারা বলে (আরবের এই) মূর্খ লোকগুলির ব্যাপারে আমরা জবাবদিহি হইব না। (যেভাবে ইচ্ছা আমরা তাহাদের অর্থ লুটিতে পারি) অথচ তাহারা ইহা বলিয়া আল্লাহ্‌র উপরে প্রকাশ্য মিথ্যা আরোপ করিতেছে। হ্যাঁ—তাহাদের জবাবদিহি হইতে হইবে এবং অবশ্যই হইবে। কারণ আল্লাহ্‌র বিধান হইল এই, যে কেহ ওয়াদা পূর্ণ করে, পাপ হইতে বাঁচিয়া থাকে, সে-ই আল্লাহ্‌র সন্তুষ্টি অর্জন করে। আর পাপ হইতে যাহারা বিরত থাকে, আল্লাহ্ তাহাদের বন্ধু হন। (—সূরা আল ইমরান ঃ আয়াত ৭৫-৭৬)

অর্থাৎ এরূপ ধারণা পোষণ আল্লাহ্‌র নামে মিথ্যা চালানোর নামান্তর। আল্লাহ্‌র ধর্ম তো পৃথিবীর সকল মানুষের সহিত সততা ও সদ্ব্যবহার করার নির্দেশ দেয়। কারণ সাদা সকল অবস্থায়ই সাদা এবং কালো সকল অবস্থায়ই কালো হইবে এবং কোন দিনই সাদা ব্যক্তি বিশেষের কারণে কালো হইবে না। সুতরাং সাধুতা সর্বক্ষেত্রে সাধুতাই থাকিবে।

হযরত ইব্‌রাহীম (আ)-এর ব্যক্তিত্ব

কুরআন মজীদ অবতীর্ণ হইবার সময়ে আরবে তিনটি প্রধান সম্প্রদায় ছিল। ইহুদী, ঈসায়ী ও মুশ্‌রিক। এই তিন দলই হযরত ইবরাহীম (আ)-এর ব্যক্তিত্বকে খুব গুরুত্ব দিত। কারণ তিন দলের উর্ধ্বতম পুরুষ ছিলেন তিনি। সুতরাং কুরআন সাম্প্রদায়িক সংকীর্ণতার বিভ্রান্তি প্রকাশ করিতে গিয়া এই তিন দলের সামনে সোজাসুজি একটি সরল প্রশ্ন উত্থাপন করিয়াছে—যদি সাম্প্রদায়িক গণ্ডিই ধর্মের মূল সত্য হয়,

তাহা হইলে হযরত ইবরাহীম (আ) কোন্ সম্প্রদায়ের ছিলেন বল ? ইহা তো সুস্পষ্ট কথা যে, সে সময়ে না ইহুদী ধর্ম জন্ম নিয়াছিল, না খৃষ্ট ধর্ম, না মুশ্‌রিক ধর্ম। সুতরাং তিনি যদি এই তিন ধর্মের একটির গণ্ডিতেও না পড়িয়া মুক্তি পাইয়া থাকেন তাহা কোন্ পথে পাইয়াছেন ? কুরআন নিজেই জবাব দেয়—তাহা তো সেই সত্য ধর্ম, যাহা তোমাদের এই মনগড়া সংকীর্ণ ধর্মের অনেক উর্ধ্বে অবস্থিত। উহাই বিশ্বজনীন সত্য ধর্ম। উহা হইল, আল্লাহ্‌র এককত্বের যিক্‌র ও সৎ জীবন যাপন করা।

وَقَالُوْا كُوْنُوْا هُوْدًا اَوْ نَصٰرٰى تَهْتَدُوْا - قُلْ بَلْ مِلَّةَ اِبْرَاهِيْمَ حَنِيْفًا - وَمَا كَانَ مِنَ الْمُشْرِكِيْنَ - (٢ : ١٣٥)

আর ইহুদীরা বলে, ইহুদী হও, মুক্তির পথ পাইবে। ঈসায়ীরা বলে, ঈসায়ী হও, মুক্তির পথ পাইবে। (হে পয়গম্বর) তুমি বল, (আল্লাহ্‌র সার্বজনীন হিদায়ত বা মুক্তির পথ তোমাদের এই সব সাম্প্রদায়িক ভাগাভাগির ভিতরে থাকিতে পারে না)। মুক্তির পথ তো সেই সরল-সহজ পথ যাহা ইবরাহীম অনুসরণ করিয়াছিল, সে তো আদৌ মুশ্‌রিক ছিল না। (—সূরা বাকারা ঃ আয়াত ১৩৫)

সুরা আল-ইমরানে এই ব্যাপারটি আরও স্পষ্ট করিয়া বলা হইয়াছে ঃ

يٰاَهْلَ الْكِتَابِ لِمَ تُحَاجُّوْنَ فِىْ اِبْرَاهِيْمَ وَمَا اُنْزِلَتِ التَّوْرٰةُ وَالْاِنْجِيْلُ اِلَّا مِنْ بَعْدِهٖ - اَفَلَا تَعْقِلُوْنَ - (٣ : ٦٥)

—হে আহ্‌লে কিতাব ! তোমরা ইবরাহীমকে লইয়া ঝগড়া করিতেছ কেন (তাহাকে সবাই দলে টানিতে চেষ্টা করিতেছ কেন) ? অথচ তওরাত বা ইঞ্জীল তো তাহার পরে অবতীর্ণ হইয়াছে। এতখানি পরিষ্কার কথাও কি তোমরা বুঝিতেছ না ? (সূরা আল ইমরান ঃ আয়াত ৬৫)

অর্থাৎ সে ইহুদী ঈসায়ীদের প্রশ্ন করিতেছে, তোমাদের এই সাম্প্রদায়িক গণ্ডি তো তাওরাত ও ইঞ্জীল অবতীর্ণ হইবার আগে আর ছিল না। অথচ এইগুলির আগেও তো মুক্তিপ্রাপ্ত মানুষ ছিল। তাহারা কোন্ ধর্মের ছিল ? এমন কি তোমাদের বনি-ইস্‌রাঈলদের তাওরাত-পূর্ব নবীদের ধর্ম কি ছিল ? হযরত ইয়াকুব, ইসহাক, ইসমাঈল প্রমুখ নবী কোন্ ধর্ম অনুসরণ করিতেন ? তাঁহারা তো হযরত মূসা ও ঈসার অনেক আগে আসিয়াছিলেন। সুতরাং বুঝা যায় যে, তোমাদের এই মনগড়া সংকীর্ণ ধর্মের উর্ধ্বে যেই মুক্তির পথ অবস্থিত, তাহা সর্বদাই বর্তমান ছিল। তাই সে বলে সেই মুক্তির পথটিই সত্যিকার ধর্ম। তাহা হইল বিশ্বাস ও কাজের পবিত্রতা ও সততা।

اَمْ كُنْتُمْ شُهَدَاءَ اِذْ حَضَرَ يَعْقُوْبَ الْمَوْتُ - اِذْ قَالَ لِبَنِيْهِ مَا تَعْبُدُوْنَ مِنْ بَعْدِىْ - قَالُوْا نَعْبُدُ اِلٰهَكَ وَاِلٰهَ اٰبَائِكَ اِبْرَاهِيْمَ وَاِسْمٰعِيْلَ وَاِسْحٰقَ اِلٰهًا وَّاحِدًا - وَّنَحْنُ لَهٗ مُسْلِمُوْنَ - (٢ : ٣٣)

—তারপর তোমরা কি হযরত ইয়াকুবের মৃত্যুর সময় সেখানে উপস্থিত ছিলে ? যখন সে সন্তানদের উদ্দেশ্যে প্রশ্ন করিল, 'মৃত্যুর পরে তোমরা কাহার ইবাদত করিবে ?' সন্তানরা জবাব দিল, 'আমরা তোমারই প্রভুর ইপাসনা করিব এবং তিনি তোমার পূর্ব পুরুষ ইব্‌রাহীম, ইস্‌মাঈল ও ইস্‌হাকেরও প্রভু। তিনিই একমাত্র প্রভু এবং আমরা তাঁহারই আনুগত্য মানিয়া লইয়াছি। (—সূরা বাকারা ঃ আয়াত ১৩৩)

কুরআন বলে, সত্য ধর্মের উদ্দেশ্য হইল বিশ্বমানবকে ভ্রাতৃত্বের বন্ধনে একত্র করা—শত্রুতার ভিত্তিতে বিচ্ছিন্ন করা নহে। পৃথিবীর সকল নবীই এই শিক্ষা দিয়া গিয়াছেন যে, তোমরা মূলত এক জাতি, একই প্রতিপালক প্রভুর বান্দা। তাই একই আল্লাহ্‌র উপাসক সবাই একই পরিবারভুক্ত মানুষের মত মিলিয়া-মিশিয়া থাকিবে। ধর্ম প্রবর্তকরা এই শিক্ষা দিয়া গেলেও ধর্মানুসারীরা তাহা হইতে বিচ্যুত হইয়াছে। ফলে প্রত্যেক দেশে নানা সম্প্রদায় ভিন্ন ভিন্ন গোষ্ঠীতে বিভক্ত হইয়া পড়িয়াছে।

কুরআনে যে সব নবীর উল্লেখ দেখিতে পাই, তাহাদেরই সবাই বিশ্বমানবতার একক সত্য ধর্মের বাণী লইয়া আসিয়াছিলেন। যেমন সূরা মু'মিনুনে হযরত নূহের প্রচার সম্পর্কে উল্লেখ করা হইয়াছে ঃ

وَلَقَدْ اَرْسَلْنَا نُوْحًا اِلٰى قَوْمِهٖ فَقَالَ يٰقَوْمِ اعْبُدُوْا اللّٰهَ مَالَكُمْ مِنْ اِلٰهٍ غَيْرُهٗ - اَفَلَا تَتَّقُوْنَ - (٢٣ : ٢٣)

—আর অবশ্যই আমি নূহকে তাহার গোত্রের কাছে পাঠাইয়াছিলাম। অতএব সে প্রচার করিল, 'হে আমার সম্প্রদায় ! আল্লাহ্‌তা'আলার ইবাদত কর। তিনি ভিন্ন কেহ ইলাহ্ নাই। তোমরা কি পাপ হইতে বিরত থাকিবে না ? (—সূরা মু'মিনুন ঃ আয়াত ২৩)

তারপর হযরত নূহ (আ)-এর পরবর্তী নবীরা যে প্রচার চালাইয়াছিলেন, তাহা এই ঃ

ثُمَّ اَنْشَاْنَا مِنْۢ بَعْدِهِمْ قَرْنًا اٰخَرِيْنَ - فَاَرْسَلْنَا فِيْهِمْ رَسُوْلًا مِّنْهُمْ اَنِ اعْبُدُوْا اللّٰهَ مَالَكُمْ مِّنْ اِلٰهٍ غَيْرُهٗ - (٢٣ : ٣١ - ٣٢)

—তারপর (নূহের প্লাবনের পর) পরবর্তী অধ্যায়ের পত্তন করিলাম। তাহাদের ভিতরেও তাহাদের মধ্য হইতে রাসূল পাঠাইলাম। তাহারাও প্রচার করিল, একক আল্লাহ্‌র ইবাদত কর, তিনি ভিন্ন তোমাদের আর কোন প্রভু নাই। (—সূরা মু'মিনুন ঃ আয়াত ৩১-৩২)

তারপর হযরত মূসা (আ)-এর প্রচারের উল্লেখ করা হইয়াছে। তারপর করা হইয়াছে হযরত ঈসা (আ)-এর প্রচারের উল্লেখ। এইসব প্রচারের উল্লেখ করিয়া সর্বশেষে মূল সত্যটি ঘোষণা করা হইয়াছে ঃ

يٰاَيُّهَا الرُّسُلُ كُلُوْا مِنَ الطَّيِّبٰتِ وَاعْمَلُوْا صَالِحًا - اِنِّىْ بِمَا تَعْمَلُوْنَ عَلِيْمٌ - وَاِنَّ هٰذِهٖ اُمَّتُكُمْ اُمَّةً وَّاحِدَةً وَّ اَنَا رَبُّكُمْ فَاتَّقُوْنِ - فَتَقَطَّعُوْا اَمْرَهُمْ بَيْنَهُمْ زُبُرًا - كُلُّ حِزْبٍ بِمَا لَدَيْهِمْ فَرِحُوْنَ - (٢٣ : ٥١ - ٥٣)

—আর আমি সকল নবীকেই এই আদেশ দান করিয়াছিলাম যে, পবিত্র বস্তু ভক্ষণ কর এবং সৎভাবে জীবন-যাপন কর। তোমরা যাহা করিতেছ, তাহা আমি জানি। আর (দেখ) তোমাদের মানব জাতি সবই একই সম্প্রদায় ছাড়া অন্য কিছুই নহে। আর তোমাদের সবার প্রভু আমি। সুতরাং পাপ ও নাফরমানী হইতে বাঁচ। তারপর অবস্থা দাঁড়াইল এই—একই মানবগোষ্ঠী শতধাছিন্ন হইয়া বিভিন্ন গণ্ডির সৃষ্টি করিল। আর প্রত্যেকেই নিজ নিজ অবস্থার উপরে খুশি রহিল। (—সূরা মু'মিনুন ঃ আয়াত ৫১-৫৩)

অর্থাৎ সব রাসূলই একের পর এক আসিয়া এই শিক্ষাই দিয়া গিয়াছেন যে, এক আল্লাহ্‌র উপাসনা কর এবং সৎভাবে জীবন-যাপন কর। তোমরা সবাই আল্লাহ্‌র কাছে এক জাতিভুক্ত। তোমাদের সকলেরই প্রভু একজন মাত্র। তোমাদের এক সম্প্রদায় অন্য সম্প্রদায় হইতে নিজেদের ভিন্ন ভাবিবে না, একে অপরকে শত্রু ভাবিবে না। কিন্তু মানুষ এই শিক্ষা ভুলিয়া গেল এবং প্রত্যেক দল নিজের যাহা কিছু লইয়া খুশি রহিল।

রঙ ধারণ পদ্ধতি

ধর্মীয় গণ্ডি সৃজন রীতির ভিতরে একটি হইল খৃষ্টানদের গির্জার অনুসৃত রীতি। উহাকে বলা হইত রঙ ধারণ রীতি বা ইস্তিবাগ। এই রীতি আদপে ইহুদীদের ছিল। মানুষ যখন পাপ হইতে তওবা করিত, তখন এই রীতি আদায় করা হইত। ইহা মনগড়া রীতি ছাড়া অন্য কিছুই ছিল না। কিন্তু ঈসায়ীরা উহাকে মুক্তি ও সৌভাগ্যের চাবিকাঠি মনে করিত। তাই কেহ ঈসায়ী হইলে তাহাকে এই রীতি পালন করিতে হইত। মাথার উপরে রঙ মিশ্রিত পানি ছিটাইয়া দিয়া ইহা পালন করা হইত। কুরআন বলে, বিশ্বাস ও কাজকে মুক্তি ও সৌভাগ্যের চাবিকাঠি না ভাবিয়া এইরূপ একটা মনগড়া পদ্ধতিতে ভাবাটা বিরাট এক বোকামি ছাড়া আর কি? আল্লাহ্‌র রঙ ধারণের পদ্ধতি তো এই যে, তোমাদের অন্তর আল্লাহ্‌র রঙে রঞ্জিত হইবে।

صِبْغَةَ اللّٰهِ - وَ مَنْ اَحْسَنُ مِنَ اللّٰهِ صِبْغَةً - وَّ نَحْنُ لَهٗ عٰبِدُوْنَ - (٢ : ١٣٨)

—এই হইল আল্লাহ্‌র রঙ ধারণ ব্যবস্থা (আল্লাহ্‌র ধর্মের স্বাভাবিক রূপ)। বিশেষ রঙ দানের ক্ষেত্রে আল্লাহ্‌র চাইতে উত্তম রঙকার আর কে হইতে পারে? আমরা তো তাঁহারই ইবাদতকারী। (—সূরা বাকারা ঃ আয়াত ১৩৮)

কর্মরীতি

তাই সূরা 'বাকারা'য় বারংবার বলা হইয়াছে, আল্লাহ্‌র ধর্ম কর্ম-প্রবণ ধর্ম। প্রত্যেক মানুষই তাহার কর্মফল ভোগ করিবে। মুক্তি ও সৌভাগ্যের কারণ কখনো কাহারও ইহা হইতে পারে না যে, তাহার গোত্রে বহু নবী ছিলেন, ওলী ছিলেন কিংবা সে পুণ্যবান লোকের বংশধর কিংবা প্রাচীন এক ধার্মিক গোষ্ঠীর সহিত তাহার যোগ রহিয়াছে।

تِلْكَ اُمَّةٌ قَدْ خَلَتْ - لَهَا مَا كَسَبَتْ وَ لَكُمْ مَّا كَسَبْتُمْ - وَلَا تُسْئَلُوْنَ عَمَّا كَانُوْا يَعْمَلُوْنَ - (٢: ١٣١)

—এই এক সম্প্রদায় ছিল যাহারা জীবন কাটাইয়া গেল। তাহারা যাহা করিয়া গেল, তাহার ফল তাহাদের ভাগ্যে রহিয়াছে। আর তোমরা যাহা করিবে, তাহার ফল তোমরা পাইবে। তাহাদের কাজের জন্য তোমাদের প্রশ্ন করা হইবে না। (—সূরা বাকারা ঃ আয়াত ১৪১)

কুরআনের ডাক

কুরআনে এই কথাটি বারংবার যেভাবে স্পষ্ট করিয়া তুলিয়াছে, সেরূপ আর কোন ব্যাপার দেখা যায় না। সে বারংবার এই কথা দ্ব্যর্থহীন ভাষায় ঘোষণা করিতেছে —সে নূতন কোন ধর্ম লইয়া আসে নাই, বরং সে চায় দুনিয়ার সকল ধর্মীয় কোন্দলের অবসান ঘটাইয়া বিশ্বমানবকে একই আল্লাহ্‌র উপাসক হিসাবে ভ্রাতৃত্বের বন্ধনে আবদ্ধ করিতে।

সে বারংবার বলে, যেই পথে আমি তোমাদের ডাকিতেছি, তাহা কোন নূতন পথ নহে। সত্যের পথ কখনো নূতন হইতে পারে না। এই পথ প্রথম দিন হইতেই বর্তমান ছিল এবং প্রত্যেক নবীই এই পথে সবাইকে আহবান করিয়া গিয়াছেন।

شَرَعَ لَكُمْ مِّنَ الدِّيْنِ مَاوَصّٰى بِهٖ نُوْحًا وَّالَّذِىْ اَوْحَيْنَا اِلَيْكَ وَمَا وَصَّيْنَا بِهٖ اِبْرَاهِيْمَ وَ مُوْسٰى وَعِيْسٰى اَنْ اَقِيْمُوْا الدِّيْنَ وَلَاتَتَفَرَّقُوْا فِيْهِ - (٤٢ : ١٣)

—আর (দেখ) তিনি তোমাদের জন্য সেই ধর্মই মনোনীত করিয়াছেন, যাহার নির্দেশ তিনি (হযরত) নূহকেও দিয়াছিলেন। আর যাহা আমি ওহী করেছি তোমাকে এবং যাহার নির্দেশ ইব্‌রাহীম, মূসা ও ঈসাকে দেওয়া হইয়াছিল। তাহাদের সবার শিক্ষা ইহাই ছিল যে, আল্লাহ্‌র একমাত্র 'দীন'কে প্রতিষ্ঠিত কর এবং উহার ভিতরে বিভেদ সৃষ্টি করিও না। (—সূরা শূরা ঃ আয়াত ১৩)

اِنَّا اَوْحَيْنَا اِلَيْكَ كَمَا اَوْحَيْنَا اِلٰى نُوْحٍ وَّالنَّبِيِّنَ مِنْ بَعْدِهٖ - وَاَوْحَيْنَا اِلٰى اِبْرَاهِيْمَ وَاِسْمٰعِيْلَ وَاِسْحٰقَ وَ يَعْقُوْبَ وَالْاَسْبَاطِ

وَعِيْسٰى وَ اَيُّوْبَ وَ يُوْنُسَ وَهَارُوْنَ وَسُلَيْمَانَ - وَاٰتَيْنَا دَاوٗدَ زَبُوْرًا - وَرُسُلاً قَدْ قَصَصْنَا هُمْ عَلَيْكَ مِنْ قَبْلُ وَ رُسُلاً لَّمْ نَقْصُصْ هُمْ عَلَيْكَ - (٤ : ١٦٣ - ١٦٤)

—(হে রাসূল) আমি তোমাকে সেইভাবে ওহীর মাধ্যমে নসিহত করিয়াছি, যেভাবে করিয়াছিলাম নূহকে এবং নূহের পরবর্তী সকল নবীকে। তেমনিভাবে ইব্‌রাহীম, ইস্‌মাঈল, ইসহাক, ইয়াকুব ও ইয়াকুবের সন্তান-সন্ততি, ইউনুস, হারূন, সোলায়মান প্রমুখকে করিয়াছি এবং দাউদকে যবুর গ্রন্থ দান করিয়াছি। ইহা ছাড়া বহু নবী রহিয়াছে, যাহাদের কথা তোমাকে শুনাইলাম না এবং কতিপয় নবীর অবস্থা তোমাকে শুনাইলাম মাত্র। (—সূরা নিসা ঃ আয়াত ১৬৩-১৬৪)

সূরা 'আন'আমে' আগেকার নবীদের উল্লেখ করার পরে রসূলুল্লাহ্‌কে লক্ষ করিয়া বলা হইল ঃ

اُوْلٰئِكَ الَّذِيْنَ هَدَى اللّٰهُ فَبِهُدٰهُمُ اقْتَدِهْ - (٦ : ٩٠)

—ইহাদেরই আল্লাহ্‌তা'আলা পথ দেখাইয়াছেন। সুতরাং (হে রাসূল) তুমি তাহাদের প্রদর্শিত পথ অনুসরণ কর। (—সূরা আন'আম : আয়াত ৯০)

সকল নবীর সমান স্বীকৃতি ও সকলের একই দীন অনুসরণ

এইজন্যই কুরআনের প্রথম ভিত্তি হইল সকল ধর্ম প্রবর্তকের সমান স্বীকৃতি দান অর্থাৎ তাঁহাদের সত্য নবী হওয়া সম্পর্কে পূর্ণ আস্থা স্থাপন এবং বিশ্বাস করা যে, তাঁহারা সবাই আল্লাহ্‌র সত্য ধর্মের প্রচার করিয়াছেন। তাই তাঁহাদের সম্মিলিত শিক্ষা অনুসরণ করাই পথ প্রাপ্তি ও সৌভাগ্য অর্জনের একমাত্র উপায়।

قُلْ اٰمَنَّا بِاللّٰهِ وَمَا اُنْزِلَ عَلَيْنَا وَمَا اُنْزِلَ عَلٰى اِبْرَاهِيْمَ وَاِسْمٰعِيْلَ وَاِسْحٰقَ وَيَعْقُوْبَ وَالْاَسْبَاطِ وَمَا اُوْتِيَ مُوْسٰى وَعِيْسٰى وَالنَّبِيُّوْنَ مِنْ رَّبِّهِمْ - لَانُفَرِّقُ بَيْنَ اَحَدٍ مِّنْهُمْ - وَنَحْنُ لَهٗ مُسْلِمُوْنَ - (٣ : ٨٤)

—(হে রাসূল) বলিয়া দাও, আমাদের নীতি তো এই যে, আমরা আল্লাহ্‌র উপর ঈমান আনিয়াছি এবং তিনি আমাদের উপরে যাহা কিছু অবতীর্ণ করিয়াছেন,উহার উপরে ঈমান আনিয়াছি। পরন্তু ইব্‌রাহীম, ইসহাক, ইয়াকুব ও ইয়াকুবের সন্তান-সন্ততির উপরে যাহা অবতীর্ণ করিয়াছেন, তাহার উপরেও ঈমান রাখি। এইভাবে মূসা, ঈসা ও দুনিয়ার অন্য সব নবীর উপর আল্লাহ্‌ যাহা কিছু অবতীর্ণ করিয়াছেন, তাহার উপরেও আমাদের ঈমান রহিয়াছে। আমরা তাঁহাদের কাহাকেও ভিন্ন করি

না (সকলকে সমান মর্যাদায় দেখি) এবং তাঁহাদের সকলের আমরা অনুসারী। (—সূরা আল ইমরান ঃ আয়াত ৮৪)

কুরআন এই আয়াতে ও অন্যান্য আরও কয়েকটি আয়াতে রাসূলদের ভিতরে পার্থক্য সৃষ্টি করাকে মস্তবড় বিভ্রান্তি বলিয়া আখ্যা দিয়াছে। আর সব রাসূলের সমান মর্যাদা দানকে সত্য পথ বলিয়াছে। পার্থক্য সৃষ্টির অর্থ এই যে, তাঁহাদের কাহাকেও সত্য জানা আবার কাহাকেও অসত্য মনে করা। কুরআন বলে, সত্যানুসারী মাত্রেরই অপরিহার্য কর্তব্য হইল, কোনরূপ পার্থক্য সৃষ্টি ব্যতিরেকে সব ঐশী গ্রন্থ, সব ধর্মীয় আহ্বান বিশ্বাস করিবে। তাহাদের চরিত্রের অন্যতম মূলনীতি হইবে, সত্য যেখানে যেই ভাষায় যাহার মাধ্যমেই প্রকাশ পাক না কেন, সত্য বলিয়া বিশ্বাস করা।

اٰمَنَ الرَّسُوْلُ بِمَا اُنْزِلَ اِلَيْهِ مِنْ رَّبِّهٖ وَالْمُؤْمِنُوْنَ - كُلٌّ اٰمَنَ بِاللّٰهِ وَمَلٰئِكَتِهٖ وَكُتُبِهٖ وَرُسُلِهٖ - لَا نُفَرِّقُ بَيْنَ اَحَدٍ مِّنْ رُّسُلِهٖ - وَقَالُوْا سَمِعْنَا وَاَطَعْنَا غُفْرَانَكَ رَبَّنَا وَاِلَيْكَ الْمَصِيْرُ - (٢ : ٢٨٥)

—আল্লাহ্‌র রাসূলদের প্রত্যেকেই তাহার নিজের উপরে অবতীর্ণ ঐশী বাণীর উপরে ঈমান আনিয়াছে। তেমনি আনিয়াছে মুমিনগণও। তাহারা সবাই আল্লাহ্‌র উপরে, ফিরিশ্‌তার উপরে, ঐশী গ্রন্থাবলির উপরে ও আল্লাহ্‌র সকল রাসূলের উপরে ঈমান আনিয়াছে। তাহাদের বক্তব্য ছিল এই, আমরা রাসূলদের ভিতরে কোনই পার্থক্য দেখি না (একজন হইতে আরেকজনকে বড় বা সত্য মনে করি না)। তাহারা বলিত—ওগো আল্লাহ্ আমরা তোমার পয়গাম শুনিয়াছি এবং তোমার অনুগত হইয়াছি। আমাদিগকে তাই ক্ষমার দৃষ্টিতে দেখিও। অবশেষে আমাদের সবাইকে তোমার কাছেই ফিরিয়া যাইতে হইবে। (—সূরা বাকারা ঃ আয়াত ২৮৫)

কুরআন বলে, আল্লাহ্ এক, তাঁহার সত্যও এক, তবে উহার পয়গাম বিভিন্ন ভাষায় পৌঁছানো হইয়াছে। এখন যদি তোমরা এক ভাষার পয়গাম সত্য বলিয়া স্বীকার কর আর অন্য ভাষাগুলি অস্বীকার কর, তাহার অর্থ দাঁড়ায় এই, একই সত্যকে এক স্থানে তুমি মানিয়া লইলে, অন্য স্থানে অমান্য করিলে। কিংবা একই কথা একদিকে মান্য কর, আরেকদিকে অমান্যও কর। এরূপ মান্য করা আদপে মান্য করাই নহে।

সে আরও বলে, আল্লাহ্‌র সত্য সাধারণ সত্যের মতই দেশ, কাল, পাত্র, ভাষা নির্বিশেষে সর্বব্যাপ্ত ও সার্বজনীন। তোমাদের স্বরচিত ভৌগোলিক, সাম্প্রদায়িক, ভাষাগত ও কালগত গণ্ডিতে সে সত্য আটক হইতে পারে না। সূর্যের মতই তিনি সবার জন্য সর্বকালে সর্বত্র আলো যোগাইয়া চলেন। সুতরাং তাঁহাকে বিশেষ কোন সীমাবদ্ধ গণ্ডিতে খুঁজিলে চলিবে না। তাঁহার সেই সার্বজনীন ও সর্বব্যাপী সত্তাকে

অর্চনা করিতে হইবে। তিনি যেখানে যে বেশে ধরা দিয়াছেন, তোমাদেরই তিনি, তোমরা তাঁহারই বান্দা।

তাই সে বলে, এক্ষেত্রে তোমাদের সামনে দুইটি পথই খোলা রহিয়াছে। হয় তোমরা তাঁহার সব কিছুর উপরে ঈমান আনিবে, নতুবা কোন কিছুর উপরেই আনিবে না। কিন্তু এই দুইয়ের মাঝখানে তৃতীয় কোন পথ নাই যে কিছু মানিবে আবার কিছু মানিবে না।

اِنَّ الَّذِيْنَ يَكْفُرُوْنَ بِاللّٰهِ وَرُسُلِهٖ وَ يُرِيْدُوْنَ اَنْ يُّفَرِّقُوْا بَيْنَ اللّٰهِ وَرُسُلِهٖ وَيَقُوْلُوْنَ نُؤْمِنُ بِبَعْضٍ وَّ نَكْفُرُ بِبَعْضٍ - وَّ يُرِيْدُوْنَ اَنْ يَّتَّخِذُوْا بَيْنَ ذَالِكَ سَبِيْلاً - اُوْلٰئِكَ هُمُ الْكَافِرُوْنَ حَقًّا - وَاَعْتَدْنَا لِلْكَافِرِيْنَ عَذَابًا مُّهِيْنًا - وَالَّذِيْنَ اٰمَنُوْا بِاللّٰهِ وَرُسُلِهٖ وَلَمْ يُفَرِّقُوْا بَيْنَ اَحَدٍ مِّنْهُمْ اُوْلٰئِكَ سَوْفَ يُؤْتِيْهِمْ اُجُوْرَهُمْ - وَ كَانَ اللّٰهُ غَفُوْرًا رَّحِيْمًا - (٤ : ١٥٠ - ١٥٢)

—যাহারা আল্লাহ্ এবং আল্লাহ্র রাসূলের বরখেলাফ চলে এবং আল্লাহ্ ও তাঁহার রাসূলের ভিতরে পার্থক্য সৃষ্টি করিতে চাহে (অর্থাৎ কাহাকে আল্লাহ্র রাসূল বলিয়া মানে আর কাহাকে মানে না) এবং বলে, তাহাদের অমুককে রাসূল মানি এবং অমুক অমুককে মানি না এবং এইভাবে তাহারা কুফর ও ঈমানের মাঝামাঝি তৃতীয় এক পথ সৃষ্টি করে, তাহাদের কাফির হওয়া সম্পর্কে কোন সন্দেহ নাই। আর যাহাদের পথ কুফরীর পথ, তাহাদের জন্য অপমানকর শাস্তি অবধারিত। কিন্তু হ্যাঁ—যাহারা আল্লাহ্ এবং তাঁহার সকল রাসূলের উপরে ঈমান আনে এবং কোন একজনকে অন্যান্য পয়গম্বর হইতে আলাদা করিয়া না দেখে (কাহারো সত্যতা অস্বীকার না করে) তাহাদের অবশ্যই যথাশীঘ্র আল্লাহ্র তরফ হইতে পুরস্কৃত করা হইবে। তিনি অত্যন্ত ক্ষমাশীল ও দয়ালু। (—সূরা নিসা ঃ আয়াত ১৫০-১৫২)

সূরা বাকারায় অর্থাৎ সূরা 'ফাতিহার পরের সূরায়ই মুমিনদের এরূপ পরিচয় দান করা হইয়াছে ঃ

وَالَّذِيْنَ يُؤْمِنُوْنَ بِمَا اُنْزِلَ اِلَيْكَ وَمَا اُنْزِلَ مِنْ قَبْلِكَ - وَبِالْاٰخِرَةِ هُمْ يُوْقِنُوْنَ - اُوْلٰئِكَ عَلٰى هُدًى مِّنْ رَّبِّهِمْ - وَاُوْلٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُوْنَ - ((٢ : ٤ - ٥)

—আর যাহারা তোমার নিকট অবতীর্ণ গ্রন্থের উপরে ঈমান আনে আর তোমার পূর্বেকার গ্রন্থাবলির উপরেও পরন্তু পরকালের উপরে আস্থা রাখে, তাহারাই

আল্লাহ্‌র নির্দেশিত সত্য পথে আছে এবং তাহারাই সফলকাম দল। (—সূরা বাকারা ঃ আয়াত ৪-৫)

কুরআন বলে, যদি তোমরা নিখিল সৃষ্টির একক স্রষ্টা মানিতে অস্বীকার না কর, আর মানিয়া লও যে, তিনি সবাইকে সমানভাবে প্রতিপালন করিতেছেন, তাহা হইলে তাঁহার মনোনীত আত্মিক বিধানও যে একরূপ হইবে, তাহা মানিবে না কেন ? সে বলে, তোমাদের সবারই প্রতিপালক এক। একই আল্লাহ্‌র নাম লইতেছে। তোমাদের নবীরা একই সত্য ধর্মের সন্ধান দিয়া গিয়াছে। এক কথায় সম্পর্ক এক পথও এক। অথচ আশ্চর্য যে, এক দল আরেক দলকে শত্রু ভাবিতেছে। একজন আরেকজনকে ঘৃণা কর। কাহার নাম লইয়া প্রত্যেকে এই ঝগড়ায় নামিয়াছ ? সেই আল্লাহ্ ও আল্লাহ্‌র ধর্মের নামে, যিনি সবাইকে একই বেদীতে মাথা ঠুকিবার ব্যবস্থা করিয়াছেন এবং সবাইকে একই ভ্রাতৃত্বের বন্ধনে আবদ্ধ হইতে বলিয়াছেন।

قُلْ يٰاَهْلَ الْكِتَابِ هَلْ تَنْقِمُوْنَ مِنَّا اِلاَّ اَنْ اٰمَنَّا بِاللّٰهِ وَمَا اُنْزِلَ اِلَيْنَا وَمَا اُنْزِلَ مِنْ قَبْلُ - وَاَنَّ اَكْثَرَكُمْ فٰسِقُوْنَ - (٥ : ٥٩)

—তাহাদের বল, হে কিতাবীগণ ! তোমরা কেন আমার বিরোধিতা করার জন্য কোমর বাঁধিয়া নামিয়াছ ? বল তো, আল্লাহ্‌র উপর এবং আমার ও আমার পূর্ববর্তীদের সমীপে তাঁহার অবতীর্ণ সব ঐশী গ্রন্থের উপর ঈমান আনাই কি আমার অপরাধ ? তবে কি আল্লাহ্‌র অর্চনা ও আল্লাহ্‌র সকল রাসূলের উপরে ঈমান আনা তোমাদের চোখে অন্যায় ও দূষণীয় ? আক্ষেপ ! তোমাদের অধিকাংশই সত্য পথ হইতে বিচ্যুত হইয়াছে। (—সূরা মায়িদা ঃ আয়াত ৫৯)

وَاِنَّ اللّٰهَ رَبِّىْ وَ رَبُّكُمْ فَاعْبُدُوْهُ - هٰذَا صِرَاطٌ مُسْتَقِيْمٌ - (١٩ : ٣٢)

—আর (দেখ) আল্লাহ্ তো তোমাদের ও আমার উভয়ের প্রতিপালক। সুতরাং তাঁহারই উপাসনা কর। ইহাই দীনের সরল পথ। (—সূরা মারয়াম ঃ আয়াত ৩৬)

قُلْ اَتُحَاجُّوْنَنَا فِى اللّٰهِ وَهُوَ رَبُّنَا وَ رَبُّكُمْ - وَلَنَا اَعْمَالُنَا وَلَكُمْ اَعْمَالُكُمْ - وَنَحْنُ لَهٗ مُخْلِصُوْنَ - (٢ : ١٣٩)

—হে রাসূল ! তাহাদের বল, তোমরা কি আল্লাহ্‌র ব্যাপারে আমার সহিত ঝগড়া করিতেছ ? তিনি তো আমার-তোমার সকলেরই প্রভু। আমাদের জন্য আমাদের কর্মফল এবং তোমাদের জন্য তোমাদের কর্মফল ! এ ব্যাপারে ঝগড়ার কি আছে ? আমরা সেই প্রভুরই খালেস বান্দা। (—সূরা বাকারা ঃ আয়াত ১৩৯)

মনে রাখা উচিত, কুরআনে যেখানে বলিয়াছে, 'নিশ্চয় আল্লাহ্ আমাদের ও তোমাদের উভয় দলের প্রতিপালক'— 'তোমাদের ও আমাদের একই প্রভু'—'তিনি

আমাদেরও প্রভু, তোমাদেরও প্রভু'—এই সকল আয়াতের উদ্দেশ্য হইল আলোচ্য সত্যটির উপরে জোর দান। অর্থাৎ প্রভু যখন সবার একই প্রভু এবং প্রত্যেকেই যখন নিজ কর্মফল ভোগ করিবে, তখন আর সেই আল্লাহ্ ও তাঁহার সত্য ধর্মের নামে বিশ্বব্যাপী এত দাঙ্গা-হাঙ্গামা ও যুদ্ধ-বিগ্রহ কেন ? কুরআন পাক বারংবার বলে, 'আমার শিক্ষা এক আল্লাহ্র অর্চনা ও সৎ জীবন-যাপনের শিক্ষা ছাড়া অন্য কিছুই নহে। আমি কোন ধর্মকে মিথ্যা বলি না, কোন নবীকেও অস্বীকার করি না। সবাইকে সমানভাবে স্বীকার করা ও সবার সম্মিলিত শিক্ষাকে নিজের শিক্ষারূপে গ্রহণ করাই হইল আমার মূলনীতি। সুতরাং আমার বিরুদ্ধে অন্য ধর্মাবলম্বীরা যুদ্ধ ঘোষণা করিতেছে কেন ?

সব সম্প্রদায়ের কাছে কুরআনের দাবি

এই কারণেই আমরা দেখি, কুরআন মজীদ কোন ধর্মানুসারীর কাছেই এক নয়া ধর্ম মানিবার আব্দার জানায় না। বরং সকল সম্প্রদায়ের কাছে এই দাবিই জানায় যে, তোমরা নিজ নিজ ধর্মের হৃত সত্যকে পুনরুদ্ধার কর এবং যুগ যুগ ধরিয়া উহাতে যত পরিবর্তন ও পরিবর্ধন ঘটিয়া আজকের এই বিকৃত রূপ দেখা দিয়াছে, তাহা দূর করিয়া মূল সত্যের অনুসরণ কর। সে বলে, যদি তোমরা তাহা কর, আমার কর্তব্য সমাধা হইল। কারণ যখনই তোমরা নিজ নিজ ধর্মের মূল সত্যের দিকে ফিরিয়া যাইবে, তোমাদের সামনে তখন সেই সত্যই ভাসিয়া উঠিবে যেদিকে আমি তোমাদের ডাকিতেছি। আমার পয়গাম কোন নূতন পয়গাম নহে। ইহা সেই প্রাচীন ও বিশ্বজনীন পয়গাম যাহা প্রত্যেক ধর্ম প্রবর্তক শুনাইয়া গিয়াছেন।

قُلْ يٰاَهْلَ الْكِتٰبِ لَسْتُمْ عَلٰى شَىْءٍ حَتّٰى تُقِيْمُوا التَّوْرٰةَ وَالْاِنْجِيْلَ وَمَا اُنْزِلَ اِلَيْكُمْ مِّنْ رَّبِّكُمْ - وَلَيَزِيْدَنَّ كَثِيْرًا مِّنْهُمْ مَّا اُنْزِلَ اِلَيْكَ مِنْ رَّبِّكَ طُغْيَانًا وَّ كُفْرًا - فَلَا تَاْسَ عَلَى الْقَوْمِ الْكٰفِرِيْنَ - اِنَّ الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا وَالَّذِيْنَ هَادُوْا وَالصّٰبِئُوْنَ وَالنَّصٰرٰى مَنْ اٰمَنَ بِاللّٰهِ وَالْيَوْمِ الْاٰخِرِ وَعَمِلَ صَالِحًا فَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُوْنَ - (٥ : ٦٨ - ٦٩)

—হে ঐশী গ্রন্থানুসারী সম্প্রদায় ! যতক্ষণ পর্যন্ত তোমরা তোমাদের উপরে অবতীর্ণ তাওরাত, ইঞ্জীল ও অন্যান্য ঐশী গ্রন্থের মূল সত্যের উপরে প্রতিষ্ঠিত না হইবে, ততক্ষণ পর্যন্ত তোমাদের কাছে সত্য ধর্মের কিছুই থাকিতে পারে না। আর (হে রাসূল) তোমার উপরে তোমার প্রভুর তরফ হইতে যাহা কিছু অবতীর্ণ হইয়াছে, (উহা হইতে পথের সন্ধান লাভ তো দূরে) তাহাদের অনেকেরই উহার ফলে কুফরী ও নাফরমানী বাড়িয়া যাইবে। যাহারা সত্যকে এইভাবে অস্বীকার করার পথ অনুসরণ করিয়াছে, তুমি অহেতুক তাহাদের জন্য দুঃখিত হইও না।

যাহারা তোমার উপরে ঈমান আনিয়াছে, আর ইহুদী, সাবী ও নাসারাদের যাহারা আল্লাহ্ ও পরকালে ঈমান আনিয়া ভাল কাজ করিবে, তাহাদের না কোন ভয় আছে, না ভাবনা। (—সূরা মায়িদা ঃ আয়াত ৬৮-৬৯)

এই কারণেই কুরআন মজীদ সমসাময়িক কালের অন্যান্য ধর্মের সঠিক ঈমান ও আমলে পোক্ত মানুষদের মুক্ত প্রাণে সত্যানুসারী বলিয়া স্বীকৃতি দিয়াছে। অবশ্য বলিয়াছে, এরূপ লোকের সংখ্যা নিতান্তই নগণ্য। অধিকাংশ লোকই নিজ নিজ ধর্মের সঠিক বিশ্বাস ও কাজের মূল সত্যটি হারাইয়া বসিয়াছিল।

لَيْسُوْا سَوَاءً - مِّنْ اَهْلِ الْكِتَابِ اُمَّةٌ قَائِمَةٌ يَّتْلُوْنَ اٰيٰتِ اللّٰهِ اٰنَاءَ الَّيْلِ وَهُمْ يَسْجُدُوْنَ - يُؤْمِنُوْنَ بِاللّٰهِ وَالْيَوْمِ الْاٰخِرِ وَيَاْمُرُوْنَ بِالْمَعْرُوْفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ - وَيُسَارِعُوْنَ فِى الْخَيْرَاتِ - وَاُولٰئِكَ مِنَ الصّٰلِحِيْنَ - وَمَا يَفْعَلُوْا مِنْ خَيْرٍ فَلَنْ يُّكْفَرُوْهُ - وَاللّٰهُ عَلِيْمٌ بِالْمُتَّقِيْنَ - (٣ : ١١٣ - ١١٥)

—এই কথা নহে যে, সবাই একই ধরনের। সেই ঐশী গ্রন্থ প্রাপ্তদের ভিতরে এমন কিছু লোকও আছে, যাহারা মূল সত্যের উপরে প্রতিষ্ঠিত রহিয়াছে। তাহারা রাত্রে উঠিয়া আল্লাহ্র বাণী পাঠ করে এবং তাহাদের মাথাও আল্লাহ্র কাছে অবনত থাকে। তাহারা ভাল কাজের আদেশ দেয় আর মন্দ কাজ হইতে ফিরিয়া থাকিতে বলে। তাহারা পুণ্যের পথে দ্রুত আগাইয়া চলে। নিশ্চয়ই এই লোকগুলি ভাল মানুষের দলে আছে। আর (স্মরণ রাখিও) ইহারা যাহা কিছু পুণ্য করিতেছে, কখ্খনো তাহা অনাদৃত হইবে না। আল্লাহ্ ভাল করিয়াই জানেন যে, কোন্ দলে কে ভাল মানুষ। (—সূরা আল-ইমরান ঃ আয়াত ১১৩-১১৫)

مِنْهُمْ اُمَّةٌ مُّقْتَصِدَةٌ - وَكَثِيْرٌ مِّنْهُمْ سَاءَ مَا يَعْمَلُوْنَ - (٥ : ٦٦)

—তাহাদের মধ্যে একদল অবশ্য মধ্যপন্থী। কিন্তু বড় দলই হইল খারাপ কাজের অনুসারী। (—সূরা মায়িদা ঃ আয়াত ৬৬)

কুরআন যে বিভিন্ন স্থানে জোর দিয়া সব ঐশী গ্রন্থকে স্বীকৃতি দান করে, কোনটিকে মিথ্যা বলে না এবং গ্রন্থধারীদের বারংবার বলে, 'সেই ঐশী গ্রন্থের উপরেও ঈমান আন যাহা তোমার উপরে অবতীর্ণ গ্রন্থকে স্বীকৃতি দান করে'—তাহার উদ্দেশ্যও এই সত্যটির উপরে জোর দেওয়া যে, আমার শিক্ষা যখন নূতন কিছু নহে বরং তোমাদেরই শিক্ষার সহায়ক ; তখন আর তোমাদের আর আমার ভিতরে ঝগড়া কোথায় ? কেন তোমরা অহেতুক আমার বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা কর ?

কুরআনের পরিভাষায় 'আল-মা'রূফ' ও 'আল-মুনকার'

এই কারণেই কুরআন পুণ্যের জন্য 'মা'রূফ' ও পাপের জন্য 'মুনকার' শব্দ গ্রহণ করিয়াছে। যেমন 'ইয়ামুরূনা বিল মা'রূফে ওয়া ইয়ানহাওনা আনিল মুনকার'।

আরবী 'উরফ' শব্দ মূল হইতে 'মা'রূফ' শব্দের উৎপত্তি। 'উরফ' অর্থ জানা, পরিচয় লাভ। সুতরাং মা'রূফ অর্থ হইল জ্ঞাত বা পরিচিত ব্যাপার। 'মুন্‌কার' অর্থ অস্বীকার করা। অর্থাৎ এমন ব্যাপার যাহা সাধারণভাবে অস্বীকৃত হইয়া আসিয়াছে। সার্বজনীন কুরআন পুণ্য ও পাপের জন্য এই দুইটি শব্দ গ্রহণ করিয়াছে। কারণ পৃথিবীতে মত ও পথের বিরোধ যতই থাকুক না কেন, কিছু ব্যাপার এমন আছে, যাহা ভাল বলিয়া সর্বত্র স্বীকৃতি লাভ করিয়াছে এবং কিছু ব্যাপার এমন আছে যাহা খারাপ বলিয়া সর্বসম্মত ধারণা সৃষ্টি হইয়াছে। যেমন সত্য বলা ভাল এবং মিথ্যা বলা অন্যায়, এই ব্যাপারে কোথাও দ্বিমত নাই। তেমনি সততা রক্ষা করা, পিতামাতার সেবা করা, পাড়া-প্রতিবেশীর সহিত ভাল ব্যবহার করা, গরীব-মিস্‌কীনের খোঁজ-খবর লওয়া, মজলুমকে সাহায্য করা ইত্যাদি ভাল কাজ এবং ইহার বিপরীতগুলি খারাপ কাজ বলিয়া সবাই মানিয়া লইয়াছে। দুনিয়ার যত ধর্ম, দর্শন, বিজ্ঞান, সাহিত্য কোন কিছুই এই ব্যাপারে মতদ্বৈধতার প্রশ্রয় দেয় নাই।

কুরআন বলে, গোটা মানব জাতির কাছে যেই সব কাজ ভাল বলিয়া পরিচিত, সেইগুলিই আল্লাহ্‌র ধর্মের কাম্য কর্ম। পক্ষান্তরে যেইগুলি সাধারণভাবে সকলের কাছে স্বীকৃতি পায় নাই অর্থাৎ যেইগুলির খারাপ হওয়া সম্পর্কে সবাই একমত, তাহা আল্লাহ্‌র ধর্মের নিষিদ্ধ কাজ। এইগুলিই যেহেতু সত্য ধর্মের মূল ছিল, তাই হাজার বিরোধ সত্ত্বেও এইগুলি সর্বসম্মতভাবে চলিয়া আসিয়াছে। সর্ব যুগের, সর্ব মানুষের সর্বসম্মত ধারণাই এই সিদ্ধান্তের স্বাভাবিক সত্যতার বড় দলীল। অথচ এই স্বাভাবিক সত্যকেই যখন আমি সত্য ধর্মের বিধান বলিয়া ঘোষণা করিয়াছি, তখন আমার সহিত কোন সত্যকামী ব্যক্তির বিরোধ থাকিতে পারে কি ?

সহজাত সরল মতবাদ আল্লাহ্‌র প্রকৃতি

সে বলে, এই কর্ম পন্থাই মানবজাতির জন্য আল্লাহ্‌র নির্ধারিত প্রকৃতির ধর্ম। প্রকৃতির বিধানের যেহেতু পরিবর্তন নাই সুতরাং ইহা সহজাত ধর্ম। ইহাতে কোনরূপ অস্বাভাবিকতা বা অসরলতা নাই। ইহাই 'দীনে হানাফী' হযরত ইবরাহীম যেই পথে সবাইকে ডাকিয়াছিলেন। আমার পরিষাভায় ইহা হইল 'আল্‌-ইস্‌লাম' অর্থাৎ আল্লাহ্‌ নির্ধারিত বিধানের আনুগত্য।

فَاَقِمْ وَجْهَكَ لِلدِّيْنِ حَنِيْفًا - فِطْرَتَ اللّٰهِ الَّتِىْ فَطَرَ النَّاسَ عَلَيْهَا - لَاتَبْدِيْلَ لِخَلْقِ اللّٰهِ - ذَالِكَ الدِّيْنُ الْقَيِّمُ - وَلٰكِنَّ اَكْثَرَ النَّاسِ لَايَعْلَمُوْنَ - مُنِيْبِيْنَ اِلَيْهِ وَاتَّقُوْهُ وَ اَقِيْمُوْا الصَّلٰوةَ وَلَا تَكُوْنُوْا مِنَ الْمُشْرِكِيْنَ - مِنَ الَّذِيْنَ فَرَّقُوْا دِيْنَهُمْ وَ كَانُوْا شِيَعًا كُلُّ حِزْبٍ بِمَا لَدَيْهِمْ فَرِحُوْنَ -

—তোমরা সকল দিক হইতে মুখ ফিরাইয়া 'আদ্-দীন'-এর দিকে অগ্রসর হও, ইহা আল্লাহ্‌র প্রকৃতি। ইহারই ভিত্তিতে মানুষ সৃষ্টি করা হইয়াছে। আল্লাহ্‌র প্রকৃতিতে কখনও পরিবর্তন আসে না। ইহাই সহজ সত্য ধর্ম। কিন্তু অধিকাংশ মানুষ তাহা জানে না। (দেখ) একমাত্র আল্লাহ্‌র দিকেই অগ্রসর হও। তাঁহার অবাধ্যতা ছাড়িয়া দাও। নামায কায়েম কর। অংশীবাদীদের দলে ভিড়িও না। তাহারা নিজেদের একক ধর্মকে ছিন্ন-বিচ্ছিন্ন করিয়া বিভিন্ন সম্প্রদায়ে বিভক্ত হইয়াছে। তারপর যাহার কাছে এখন যাহা আছে, তাহা নিয়াই তাহারা মত্ত রহিয়াছে। (—সূরা রূম ঃ আয়াত ৩০-৩২)

আল-ইসলাম

সে বলে, ইহাই আল্লাহ্‌র নির্ধারিত মতবাদ। ইহার ব্যতিক্রমে যাহা কিছু দেখা যায়, সবই মানুষের মনগড়া আর সাম্প্রদায়িক কোটারী-মূলক বিভ্রান্তির ফসল। এখন যদি তোমরা তোমাদের সর্বসম্মত সত্য ধর্ম ফিরিয়া পাইতে চাও, তাহা হইলে নিজ সৃষ্ট বিভ্রান্তির বেড়াজাল ছিন্ন করিয়া মূল ধর্মে প্রত্যাবর্তন কর। তাহা হইলেই আমার মিশন সফল হইল। ইহা হইতে বেশি কিছু আমি চাহি না।

اِنَّ الدِّيْنَ عِنْدَ اللّٰهِ الْاِسْلَامُ – وَمَا اخْتَلَفَ الَّذِيْنَ اُوْتُوْا الْكِتَابَ اِلاَّ مِنْۢ بَعْدِ مَا جَاءَهُمُ الْعِلْمُ بَغْيًا بَيْنَهُمْ – وَمَنْ يَّكْفُرْ بِاٰيٰتِ اللّٰهِ فَاِنَّ اللّٰهَ سَرِيْعُ الْحِسَابِ – فَاِنْ حَاجُّوْكَ فَقُلْ اَسْلَمْتُ وَجْهِىَ لِلّٰهِ وَمَنِ اتَّبَعَنِ – وَقُلْ لِّلَّذِيْنَ اُوْتُوْا الْكِتَابَ وَالْاُمِّيِّنَ وَاَسْلَمْتُمْ – فَاِنْ اَسْلَمُوْا فَقَدِ هْتَدَوْا – وَاِنْ تَوَلَّوْا فَاِنَّمَا عَلَيْكَ الْبَلاَغُ – وَاللّٰهُ بَصِيْرٌۢ بِالْعِبَادِ –

—আল্লাহ্‌র কাছে ধর্ম একটি মাত্র এবং তাহা হইল 'আল্-ইসলাম '। আর পূর্ব গ্রন্থধারীরা যে ধর্মের ভিতর ভিন্নতা সৃষ্টি করিয়াছে এবং একমাত্র ধর্মে সমবেত হওয়ার বদলে ইহুদী, নাসারা ইত্যাদি সম্প্রদায়ে বিভক্ত হইয়াছে তাহা এইজন্য যে, জ্ঞান ও শিক্ষার দৃষ্টি তাহাদের খোলা থাকা সত্ত্বেও জিদ ও নাফরমানী তাহাদের বিচ্ছিন্ন করিয়া ফেলিয়াছে। আর (মনে রাখিও) যে কেহ আল্লাহ্‌র বাণী অস্বীকার করে তাহাকে যথাশীঘ্র সাজা দানের ব্যাপারে আল্লাহ্‌র কর্ম-ফলের বিধান মোটেই উদাসীন থাকিবে না। যদি এইগুলি তোমার সঙ্গে এই ব্যাপার লইয়া ঝগড়া করে, তাহা হইলে তুমি বলিয়া দাও আমার ও আমার অনুসারীদের পথ হইল আল্লাহ্‌র সামনে আনুগত্যের শির নত করা, তাই আমরা মাথা নত করিয়া দিয়াছি। তারপর পূর্ব গ্রন্থধারী মূর্খ আরব মুশ্‌রিকদের জিজ্ঞাসা কর, তোমরা তাঁহার কাছে মাথা নত করিবে কি না ? অর্থাৎ সব ঝগড়া ছাড়িয়া সোজা কথা বল যে, আল্লাহ্‌র অনুগত হইবে কি না ? যদি তাহারা মাথা নত করে, তাহা

হইলে সব ঝগড়ার পরিসমাপ্তি ঘটিল এবং তাহারা পথ পাইল। যদি তাহারা ঘাড় ফিরাইয়া লয়, তাহা হইলে তোমার দায়িত্ব শুধু সত্যের পয়গাম পৌঁছানো ছাড়া আর কিছুই নহে। আর আল্লাহ্ বান্দার সব খবরই রাখেন। (—সূরা আল-ইমরান ঃ আয়াত ১৯-২০)

কুরআন আল্লাহ্র মতবাদ (দীন) বুঝাইতে 'আল্-ইসলাম' শব্দটি এই জন্য গ্রহণ করিয়াছে যে, ইস্লাম অর্থ কোন কিছু মানিয়া লওয়া ও অনুগত হওয়া। দীনের তাৎপর্যও ইহাই। আল্লাহ্ মানুষকে যে কল্যাণের ও সৌভাগ্যের বিধি দান করিয়াছেন, উহার সঠিক অনুসরণ চাই। সে আরও বলে, ইহা তো শুধু মানুষের জন্যই নহে বরং নিখিল সৃষ্টির অস্তিত্ব ইহার উপরে প্রতিষ্ঠিত। অর্থাৎ বিশ্ব জাহানের সব কিছুই আল্লাহ্র নির্ধারিত প্রকৃতির বিধানের অনুগত হইয়া চলিয়াছে। যদি মুহূর্তের জন্য উহার ব্যত্যয় ঘটে, তাহা হইলে গোটা সৃষ্টি লণ্ডভণ্ড হইয়া যায়।

اَفَغَيْرَ دِيْنِ اللّٰهِ يَبْغُوْنَ وَلَهٗ اَسْلَمَ مَنْ فِى السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ طَوْعًا وَّكَرْهًا وَّاِلَيْهِ يُرْجَعُوْنَ .

—অতঃপর এই লোকগুলি কি আল্লাহ্র নির্ধারিত (প্রকৃতির) ধর্ম ছাড়িয়া অন্য কোন ধর্ম খুঁজিতেছে ? অথচ আসমান ও জমিনের সব কিছুই ইচ্ছায় কিংবা অনিচ্ছায় ইস্লাম (আনুগত্যের পথ) অনুসরণ করিয়া চলিতেছে এবং অবশেষে সবাই আল্লাহ্র দিকেই ফিরিয়া যাইবে। (—সূরা আল-ইমরান ঃ আয়াত ৮৩)

সে যখন বলে, 'আল-ইসলাম' ভিন্ন আল্লাহ্র কাছে অন্য কোন ধর্ম গ্রহণীয় নহে ; তাহার অর্থ এই যে, সকল রাসূলের একই সুরে প্রচারিত সত্য ধর্ম ছাড়া সম্প্রদায় বিশেষের মনগড়া ধর্মগুলির একটিও আল্লাহ্র কাছে স্বীকৃতি পাইবে না। সূরা 'আল-ইমরানে' যেখানে বলা হইয়াছে যে, ধর্মের সঠিক পথ সকল ধর্মের প্রবর্তকদের স্বীকৃতি দান ও অনুসরণের পথ, তখন সেই সঙ্গে ইহাও বলা হইয়াছে ঃ

وَمَنْ يَّبْتَغِ غَيْرَ الْاِسْلَامِ دِيْنًا فَلَنْ يُّقْبَلَ مِنْهُ - وَهُوَ فِى الْاٰخِرَةِ مِنَ الْخَاسِرِيْنَ -

—ইসলাম ছাড়া যদি কেহ অন্য ধর্ম খুঁজে, তাহা হইলে স্মরণ রাখিও, তাহার সেই ধর্ম কখনো স্বীকৃতি লাভ করিবে না। আর পরকালে সে নিজেকে ক্ষতিগ্রস্ত দেখিবে। (—সূরা আল-ইমরান ঃ আয়াত ৮৫)

এইজন্যই কুরআন সকল ধর্মাবলম্বীকে বারংবার সতর্ক করিয়া বলিতেছে, ধর্মের নামে বিভেদ ও সাম্প্রদায়িক গণ্ডি সৃষ্টি হইতে বিরত থাক এবং আমি যেসব বিভ্রান্তির বেড়াজাল হইতে মুক্তি দিতে চাই, তাহাতে কেহ জড়াইও না। সে বলে, আমার ডাকে দুনিয়ার যে সকল মানুষ ধর্মের নামে একে অপরের শত্রু সাজিয়াছিল, তাহারা সবাই আল্লাহ্ অর্চনার একই পথে সুনিবিড় ভ্রাতৃত্বের বন্ধনে আবদ্ধ হইয়াছে। যে ইহুদী

হযরত ঈসা (আ)-এর নামও শুনিতে পারিত না, যে খ্রীস্টান ইহুদীদের রক্তপিপাসু ছিল, যে অগ্নিপূজকের নিকট অন্য সব সম্প্রদায়ের মানুষ অপবিত্র ছিল, যে আরববাসী অনারবদের শরাফত ও সভ্যতা হইতে বঞ্চিত ভাবিত, যে সাবী শুধু নিজেদেরই দুনিয়ার আদি সত্যের ধ্বজাধারী ভাবিত, তাহাদের সবাইকে আমার ডাক এক সূত্রে গাঁথিয়া লইল। এখন তাহারা একে অপরকে ঘৃণা করার বদলে ভালবাসে আর প্রত্যেক নবীর সত্যতা স্বীকার করে এবং তাঁহাদের সর্বসম্মত সত্য ধর্মের উপর চলে।

وَاعْتَصِمُوْا بِحَبْلِ اللّٰهِ جَمِيْعًا وَّ لَاتَفَرَّقُوْا - وَذْكُرُوْا نِعْمَتَ اللّٰهِ عَلَيْكُمْ اِذْكُنْتُمْ اَعْدَاءً فَاَلَّفَ بَيْنَ قُلُوْبِكُمْ فَاَصْبَحْتُمْ بِنِعْمَتِهٖ اِخْوَانًا - وَكُنْتُمْ عَلٰى شَفَا حُفْرَةٍ مِّنَ النَّارِ فَاَنْقَذَكُمْ مِنْهَا - كَذٰلِكَ يُبَيِّنُ اللّٰهُ لَكُمْ اٰيٰتِهٖ لَعَلَّكُمْ تَهْتَدُوْنَ -

—আর (দেখ) সবাই মিলিয়া আল্লাহ্‌র রজ্জু মজবুত করিয়া ধর এবং ছিন্ন-ভিন্ন হইও না। আল্লাহ্ তোমাদের উপরে যে মেহেরবানী করিয়াছেন, তাহা স্মরণ রাখিও। তোমাদের অবস্থা তো এই ছিল যে, একে অপরের শত্রু ছিলে। তারপর আল্লাহ্ তোমাদের মনের ভিতরে পরস্পরের জন্য প্রীতি জন্মাইলেন। আল্লাহ্‌র সেই নিয়ামতের বদৌলতে তোমরা সবাই ভাই ভাই হইয়া গেলে। আর (শোন) তোমাদের অবস্থা ছিল এই, একটি জ্বলন্ত অগ্নির গভীর খাদের কিনারায় তোমরা দণ্ডায়মান ছিলে। আল্লাহ্ সেখান হইতে তোমাদিগকে বাঁচাইয়া আনিলেন। আল্লাহ্ এইভাবে তাঁহার নিদর্শনের পরিচয় তোমাদের চোখের সামনে তুলিয়া ধরেন যেন তোমরা সত্য পথের সন্ধান পাও। (—সূরা আল-ইমরান ঃ আয়াত ১০৩)

وَلَاتَكُوْنُوْا كَالَّذِيْنَ تَفَرَّقُوْا وَاخْتَلَفُوْا مِنْۢ بَعْدِ مَا جَاءَهُمُ الْبَيِّنَاتُ - وَاُولٰئِكَ لَهُمْ عَذَابٌ عَظِيْمٌ -

—আর (দেখ) যাহারা একক ধর্মে স্থির থাকার স্থলে ছিন্ন-বিচ্ছিন্ন হইয়া বিভেদের প্রাচীর গড়িয়া তুলিয়াছে, তোমরা আবার তাহাদের মত হইও না। অথচ তাহাদের সামনে জাজ্বল্যমান দলীল-প্রমাণ ছিল। (স্মরণ রাখিও) তাহাদের জন্য ভীষণ শাস্তি রহিয়াছে। (—সূরা আল-'ইমরান ঃ আয়াত ১০৫)

وَاَنَّ هٰذَا صِرَاطِىْ مُسْتَقِيْمًا فَاتَّبِعُوْهُ - وَلَاتَتَّبِعُوا السُّبُلَ فَتَفَرَّقَ بِكُمْ عَنْ سَبِيْلِهٖ - ذٰلِكُمْ وَصّٰكُمْ بِهٖ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُوْنَ -

—আর (দেখ) এই হইল আমার পথ। একেবারেই সরল সহজ পথ। তাই সেই একই পথে চল। নানা ধরনের পথ অনুসরণ করিও না। কারণ আল্লাহ্ তোমাদের এই কথাই উপদেশ দেন। তোমরা যেন নাফরমানী হইতে বাঁচিয়া থাক। (—সূরা আন'আম ঃ আয়াত ৬)

কুরআন মজীদের সঙ্গে অন্যান্যের বিরোধের ভিত্তি

কিছুক্ষণের জন্য কুরআনের সঙ্গে বিরোধীদের ঝগড়ার ব্যাপারটি চিন্তা করুন। এই বিরোধীরা কাহারা ? তাহারা পূর্ববর্তী ধর্মানুসারীর দল। তাহাদের কোন কোন দলের সাথে ঐশী গ্রন্থ ছিল, আবার কোন কোন দলের তাহা ছিল না।

তাহাদের বিরোধের কারণ কি এই ছিল যে, কুরআন তাহাদের ধর্ম প্রবর্তকদের মিথ্যা বলিয়াছে ? না তাহাদের উপরে অবতীর্ণ ঐশী গ্রন্থকে মিথ্যা বলিয়াছে ? না সে এই দাবি করিয়াছিল যে, সত্য শুধু আমার কাছে রহিয়াছে, ' ান্যান্য ধর্ম প্রবর্তকদের মান্য করিও না ? না সে ধর্মের নামে কোন নূতন কথ. .ইয়াছে যাহা অন্যান্য ধর্মানুসারীর পক্ষে মানিয়া লওয়া স্বাভাবিক ছিল না ?

কুরআনের পৃষ্ঠা খোলাই রহিয়াছে। উহার অবতীর্ণ হবার ইতিহাসও দুনিয়ার সকলের জানা আছে। এই দুই অবস্থাই আমাদের বলিয়া দেয়, এই সবের একটি কারণেও তাহারা কুরআনের বিরোধিতা করিয়াছিল না। সবাই জানে, কুরআন শুধু তাহাদের ধর্ম প্রবর্তকদের স্বীকৃতিই জানায় না বরং কুরআনের পূর্বেকার সকল ধর্ম প্রবর্তককেই সত্য বলিয়া ঘোষণা করে। এমন কি তাহাদের কাহারো অস্বীকৃতিতে স্বয়ং আল্লাহ্‌কে অস্বীকার করার মত অপরাধ মনে করে। সে কোন ধর্মাবলম্বীকে নিজ ধর্ম ছাড়িতে বলে না বরং প্রত্যেককে নিজ নিজ ধর্মের মূল শিক্ষায় ফিরিয়া যাইতে আবেদন জানায়। সে ধর্মের নামে কোন নূতন কথা শোনায় না বরং দুনিয়ার সকল ধর্মের স্বীকৃতি দিয়া হৃত সত্যকে পুনরুজ্জীবিত করে মাত্র। তাহা হইল এক আল্লাহ্‌র বিশ্বাস ও সৎ জীবন-যাপন। এমন কি যার যার ধর্মে থাকিয়া এই কাজটুকু করিলেই তাহার মিশন সে সফল মনে করে।

প্রশ্ন জাগে, তাহা হইলে অন্যান্য ধর্মাবলম্বীর সঙ্গে কুরআনের বিরোধ কোথায় ? যে ব্যক্তি কাহাকেও মন্দ বলে না, সবাইকে মানে, সকলের শিক্ষাকে গ্রহণ করে, সর্বমান্য বিধি-নিষেধগুলিই সবাইকে পালন করিতে বলে, এমন লোকের সহিত কি লইয়া লড়াই করা চলে ? আর তাহার ডাকে সাড়া না দিয়াই বা পারে কি করে ?

বলা হয়, কুরায়শরা এই ভিত্তিতে বিরোধিতা করিয়াছিল যে, কুরআন প্রতিমা পূজা নিষেধ করিয়াছিল। অথচ তাহারা প্রতিমা পূজায় অভ্যস্ত হইয়াছিল। অবশ্য ইহাও অন্যতম কারণ ছিল। কিন্তু ইহাই ঝগড়ার মূল ছিল না। তাহা হইলে প্রশ্ন জাগে, আরবের ইহুদীরা তো আর প্রতিমা পূজক ছিল না। তাহারা বিরোধিতা করিল কেন ? ঈসায়ীরাও তো প্রতিমা পূজা সমর্থন করিত না।

আদপে অন্য ধর্মানুসারীদের বিরোধ এইজন্য ছিল না যে, তাহাদের অসত্য বলা হইয়াছিল। বরং তাহাদের আক্রোশ এইটাই ছিল যে, তাহাদের মিথ্যার পূজারী বলা হইল না কেন ? সকল ধর্মানুসারীই চাহিয়াছিল যে, শুধু তাহাদেরই সত্যানুসারী বলা হউক এবং অন্য সবাইকে অসত্যের পূজারী বলা হউক। তাহা না করিয়া কুরআন

সবগুলিকেই সত্য ধর্ম বলিতেছে, ইহা তাহাদের মোটেও খুশি করিতে পারে নাই। হযরত মূসা (আ)-কে কুরআন সত্য নবী বলায় ইহুদীরা খুশি হইয়াছিল। কিন্তু সঙ্গে সঙ্গে হযরত ঈসা (আ)-কেও স্বীকৃতি দেওয়ায় ইহুদীরা ক্ষেপিয়া গেল। হযরত ঈসা (আ) ও হযরত মরিয়ম (আ)-এর পবিত্রতা ঘোষণা করায় ঈসায়ীদের ঝগড়ার কি কারণ থাকিতে পারে ? কিন্তু কুরআন সঙ্গে সঙ্গে যখন ঘোষণা করিল যে, মুক্তি ও সৌভাগ্য গির্জার সার্টিফিকেটের উপরে নির্ভর করে না বরং তাহা প্রত্যেকের বিশ্বাস ও কর্মের পবিত্রতা ও সততার উপরেই নির্ভরশীল ; তখন গির্জায় সংকীর্ণতা ইহা সহ্য করিতে পারিল না।

কুরায়শদের কাছে কুরআনে হযরত ইবরাহীম ও হযরত ইস্‌মাঈলের মর্যাদা লাভের ব্যাপারটি অবশ্যই সুখকর ছিল। কিন্তু যখন তাহারা দেখিল যে, ইহুদী ও ঈসায়ীদের নবীদেরও সে সমান মর্যাদা দিতেছে, অমনি তাহাদের গোত্রীয় ও সাম্প্রদায়িক অহংকার মাথাচাড়া দিয়া উঠিল। তাহারা বলিল, কুরআন পন্থীরা হযরত ইবরাহীম ও হযরত ইসমাঈলের সত্যিকারের অনুসারী হইলে তাহাদের সঙ্গে ঈসা ও মূসাকে এক কাতারে দাঁড় করায় কি করিয়া ?

কুরআনের বিরোধিতার মূল সূত্র তিনটি

সংক্ষেপে এতটুকু বুঝিলেই যথেষ্ট যে, অন্য ধর্মাবলম্বীদের কুরআনের সহিত বিরোধিতার মূল সূত্র তিনটি ঃ

১. সে ধর্মীয় কোটারী সৃষ্টির বিরোধী এবং সব ধর্মকেই সত্য ও এক ধর্ম বলিয়া ঘোষণা করে। বিভিন্ন ধর্মানুসারীরা ইহা মানিয়া লইলে সত্য ধর্ম একচেটিয়া করিয়া লওয়ার সুযোগ কোন সম্প্রদায়েরই থাকে না। সবাই তাহাতে অংশীদার হইয়া দাঁড়ায়। সাম্প্রদায়িক সংকীর্ণতা ইহা স্বীকার করিতে পারে না।

২. কুরআন বলে, মুক্তি ও সৌভাগ্য নির্ভর করে বিশ্বাস ও কর্মের পবিত্রতা ও সততার উপরে ; বংশ, জাতি, সম্প্রদায় কিংবা বাহ্যিক আচার অনুষ্ঠানের উপরে নহে। ইহা তাহারা মানিয়া লইলে সকল মানুষের জন্য যার যার মুক্তি ও সৌভাগ্যের দ্বার সমানভাবে খুলিয়া ধরা হয়। তখন কোন দল বা ব্যক্তির ঠিকাদারী ও দালালি বজায় থাকে না। ইহা অন্যান্য ধর্মের ঠিকাদারী মানিয়া লইতে পারিল না।

৩. সে বলে, মূল ধর্ম হইল আল্লাহ্-অর্চনা। তাহা হইল একই আল্লাহ্‌র একনিষ্ঠ উপাসনা। কিন্তু অন্য ধর্মাবলম্বীরা কোন না কোন ভাবে অংশীবাদ ও প্রতিমা অর্চনার প্রশ্রয় দিয়াছিল। এক আল্লাহ্ মানিতে তাহাদের তেমন আপত্তি ছিল না। তবে কালক্রমে প্রচলিত অংশীবাদী ধারণা ও প্রতিমা অর্চনা পদ্ধতি তাহাদের মনে শিকড় গাড়িয়া বসিয়াছিল। সুতরাং বর্জন করা তাহাদের পক্ষে সহজসাধ্য হইল না।

সারকথা

এই পর্যন্ত যাহা কিছু আলোচিত হইয়াছে, তাহা মোটামুটি ভাবে নিম্নে কয়েকটি দফায় ব্যক্ত করা যাইতে পারে ঃ

১. কুরআন মজীদ অবতীর্ণ হইবার সময়ে গোত্রীয়, বংশীয় ও পারিবারিক সীমাবদ্ধ জীবন পদ্ধতির মতই ধর্মও ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র সম্প্রদায়ের গণ্ডিতে আবদ্ধ ছিল। প্রত্যেক সম্প্রদায়ের লোক শুধু নিজেদেরই সত্য ভাবিত। মুক্তি ও সৌভাগ্যকে তাহাদের একচেটিয়া সম্পদ ভাবিত। নিজ সম্প্রদায়ের বাহিরে কাহাকেও মুক্তি লাভের অধিকারী বলিয়া ভাবিত না।

২. প্রত্যেক সম্প্রদায়ের কাছে শুধু বাহ্যিক আচার-অনুষ্ঠানই ধর্মীয় সত্য বলিয়া বিবেচিত হইত। যেমন বিশেষ পদ্ধতির উপাসনা ও উৎসর্গ, বিশেষ ধরনের আহার গ্রহণ ও বিশেষ কয়েকটি অনুষ্ঠান পালনকেই তাহারা মুক্তি ও সৌভাগ্যের জন্য যথেষ্ট ভাবিত।

৩. প্রত্যেক সম্প্রদায়ের সামাজিক ইচ্ছা-আকাঙ্ক্ষা এক নহে বলিয়া তাহাদের আচার-অনুষ্ঠানও বিভিন্ন রূপ হইত। তাই এক সম্প্রদায় অন্য সম্প্রদায়কে ভ্রান্ত বলিত। কারণ তাহাদের আচার-অনুষ্ঠান অন্যরূপ।

৪. প্রত্যেক সম্প্রদায় শুধু নিজেদের সত্য বলিয়াই দাবি করিত না ; পরন্তু অন্য সব সম্প্রদায়কে ভ্রান্ত ঘোষণা করিত। তাই এক সম্প্রদায় অন্য সম্প্রদায়ের বিরুদ্ধে ঘৃণা ও বিদ্বেষ ছড়াইত। এই অবস্থাটি মানব জাতির ভিতরে স্থায়ী কোন্দল জিয়াইয়া রাখিল। আল্লাহ্‌র নাম নিয়াই প্রত্যেক সম্প্রদায় অন্য সব সম্প্রদায়ের বিরুদ্ধে ঘৃণা ছড়াইত ও তাহাদের হত্যা করা বৈধ মনে করিত। অথচ কুরআন মজীদ গোটা মানবজাতির সামনে **এক সার্বজনীন সত্য ধর্মের নীতি ঘোষণা করিল। যেমন ঃ**

(ক) সে শুধু সব **ধর্মের সত্যতাই স্বীকার করিল না ; পরন্তু সাফ সাফ বলিয়া** দিল, আল্লাহ্‌র অন্যান্য **দানের মতই সার্বজনীন ও সকল দলের ভাগ্যেই উহার অংশ** পড়িয়াছে। কোন বিশেষ **দলকে উহা একচেটিয়া করিয়া দেওয়া হয় নাই।**

(খ) সে বলে, **আল্লাহ্‌র প্রকৃতির** অমোঘ বিধানগুলির মত আত্মিক জগতেও আল্লাহ্‌র অমোঘ বিধান **রহিয়াছে**। আর তাহাও একক ও সার্বজনীন বিধান। বিভিন্ন ধর্মাবলম্বীর বড় ভ্রান্তি **হইল** এই—আল্লাহ্‌র সেই একক সত্য ধর্মকে ছিন্ন-বিচ্ছিন্ন করিয়া তাহারা মানুষের ভিতরে বিভেদ ও কোন্দল সৃষ্টি করিয়াছে।

(গ) সে বলে, আল্লাহ্‌র ধর্ম তো চায় মানুষের সব বিভেদ মিটাইয়া তাহাদিগকে একই আল্লাহ্‌র অর্চনায় ঐক্যবদ্ধ করা। তিনি তো মানুষে মানুষে অনৈক্য ও কোন্দল সৃষ্টির জন্য ধর্ম পাঠান নাই। সুতরাং ইহার চাইতে বিভ্রান্তি আর কি হইতে পারে যে, যাহা পাঠানো হইয়াছে বিভেদ দূর করার জন্য, তাহা আসিয়া বিরোধ আরো বাড়াইয়া তুলিতেছে ?

(ঘ) সে বলে, দীন এক জিনিস আর শরীআত আরেক জিনিস। একটি মত, আরেকটি পথ। মত এক, পথ বহু। দীন তাই সকলেরই এক। অবশ্য শরীআত ভিন্ন ভিন্ন। আর এই বিভিন্নতা অপরিহার্য ছিল। কারণ সব যুগের সব মানুষ এক ছিল না। সুতরাং যখন যেরূপ যেখানে দেখা দিয়াছে, সেই অনুসারে শরীআত রচিত হইয়াছে। তাই শরীআতের বিভিন্নতা দীনের পার্থক্য প্রমাণ করে না। তোমরা দীন ভুলিয়া শরীআত লইয়া মারামারি করিতেছ।

(ঙ) সে বলে, তোমাদের ধর্মীয় দলাদলি এবং তাহার ভিত্তিতে রচিত ভিন্ন ভিন্ন আচার-অনুষ্ঠান কখনও মুক্তি ও কল্যাণের কাজে আসিতে পারে না। এই সাম্প্রদায়িক গণ্ডি তো তোমাদের হাতে গড়া। আল্লাহ্‌র নির্ধারিত নহে আদৌ। আল্লাহ্‌র দীন তো এক। সেই সত্য দীন হইল, এক আল্লাহ্‌তে বিশ্বাস ও তাঁহার নির্ধারিত ভাল কাজ করা।

(চ) সে পরিষ্কার ঘোষণা করে, তাহার আগমনের উদ্দেশ্য হইল সকল ধর্মের সত্যতা স্বীকার। সঙ্গে সঙ্গে ইহাও বলিয়া দেওয়া যে, সকল ধর্মানুসারীই সত্য ধর্ম হইতে বিচ্যুত হইয়াছে। যদি তাহারা হৃত সত্য পুনরুদ্ধার করিতে পারে, তবেই তাহার উদ্দেশ্য সার্থক হইবে তাহা হইলেই তাহাকে মানা হইল। সে সর্বসম্মত একমাত্র সত্য ধর্মের নাম দিয়াছে, 'আদ্-দীন' ও 'আল্-ইসলাম'।

(ছ) সে বলে, আল্লাহ্‌র ধর্ম মানুষে মানুষে বিদ্বেষ সৃষ্টির স্থলে ভালবাসা সৃষ্টির জন্য আসিয়াছে। সবাই একক প্রভুর দাসত্বের নিগড়ে ঐক্যবদ্ধ হইবে। যখন সকলের প্রতিপালক এক, সবার উদ্দেশ্য যখন তাঁহারই অর্চনা, প্রত্যেক মানুষই যখন নিজ কর্মের জন্য নিজেই দায়ী, তখন আর ধর্ম ও আল্লাহ্‌র নামে এত কোন্দল কেন ?

৫. ধর্মজগতের মতবিরোধ শুধু মতবিরোধ রহিল না, পারস্পরিক বিদ্বেষ ও ঝগড়ায় পরিণত হইল। এখন প্রশ্ন হইল, এই ঝগড়া দূর করার উপায় কি ? সব ধর্মের সব দাবি মানিয়া লওয়া তো আর চলে না। কারণ প্রত্যেক ধর্ম শুধু নিজের সত্যতা দাবি করিয়াই ক্ষান্ত হয় না, অপরগুলি যে ভ্রান্ত, সেই দাবিও করিতে ছাড়ে না। সুতরাং তাহাদের দাবি মানার অর্থ হইল, একই সঙ্গে সব ধর্মের সত্যতাও মানিতে হয় আবার অসত্যতাও ঘোষণা করিতে হয়। সেক্ষেত্রে এই ঝগড়া মিটাইবার একমাত্র পথ হইল কুরআনের দাবি মানিয়া লওয়া। তাহা এই, আসল দীন হিসাবে সব ধর্মই সত্য। ধর্মানুসারীরা সেই সত্য দীন ছাড়িয়া নিজেদের খেয়াল-খুশিমত ধর্মীয় কোটারী সৃষ্টি করিয়াছে। এখন যদি তাহারা সবাই মূল সত্যে প্রত্যাবর্তন করে, তাহা হইলেই সব ধর্মীয় কোন্দলের পরিসমাপ্তি ঘটে। সবাই দেখিতে পাইবে আসল ধর্ম তো সকলেরই এক। সকল ধর্মের সর্বসম্মত সেই মতবাদ হইল 'আদ্-দীন'। উহাই বিশ্ব মানবতার শাশ্বত ধর্ম আল-ইসলাম।

৬. মানবজাতির পারস্পরিক ঐক্য ও সংহতির যত সম্পর্ক ছিল, সবই তাহাদের হাতে ছিন্ন-বিচ্ছিন্ন হইয়াছিল। একই আদমের গোষ্ঠী পরে অনেক শ্রেণীতে পরিণত

হইল। একই মানবজাতি বহু জাতিতে পরিণত হইল। একই দেশের মানুষ বিভিন্ন দেশের বাসিন্দা হইল। সমান মর্যাদার মানুষ বিভিন্ন মর্যাদায় বিভক্ত হইল। এরূপ অবস্থায় এমন কোন্ সম্পর্ক আছে যাহা সব বিভেদের উপরে জয়ী হইতে পারে কিংবা দুনিয়ার সকল মানুষকে একই কাতারে দাঁড় করাইতে পারে ? কুরআন বলে, তাহা হইল আল্লাহ্-অর্চনার সম্পর্ক। এই একটি মাত্র সম্পর্ক দুনিয়ার সকল বিচ্ছিন্ন মানুষকে আবার একই পরিবারভুক্ত করিতে পারে। আমাদের সকলের প্রতিপালক এক এবং সবাইকে একই ভাবে তাঁহার পাদমূলে মাথা ঠুকিতে হয়—এই বিশ্বাস একমুখী ও ঐক্যবদ্ধ হবার এরূপ দুর্জয় প্রেরণা যোগায় যাহা মানুষের হাতে-গড়া বিভেদের প্রাচীর চুরমার করিয়া ফেলিতে পারে।

সরল পথ

এই কারণেই সূরা 'ফাতিহায় 'সিরাতে মুস্তাকিম' (সরল পথ)-এ চলার জন্য প্রার্থনা করিতে শিখানো হইয়াছে। সিরাত অর্থ পথ এবং মুস্তাকিম অর্থ সরল। অর্থাৎ এমন পথ যাহার কোথাও প্যাঁচ নাই, নাই কোন জটিলতা। এই পথের সহজ পরিচয় দেওয়া হইল এই, 'যাহারা অভিশপ্ত ও বিভ্রান্ত নহে ; বরং যাহাদের উপরে বর্ষিত হইয়াছে তোমার অনুগ্রহ, তাহাদের পথ।'

এই অনুগ্রহ প্রাপ্ত দল কাহারা ? যাহাদের পথ সরল। কুরআন এখানে সেখানে নানাভাবে বুঝাইয়াছে, দুনিয়ার বিভিন্ন এলাকায় ভিন্ন ভিন্ন যুগে যত নবী ও সাধক আবির্ভূত হইয়াছিলেন, তাঁহাদের অনুসৃত পথই সরল পথ।

وَمَنْ يُّطِعِ اللّٰهَ وَالرَّسُوْلَ فَاُولٰئِكَ مَعَ الَّذِيْنَ اَنْعَمَ اللّٰهُ عَلَيْهِمْ مِنَ النَّبِيِّنَ وَالصِّدِّيْقِيْنَ وَالشُّهَدَاءِ وَالصّٰلِحِيْنَ - وَحَسُنَ اُولٰئِكَ رَفِيْقًا -

—আর যে ব্যক্তি আল্লাহ্ ও রাসূলের আনুগত্য স্বীকার করিল, নিঃসন্দেহে সে অনুগ্রহ প্রাপ্তদের সঙ্গী হইল। এই অনুগ্রহপ্রাপ্ত দলে নবীরা, সত্যানুসারীরা, শহীদরা ও পুণ্যবানরা আছে। (যাহার সঙ্গী এই ধরনের লোক) তাহার বন্ধুত্ব কতই সার্থক ও উত্তম। (—সূরা নিসা ঃ আয়াত ৬৯)

এই আয়াতে ধারাবাহিকভাবে চারিটি দলের উল্লেখ করা হইয়াছে এবং তাহাদের অনুগ্রহপ্রাপ্ত আখ্যা দেওয়া হইয়াছে। নবী, সিদ্দীক, শহীদ ও সালেহ।

'নবী' বলিতে আল্লাহ্র সত্য ধর্মের সকল বাণীবাহককে বলা হইয়াছে। তাঁহারা গোটা মানবজাতিকে পথ দেখাইবার জন্য আসিয়াছিলেন।

'সিদ্দীক' বলিতে সত্যিকারের সত্যানুসারীদের বুঝায়। সত্যের ছাঁচে তাঁহারা এরূপ গড়িয়া গিয়াছেন যে, উহার বিরুদ্ধে কিছু কল্পনাই করিতে পারেন না।

'শহীদ' বলিতে সত্যের সাক্ষ্যদানকারীকে বুঝায়। এরূপ মানুষ যাহারা কথায় ও কাজে সত্যের ধ্বজা উঁচু করিয়া তুলিয়া ধরেন।

'সালেহ' বলিতে তাহাকে বুঝায়, পুণ্যের পথে যে স্থির থাকে এবং পাপের পথে কখনো পা বাড়ায় না।

সুতরাং জানা গেল যে, অনুগ্রহপ্রাপ্ত মানুষ দ্বারা যে সকল রাসূল ও সত্যানুসারীরা কুরআনের পূর্বে দুনিয়ায় আসিয়া গিয়াছেন, তাহাদেরই বুঝানো হইয়াছে। ইহাতে না কোন সম্প্রদায় বা গোত্রের বিশেষত্ব দেখানো হইয়াছে, না কোন বিশেষ ধর্মের গুরুত্ব দেওয়া হইয়াছে। পৃথিবীর সকল নবী, সিদ্দীক, শহীদ ও সালেহদের কথা নির্বিশেষে বলা হইয়াছে। এই অনুগ্রহপ্রাপ্তদের পথই হইল সিরাতে মুস্তাকিম বা সরল পথ।

আল্লাহ্‌র সেই সব সত্যানুসারীর পথটি কি ছিল ? কুরআন সেই পথকেই সত্য ধর্মের পথ আখ্যা দিয়াছে। দুনিয়ার সকল নবীই জগদ্বাসীকে এই শিক্ষা দিয়া গিয়াছেন, 'আল্লাহ্‌র একমাত্র দীন কায়েম কর এবং বিচ্ছিন্ন হইও না, ইহাই সত্যের সরল পথ।'

বস্তুত এই কারণেই কুরআন মজীদ বিভিন্ন স্থানে 'আদ্-দীন'কে 'সিরাতে মুস্তাকিম' বলিয়াছে। সূরা 'শূরা'য় রাসূলুল্লাহ্ (সা)-কে লক্ষ করিয়া বলিতেছে, তুমি মানুষকে সিরাতে মুস্তাকিমের দিকে ডাকিবে এবং সিরাতে মুস্তাকিমই আল্লাহ্‌র নির্ধারিত কল্যাণের পথ।

وَاِنَّكَ لَتَهْدِى اِلٰى صِرَاطٍ مُّسْتَقِيْمٍ - صِرَاطِ اللّٰهِ الَّذِىْ لَهٗ مَا فِى السَّمٰوٰتِ وَمَا فِى الْاَرْضِ - اَلَا اِلَى اللّٰهِ تَصِيْرُ الْاُمُوْرُ -

—আর (হে রাসূল) সন্দেহ নাই যে, তুমি সিরাতে মুস্তাকিমের দিকে মানুষকে চালিত করিবে। উহাই আল্লাহ্‌র পথ। আকাশ ও পৃথিবীতে যাহা কিছু আছে সব কিছুরই মালিক এই আল্লাহ্। হ্যাঁ, স্মরণ রাখিও (নিখিল সৃষ্টির) সব কাজই তাঁহার কাছে গিয়া গড়াইবে। (—সূরা শূরা ঃ আয়াত ৫২-৫৩)

সূরা 'নহলে' হযরত ইবরাহীম (আ) সম্পর্কে বলা হইয়াছে, 'আল্লাহ্ তাহাকে সিরাতে মুস্তাকিম প্রদর্শন করিয়াছেন।' সূরা 'যুখ্‌রুফে' হযরত ঈসা (আ)-এর মুখে শুনিতে পাই, 'নিশ্চয়ই আল্লাহ্ আমার এবং তোমাদের সকলের প্রতিপালক। সুতরাং তাঁহারই বন্দেগী কর, ইহাই সিরাতে মুস্তাকিম। সূরা 'আন'আমে' হযরত নূহ, হযরত ইবরাহীম ও তাঁহার পরবর্তী বনি ইসরাঈল নবীদের উল্লেখ করিয়া অবশেষে বলা হইয়াছে, 'আর আমি তাহাদের মনোনীত করিয়াছি এবং তোমাদের সিরাতে মুস্তাকিম প্রদর্শন করিয়াছি।'

মোদ্দা কথা, আল্লাহ্‌র বিশ্বজনীন সত্য ধর্মের তাৎপর্য বুঝাইবার জন্য 'সিরাতে মুস্তাকিম' হইতে উত্তম কোন শব্দ হইতে পারে না। তুমি কোথাও যাবার জন্য যত রাস্তাই আবিষ্কার কর না কেন, সোজা পথ তাহার ভিতরে একটিই হইবে এবং সেই পথেই সবার যাতায়াত চলিবে। সেই পথই হইবে লক্ষ্যস্থলে পৌঁছিবার সব চাইতে

নিরাপদ ও সুবিধার পথ। কেহই বাঁকা ও অনিশ্চিত পথে যাইতে চাইবে না। কুরআন বলে, ঠিক এভাবেই দীনের সরল পথ একটি মাত্র। আদিকাল হইতে সর্বযুগে ইহা বর্তমান ছিল। সব যুগের সব দেশের সব জাতি এই পথে চলিয়া লক্ষ্যস্থলে পৌঁছিয়াছে। পরবর্তীকালে ধর্মানুসারীরা অনেক বাঁকা পথ সৃষ্টি করিয়া ভিন্ন ভিন্ন দিকে চলিয়া গিয়াছে। তাই সে বলে, যদি তোমরা এখন লক্ষ্যস্থলে পৌঁছিবার ইচ্ছা রাখ, তাহা হইলে সেই সরল রাজপথে সমবেত হও। ইহাই হইল সহজ, সরল ও প্রশস্ত চলার পথ—লক্ষ্যস্থলে পৌঁছিবার একমাত্র পথ।

وَ اَنَّ هٰذَا صِرَاطِىْ مُسْتَقِيْمًا فَاتَّبِعُوْهُ - وَلَاتَتَّبِعُوْا السُّبُلَ فَتَفَرَّقَ بِكُمْ عَنْ سَبِيْلِهٖ - ذٰلِكُمْ وَصّٰكُمْ بِهٖ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُوْنَ -

—আর (দেখ) এই আমার পথ। একেবারে সোজা পথ। এই একই পথে চল। নানা ধরনের এদিক-ওদিক পথে চলিও না। সেইগুলি তোমাদের আল্লাহ্‌র সহজ সরল পথ হইতে দূরে সরাইয়া ছিন্ন-বিচ্ছিন্ন করিয়া ফেলিবে। এই উপদেশই আল্লাহ্ তোমাদিগকে দান করিতেছেন। উদ্দেশ্য, তাঁহার নাফরমানী হইতে তোমরা বাঁচিতে পারিবে। (—সূরা আন'আম ঃ আয়াত ১৫৩)

সিরাতে মুস্তাকিমের নিম্ন বিশ্লেষণটি লক্ষ করিলে ব্যাপারটি আরও পরিষ্কার হইবে। স্বয়ং রাসূল (সা) এই ব্যাখ্যাটি দান করিয়াছেন ঃ

عَنْ ابن مسعود (رض) قال خط لنا رسول الله صلعم خطا بيده قال هذا سبيل الله مستقيما ثم خط خطوطا عن يمين ذالك الخط وعن شماله ثم قال وهذه السبل ليس منها سبيل الاعليه الشيطان يدعوا اليه ثم قرأ هذه الاية - (اخرجه النسائى واحمد الخ)

হযরত আবদুল্লাহ্ ইবনে মাস'উদ (রা) বলেন, রাসূলুল্লাহ্ (সা) নিজ অঙ্গুলী সঞ্চালন করিয়া একটি সরল রেখা টানিলেন। ধরিয়া লও, এই আল্লাহ্‌তা'আলার নির্ধারিত পথ—একেবারে সোজা পথ। তারপর সেই রেখার ডাইনে ও বামে দুইটি বক্র রেখা টানিয়া বলিলেন—এই হইল বিভিন্ন মনগড়া বাঁকা পথ। আর এই পথগুলির এমন একটি পথও পাইবে না, যেখানে মানুষকে ডাকিয়া নিবার জন্য একটি শয়তান মোতায়েন নাই।

ইহাতে জানা গেল, এদিক ওদিক যতগুলি বাঁকা পথ রহিয়াছে, সকলই বিচ্ছিন্নতার পথ। সেইগুলি মানবজাতিকে ঐক্যবদ্ধ করার স্থলে শতধা বিচ্ছিন্ন করে। এইগুলির মাঝখানে যে সরল রাজপথটি আবহমান কাল হইতে চলিয়া আসিয়াছে, কেবল উহাই মানবজাতিকে ঐক্যবদ্ধ করিতে পারে।

এই বিচ্ছিন্নতার পথগুলি কি ? কুরআন মজীদ সাম্প্রদায়িক ও গোত্রীয় কোটারী ধর্মগুলিকেই বিচ্ছিন্নতার পথ বলিয়াছে। পূর্বে এইগুলির আলোচনা হইয়া গিয়াছে।

মনগড়া পথগুলির বক্রতা ও রাজপথের ঋজুতা যে কেহ সহজেই বুঝিতে পারে। আল্লাহ্‌র ধর্ম যদি সার্বজনীন হয়, তাহা হইলে তাঁহার অন্যান্য বিধানের মত ইহাও স্পষ্ট ও সহজ হইবে। সরল বিশ্বাস ও সহজ কাজ হইবে সেই ধর্মের মূল। কোন জটিলতা-কুটিলতার স্থান থাকিবে না সেখানে। সব ধরনের মানুষ সহজেই তাহা বুঝিতে ও করিতে পারে। এখন চিন্তা করুন, বিভিন্ন সম্প্রদায়ের লোকে দলীয় সংকীর্ণতার ভিত্তিতে যে মনগড়া ধর্মের সৃষ্টি করিয়াছে, সেইগুলি কি সকলের সহজবোধ্য ও পাল্য হইবে, না কুরআন যে মূল ধর্মের পরিচয় দান করে, তাহা সহজবোধ্য ও পাল্য হইবে ?

এমন কোন সম্প্রদায় নাই যাহাদের কাছে বিশ্বাসের এক দুর্বোধ্য বোঝা ও কর্মের এক দুঃসাধ্য ফিরিস্তি নাই। আমি বিস্তারিতভাবে তাহা আলোচনা করিতে চাই না। প্রত্যেকেই জানে যে, বিশ্বের সকল ধর্মাবলম্বীর কপোল-কল্পিত ধর্ম-বিশ্বাস ও কর্মের ধরন ও অবস্থা কি ? ধর্ম যে জ্ঞানের জন্য ধাঁধা সৃষ্টিকারক ও মনের জন্য পীড়াদায়ক, তাহা তো সর্বজনস্বীকৃত কথা। কিন্তু কুরআন যে পথকে সত্য ধর্মের পথ বলে, তাহা কিরূপ ? সেই পথ তো এতখানি উজ্জ্বল, সরল ও সংক্ষেপ যে, বিশ্বাস ও কাজের পূর্ণ ফিরিস্তি মাত্র দুইটি শব্দে শেষ করিয়াছে। তাহা হইল ঈমান ও নেক আমল। ইহার বিশ্বাসের ব্যাপারে জ্ঞানের ধাঁধা সৃষ্টি হয় না, কাজের ব্যাপারে মনের বিতৃষ্ণা জাগে না। সব ধরনের প্যাঁচ ও জটিলতা মুক্ত, বিশ্বাস ও কর্মের সবচাইতে সহজ রূপ। এক কথায়, উহা রাত্রি ও দিনের মত উজ্জ্বল।

اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ الَّذِىْ اَنْزَلَ عَلٰى عَبْدِهِ الْكِتَابَ وَلَمْ يَجْعَلْ لَّهٗ عِوَجًا –

—সব ধরনের প্রশংসার মালিক আল্লাহ্ তা'আলা। যিনি স্বীয় বান্দাদের উপরে গ্রন্থ অবতীর্ণ করিয়াছেন এবং তাহাতে কোনরূপ জটিলতার স্থান দেন নাই। (—সূরা কাহ্‌ফ ঃ আয়াত ১)

সে যাহা হউক, কুরআনের অনুসারী সত্য ধর্মের সহজ পথে চলে। কোন বিশেষ সম্প্রদায়, বংশ, জাতি বা কালের পথে সে চলে না। আল্লাহ্‌র স্থান, কাল, পাত্র নির্বিশেষের জন্য নির্ধারিত ধর্মই সে পালন করে।

اِنَّ اللّٰهَ هُوَ رَبِّىْ وَ رَبُّكُمْ فَاعْبُدُوْهُ – هٰذَا صِرَاطٌ مُّسْتَقِيْمٌ –

—আল্লাহ্ আমার ও তোমাদের উভয়ের প্রতিপালক। সুতরাং তাঁহারই 'ইবাদত কর। ইহাই সরল পথ। (—সূরা যুখরুফ ঃ আয়াত ৬৪)

ইহা ছাড়া এখানে আরও কয়েকটি ব্যাপারের দিকে দৃষ্টি রাখা দরকার। প্রথমত কল্যাণ ও সৌভাগ্যের পথের নাম দেওয়া হইয়াছে সোজা পথ। সোজা পথে চলার আকাঙক্ষা সকল মানুষের ভিতরেই স্বাভাবিকভাবে বিদ্যমান। তারপর উহার পরিচয়

দিতে গিয়াও এমন সোজা কথা বলা হইয়াছে, যাহা বুঝিতে কাহারও মাথা ঘামাইতে হয় না ! বিশেষ একদল মানুষের দিকে আঙুল তুলিয়া বলা হইয়াছে, ইহাদের অনুসৃত পথই সরল পথ। সুতরাং মানুষ এরূপ বাস্তব উদাহরণের মাধ্যমে অতি সহজেই ব্যাপারটি বুঝিয়া ফেলিল। যে সম্প্রদায়ের আর যে দেশের মানুষই হউক, এ ব্যাপারটি সবাই জানে যে, একদল মানুষ ভাল পথে চলিয়া জীবন সফল করিয়া গিয়াছে। আর অন্যদল খারাপ পথে চলিয়া জীবন নষ্ট করিয়া গিয়াছে। সুতরাং যখন বলা হইল, সকল ভাল মানুষের পথই সোজা পথ, তখন সঙ্গে সঙ্গে মানুষের অন্তরে পথটি উজ্জ্বল দিবাকরের মত ধরা দিল। যদি দার্শনিক কায়দায় উহার সংজ্ঞা দান করা হইত, তাহা হইল একে তো বুঝা সবার পক্ষে সহজসাধ্য হইত না, পরন্তু সেই পথটি এতখানি সুস্পষ্ট ও সুনির্দিষ্ট করা যাইত না।

দ্বিতীয়ত, মানুষের কল্যাণ ও সৌভাগ্যের ব্যাপারটি বুঝাইতে 'সিরাতে মুস্তাকিম' হইতে ভাল নাম কোন বিবেচনায়ই দেখা যাইতে পারে না। মানুষের চিন্তা ও কাজের সব ক্ষেত্রেই সোজা পথ বলিতে সঠিকতা ও নির্ভুলতা বুঝায়। যেখানে বক্রতা ও বিচ্যুতি আসে সেখানেই গণ্ডগোল দেখা দেয়। এইজন্য পৃথিবীর সকল ভাষায়ই সোজা চলা কল্যাণ ও সৌভাগ্যের অর্থে ব্যবহৃত হয়। ভাল বুঝাইতে 'সোজা' শব্দটি এমন একটি পরিভাষা যাহাকে দুনিয়ার সকল মানুষের নির্বাচিত বলা যাইতে পারে।

খ্রীস্টপূর্ব পঞ্চম শতকে প্রথম দরায়ূস যে সব ফরমান খোদাই করিয়া গিয়াছেন, তাহার ভিতরে বেস্তাঁর শিলালিপি আজ পর্যন্ত বিদ্যমান আছে। উহার উপসংহারের বাক্যটি এই—'হে মানুষ ! আহুরামুজদা (খোদা) তোমাদের জন্য এই নির্দেশ দিয়াছেন যে, পাপের খেয়াল করিও না। সোজা পথ ছাড়িও না। গুনাহ্ হইতে দূরে থাক।'

সুতরাং 'সিরাতে মুস্তাকিমে' চলার আকাঙক্ষা মূলত জীবনের প্রতিটি ক্ষেত্রে সঠিক ও সরলভাবে চলার আকাঙক্ষা হইয়া দাঁড়ায়। তাই দেখিতে পাই, চেষ্টা ও কাজের প্রতিটি ক্ষেত্রে সফলকাম দল তাহারাই, যাহারা সরল পথ অনুসরণ করে।

কুরআনে 'সিরাতে মুস্তাকিম'-এর পরিচয় শুধু উহার উপস্থিতির মাধ্যমেই বুঝানো হয় নাই। বরং উহার বিপরীত দিকও তুলিয়া ধরা হইয়াছে। অর্থাৎ যাহারা অভিশপ্ত ও বিভ্রান্ত, তাহাদের পথ নহে।

অভিশপ্ত দল 'অনুগ্রহপ্রাপ্ত' দলের বিপরীত। কারণ অনুগ্রহের বিপরীত হইল অভিশাপ। আর বিশ্ব প্রকৃতির বিধান হইল ভাল লোক পুরস্কৃত হয় ও মন্দ লোক অভিশাপ কুড়ায়। সত্য পথ যে পাইল না, আর সত্যের পথে যাহার স্খলন ঘটিল, সে বিভ্রান্ত। যাহারা পথ পাইল, অনুগ্রহও পাইল, অথচ আবার সেই পথ ছাড়িয়া দিল এবং অনুগ্রহের পথ ছাড়িয়া অন্যায় পথ অনুসরণ করিল, তাহারা অভিশপ্ত। বিভ্রান্ত ব্যক্তি তো পথই পাইল না। তাই এদিক ওদিক ঘুরিয়া মরিতেছে এবং সিরাতে মুস্তাকিমের কল্যাণ হইতে বঞ্চিত হইয়াছে।

অভিশপ্তদের এই বঞ্চনা পথ প্রাপ্তির পরে অস্বীকার করার ফলে দেখা দেয়। পক্ষান্তরে বিভ্রান্তদের বঞ্চনার মূল হইল মূর্খতা। তাই এ কথা সুস্পষ্ট যে, প্রথম দলের বঞ্চনা অধিকতর অপরাধমূলক।

আমরাও দেখি, দুইটি দল সর্বদা কল্যাণ ও সাফল্য লাভে বঞ্চিত হয়। একদল জাহিদ, আরেকদল জাহিল ! জাহিদরা সত্য পাইয়াও ঘাড় ফিরাইয়া বিপথে পা বাড়ায়। জাহিলরা সত্যের সন্ধানই পায় না এবং নিজ মূর্খতা লইয়াই সে তৃপ্ত। এইজন্যই সিরাতে মুস্তাকিম অনুসরণ করার আকাঙক্ষা প্রকাশের সঙ্গে সঙ্গে উক্ত দুই অবস্থা হইতে বাঁচিবার ইচ্ছা পোষণ করার শিক্ষা দেওয়া হইতেছে। যেন কল্যাণ ও সাফল্য লাভের চিন্তাটি সব ধরনের ক্রটি মুক্ত হইয়া পূর্ণত্ব অর্জন করে।

ধর্ম জগতে উক্ত দুই ধরনের বঞ্চনার অসংখ্য উদাহরণ বিভিন্ন জাতির ইতিহাসে মিলে। বহু সম্প্রদায় কল্যাণ ও সাফল্যের পথ পাইয়াও হারাইয়াছে। দুনিয়ায় যাহারা একদিন ছিল অনুগ্রহপ্রাপ্ত, তাহারা পরে অভিশপ্ত সাজিয়াছে। আবার এরূপ জাতিও আছে, যাহাদের সামনে সত্য পথ স্পষ্ট করিয়া তোলা সত্ত্বেও মূর্খতার অন্ধকারে গা ঢাকা দিয়া থাকা শ্রেয় ভাবিয়াছে। সুতরাং তাহারাও সত্যের পথ হইতে বঞ্চিত থাকিল এবং বঞ্চনার সাগরে ডুবিয়া মরিল।

রাসূল (সা) ও সাহাবায়ে কেরামের বাণীতে এই ব্যাপারটির যে বিশ্লেষণ দেখি, তাহা আরও সুস্পষ্ট। তিরমিজী, আহ্‌মদ, ইবনে হাব্বান প্রমুখের সংকলনে উদ্ধৃত এক বিখ্যাত হাদীসে আছে—রাসূলুল্লাহ্‌'(সা) বলিয়াছেন, অভিশপ্ত দল ইহুদী এবং বিভ্রান্ত দল হইল ঈসায়ীরা।' একথা নিশ্চিত যে, রাসূলের এই কথা শুধু উদাহরণ হিসাবে বলা হইয়াছে। তাই অভিশপ্ত শুধু ইহুদীরা আর বিভ্রান্ত শুধু ঈসায়ীরা মনে করিলে ভুল হইবে। তবে এই দুই দলের ভিতরে বঞ্চিত দুই শ্রেণীর মানুষের পূর্ণ পরিচয় পাওয়া যায়। ইহুদীদের জাতীয় ইতিহাস অভিশাপ লাভের এবং ঈসায়ীদের জাতীয় ইতিহাস বিভ্রান্তির ইতিহাস। দুই দলের ইতিহাস দুইটি ব্যাপারের জন্য প্রচুর উপমা ও উপদেশ সরবরাহ করে।

কুরআন মজীদের কাহিনী ও ইতিহাসের শিক্ষা

এ কারণেই কুরআন হিদায়ত ও উপদেশের জন্য যে সব পদ্ধতি অনুসরণ করিয়াছে, তাহার ভিতরে সব চাইতে উল্লেখযোগ্য পদ্ধতি হইল অতীতের বিভিন্ন জাতির ঘটনাবলি ও উহার পরিণতি তুলিয়া ধরা। সে বলে, সৃষ্টিজগতের অন্যান্য ক্ষেত্রের মত আল্লাহ্‌র অনুসৃত কল্যাণ ও অকল্যাণের বিধান জাতি ও গোষ্ঠীর বেলায়ও সক্রিয়। প্রত্যেক যুগে প্রত্যেক দেশে সেই বিধান সমান ফলাফল দান করে। আল্লাহ্‌র বিধানে রদ-বদল নাই। উহার ফলাফলও সর্বকালে সর্ব অবস্থায় অটল থাকে। যেভাবে বিষ ও মধুর প্রাণ সংহারিণী ও প্রাণ সঞ্জীবনী শক্তি সর্বকালে সর্বদেশে সকল মানুষের বেলায় সমানভাবে সক্রিয় থাকে, তেমনি জাতির উত্থান ও পতনের মৌলিক

কারণগুলি অতীতে যেরূপ কার্যকরী ছিল, ভবিষ্যতেও তেমনি থাকিবে। ইহাই ইতিহাসের শিক্ষা।

سُنَّةَ اللّٰهِ فِى الَّذِيْنَ خَلَوْا مِنْ قَبْلُ - وَلَنْ تَجِدَ لِسُنَّةِ اللّٰهِ تَبْدِيْلاً -

—তোমাদের আগে যাহারা পার হইয়া গিয়াছে, তাহাদের বেলায়ও আল্লাহ্‌র এই নীতি বলবৎ ছিল এবং এখনও তোমরা আল্লাহ্‌র সেই নীতিতে কোনরূপ রদ-বদল দেখিবে না। (—সূরা আহযাব ঃ আয়াত ৬২)

فَهَلْ يَنْظُرُوْنَ الاَّ سُنَّتَ الْاَوَّلِيْنَ - فَلَنْ تَجِدَ لِسُنَّتِ اللّٰهِ تَبْدِيْلاً وَ لَنْ تَجِدَ لِسُنَّتِ اللّٰهِ تَحْوِيْلاً -

—তারপর এই লোকগুলি কোন্ ব্যাপারটির পথের দিকে তাকাইয়া রহিয়াছে? তাহারা কি আগেকার লোকদের বেলায় অনুসৃত নীতির পুনরাবৃত্তির অপেক্ষা করিতেছে? তাহা হইলে স্মরণ রাখিও, তুমি আল্লাহ্‌র নীতির কোনদিন পরিবর্তন দেখিতে পাইবে না। আর তাঁহার নীতির কোন একটি ধারাও অদল-বদল দেখিবে না। (—সূরা ফাতির ঃ আয়াত ৪৩)

سُنَّةَ مَنْ قَدْ اَرْسَلْنَا قَبْلَكَ مِنْ رُّسُلِنَا وَلاَ تَجِدُ لِسُنَّتِنَا تَحْوِيْلاً

—(হে রাসূল) তোমার আগে যেসব নবী আমি পাঠাইয়াছি, তাহাদের জন্যও আমার এই নীতি প্রচলিত ছিল। আমার নীতি কখনও টলিবার নহে। (—সূরা বনী ইসরাঈল ঃ আয়াত ৭৭)

বস্তুত, সে একদিকে অনুগ্রহপ্রাপ্ত দলের সফলতার কথা বারংবার উল্লেখ করে, অপরদিকে অভিশপ্ত ও বিভ্রান্ত দলের ব্যর্থতা ও বঞ্চনার ইতিহাস বারবার শুনাইতে থাকে। আবার স্থানে স্থানে যে সব মৌলিক নীতি ও স্বতঃসিদ্ধ আইন জাতিগুলির উত্থান-পতনের কারণ হইয়াছে, তাহা বাহির করিয়া দেখাইতে থাকে। সে খোলাখুলি বলিয়া দেয়, এই কাজের জন্য আর এই সব কারণে পুরস্কারপ্রাপ্ত দল সফলতা অর্জন করিল এবং এই সব ভুলভ্রান্তি ও স্খলন-পতনের জন্য অভিশপ্ত দলের ব্যর্থতা দেখা দিয়াছে। ভাল পরিণতিকে বলা হয় পুরস্কার এবং খারাপ পরিণতিকে বলা হয় অভিশাপ। কারণ আল্লাহ্‌র প্রকৃতির অনুকূল হইলেই সফলতা দেখা দেয় এবং প্রতিকূল হইলেই ব্যর্থতা দেখা দেয়। সে আরও বলে, যেসব কারণে দশবার কোন বিশেষ ফল দেখা দিয়াছে, তুমি কেমন করিয়া বলিতে পার যে, এগারবারের বার সেই ফল দেখা দিবে না?

قَدْ خَلَتْ مِنْ قَبْلِكُمْ سُنَنٌ - فَسِيْرُوْا فِى الْاَرْضِ فَانْظُرُوْا كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الْمُكَذِّبِيْنَ -

—তোমাদের আগেও পৃথিবীতে আল্লাহ্‌র নীতির ফলাফল দেখা দিয়াছে। তাই দেশে দেশে ঘুরিয়া দেখ, যাহারা আল্লাহ্‌র নীতিকে মিথ্যা বলিয়াছিল, তাহাদের কি দশা ঘটিয়াছে। (—সূরা আল-'ইমরান ঃ আয়াত ১৩৭)

কুরআনের সূরাগুলির বেশ কয়টি সংখ্যাই এই ইতিহাসের শিক্ষা দানের কাজে ব্যবহৃত হইয়াছে। বলা যাইতে পারে, কুরআন অতীত কালের যত ঘটনা তুলিয়া ধরিয়াছে, সবই সূরা 'ফাতিহা'র শেষ বাক্যটির বিশ্লেষণ মাত্র। অর্থাৎ তাহা পুরস্কৃত দল ও অভিশপ্ত দলের সফলতা ও ব্যর্থতারই ইতিহাস।

সূরা ফাতিহার শিক্ষা ও প্রেরণা

আচ্ছা, এক্ষণে কয়েক মুহূর্তের জন্য আপনারা সূরা 'ফাতিহা'র তাৎপর্য সামগ্রিকভাবে অনুধাবনের জন্য একবার গোটা আলোচনার উপরে দৃষ্টিপাত করুন। ভাবিয়া দেখুন, ইহার সাতটি আয়াতের ভিতরে ধর্মীয় ধ্যান-ধারণার যে প্রাণশক্তি নিহিত রহিয়াছে, তাহা কি ধরনের চিন্তাধারা সৃষ্টি করে ? সূরা 'ফাতিহা' একটি প্রার্থনা মাত্র। ধরুন, এক ব্যক্তির অন্তর ও মুখ হইতে দিন-রাত এই প্রার্থনাই ধ্বনিত হইতেছে। সেরূপ অবস্থায় সেই ব্যক্তির ধর্ম বিশ্বাস ও চিন্তাধারার অবস্থা কিরূপ হইবে ?

সে আল্লাহ্‌র প্রশংসা-স্তুতির বেলায় পঞ্চমুখ। কিন্তু তাহার সেই আল্লাহ্ কোন গোত্র, সম্প্রদায় ও জাতির বিশেষ আল্লাহ্ নহেন বরং তিনি 'রাব্বুল আলামীন' অর্থাৎ নিখিল সৃষ্টির প্রতিপালক। সুতরাং তিনি সমগ্র মানবজাতিকে একই ভাবে প্রতিপালন করেন ও সমভাবে দয়া-দাক্ষিণ্য প্রদর্শন করেন। তারপর সে তাঁহার গুণবাচক নাম ধরিয়া ডাকিতে চায়। অথচ তাঁহার বিভিন্নমুখী গুণাবলির ভিতরে কেবল রহমত ও আদালত গুণই তাহার মনে পড়ে। যেন তাহার কাছে আল্লাহ্‌র অস্তিত্ব আগাগোড়া দয়া ও ইন্‌সাফ হইয়া ধরা দিয়াছে। দয়া ও ইন্‌সাফ ছাড়া সে যেন আল্লাহ্‌র আর কোন পরিচয় পায় নাই। তারপর সে তাঁহার বন্দেগীর জন্য মাথা নত করিয়া বান্দা হইবার আকাঙ্ক্ষা জানায়। সে বলে, শুধু তোমারই কাছে মাথা ঝুকানো যাইতে পারে এবং কেবল তুমিই আমাদের সকল অভাব অভিযোগের প্রতিকার করিতে পার। সে তাহার বন্দেগী ও মদদ উভয়ের জন্য একই শক্তির সঙ্গে নিজকে সংযুক্ত করে। এখানে সে দুনিয়ার সকল ধরনের শক্তি ও সর্বপ্রকারের মানবীয় দাসত্বের বিধিনিষেধের বেড়ী নিমেষে ছিন্ন করিয়া ফেলে। এখন আর কোন আসনের কাছেই সে মাথা নত করিবে না। কোন মানুষের কাছে সে অবনত হইতে পারে না। কাহারও কাছে সাহায্যের জন্য হাত বাড়াইতে চাহে না।

এরপর সে আল্লাহ্‌র কাছে সহজ-সরল পথে চলার শক্তি কামনা করে ! মানুষের প্রাণের একমাত্র প্রার্থনা ইহাই হইতে পারে। কিন্তু সেই সোজা পথ কোন্‌টি ? বিশেষ কোন গোত্রের সোজা পথ ? বিশেষ কোন সম্প্রদায়ের সোজা পথ ? না। দুনিয়ার সকল ধর্মের প্রবর্তকরা, সকল গোত্রের ভাল মানুষেরা সর্বদেশে সর্বকালে সর্বসম্মতভাবে যেই

সোজা পথ অনুসরণ করিয়াছেন, সেই পথ। এভাবে সে অভিশপ্ত ও পথভ্রষ্টদের পথ হইতেও পরিত্রাণ কামনা করে। এখানেও সে কোন গোত্র, সম্প্রদায় বা জাতির কথা উল্লেখ করে না। সে এক কথায় সর্বকালের সর্বদেশের সকল গোত্র ও সম্প্রদায়ের অভিশপ্ত ও বিভ্রান্ত দলের পথ হইতে বাঁচিতে চায়। মোটকথা, সে পাইতে চায় যাহা সার্বজনীন ভাল এবং ছাড়িতে চায় যাহা সার্বজনীন মন্দ। ব্যক্তি, গোত্র, সম্প্রদায় ও দেশ বিশেষের আপেক্ষিক ভাল-মন্দের বিভ্রাটে সে পড়িতে চায় না।

চিন্তা করুন, ধর্মীয় ধ্যান-ধারণার এই ধরনটি মানুষের চিন্তাশক্তি ও অনুভূতির জগতকে কোন্ ছাঁচে গড়িয়া তোলে ? যেই ব্যক্তির মন ও মগজ এই ফ্রেমে গড়িয়া উঠিবে, সে কিরূপ মানুষ হইবে ? অন্তত দুইটি ব্যাপার এখানে আপনি অস্বীকার করিতে পারিবেন না। এক, তাহার আল্লাহ্-অর্চনা পরিচালিত হইবে আল্লাহ্র বিশ্বব্যাপী দয়া ও সৌন্দর্যের ধারণাকে আশ্রয় করিয়া। দুই, কোনক্রমেই সে গোত্র, সম্প্রদায় বা দেশের সীমারেখায় আবদ্ধ থাকিবে না। সে উদ্বুদ্ধ হইবে আন্তর্জাতিক মানবতাবোধে। কুরআনের আহ্বানের ইহাই হইল মূল প্রেরণা।

আল্লাহুম্মা আমীন—ছুম্মা আমীন—আমীন !!

اُفَوِّضُ اَمْرِىْ اِلَى اللّٰهِ اِنَّ اللّٰهَ بَصِيْرٌ بِالْعِبَادِ .

ইফাবা. ২০০২-২০০৩ প্র ২৪২১ (উ)-৫২৫০